বাবা সাহেব

ড: আম্বেদকর

রচনা-সম্ভার

15

বাবা সাহেব

ড. আম্বেদকর রচনা-সম্ভার

বাংলা সংস্করণ

পঞ্চদশ খণ্ড
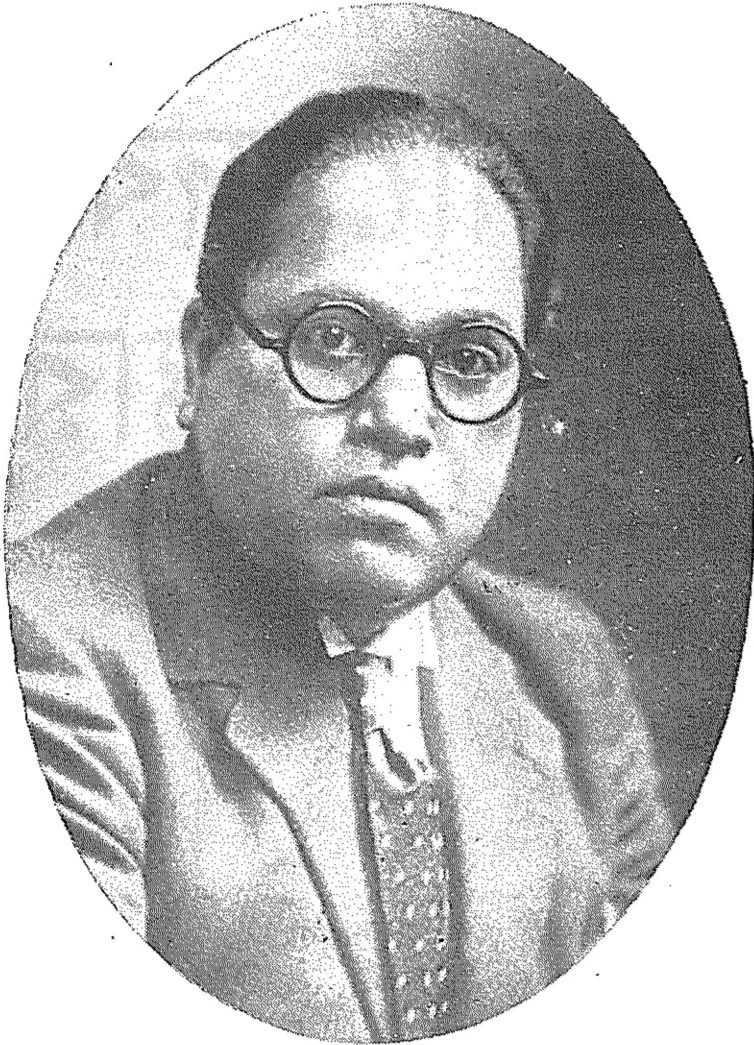
বাবা সাহেব ড. আম্বেদকর

জন্ম : ১৪ এপ্রিল, ১৮৯১ মহা-পরিনির্বাণ : ৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৬

আম্বেদকর রচনা-সম্ভার

সংকলন : ইংরেজি ভাষায়
বসন্ত মুন

অনুবাদ : বাংলা ভাষায়
সৈয়দ কওসর জামাল
শান্তনু পালধি

অনুমোদন : বাংলা ভাষায়
আশিস সান্যাল

পরামর্শ পরিষদ

শ্রীমতী মানেকা গান্ধী
মাননীয়া সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী, ভারত সরকার

আশা দাস, আই. এ. এস
সচিব, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার

শ্রী এস. কে. বিশ্বাস, আই. এ. এস
অতিরিক্ত সচিব, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার

ড. এম. এস. আহমেদ, আই.এ.এস.
যুগ্ম সচিব, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার
সদস্য সচিব, ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

শ্রীমতী কৃষ্ণা ঝালা, আই. এ. এস
সচিব, তফসিলি জাতি ও আদিবাসী
কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ড. ইউ. এন. বিশ্বাস, আই. পি. এস
যুগ্ম নিদেশক (পূর্ব) এবং স্পেশাল আই. জি. পি
কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো, ভারত সরকার

কৃষণ লাল
নিদেশক, ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

অধ্যাপক আশিস সান্যাল
সম্পাদক

মুখবন্ধ

ভারতরত্ন বাবা সাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকর এমন এক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যিনি ইতিহাস, সংস্কৃতি, সামাজিক-রাজনৈতিক বিকাশ, ইত্যাদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। তিনি ছিলেন সত্যিকারের দেশভক্ত এবং ভারতের সব সমস্যার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিনি নিজেই যেন হয়ে গেছেন মহান ভারতের প্রতীক। ভারতের বিভাজন এবং মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র পাকিস্তান গঠনের দাবি সম্বন্ধে ড. আম্বেদকর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর 'পাকিস্তান অর পার্টিশন অব্ ইন্ডিয়া' এক যুক্তিপূর্ণ চিন্তার ফসল, যার মধ্যে রয়েছে আমাদের অতীত ইতিহাস। এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ পাঠ করে বাংলাভাষী বিবেকবান পাঠক সমাজ ভবিষ্যতের দিশা পাবেন এবং ভারত বিভাগের যথার্থ কারণসমূহ বিবেচনা করে যাতে ভারতের ঐক্য এবং অখণ্ডতা বজায় থাকে, সে বিষয়ে সতর্ক হবেন। শক্তিশালী ভারত গঠনে আমাদের সকলের যথাসম্ভব সহযোগিতা অবশ্য কর্তব্য।

শ্রীমতী মানেকা গান্ধী
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী
ভারত সরকার

নতুন দিল্লি
নভেম্বর, ১৯৯৯

AMBEDKAR RACHANA-SAMBHAR
(Collected Works of Dr Ambedkar in Bengali)

Volume-15

Total No Pages : 536 including 12 pages Index

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৯৯
First Published : November, 1999

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ : বিশ্বনাথ মিত্র

প্রকাশক :
ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক,
ভারত সরকার,
নতুন দিল্লি -১১০ ০০১

Published by
Dr Ambedkar Foundation,
Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India,
New Delhi-110 001.

লেজার টাইপ সেটিং এবং প্রিন্টিং
ইমেজ গ্রাফিক্স,
৬২/১, বিধান সরণি,
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

দাম :
সাধারণ সংস্করণ : ৪০ টাকা (Rs. 40/-)
শোভন সংস্করণ : ১০০ টাকা (Rs. 100/-)

বিক্রয় কেন্দ্র :
ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
২৫, অশোক রোড,
নতুন দিল্লি - ১১০ ০০১

পরিবেশক :
পিপলস্ এডুকেশন সোসাইটি,
সি-এফ, ৩৪২, সেক্টর-১,
সল্ট লেক সিটি,
কলকাতা - ৭০০ ০৬৪

‘এক্ষেত্রে আমার অবস্থান একমাত্র না হলেও নির্দিষ্ট। আমি মনে করি না, পাকিস্তানের দাবি শুধু রাজনৈতিক অস্থিরতার ফল, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত হবে। আমি যেভাবে বিবেচনা করেছি তাতে ধারণা, এটি একটি জৈবনিক অবস্থা। কোনও বিশেষ গঠন যেমন শরীরে তৈরি হয়, মুসলিম রাজনীতিতে তেমনি এটি এক গঠনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে তৈরি হয়েছে। শারীরিক গঠনের মতোই এই বৈশিষ্ট্য টিকে থাকবে কি না তা নির্ভর করছে, সেই সব শক্তিগুলির ওপর, হিন্দু ও মুসলমানের অস্তিত্বের সংঘর্ষে যেগুলি খুব-ই ক্রিয়াশীল।’

ড. ভীমরাও আম্বেদকর

‘পাকিস্তান অথবা ভারতভাগ’-এর ভূমিকা থেকে

সদস্য সচিবের কথা

বাবা সাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের অবদান ভারতের নব-জাগৃতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। যুগ যুগ ধরে শোষিত ও দলিত মানুষদের সামাজিক-আর্থনীতিক উন্নতির জন্য তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। শোষিত ও দলিত মানুষদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারেও তাঁর প্রয়াস ছিল নিরলস। দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রয়াস ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাবা সাহেবের স্বপ্নকে মূর্তরূপ দেবার জন্য ভারত সরকার 'আম্বেদকর ফাউন্ডেশন' স্থাপন করেছেন। ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হল :—

(১) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুস্তকালয় স্থাপন, (২) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রবর্তন, (৩) ড. আম্বেদকর বিদেশ-ছাত্রবৃত্তি প্রদান, (৪) ড. আম্বেদকরের নামে অধ্যাপকপদ সৃষ্টি করা, (৫) ভারতীয় ভাষায় বাবা সাহেব ড. আম্বেদকরের রচনা ও বক্তৃতার অনুবাদ প্রকাশ করা, (৬) ড. আম্বেদকর আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদান এবং (৭) দিল্লির ২৬ আলিপুর রোডে ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় স্মারক প্রতিষ্ঠা করা।

এই কার্যক্রম ও প্রকল্পগুলি রূপায়িত করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধী এবং ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের সচিব শ্রীমতী আশা দাস বিভিন্ন সময়ে অমূল্য পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের কাছে প্রকাশ করছি আমার কৃতজ্ঞতা।

বাবা সাহেবের রচনা-সম্ভার হিন্দি সহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করবার এই জাতীয় মহত্ত্বপূর্ণ উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করবার প্রয়াসে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদক, অনুমোদক, সম্পাদক ও মুদ্রক নির্বাচনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন খণ্ড প্রকাশে কিছুটা দেরি হয়েছে। এজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।

বাংলায় পঞ্চদশ খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুব-ই আনন্দিত এবং এর জন্য সম্পাদক শ্রী আশিস সান্যালকে অভিনন্দন জানাই। ধন্যবাদ জানাই ফাউন্ডেশনের নির্দেশক কৃষণ লালকে। এ-ছাড়াও অনুবাদক, অনুমোদক এবং আরও যাঁরা এই কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমার অভিনন্দন।

ফাউন্ডেশন এর মধ্যেই ড. আম্বেদকরের যে সব রচনা-সম্ভার প্রকাশ করেছে, সেগুলি প্রশংসিত হওয়ায় আমি আনন্দিত। সব শেষে জানাই, রচনা-সম্ভার সম্বন্ধে পাঠকের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

ড. এম. এস. আহমেদ
সদস্য-সচিব
ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

নতুন দিল্লি
নভেম্বর, ১৯৯৯

সম্পাদকের নিবেদন

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রাক্ মুহূর্তে যে ভয়ঙ্কর উত্তাল উন্মাদনায় সমগ্র ভারত কম্পিত হচ্ছিল, তার এক আশ্চর্য বিশ্লেষণ ড. আম্বেদকরের 'পাকিস্তান অথবা ভারতভাগ' গ্রন্থটি। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নৈর্বক্তিক দৃষ্টিতে বিষয়টির বিচার করেছেন। অনেকে হয়তো তাঁর সঙ্গে একমত না-ও হতে পারেন। কিন্তু তিনি যে-সব সমস্যাকে তুলে ধরেছেন, তার প্রাসঙ্গিকতা এখনও অস্বীকার করা যায় না। গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই কয়েকটি সংস্করণ বিক্রি হয়ে যায়। মহারাষ্ট্র সরকার ইংরেজি ভাষায় ড. আম্বেদকরের যে রচনা-সম্ভার প্রকাশ করেছেন, তার অষ্টম খণ্ডে সংকলিত আছে এই গ্রন্থটি। ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর রচনা-সম্ভারে বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় গ্রন্থটি পঞ্চদশ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

অন্যান্য খণ্ডের মতো এই খণ্ডে যতদূর সম্ভব বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী মাননীয়া মানেকা গান্ধীর সহযোগিতার কথা স্মরণ করছি। এ ছাড়াও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশনের সদস্য-সচিব ড. এম. এস. আহমদ এবং অন্যান্য আধিকারিকদের কাছে, যাঁদের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া এই প্রকল্প সার্থক হত না। অনুবাদকদেরও ধন্যবাদ জানাই।

অধ্যাপক আশিস সান্যাল
সম্পাদক

কলকাতা
নভেম্বর, ১৯৯৯

সূচিপত্র

অংশ-V

পাকিস্তান

অথবা

ভারত ভাগ

দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

পাকিস্তানের সমস্যা নিয়ে সবার মাথা ব্যথা হলেও সবার চেয়ে আমার যেন বেশিই। এই ভাবনায় আমি এত সময় দিয়েছি যে এখন মনে করলে অনুতাপ হয়, অথচ আরও বেশি দরকারি সাহিত্যকর্মের দিকটা আটকে থেকেছে। আমি তাই আশা রাখি যে, এই দ্বিতীয় সংস্করণেই এটা শেষ হবে। আমার বিশ্বাস এগুলি ফুরনোর আগেই সমস্যার একটা সুরাহা হবে বা বাতিল হবে।

আগের সংস্করণের সঙ্গে এটির চারটি বিষয়ে পার্থক্য আছে।

প্রথম সংস্করণে* অনেক ছাপার ভুল থেকে গিয়েছিল, যা নিয়ে অনেক পাঠক সমালোচক অনুযোগ করেছেন। এই সংস্করণ প্রকাশের সময় আমি সতর্ক থেকেছি যাতে এ বিষয়ে কোনও অভিযোগ আর শুনতে না হয়। প্রথম সংস্করণে বইটির তিনটে অংশ ছিল। পঞ্চম অংশটি বর্তমান সংস্করণে যুক্ত হয়েছে। এখানে পাকিস্তানের সমস্যার সঙ্গে জড়িত নানা বিষয়ে আমার নিজের মতামত আছে। এই অংশটি যোগ করেছি এই কারণে যে, বইয়ের প্রথম সংস্করণ সম্পর্কে অভিযোগ ছিল যে, বিষয়টির ওপর আমি আমার মতামত জানাই নি। আর একটি ব্যাপারে বর্তমান বইটি পৃথক। প্রথম সংস্করণের মানচিত্রগুলো রেখেছি, কিন্তু অনেক পরিশিষ্টের সংযুক্তি ঘটেছে। প্রথম সংস্করণে পরিশিষ্ট ছিল মাত্র এগারোটি, আর বর্তমান সংস্করণে আছে পঁচিশটি। এই সংস্করণে আমি একটা নির্ঘণ্ট'ও যোগ করেছি, যা প্রথমটিতে ছিল না।

বইটি এক বাস্তব চাহিদা মিটিয়েছে বলেই মনে হয়। এই বইয়ের অন্তর্গত চিন্তা-ভাবনা ও যুক্তিগুলিকে কিভাবে লেখক, রাজনীতিবিদ এবং খবরের কাগজের সম্পাদকরা ব্যবহার করেছেন নিজেদের সপক্ষে, তা আমি দেখেছি। দুঃখ এই যে, কৃতজ্ঞতা স্বীকারের সৌজন্যটুকুও তাঁরা রক্ষা করেননি; যখন তাঁরা আমার শুধু যুক্তি নয়, এই বইয়ের ভাষা পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন। তবে আমি এতে কিছু মনে করি না। বরং আনন্দিত যে, এই বইটি উপকারে এসেছে সেইসব ভারতবাসীর কাছে যাঁরা পাকিস্তান সমস্যার জটিলতার মুখোমুখি হয়েছেন। শ্রী গান্ধী ও শ্রী জিন্নাহ্ তাঁদের সাম্প্রতিক কথাবার্তায় এই বইটিকে প্রামাণ্য বলে উল্লেখ করেছেন এবং

* প্রথম সংস্করণে দুর্ভাগ্যক্রমে অসাবধানতাবশত প্রুফ দেখার ভুলে বাংলার বিভিন্ন জেলায় জনসংখ্যার উল্লেখে এবং মানচিত্রে অনেক অমিল থেকে যায়। মানচিত্রে যে দুটি জেলা পাকিস্তানে দেখানো উচিত ছিল, তা বাদ যায়। বর্তমান সংস্করণে, এই ভুল সংশোধন করা হয়েছে এবং জনসংখ্যার উল্লেখ স্বাভাবিক করা হয়েছে।

বইটির সারবত্তা প্রমাণের পক্ষে এটাই যথেষ্ট।

বইয়ের নাম থেকে মনে হতে পারে যে, পাকিস্তানের নানা বিষয় এতে আলোচনা করা হয়েছে, আসলে কিন্তু আরও অনেক কিছু আছে। এটি ভারতের ইতিহাস ও ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রদায়িক দিকগুলির একটা বিশ্লেষণমূলক উপস্থাপনা। সুতরাং পাকিস্তান বিষয়ে প্রাথমিক বিষয়গুলিও এখানে আলোচিত হয়েছে। বইটি তাই শুধু পাকিস্তান বিষয়ে নিবন্ধ নয়। ভারতের ইতিহাস ও রাজনীতি সম্পর্কিত যে সব বিষয় এখানে আছে, তার পরিধি এত বড় ও বিচিত্র যে, বইটিকে ভারতের রাজনৈতিক অভিধানও বলা যেতে পারে।

বইটি হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে অখুশি করেছে, যদিও হিন্দুদের অখুশি হওয়ার কারণ মুসলমানদের অখুশি হওয়ার কারণ থেকে ভিন্ন। বইটিকে যে এইভাবে গ্রহণ করা হয়েছে তাতে আমি দুঃখিত নই। হিন্দুরা এটিকে স্বীকার করে নি এবং মুসলমানরাও এটিকে গ্রহণ করে নি, এ থেকে প্রমাণিত হয় উভয়ের বদগুণগুলি এতে নেই এবং চিন্তার স্বাধীনতা ও তথ্যের নির্ভয় প্রকাশের দিক থেকে বইটিতে কোনও দলীয় উপস্থাপনা হয়নি।

কিছু লোক আহত হয়েছেন কেননা আমি যা বলেছি তা তাদের আহত করেছে। স্বীকার করা ভালো যে, আমার মতামত কোনও ব্যক্তি বা শ্রেণীকে আহত করার ভয়ে প্রভাবিত হয়নি। এর জন্যে আমি দুঃখিত হলেও অনুতপ্ত নই। যাঁদের ক্ষুণ্ণ করেছি, তাঁরা আমার অভীষ্টের নিস্পৃহতা ও সততার কথা চিন্তা করে আমাকে নিশ্চয় ক্ষমা করবেন। আবেগবর্জিত এ রচনা, এমন দাবি করি না। কিন্তু এটা বলা যেতে পারে যে, কোনও পক্ষপাত নেই। এটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার যে, কোনও ভারতীয় তার দেশের সম্পর্কে বলার সময় ও তার সময়ের কথা ভাবার সময় শান্ত থাকতে পারবে। পাকিস্তান প্রশ্নে আলোচনার সময় আমি যেভাবে দেখেছি, তার একটি নিখুঁত, কখনও কখনও সংকেতপূর্ণ ছবি তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য। দু'পক্ষেরই যে সব ভালো দিক ও মন্দ দিক আমি লক্ষ্য করেছি তা সরাসরি তুলে ধরেছি। গোঁড়া ও অবাস্তব কর্মপন্থার মাধ্যমে যে খারাপ প্রভাব সৃষ্টি হবে তা দেখিয়েছি বেশ কষ্ট করেই।

রাষ্ট্র শক্তির সঙ্গে অন্তর্গত রাষ্ট্র বিরোধী জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে ইতিহাসের সাক্ষ্য দ্ব্যর্থবাহক না হলে খুব নিশ্চিত নয়। অধ্যাপক ফ্রীডমান [১] যেমন লক্ষ্য করেছেন :

---

১. দি ক্রাইসিস অব্ দি ন্যাশনাল স্টেট (১৯৪৩), পৃষ্ঠা-৪।

'এমন একটিও আধুনিক রাষ্ট্র নেই যা কোনও না কোনও সময় অবাধ্য জাতীয় অংশকে তার বশে আনতে বাধ্য করেনি। স্কটরা, ব্রেটনরা, কেটালনরা, জর্মনরা, পোল্যান্ডবাসী, চেকরা, ফিনল্যান্ডের লোক—সবাইকে কোনও না কোনও সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও শক্তিশালী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মেনে নিতে হয়েছে। গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সে যেমন হয়েছে, প্রায়-ই বলপ্রয়োগের মধ্যে দিয়েই রাষ্ট্র কর্তৃত্ব ও দেশীয় ঐক্যের সহযোগিতা ও সমন্বয় তৈরি হয়েছে। কিন্তু জর্মন, পোল্যান্ড, ইটালি এবং মধ্য ইউরোপের দেশগুলির মতো অনেক ক্ষেত্রেই জাতীয়তাবাদের শক্তিগুলি রাষ্ট্র ক্ষমতার বন্ধনী থেকে বেরিয়ে নিজেদের জন্যে পৃথক রাষ্ট্র গঠন না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয়নি ...'।

গত সংস্করণে আমি সেই সব দেশের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছি, যেখানে রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদকে অর্থহীনভাবে অবদমন করতে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। এই সংস্করণে আমি পাশাপাশি উল্টো অভিজ্ঞতার কথাও যোগ করেছি যেখানে অন্য কিছু দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির পক্ষে এক রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস করা অসম্ভব ছিল না। বলা হতে পারে যে, দু'পক্ষকেই উপদেশ দিতে গিয়ে আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ শব্দ ব্যবহার করেছি। আমি যদি এমন করে থাকি, তার কারণ আমি অনুভব করেছি যে, চিকিৎসক যেমন শরীরের নিঃসাড় অংশকে সচল করতে সেই অংশের মূল প্রণালীতে ঘা দেন, তেমনি আত্মসন্তুষ্ট ও অসচেতন সাধারণ ভারতবাসীকে পরিপার্শ্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে এই পদ্ধতি দরকার হয়েছে। আশা করি, আমার এই প্রচেষ্টায় উদ্দিষ্ট ফল পাওয়া যাবে।

এই মুখবন্ধ শেষ করার আগেই অবশ্যই ধন্যবাদ জানানো দরকার বোম্বাইয়ের খালসা কলেজের অধ্যাপক মনোহর বি. টিটনিস এবং শ্রী কে. ভি. চিত্রেকে, যাঁরা প্রথম সংস্করণের সমস্ত মুদ্রণ ত্রুটি শুধরে এই সংস্করণ যাতে ত্রুটিমুক্ত হয়, তা দেখার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। অধ্যাপক টিটনিসের কাছে আমি আরও কৃতজ্ঞ এই জন্যে যে, তিনি বইয়ের যে নির্ঘণ্টটি* এর উপযোগিতা বাড়িয়েছে সেটি তৈরি করেছেন।

১ জানুয়ারি, ১৯৪৫ বি. আর. আম্বেদকার
২২, পৃথ্বিরাজ রোড
নিউ দিল্লী

* স্কট—স্কটল্যান্ডে বসবাসকারী আয়ারল্যান্ডের গেইল ভাষাভাষী লোক;
ব্রেটন—ফ্রান্সের বৃটানি প্রদেশের অধিবাসী;
কেটালন—স্পেনের পূর্ব সীমান্তবর্তী অঞ্চল কেটানোলিয়ার অধিবাসী।
—বাংলা সংস্করণের সম্পাদকের সংযোজন

* বাংলা সংস্করণে এই নির্ঘন্ট অনুসরণ করা হয় নি।

প্রস্তাবনা

দীর্ঘ একটি ভূমিকা সম্বলিত হয়ে আমার রচনা শুরু হচ্ছে বলে একথা বলা যেতেই পারে যে আর কোনও প্রস্তাবনার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু রচনার শেষে একটি উপসংহার থেকে যাওয়ায় একটা প্রস্তাবনা যোগ করা হল এই কারণে যে, প্রথমত, উপসংহারটিকে প্রস্তাবনা দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যাবে এবং দ্বিতীয়ত, এর মাধ্যমে একটা সুযোগ পাওয়া গেল যাতে আগ্রহী পাঠককে এই রচনার উৎস সম্পর্কে জানানো যাবে এবং আলোচিত বিষয়গুলির গুরুত্ব সম্পর্কে তার মনে একটা ভাব তৈরি করা যাবে। আগ্রহ নিরসনের জন্যে বলব যে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি' (সংক্ষেপে আই. এল. পি.) নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন কমবেশি তিন বছর ধরে বিরাজ করছে। রাজনীতিতে অভিজ্ঞ এমন দাবি করার মতো খুব পুরনো সংগঠন এটি নয়। বার্ধ্যক্যজনিত বুদ্ধিভ্রম, যাকে দ্বিতীয় শৈশব নামে ডাকা যায়, তা আই. এল. পি.-কে গ্রাস করেনি। অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের তুলনায় আই. এল. পি. তরুণ ও দারুণ কর্মঠ সংগঠন, যাকে কোনও কৌশলে বা স্বার্থের লোভে প্রভাবিত করা যাবে না। মুসলিম লীগ কর্তৃক পাকিস্তান সম্পর্কে 'লাহোর প্রস্তাব' গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আই. এল. পি.-র নির্বাহি পরিষদ এই পাকিস্তান পরিকল্পনা বিষয়ে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে তা নির্ধারণ করছে আলোচনায় বসে। পরিষদ দেখে যে পাকিস্তান পরিকল্পনার যে অন্তর্গত ধারণা তার কোনও বিরোধিতার প্রয়োজন নেই। তবে যাই হোক, পরিষদ সেই পরিস্থিতিতে এক স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসা যথার্থ মনে করেনি। সুতরাং পরিষদ বিষয়টিকে বিচার করে একটা প্রতিবেদন দেবার জন্যে এক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। কমিটিতে যাঁরা ছিলেন তাদের মধ্যে—চেয়ারম্যান হিসাবে আমি এবং অধ্যক্ষ এম. ভি. দোন্ডে, বি. এ.; সদস্য হিসাবে শ্রী এস. সি. যোশি, এম. এ. এল. এল. বি., এ্যাডভোকেট, (ও.এস) এম. এল. সি. (ও.এস) শ্রী আর আর ভোলে, বি. এস. সি., এল. এল. বি., এম. এল. এ.; শ্রী ডি জি যাদব, বি. এ., এল. এল. বি., এম. এল. এ.; এবং শ্রী এ. ভি. চিত্রে, বি. এ., এম. এল. এ.—সবাই আই এল পি-র। শ্রী ডি ভি প্রধান, সদস্য, বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন, কমিটির সচিব হিসাবে কাজ করেছিলেন। কমিটি আমাকে পাকিস্তান বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে বললে আমি তা করে দিই। এই প্রতিবেদন নির্বাহি পরিষদের কাছে দাখিল করা হয় এবং পরিষদ্ সিদ্ধান্ত নেয় যে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হবে। এক্ষণে প্রকাশিত নিবন্ধ হল সেই প্রতিবেদন।

এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য হল পাকিস্তান বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুদের সহায়তা করা, যাতে তারা নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। এই উদ্দেশ্য মাথায় রেখে আমি শুধু সমস্ত প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্যই দিইনি, ১৪টি পরিশিষ্ট* ও তিনটি মানচিত্রও যুক্ত করেছি, যা আমার মতে গ্রন্থের প্রয়োজনীয় সংযোজন।

গ্রন্থভুক্ত উপাদানগুলি শুধু পাঠ করলেই যথেষ্ট হবে না, পাঠকের এইসব নিয়ে ভাবনা-চিন্তাও দরকার। কার্লাইল (Carlyle) তাঁর প্রজন্মের ইংরেজদের উদ্দেশে যে সর্তকবাণী করেছিলেন, তা আমি এই বইয়ের পাঠককেও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। কার্লাইল বলেছিলেন—

'ইংল্যান্ডের প্রতিভা এখন আর দুরন্ত যৌবন হাঁকিয়ে বিশ্বকে অগ্রাহ্য করে ঝড়ের ভিতর ঈগলের মতো ঊর্ধ্বপানে, সূর্যের দিন এগোয় না ...ইংল্যান্ডের প্রতিভা এখন লোভী উটপাখির মতো খাদ্য ও নিজস্ব চামড়া বাঁচাতে ব্যগ্র ...সে তার উটপাখির মাথা যে কোনও আশ্রয়ের মধ্যে গুঁজতে চায়, এবং এইকারণে সে যে কোনও একটা অজুহাতের অপেক্ষা করে থাকে। এমন বিষয় দেরিতে হলেও মনে হয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। উটপাখি শাদামাঠা খাদ্য ও ভ্রূণের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে থাকলেও একদিন উঠতেই হবে। আর তা ঘটার আগেই উঠে পড়া ভালো। দেবতারা ও মানুষ আমাদের জাগিয়েছে। আমাদের পুর্ব পুরুষদের কণ্ঠস্বর ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে সবার কানে পৌছাচ্ছে, আমাদেরকে জাগাতে'।

আমার বিশ্বাস, এই সতর্কবাণী বর্তমান অবস্থায় ভারতবাসীদের জন্যেও প্রযোজ্য। তারা যদি এতে কর্ণপাত না করেন, তবে ক্ষতি তাদেরই।

এবারে এই প্রতিবেদন তৈরিতে যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে দু' একটা কথা জানাই। শ্রী এম. জি টিপনিস, ডি. সি. ই. (কলাভুবন, বরোদা) ও শ্রী ছগনলাল এস মোদি দারুণভাবে সহায়তা করেছেন এ কাজে—প্রথমোক্ত ব্যক্তি মানচিত্রগুলি তৈরি করেছেন, আর দ্বিতীয় জন পাণ্ডুলিপি টাইপ করেছেন। শুধু ভালোবাসার খাতিরে তাঁরা এই শ্রম করেছেন, আমি তাঁদের কাজের জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ প্রাপ্য আমার বন্ধু শ্রী বি. আর কাদরেকার ও শ্রী কে. ভি. চিত্রের, সবচেয়ে নিরুৎসাহের কাজ প্রুফ দেখা ও মুদ্রণের তদারকি করার জন্যে।

২৮ ডিসেম্বর ১৯৪০ **বি. আর. আম্বেদকার**

'রাজগৃহ'

দাদার, বোম্বে-১৪

---

* দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য। বর্তমানে ২৫টি পরিশিষ্ট রয়েছে।

ভূমিকা

মুসলিম লীগের পাকিস্তান সিদ্ধান্তে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ এটিকে রাজনৈতিক এক হীনরোগ হিসাবে দেখেছেন, যার দ্বারা মানুষ সচেতন ঐক্য ও ক্ষমতার শৈশবে আক্রান্ত হয়। অন্যরা এটিকে মুসলমান মানসের এক স্থায়ী ছাঁচ হিসাবে দেখেছেন, যা সাময়িক অবস্থা মাত্র নয়. এবং ফলত তারাই বেশি উদ্বিগ্ন হচ্ছেন।

প্রশ্নটি নিঃসন্দেহে বিতর্কিত। বিষয়টি এত শক্ত যে, এ সম্পর্কে যতো যুক্তি পক্ষে বা বিপক্ষে হতে পারে সব-ই দেখাচ্ছেন দু'পক্ষই। কারও যুক্তি হল, ভারতকে দুটি রাজনৈতিক সত্তায় বিভক্ত করে স্বতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্গত করা এক দুর্বল কল্পনা মাত্র। অন্যরা দেশের ঐক্যকে খণ্ডিত করার এই যথেচ্ছ প্রচেষ্টাকে মানতে পারছেন না, কেননা তাদের মতে দেশ শত শত বছর ধরে অখণ্ডিত, এই কারণে তারা এত ক্রুদ্ধ যে, চিন্তাকে ঠিকমত প্রকাশ করতে পারছেন না। অন্যদের ভাবনা হল এই যে, ব্যাপারটাকে এত গুরুত্ব দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। তারা মনে করছে, এটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার। তাই বিষয়টিকে উপমা ও রূপকের মাধ্যমে উড়িয়ে দিতে চাইছে। 'মাথা ব্যথা সারানোর জন্যে কেউ মাথাটাকেই কেটে ফেলে না', 'দু'জন স্ত্রীলোক একটি শিশুর ওপর মাতৃত্বের দাবিতে বিবাদ করছে বলে শিশুটিকে দুভাগ করে কেটে ফেলতে পার না'—পাকিস্তান পরিকল্পনার অবাস্তবতা প্রমাণ করতে গিয়ে এমন অনেক বাক্যালঙ্কারের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে। শুধু আবেগের স্তরে এই বিতর্ক চলতে থাকলে অবাক হবার কিছু থাকে না, যদি ভাবাবেগহীন কোনও সন্ধিৎসু এসবের মধ্যে বুদ্ধির চেয়ে ভ্রম, আলোর চেয়ে উত্তাপ এবং গাম্ভীর্যের চেয়ে বিদ্রূপের প্রাধান্য দেখে।

এক্ষেত্রে আমার অবস্থান একমাত্র না হলেও নির্দিষ্ট। আমি মনে করি না পাকিস্তানের দাবি শুধু রাজনৈতিক অসুস্থতার ফল, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত হবে। আমি যেভাবে বিবেচনা করেছি তাতে মনে হয় এটি একটি জৈবনিক অবস্থা। কোনও বিশেষ গঠন যেমন শরীরে তৈরি হয়, মুসলমান রাজনীতিতে তেমনি এটি এক গঠনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে তৈরি হয়েছে। শারীরিক গঠনের মতোই এই বৈশিষ্ট্য টিকে থাকবে কি না তা নির্ভর করছে সেই সব শক্তিগুলির ওপর, হিন্দু ও মুসলমানের অস্তিত্বের সংঘর্ষে যেগুলি খুবই ক্রিয়াশীল। পাকিস্তান চিন্তায় আমি দুর্বল

হয়ে পড়ছি না, তাচ্ছিল্যভরেও তাকে দেখছি না, আবার এও বিশ্বাস করি না যে, উপমা ও রূপকের বাক্যবাণে তাকে নির্মূল করা যাবে। যাদের ধারণা উপমার সাহায্যে একে রোধ করা যাবে, তাদের মনে রাখা উচিত যে, অর্থহীন বিষয়কে ছড়ার মধ্যে দিয়ে বললেই অর্থহীনতা দূর হয় না, আর রূপক কখনও যুক্তি নয়, তবে এর ব্যবহারে কখনও কোনও কথা সরাসরি পৌঁছে দেওয়া যায় ও এর সাহায্যে মনে গেঁথে দেওয়া যায়। আমি বিশ্বাস করি যে, পরিকল্পনাটিকে সরাসরি বাতিল করে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, অবশ্য যদি এই পরিকল্পনার পিছনে ভারতের মুসলমানদের শতকরা নব্বই অংশের ভাবাবেগ কাজ করে। আমি নিঃসন্দেহ যে, পাকিস্তানের প্রতি যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি হল বিষয়টিকে সম্যকভাবে বিচার করা, তাৎপর্য জানা এবং সে সম্পর্কে এক বুদ্ধিদীপ্তি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

এসব সত্ত্বেও, পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, এই বই কি মরশুমি ফল যা খেয়ে শরীর সতেজ রাখার মতো কোনও মরশুমি বিচার? তা যদি হয়, তবে কি তা পাঠ-যোগ্য? এসব স্বাভাবিক প্রশ্ন এবং একজন লেখক, যার উদ্দেশ্য হল পাঠককে আকর্ষণ করা, সে এই ভূমিকার সদ্ব্যবহার করবে।

বইটির সমসাময়িকতা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। মানতেই হবে যে, গত ২০ বছরে ভারতীয়দের মধ্যেই ভারতকে দেখার পদ্ধতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ভারত সম্পর্কে অধ্যাপক আরনল্ড টয়েনবি (১৯১৫) লিখেছিলেন :

'ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ রাজনৈতিক বিচারে ভারতকে 'নিদ্রিত সুন্দরী' হিসাবে দেখা হয়েছে, উত্থিত হলে যাকে প্রেম নিবেদনের অধিকার ব্রিটেনের আছে। তাই সে নিদ্রিত সুন্দরীর চারপাশে বাগানে কাঁটার বেড়া দিয়েছে যাতে বাইরে ওঁৎ পেতে থাকা লুণ্ঠনকারীদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করা যায়। রাজকুমারী এখন নিদ্রা থেকে উঠেছে এবং দাবি করছে, পাণি-প্রদানের স্বাধিকার, আর লুণ্ঠনকারীরা নিজেদের সম্মানীয় ভদ্রলোক করে তুলে বাগানের চারদিকের মরুভূমিকে বাগান করে তুলতে ব্যস্ত; বাধা শুধু ব্রিটিশ কাঁটাঝোপের বেড়া। ওরা যখন বিনীতভাবে এই বেড়া সরিয়ে ফেলতে অনুরোধ করে, তখন আমাদের সম্মতি দেওয়াই ভালো, কারণ নিজেদের যথেষ্ট শক্তিশালী করে তবেই তারা দাবি করবে। আমরা না মানলে পরিণামে যা ঘটবে, ভারতীয় রাজকুমারীর সহানুভূতি আর আমাদের দিকে থাকবে না। এখন জাগরিত হয়ে সে তার প্রতিবেশীদের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করছে, নিজেকে রক্ষা করার সামর্থ তার আছে এমন ধারণা থেকে সে এখন ওদের মতোই বিমর্ষ তার বাগানের চারপাশে কাঁটাঝোপের বেড়ার মধ্যে আটকে রাখার জন্যে।

'আমরা যদি তার সঙ্গে বিচক্ষণতাপূর্ণ ব্যবহার করি, ভারত কখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আত্মিক ভ্রাতৃত্ব থেকে বেরিয়ে যাবে না। কিন্তু এটা অবশ্যম্ভাবী যে, আমাদের ক্রমশই বেশি করে তাকে নিজস্ব জীবনের স্বাধীনতা দিতেই হবে, এবং তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে অ্যাংলো স্যাক্সন কমনওয়েলথ্-এর আদর্শ অনুসরণ করতে হবে'...।

অধ্যাপক টয়েনবি ইংরাজ লেখক হলেও ১৯১৫ সালে যে মতামত তিনি প্রকাশ করেছিলেন, তা মোটামুটিভাবে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব ভারতীয়ের-ই মত। টয়েনবি কথিত 'নিদ্রিত সুন্দরী' ভারত আজ জেনেছে, ভারতীয়রা এখন তাকে নিয়ে কী ভাবছে? এই প্রশ্নে কোনও সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই যে, যারা এই সুপ্ত সুন্দরীর সাম্প্রতিক আচরণ দেখেছে, তারাই জানে যে, যা ধরে নেওয়া হয়েছিল সেরকম হওয়ার বদলে তাকে এক অদ্ভুত প্রাণী বলেই মনে হয়। সে এক পাগল তরুণী—অর্ধেক মানবী আর অর্ধেক জন্তুর মতো দ্বৈত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সর্বদা কম্পমান তার এই দ্বৈত প্রকৃতির বিরোধে। তার দ্বিধা ব্যক্তিত্ব নিয়ে কারও কোনও সন্দেহ থাকলে, এখন ভারতকে দুভাগ করে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানে পরিণত করার দাবিতে তা দূরীভূত হবে। নিজ নিজ সংস্কৃতির পরে সুখকর পৃথক গৃহ নির্মিত হলেই একে অপরের থেকে মুক্ত হয়ে দ্বৈত চরিত্রজনিত দ্বন্দ্ব থেকেও যেন মুক্তি পায়।

একথা প্রশ্নাতীত যে, পাকিস্তান একটি পরিকল্পনা এবং তাকে বিবেচনা করতে হবে। মুসলমানরা এই পরিকল্পনা বিবেচনার জন্য পীড়াপীড়ি করবে। ইংরাজরা চাইবে যে, তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা শেষ হবার আগে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এমন একটা বুঝাপড়া হোক যাতে তাদের সম্মতি থাকবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই বুঝাপড়া এমন শর্ত দিলে ইংরাজদের দোষ দেওয়া যাবে না। আগ্রাসী হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর ক্ষমতা সঁপে সংখ্যালঘুদের তাদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে নিশ্চয় ইংরাজদের সম্মতি থাকবে না। তাদের সাম্রাজ্যবাদের পরিসমাপ্তি ঘটবে না, অন্য আর এক ধরনের সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হবে। সুতরাং পাকিস্তান প্রশ্নের মুখোমুখি না হয়ে হিন্দুদের উপায় নেই।

পাকিস্তান পরিকল্পনা বিবেচনা যদি করতেই হয় এবং বস্তুত তা করতেই হবে, তাহলে কিন্তু কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে।

প্রথম বিষয় হল, হিন্দু ও মুসলমানদের এই প্রশ্নের মীমাংসা নিজেদের-ই করতে হবে। অন্য কারও সহায়তা নেওয়া যাবে না। অবশ্যই এটা আশা করা যাবে না যে, ইংরাজরা তাদের হয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেবে। সাম্রাজ্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে,

ভারত এক থাকল বা পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানে বিভক্ত হল কিংবা কংগ্রেসের প্রস্তাব মতো যদি বিশটা ভাষাগত অঞ্চলে টুকরো হয়, ইংরাজদের তাতে কিছু এসে যায় না। তারা এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না এই সহজবোধ্য কারণে যে, এই আঞ্চলিক বিভক্তীকরণে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না।

আবার হিন্দুরা যদি আশা করে যে, ইংরাজরা শক্তি প্রয়োগ করে পাকিস্তানকে দমন করবে, তাও অসম্ভব। প্রথমত, শক্তি প্রয়োগ কোনও সমাধান নয়। শক্তি ও প্রতিরোধের অসার্থকতার কথা অনেক দিন আগেই বার্ক (Burke) আমেরিকান কলোনিতে শক্তি প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর ভাষণে বলেছেন। শুধু হিন্দু মহাসভার হিতার্থেই নয়, সবার স্বার্থেই বার্কের স্মরণীয় কথাগুলি উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

তিনি বলেছিলেন—

'শুধুমাত্র শক্তির ব্যবহার সাময়িক। এ অবস্থা কিছুক্ষণ স্থায়ী হতে পারে, কিন্তু পুনঃপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা দূর হয় না : একটা জাতিকে সব সময় বিজিত রেখে শাসন করা যায় না। শক্তির বিরুদ্ধে পরবর্তী যুক্তি হল এর অনিশ্চয়তা। সন্ত্রাস সব সময় শক্তির ফল নয়, আর একটি সৈন্যদলের অর্থ নয় জয়। তুমি যদি জয় লাভ না করো, তার মানে তোমার সম্পদ নেই; কেননা শান্তি স্থাপনা ব্যর্থ হলে শক্তি থেকেই যায়, কিন্তু শক্তি ব্যর্থ হলে পুনরায় শান্তি সংস্থাপনের কোনও আশাই থাকে না। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কখনও দয়ার্দ্রতা দিয়ে ক্রয় করা যায়, কিন্তু কখনোই তা পরাজিত হিংসার ভিক্ষা হিসাবে আসে না। শক্তির বিরুদ্ধে আরও এক যুক্তি হল, তুমি তোমার প্রচেষ্টায় যে লক্ষ্যে পৌঁছতে চাইছো, তাকেই তুমি দুর্বল করে দিচ্ছো। যার জন্যে তুমি লড়ছো (জনগণের আনুগত্য জয়) তার পরিবর্তে তুমি যা উদ্ধার করছো তা হল ক্ষয়ে যাওয়া, নিমজ্জিত, ব্যয়িত ও বিলীন কিছু'।

পাকিস্তানের পরিবর্ত হিসাবে বলপ্রয়োগে দমন করার প্রস্তাব তাই অচিন্ত্য।

আবার আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতির উপকারিতা থেকে মুসলমানদের বঞ্চিত করাও যাবে না। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারে বিশ্বাসী হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা প্রশ্ন তোলেন, ইউরোপের ছোট ছোট জাতিগুলির ক্ষেত্রে বিশ্ববিবেক যা মেনে নিয়েছে, ব্রিটেন তা ভারতকে দিতে অস্বীকার করবে কী করে। তাহলে, এক-ই নিঃশ্বাসে তারা অন্য সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে ব্রিটেনকে তা দিতে অস্বীকার করার কথা বলতে পারে না। যে হিন্দু জাতীয়তাবাদী আশা করেন যে, পাকিস্তানের পরিকল্পনা ত্যাগ করতে ব্রিটেন

মুসলমানদের ওপর বলপ্রয়োগ করবে, তিনি ভুলে যান যে, আগ্রাসী বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে জাতীয়তাবাদী শক্তির স্বাধীনতার অধিকার এবং আগ্রাসী সংখ্যাগরিষ্ঠের জাতীয়তাবাদের হাত থেকে সংখ্যালঘুর স্বাধীনতার অধিকার দু'টিই কোনও আলাদা ব্যাপার নয়—শেষেরটির চেয়ে প্রথমটি বেশি পবিত্র জায়গায় সংস্থাপিত তাও নয়। দুটিই স্বাধীনতা সংগ্রামের দুটি ভিন্ন দিক, তাই নীতির দিক থেকে উভয়েই অভিন্ন। আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্তি চাইছেন যে জাতীয়তাবাদীরা, তারাই আবার আক্রমণাত্মক গরিষ্ঠতার জাতীয়তাবাদ থেকে মুক্তিকামী সংখ্যালঘুর অধিকারকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের-ই সাহায্য নিয়ে বানচাল করতে পারেন না। সুতরাং ব্যাপারটি শুধুমাত্র হিন্দু ও মুসলমানেরই সিদ্ধান্তের ব্যাপার। ইংরাজরা তাদের হয়ে সে কাজ করতে পারে না। এই বিষয়টি সর্বপ্রথম মাথায় রাখতে হবে।

পাকিস্তানের মূল কথা হল, সারা ভারত ব্যাপী একটি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। পাকিস্তান প্রকল্প দুটি কেন্দ্রীয় সরকার চায়—একটি পাকিস্তানের জন্যে, অন্যটি হিন্দুস্থানের জন্যে। এখান থেকে দ্বিতীয় মুখ্য বিষয় উঠে আসছে, যা ভারতীয়দের মনে রাখা দরকার। এই বিষয়টি হল এই যে, পাকিস্তান সম্পর্কিত যা কিছু সিদ্ধান্ত, তা গ্রহণ করতে হবে নতুন সংবিধান রচনার পরিকল্পনা গ্রহণের আগেই। ভারতের জন্য যদি একটি কেন্দ্রীয় সরকার রাখতে হয়, তাহলে তার সাংবিধানিক কাঠামোটা হবে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের জন্য পৃথক কেন্দ্রীয় সরকারের উপযোগী সাংবিধানিক ব্যবস্থা থেকে আলাদা। তা যদি হয়, তবে সিদ্ধান্ত যা নেওয়ার তাকে পিছিয়ে দেওয়া যাবে না। হয় পরিকল্পনাটি বাতিল করতে হবে বা সর্বসম্মতভাবে অন্য কোনও পরিবর্তিত পরিকল্পনা নিতে হবে, না হলে এ বিষয়েই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এমন ধারণা করা মারাত্মক ভুল হবে যে, সাময়িকভাবে যদি পাকিস্তান প্রসঙ্গ চাপা পড়ে যায়, তাহলে তা আর কখনও মাথা তুলবে না। আমি নিশ্চিত, পাকিস্তান প্রসঙ্গ চাপা দেওয়া আর পাকিস্তানের ভূতকে চাপা দেওয়া এক ব্যাপার নয়। একক কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধতা যতদিন থাকবে, পাকিস্তানের ভূত ততদিন ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ওপর কালো ছায়া মেলে থাকবে। স্থায়ী কোনও সমাধানের বিষয়টি ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রেখে কোনও সাময়িক ব্যবস্থা করাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এটা হবে রোগ দূর না করে উপসর্গের চিকিৎসা করা মাত্র। তবে এইসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, অসুখ গভীরে চলে যায় এবং আরও সাংঘাতিকভাবে মাঝে মাঝেই তার প্রকোপ দেখা দেয়।

আমি নিশ্চিত যে, ভারতে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার থাকবে কি না, সে বিষয়টি এখন নির্ধারিত হয়নি। এটি এমন না হলেও যে কোনও বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

মুসলমানরা সরাসরি ঘোষণা করেছে যে, তারা ভারতে কোনও কেন্দ্রীয় সরকার চায় না এবং স্পষ্ট করেই তারা তাদের যুক্তি দেখিয়েছে। তারা মুসলমান অধ্যুষিত এমন পাঁচটি রাজ্য তৈরিতে সমর্থ হয়েছে। এই রাজ্যগুলিতে তারা মুসলমানদের তৈরি সরকার গঠনের সম্ভাবনা দেখছে। তারা এও দেখতে উৎসুক যে, এই রাজ্যগুলিতে মুসলমান সরকারের স্বাধীনতা রক্ষিত থাকছে। এইসব বিবেচনা করে তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে ভারতীয় মুসলমানদের চক্ষুঃপীড়ার কারণ মনে করছে। কেন্দ্রীয় সরকার মানেই এইসব মুসলমান রাজ্যগুলিকে হিন্দুদের অধীনস্থ করা এবং তাদের শাসন ব্যবস্থায় নাক গলানোর ব্যবস্থা। মুসলমানরা মনে করছে যে সারা ভারতের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ হল হিন্দু কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে মুসলমান রাজ্য সরকারগুলিকে তুলে দেওয়া এবং মুসলমান রাজ্যগুলি গঠনের মধ্য দিয়ে তারা যে সাফল্য পেয়েছে তা কেন্দ্রের হিন্দু সরকারের অধীনতায় মূল্যহীন হয়ে পড়বে। মুসলমানরা তাই হিন্দু কেন্দ্রীয় শাসনের অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে কোনও কেন্দ্রীয় সরকারই চায় না।[১]

শুধু কি মুসলমানরাই কেন্দ্রীয় সরকারের অস্তিত্ব চায় না? হিন্দুদের মত কী? মনে হয়, তাদের সমস্ত রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় একটা অনুচ্চারিত জায়গা থেকে গেছে যে, ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোয় কেন্দ্রীয় সরকার একটা স্থায়ী অংশ হয়ে থাকবে। এখন এই অনুচ্চারিত এলাকাটি কতটা জায়গা জুড়ে, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। আমি শুধু বলতে পারি, যে দুটি বিষয় এখানে সুপ্তভাবে ক্রিয়াশীল, যা যে কোনও দিন মুখ্য হয়ে উঠে হিন্দুদের কেন্দ্রীয় সরকারের ধারণা থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

প্রথম হল, হিন্দু রাজ্যগুলির মধ্যেকার সাংস্কৃতিক বৈপরীত্য বা বিরাগ। হিন্দু রাজ্যগুলি কোনও মতেই একটি সুখী পরিবারের মতো নয়। এই ভণিতায় কোনও লাভ নেই যে, বাঙালিদের প্রতি বা রাজপুত কিংবা মাদ্রাজিদের প্রতি শিখদের কোনও দুর্বলতা আছে। বাঙালি নিজেকেই ভালবাসে শুধু। মাদ্রাজি নিজের জগতেই সীমাবদ্ধ। আর মারাঠি মনেই করতে পারে না যে, সে একদিন মুসলমান সাম্রাজ্য

---

১. 'তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে' স্যার মুহম্মদ ইকবাল এই বক্তব্যই তুলে ধরেছেন।

ধ্বংস করতে চেয়েছিল, সে এখন আর সব হিন্দুদের কাছেই বিড়ম্বনা মাত্র। হিন্দু রাজ্যগুলির এমন কোনও সাধারণ ঐতিহ্য বা স্বার্থ নেই যা তাদের বেঁধে রাখবে। উপরন্তু, ভাষা ও শ্রেণীর পার্থক্য ও অতীতের দ্বন্দ্ব তাদেরকে বিভক্ত করে রাখার পক্ষে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। একথা সত্য যে, হিন্দুরা একত্র হচ্ছে এবং এক ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, তারা এখনও একটা জাতি বা 'নেশন' হয়ে উঠতে পারেনি। জাতি গঠনের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চলেছে, এবং এই প্রক্রিয়া শেষ হবার পথে বিঘ্ন আছে যা সম্পূর্ণ এক শতকের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এসবের একটা অর্থকরী দিক রয়েছে। এটা এখনও তেমনভাবে জানা হয়নি যে, একটা কেন্দ্রীয় সরকার চালাতে ভারতের লোককে এবং সেই অনুপাতে প্রদেশগুলিকে কতটা আর্থিক মূল্য দিতে হবে।

ব্রিটিশ ভারতে মোট রাজস্বের পরিমাণ বছরে ১৯৪,৬৪,১৭,৯২৬ টাকা। এর মধ্যে, প্রাদেশিক সরকারগুলি কর্তৃক তাদের এক্তিয়ারভুক্ত উৎস থেকে আয়ের পরিমাণ ৭৩,৫৭,৫০,১২৫ টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব সূত্র থেকে আসে ১২১,০৬,৬৭,৮০১ টাকা। ভারতের লোককে কেন্দ্রীয় সরকার চালাতে কত টাকা ব্যয় করতে হয় তা এখন স্পষ্ট। যখন এটা দেখা যাবে যে, শুধু শান্তি রক্ষা ছাড়া জনগণের উন্নতি বিষয়ক অন্য কোনও কাজ কেন্দ্রীয় সরকার করে না, তখন এতে অবাক হবার কিছুই থাকবে না যদি জনসাধারণ প্রশ্ন তোলে এত টাকা খরচ করে শান্তি ক্রয় করা উচিত কি না। এ প্রসঙ্গে একথা মনে রাখতে হবে যে, প্রদেশের লোকেরা আক্ষরিক অর্থেই অনাহারে কাটাচ্ছে এবং রাজস্ব বাড়ানোর কোনও উৎসও রাজ্যের হাতে নেই।

কেন্দ্রীয় সরকার চালনার জন্য যে করের বোঝা তা ভারতের জনসাধারণকেই বহন করতে হয় এবং এই আর্থিক দায়িত্ব অত্যন্ত অসমভাবে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় রাজস্বের উৎসগুলি হল—

(১) আমদানি-রপ্তানি শুল্ক। (২) আবগারি শুল্ক। (৩) লবণ। (৪) মুদ্রা। (৫) ডাক ও তার। (৬) আয়কর এবং (৭) রেল পরিষেবা। ভারত সরকারের যে হিসাব পাওয়া যায় তা থেকে বুঝা যায় না যে মুদ্রা, ডাক ও তার এবং রেল পরিষেবা এই তিন উৎসের কোন্ খাতে কত টাকা আসে। তবে শুধুমাত্র অন্যান্য উৎস থেকে কত রাজস্ব আদায় হয়, রাজ্য ধরে ধরে তার হিসাব মেলে।

প্রদেশ	নিজস্ব সূত্র থেকে প্রাদেশিক সরকারগুলির রাজস্ব (টাকায়)	নিজস্ব সূত্র থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব (টাকায়)
১। মাদ্রাজ	১৬,১৩,৪৪,৫২০	৯,৫৩,২৬,৭৪৫
২। বোম্বাই	১২,৪৪,৫৯,৫৫৩	২২,৫৩,৪৪,২৪৭
৩। বাংলা	১২,৭৬,৬০,৮৯২	২৩,৭৯,০১,৫৮৩
৪। যুক্তপ্রদেশ	১২,৭৯,৯৯,৮৫১	৪,০৫,৫৩,০৩০
৫। বিহার	৫,২৩,৮৩,০৩০	১,৫৪,৩৭,৭৪২
৬। মধ্যপ্রদেশ ও বিদর্ভ	৪,২৭,৪১,২৮০	৩১,৪২,৬৮২
৭। অসম	২,৫৮,৪৮,৪৭৪	১,৮৭,৫৫,৯৬৭
৮। ওড়িশা	১,৮১,৯৯,৮২৩	৫,৬৭,৩৪৬
৯। পঞ্জাব	১১,৩৫,৮৬,৩৫৫	১,১৮,০১,৩৮৫
১০। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১,৮০,৮৩,৫৪৮	৯,২৮,২৯৪
১১। সিন্ধু	৩,৭০,২৯,৩৫৪	৫,৬৬,৪৬,৯১৫

এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার চালানোর খরচ শুধু বেশিই নয়, এই খরচ অসমভাবে বিভিন্ন প্রদেশের ওপর পড়ে। বোম্বাইয়ের প্রাদেশিক সরকার ১২,৪৪,৫৯,৫৫৩ টাকা রাজস্ব আদায় করে, অথচ এই প্রদেশ থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ ২২,৫৩,৪৪,২৪৭ টাকা। বাংলা সরকার সংগ্রহ করে ১২,৭৬,৬০,৮৯২ টাকা, আর এই প্রদেশ থেকে কেন্দ্রের রাজস্বের পরিমাণ ২৩,৭৯,০১,৫৮৩ টাকা। সিন্ধু সরকার আদায় করে ৩,৭০,২৯,৩৫৪ টাকা, আর এই প্রদেশ থেকে কেন্দ্রের আদায় ৫,৬৬,৪৬,৯১৫ টাকা। অসম সরকার তোলে প্রায় আড়াই কোটি টাকা, কিন্তু অসম থেকে কেন্দ্র তোলে প্রায় দু কোটি টাকা। এই প্রদেশগুলির ওপর কেন্দ্রীয় রাজস্বের বোঝা যখন এইরকম, তখন অন্যান্য প্রদেশগুলি কেন্দ্র সরকারকে প্রায় কিছুই দেয় না। পঞ্জাব নিজের জন্যে সংগ্রহ করে

১১ কোটি টাকা, কিন্তু এই প্রদেশের আদায় কেন্দ্রের জন্যে মাত্র এক কোটি টাকা। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রাদেশিক রাজস্ব হল ১,৮০,৩৩,৫৪৮ টাকা, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার পায় মাত্র ৯,২৮,২৯৪ টাকা। যুক্তপ্রদেশ তোলে ১৩ কোটি টাকা কিন্তু কেন্দ্রের রাজস্ব মাত্র ৪ কোটি টাকা। বিহার সংগ্রহ করে নিজের জন্যে ৫ কোটি, মাত্র দেড় কোটি পায় কেন্দ্র। মধ্যপ্রদেশ ও বিদর্ভ ৪ কোটি রাজস্ব পায়, সেখান থেকে কেন্দ্র পায় ৩১ লক্ষ টাকা।

এই আর্থিক বিষয়টি এতদিন কারও নজরে পড়েনি। কিন্তু সময় আসতে পারে যখন হিন্দুরা, যারা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সবচেয়ে বড় সমর্থক তাঁদের কাছেও দেশাত্মবোধের চেয়েও আর্থিক বিবেচনাগুলির আবেদন বেশি হয়ে উঠবে। সুতরাং এটা সম্ভব যে কোনও দিন হিন্দুরা আর্থিক বিবেচনা এবং মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক বিবেচনা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের অবলুপ্তি এক সঙ্গে চাইবে।

এটা যদি সত্যিই ঘটে, তাহলে তা নতুন সংবিধান গঠনের আগেই ঘটুক। একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে যদি সংবিধান একবার গৃহীত হয়ে যায়, এবং তারপর যদি তা ঘটে তবে তা হবে মারাত্মক ক্ষতির কারণ। তখন শুধু ভারতের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে না, হিন্দু ঐক্যও বাঁচানো যাবে না। আমি আগেই বলেছি, হিন্দু প্রদেশগুলির মধ্যেও তেমন ঐক্যের ভিত নেই। তবু যেটুকু ঐক্য আছে, তা যদি একবার চলে যায় তাহলে তা আবার তৈরি করা মুসকিল হয়ে পড়বে। এর কারণ হল—সাংগঠনিক কাঠামো নির্মাণের আগে ভারতীয়দের-ই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এর ভিত্তি সাময়িক হবে, না চিরস্থায়ী হবে। এক-ই ভিত্তির ওপর একক একটি কাঠামো গড়ে ওঠার পর কোনও এক অংশকে কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন করার অর্থ হল, অন্য অংশে ফাটল এবং পুরো কাঠামোটিই ভেঙে পড়ার আশঙ্কা। ভারতের ক্ষেত্রে যেমন, এই ভিত্তি দুর্বল মানের হলে, ফাটল ধরার বিপদ অত্যন্ত বেশি। যদি ভারতের জন্য সামগ্রিক একটি নতুন সংবিধান রচিত হয়, সেই ভিত্তিতে কাঠামোটি তৈরি করা হয়, এবং তারপরে যদি হিন্দুস্থান থেকে পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রশ্ন ওঠে এবং হিন্দুরা যদি তা মেনে নিতে বাধ্য হয়, তাহলে তার পরিণতিতে সমগ্র কাঠামোটিই ভেঙে পড়বে। মুসলমান প্রদেশগুলির ইচ্ছা খুব সহজেই হিন্দু প্রদেশগুলিতে সঞ্চারিত হতে পারে এবং মুসলমান প্রদেশগুলিতে উদ্ভূত বিচ্ছিন্নতার মানসিকতা সর্বত্রই বিচ্ছিন্নতার এক বাতাবরণ তৈরি করবে।

বিচ্ছিন্নকরণের ফলে রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে পড়েছে এমন উদাহরণ ইতিহাসে বিরল নয়। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের রাজ্যগুলির উদাহরণ হাতের কাছেই

আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে সর্বদাই তৎপর নাটাল এবং সম্প্রতি পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়ান কমনওয়েল্‌থ থেকে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে।

এই সমস্ত ক্ষেত্রে সত্যি করেই বিচ্ছিন্নকরণ ঘটেনি, আর যেখানে ঘটেছে, আঘাত অচিরেই শুকিয়ে গেছে। ভারতীয়দের প্রতি ভাগ্য এমন সুপ্রসন্ন হবে মনে হয় না। তাদের ভাগ্য চেকোস্লোভাকিয়ার মতো হবে। প্রথমত, এই আশা পোষণ করা বৃথা হবে যে, যদি হিন্দু প্রদেশগুলি থেকে মুসলমান প্রদেশগুলি বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে ভারতীয় কাঠামো বিপর্যস্ত হয়, তাহলেও আমেরিকাতে গৃহযুদ্ধের পর যেমন হয়েছে তেমনি ভাবে বিচ্ছিন্নতাকামী রাজ্যগুলিকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় কাঠামোটি ব্রিটিশ অধিরাজ্যের ধাঁচে হলেও বিচ্ছিন্নকরণের হাত থেকে ভারতকে বাঁচাবার ক্ষমতা ব্রিটিশদেরও থাকবে না। তাই এটা জরুরি যে, নতুন কাঠামোটি তৈরির আগেই পাকিস্তান বিষয়ের মীমাংসা করতে হবে।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, পাকিস্তান হল এমন এক পরিকল্পনা, যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত পরবর্তী সংবিধান সংশোধনের সময়েই গ্রহণ করতে হবে এবং যদি এ থেকে পরিত্রাণের উপায় না থাকে, তাহলে তার পরিণাম হবে যদি বিষয়টিকে সম্পূর্ণ রূপে অনুধাবন না করেই অগ্রসর হওয়া যায়। আমার মনে পড়ছে সাংবিধানিক আইন বিষয়ের 'গোল টেবিল বৈঠকে' অংশগ্রহণকারী কোনও কোনও ভারতীয় প্রতিনিধির অজ্ঞতার কথা 'অবজারভার পত্রিকা'য় মিঃ গারভিনের নেতৃত্বে এই দলের কেউ কেউ মন্তব্য করেছিলেন যে, 'সাইমন আয়োগ' ভারতের ওপর কোনও প্রতিবেদন না লিখে যদি ভারতের সাংবিধানিক সমস্যা ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংবিধানের সাহায্যে কিভাবে তা দূর করা যায় তা নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতেন তাহলে ভালো হত। এমন প্রতিবেদন আমি জানি তৈরি করা হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধান প্রণেতা প্রতিনিধিদের জন্য। এটা পুরনো ঘাটতি শুধরে নেওয়ার একটা চেষ্টা এবং এই কারণে আমার বিশ্বাস, এটিকে একটি মরসুমী বিষয় হিসাবে স্বাগত জানানো যায়।

এই বইটি মরশুমি তাৎপর্যের প্রশ্নে এত কথা। এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন, এটির পাঠযোগ্যতা নিয়ে। কোনও লেখক-ই অগাস্টিন বিরেলের এই কথাগুলি ভুলতে পারেন না :

'রাঁধুনি, যোদ্ধা ও লেখকের পরীক্ষা তাদের কাজের ফলাফলে; সুস্বাদু খাবার, গৌরবময় যুদ্ধ জয় ও মনোরম বই—এই হল আমাদের দাবি। উপকরণ, কায়দা বা

পদ্ধতি জেনে আমাদের লাভ নেই। রান্নাঘর, পরামর্শগৃহ অথবা লেখাপড়ার ওপর যাওয়ার ইচ্ছে আমাদের মোটেই নেই। রাঁধুনি যেমন খুশি তার হাতলওয়ালা পাত্র (Sauceepan) ব্যবহার করুক, সেনাপতি যেভাবে খুশি সৈন্য সাজাক, লেখক যেমন ভাবে ইচ্ছে উপাদানগুলিকে ব্যবহার করুক বা কাহিনী বানাক, খাবার প্লেটে দেওয়া হলে আমরা শুধু দেখবো, এটা খেতে ভালো তো? যুদ্ধ শেষ হলে আমরা জিজ্ঞাসা করি, জিতল কে? আর বই প্রকাশিত হলে শুধাই, পড়া যাবে তো'?

আমি এ সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু তা নিয়ে আমার দুর্ভাবনাও নেই। এসব কথা অন্যান্য বইয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু পাকিস্তান সম্পর্কে কোনও বইয়ের ওপর নয়। প্রতিটি ভারতীয়ের উচিত পাকিস্তান বিষয়ে বই পড়ে ফেলা—এটি না হলে, অন্য কোনওটি, অবশ্য যদি সে তার দেশকে একটা স্পষ্ট রাস্তা খুঁজে পেতে সাহায্য করতে চায়।

এ বই যদি পড়তে ভালো না লাগে, পাঠক এর মধ্যে দুটি ভালো জিনিস খুঁজে পাবেন। প্রথমেই যা তার চোখে পড়বে তা হল, এর ভালো উপকরণ। এগুলিকে বুঝতে গিয়ে তাকে পরিশ্রম করতে হবে। এর মধ্যে পাঠক অবশ্যই খুঁজে পাবেন গত বিশ বছরে ঘটে যাওয়া ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের একটা চুম্বক, যা যে কোনও ভারতবাসীর জানা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি পাঠকের নজরে পড়বে তা হল, বইয়ের পক্ষপাতহীনতা। পাকিস্তান বিষয়টিকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাই এর উদ্দেশ্য, এর পক্ষাবলম্বন নয়। ব্যাখ্যা করাই উদ্দেশ্য, মতান্তরিতকরণ নয়। তবে পাকিস্তান বিষয়ে আমার কোনও মতামত নেই এমন ভণিতা করা ঠিক হবে না। মতামত আমার আছে। কিছু কিছু মত স্পষ্ট উচ্চারিত, কিছু কিছু আবার বুঝে নেওয়ার মতো। প্রথম ক্ষেত্রে, যেখানেই স্পষ্ট করে মত দিয়েছি, সেখানেই যুক্তি দিয়েই সেই অভিমত উপস্থিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, মতামত যা-ই হোক, সাধারণ কুসংস্কারের মতো তা দৃঢ় নয়। বস্তুত, সে সব অভিমত নয়, বলা যায় চিন্তামাত্র। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমি একটি মুক্ত মনের পরিচয় রেখেছি, তবে শূন্য মনের নয়। মুক্ত মনের মানুষ সর্বদাই অভিনন্দনের পাত্র। সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে হবে যে, মুক্ত মনের মানুষ শূন্য মনেরও হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভবও হতে পারে। এমন মানুষ মাস্তুলহীন ও হালহীন জাহাজের মতো। এটি ভাসে, কিন্তু দিকনির্দেশের অভাবে ডুবেও যেতে পারে। পাঠক বুঝতে পারবে যে, আমি তার সামনে সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি রেখে তাকে সাহায্য করতে

চেয়েছি, নিজের অভিমত তার ওপর চাপিয়ে দিতে চাইনি। যে কোনও প্রশ্নের দুটি দিক-ই তার সামনে তুলে ধরেছি, যাতে সে নিজস্ব মতামত তৈরি করে নিতে পারে।

পাঠক অভিযোগ করতে পারে যে, আমি প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি রাখার সময় প্ররোচনাপূর্ণ ভাবে তা করেছি। আমি সচেতন যে, এমন অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে আনা যেতে পারে। এর জন্যে আমি মুক্ত চিত্তে এবং আনন্দের সঙ্গেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার অজুহাত হল, আমি কাউকে আঘাত করতে চাইনি। আমার একটিই উদ্দেশ্য, তা হল উদাসীন ও অন্যমনস্ক পাঠককে এই বইয়ের আলোচিত বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করে তোলা। আমার প্রতি কোনও বিরক্তি এলে তা সরিয়ে রেখে পাঠককে এই দুর্দান্ত বিষয়টির দিকে ভাবনাকে নিয়োজিত করতে হবে : পাকিস্তান হবে, না হবে না?

□ □ □

অংশ - I

পাকিস্তানের পক্ষে মুসলমানদের বক্তব্য

পাকিস্তান গঠনের জন্যে মুসলমানদের কারণগুলি নিম্নোক্ত যুক্তির মাধ্যমে যৌক্তিকতা খোঁজে—

(১) মুসলমানরা যা চাইছে তা হল, আঞ্চলিক ভাবে বেশি সমজাতীয় (homogeneous) প্রশাসনিক অঞ্চলের গঠন।

(২) সমজাতীয় প্রশাসনিক অঞ্চলগুলির মধ্যে যেগুলি প্রধান ও মুসলমান অধ্যুষিত, সেগুলিকে পৃথক রাজ্য হিসাবে গড়তে চায় তারা :

(ক) কারণ, মুসলমানরা নিজেরাই একটি পৃথক জাতি এবং তাদের ইচ্ছা একটি জাতীয় বাসস্থান গঠনের, এবং

(খ) দ্বিতীয় কারণ, অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে, হিন্দুরা তাদের সংখ্যাধিক্যের বলে মুসলমানরা যেন এক বিদেশী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, এমন ভাবে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করতে চায়।

এই খণ্ডটি এইসব যুক্তির বিশ্লেষণেই ব্যয়িত হবে।

অধ্যায় - ১

লীগ কি দাবি করছে?

এক

১৯৪০ সালের ২৬ মার্চ হিন্দু ভারত যেভাবে চমকে উঠেছিল, তেমন আর কোনও দিন হয়নি। ওইদিন মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়—

'১. সংবিধানগত প্রশ্নে 'সারা ভারত মুসলিম লীগে'র কাউন্সিল ও ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৩৯-এর ২৭ আগস্ট, ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর, ২২ অক্টোবর এবং ১৯৪০-এর ৩ ফেব্রুয়ারি যে সিদ্ধান্তে এসেছে, তাতে সম্মতি জানিয়ে সারা ভারত 'মুসলিম লীগে'র এই অধিবেশন পুনরায় জানাচ্ছে যে, ১৯৩৫ সালের 'ভারত শাসন আইনে' বর্ণিত যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা এ দেশের বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে অযোগ্য ও অচল এবং তা মুসলমান ভারতের কাছে কোনও মতেই গ্রহণযোগ্য নয়'।

'২. অধিবেশন জোর দিয়ে আরও জানাচ্ছে যে, মহামান্য সম্রাটের সরকারের পক্ষে ভাইসরয় ১৯৩৯ সালের ১৮ অক্টোবর যে ঘোষণা করেছেন তা স্বস্তিকর এই কারণে যে তিনি জানিয়েছেন, যে নীতি ও পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে 'ভারত শাসন আইন' ১৯৩৫ রচিত, সেগুলি পুনর্বিবেচিত হবে ভারতের নানা দল, স্বার্থ ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে। কিন্তু মুসলমান ভারত সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না সমস্ত সংবিধানগত পরিকল্পনাটি আগাগোড়া পুনর্বিবেচিত হচ্ছে এবং কোনও সংশোধিত পরিকল্পনাই মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না এতে তাদের সম্মতি থাকে'।

'৩. সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে যে, সারা ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশনের সুবিবেচিত মতামত হল—কোনও সাংবিধানিক পরিকল্পনাই এ দেশে কার্যকরী হবে না বা মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না এই মূল নীতিগুলি তার ভিত্তি হয়—যেমন ভৌগোলিক ভাবে সংলগ্ন এলাকাগুলিকে নিয়ে অঞ্চল গঠন করা হচ্ছে এবং গঠন এমন হবে যাতে সংখ্যার দিক থেকে যেখানে মুসলমানরা বেশি,

যেমন ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চল; তাদের একত্র করে 'স্বাধীন প্রদেশ' গঠিত হবে এবং প্রতিটি এলাকা স্বশাসিত এবং সার্বভৌম হবে'।

'৪. সংবিধানে সংখ্যালঘুদের জন্যে যথেষ্ট, কার্যকরী ও আবশ্যিক রক্ষাকবচ নির্দিষ্টভাবে গ্রহণ করতে হবে, যাতে প্রতি এলাকায় তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ তাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে রক্ষিত হবে; ভারতের অন্য অংশে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘু, সংবিধানে তাদের এবং অন্য সংখ্যালঘুর জন্য যথেষ্ট কার্যকরী ও আবশ্যিক রক্ষাকবচ নির্দিষ্ট করতে হবে, যাতে তারা তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ তাদের সঙ্গে আলোচনা মতো রক্ষিত হয়'।

'৫. এই অধিবেশন ওয়ার্কিং কমিটিকে পুনরায় এই দায়িত্ব অর্পণ করছে যে, তারা এই নীতিগুলির ওপর ভিত্তি করে সংবিধানের একটা প্রকল্প গঠন করবে, এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলি যাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়, যোগাযোগ, শুল্ক এবং এরকম সব ব্যাপারে সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিতে পারে তার ব্যবস্থা থাকবে'।

এই সিদ্ধান্তের পেছনে কোন্ চিন্তা ভাবনা কাজ করছে? তিন নম্বর অনুচ্ছেদে দেখা যাচ্ছে যে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, মুসলমান-প্রধান এলাকাগুলিকে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করতে হবে। স্পষ্ট ভাষায়, এর অর্থ হল পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিমের বেলুচিস্তান ও সিন্ধু এবং পূর্বের বাংলা ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশ না হয়ে তার বাইরে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হবে। এই হল মুসলিম লীগের সিদ্ধান্তের মূল কথা।

এসব এই মুসলমান প্রদেশগুলি আলাদা ও স্বাধীন হিসাবে পরিগণিত হওয়ার পর একেকটি স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে, না সেগুলি মিলিতভাবে একটা রাষ্ট্র হবে, এ ভাবনা সিদ্ধান্তে আছে কি?

এই ক্ষেত্রে, সিদ্ধান্তটি পরস্পর বিরোধী না হলেও অস্পষ্ট। অঞ্চলগুলিকে স্বাধীন রাষ্ট্রে 'যেখানে অন্তর্গত অংশগুলি স্বশাসিত ও সার্বভৌম হবে' সেখানে পরিণত করা হবে। এখানে 'কন্সিটিউয়েন্ট ইউনিট্স' বলতে বুঝায় যে একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারণা। তা যদি হয় তবে এই ইউনিটগুলিকে 'সার্বভৌম' বলা অর্থহীন। অংশগুলির যুক্তরাষ্ট্র এবং অংশগুলির সার্বভৌমত্ব হল পরস্পর বিরোধী। এমন হতে পারে যে, একটা যৌথরাষ্ট্রের (Confederation) কথা ভাবা হয়েছে। যাই হোক, এই মুহূর্তে এটা ভাবা অর্থহীন নয় এই স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি আমেল (federation) তৈরি করবে,

না যৌথরাষ্ট্র তৈরি করবে। যা জরুরি, তা হল মূল দাবিটি—অর্থাৎ এই অংশগুলি ভারত থেকে বিযুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

সিদ্ধান্তের ভাষা এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যাতে এই ধারণা হতে পারে যে, পরিকল্পনাটি খুবই নতুন। কিন্তু কোনও সন্দেহই নেই যে, সিদ্ধান্তে যে পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে তা আসলে ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে লখনউতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত স্যার মহম্মদ ইকবালের সভাপতি ভাষণের প্রতিধ্বনি। পরিকল্পনাটি সেই অধিবেশনে মুসলিম লীগ গ্রহণ করেনি। প্রস্তাবটিকে অবশ্য জনৈক মিঃ রেহমত আলি কর্তৃক 'পাকিস্তান' নাম দেওয়া হয়েছিল, আর এই নামেই এটি এখন পরিচিত হয়েছে। মিঃ রেহমত আলি, এম এ, এল এল বি, পাকিস্তান আন্দোলন শুরু করেন ১৯৩৩ সালে। তিনিই ভারতকে দু'ভাগে, যথা পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান হিসাবে ভাগ করেন। তাঁর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান। দেশের বাকিটা ছিল তাঁর কাছে হিন্দুস্থান। তাঁর ধারণায় একটি 'স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পাকিস্তান' গঠিত হবে উত্তরের পাঁচটি মুসলমান প্রদেশ নিয়ে। 'গোল টেবিল বৈঠকে'র সদস্যদের কাছে এই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু সরকারিভাবে তা পেশ করা হয়নি। মনে হয় ব্যক্তিগত পর্যায়ে একটা চেষ্টা করা হয়েছিল যাতে ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন পাওয়া যায়। কিন্তু সরকার এই প্রস্তাব বিবেচনা করতে রাজি হয়নি কেননা, তাদের মনে হয়েছিল এর ফলে 'পুরনো মুসলমান সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান' ঘটবে।

এক্ষণে মুসলিম লীগ এই পুরনো পরিকল্পনাটিকেই বিশদভাবে পেশ করেছে। তারা পূর্বে আরও একটি মুসলমান প্রদেশ তৈরি করতে চেয়েছে যাতে বাংলা ও অসমের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কেবল এই বিষয়টি ছাড়া, প্রস্তাবটিতে আর যা বলা হয়েছে তা মূলগতভাবে এবং পরিকল্পনার কাঠামোর দিক থেকে স্যার মহম্মদ ইকবালেরই প্রস্তাব, যা রেহমত আলি প্রচার করেছেন। পূর্বের এই নতুন মুসলমান প্রদেশের কোনও নাম দেওয়া হয়নি। মিঃ রেহমত আলির আদর্শের তত্ত্ব ও বিষয়গুলির দিক থেকে এর ফলে কোনও পার্থক্য ঘটেনি। মুশকিল হল এই যে, বিষয়কে বৃহৎ করতে গিয়ে মুসলিম লীগ দুটি মুসলমান প্রদেশের নামকরণই করেনি, যা উচিত ছিল। ফলে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের গালভরা ও চোয়াল-ব্যথা-করা নাম—পশ্চিমের মুসলমান রাজ্য ও পূর্বের মুসলমান রাজ্য বলে কাজ চালাতে হচ্ছে। এই সমস্যার সমাধানে আমার প্রস্তাব হল, দ্বিজাতি তত্ত্বের আদর্শে গড়া পাকিস্তান নাম বজায় রেখে এবং ফলাফল হিসাবে ভারতভাগ মেনে নিয়েই আমরা

উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বের দুই মুসলমান প্রদেশকে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান নামে ডাকতে পারি।

পরিকল্পনাটি হিন্দু ভারতকে শুধু মনোযোগী করেনি, বড় ধাক্কাও দিয়েছে। এখন এই প্রশ্ন করা স্বাভাবিক—এই পরিকল্পনার মধ্যে নতুন ও ধাক্কা দেওয়ার মতো কী আছে?

দুই

উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশগুলিকে সংযুক্ত করার ধারণাটি কি খুব-ই ধাক্কা দেওয়ার মতো? তা হলে মনে রাখা দরকার যে, এই প্রদেশগুলিকে একত্র করার প্রকল্প খুবই পুরনো—অনেক ভাইসরয়, প্রশাসক ও সেনাধ্যক্ষরা আগেই এমন ভেবেছেন। উত্তর-পশ্চিমের পাকিস্তানি প্রদেশগুলির মধ্যে পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ১৮৪৯ সালে ব্রিটিশরা পঞ্জাব দখলের সময় থেকে একই ছিল। এই দুটি প্রদেশ ১৯০১ সাল পর্যন্ত একটাই প্রদেশ ছিল। ১৯০১ সালেই লর্ড কার্জন তাকে দুটিতে বিভক্ত করে। আর পঞ্জাবকে সিন্ধুর সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই যে, পঞ্জাব দখলের আগেই সিন্ধু দখল না হয়ে যদি পরে হতো, তবে সিন্ধু ও পঞ্জাবের সঙ্গে যুক্ত হতো। এই দুটি জায়গা শুধু পাশাপাশিই নয়, একই নদীর সঙ্গে সংযুক্ত। পঞ্জাবের অবর্তমানে বোম্বাই-ই ছিল এমন জায়গা, যেখান থেকে সিন্ধুকে শাসন করা যাবে, তাই তাকে বোম্বাইয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। তাই বলে সিন্ধুকে বোম্বাই থেকে বিযুক্ত করে পঞ্জাবের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার ইচ্ছেও বাতিল হয়নি। আর এমন প্রস্তাব মাঝে মাঝেই উঠেছে। প্রথম এই প্রস্তাব রাখা হয়েছিল লর্ড ডালহৌসির বড়লাট থাকার সময়, কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে কোর্ট অফ ডিরেক্টরস তা মঞ্জুর করেনি। সিপাহী বিদ্রোহের পর প্রশ্নটি আবার পুনর্বিবেচিত হয়েছিল, কিন্তু সিন্ধু নদীর তীর বরাবর যোগাযোগের অবস্থা খুব-ই অনুন্নত থাকার জন্য লর্ড ক্যানিং সম্মতি দিতে রাজি হননি। ১৮৭৬ সালে লর্ড নর্থব্রুকের মত ছিল যে, সিন্ধু পঞ্জাবের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৮৭৭ সালে নর্থব্রুকের উত্তরসূরী লর্ড লিটন সিন্ধু নদ পারের এলাকা নিয়ে একটা প্রদেশ গড়তে চেয়েছিলেন, যাতে যুক্ত হবে পঞ্জাবের ছটি জেলা ও সিন্ধুর নদ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি। পঞ্জাবের ছটি জেলা হল—হাজারা, পেশওয়ার, কোহার্য, বান্নু, দেরা ইসমাইল খান, দেরা গাজি খান, এবং সিন্ধু নদের তীরবর্তী সিন্ধু অঞ্চল (করাচি বাদে)। লিটন আরও প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে মধ্যপ্রদেশের অংশ বা পুরোটা বোম্বাইয়ের সঙ্গে যুক্ত হোক, যাতে সিন্ধু নদের

তীরবর্তী অঞ্চল চলে যাওয়াটা পুষিয়ে যায়। এইসব প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র-সচিবের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। লর্ড ল্যান্সডাউনের ভাইসরয়ত্বে (১৮৮৮-৯৪) এক-ই প্রস্তাব অর্থাৎ পঞ্জাবকে সিন্ধুর সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব, উত্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু 'বেলুচিস্তান এজেন্সি' গঠনের জন্য সিন্ধু আর সীমান্ত জেলা থাকেনি এবং প্রস্তাবের পেছনে যে সামরিক কারণ ছিল তা প্রাসঙ্গিকতা হারায়; ফলে সিন্ধুকে আর পঞ্জাবের সঙ্গে যুক্ত করা যায়নি। ব্রিটিশরা যদি বেলুচিস্তান দখল না করত এবং লর্ড কার্জন যদি পঞ্জাব থেকে কেটে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠন না করতেন, তা হলে আমরা অনেক দিন আগেই একটি প্রশাসনিক একক হিসাবে পাকিস্তানের সৃষ্টি হওয়া দেখতে পেতাম।

বাংলাতে জাতীয় মুসলমান রাজ্য গঠনের প্রসঙ্গে ওই এক-ই কথা—এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। অনেকেরই স্মরণে আছে যে ১৯০৫ সালে বাংলা ও অসম রাজ্যকে তৎকালীন বড়লাট দুটি রাজ্যে বিভক্ত করেছিলেন—এক অংশে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ব বাংলা ও অসম এবং অন্য অংশে কলকাতা রাজধানীসহ পশ্চিমবাংলা। নতুন সৃষ্টি পূর্ববাংলা ও অসম প্রদেশের অংশ হয়েছিল অসম ও পূর্ব বাংলার (১) ঢাকা, (২) ময়মনসিংহ, (৩) ফরিদপুর, (৪) বাখরগঞ্জ, (৫) ত্রিপুরা, (৬) নোয়াখালি, (৭) চট্টগ্রাম, (৮) পার্বত্য চট্টগ্রাম (৯) রাজশাহি, (১০) দিনাজপুর, (১১) জলপাইগুড়ি, (১২) রংপুর, (১৩) বগুড়া, (১৪) পাবনা এবং (১৫) মালদহ। পশ্চিমবাংলায় থাকলো পুরানো বাংলা ও অসম প্রদেশের বাকি জেলাগুলি এবং মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর।

এই একটি প্রদেশকে ভাগ করে দুটিতে পরিণত করা যা, ভারতের ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত হয়েছিল এইজন্যে যাতে পূর্ব বাংলায় একটি মুসলমান রাজ্য গঠিত হতে পারে, কেননা অসম বাদ দিলে, পূর্ববাংলা মূলত মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়েছিল ১৯১১ সালে—ব্রিটিশরা হিন্দুদের দাবির কাছে নত হয়েছিল, কেননা হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ছিল। বঙ্গভঙ্গ যদি রদ করা না হতো, তাহলে পূর্ববাংলার মুসলমান প্রদেশের বয়স হত আজ ৩৯ বছর। *

* ভারত সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তি, নং ২৮৩২, তারিখ ১ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫। দুটি প্রদেশ আলাদা প্রশাসনিক একক হিসাবে ঘোষিত হয় অক্টোবর ১৬, ১৯০৫।

তিন

হিন্দুস্থান থেকে পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নকরণের চিন্তা কি খুব-ই অপ্রত্যাশিত? তা হলে স্মরণ করা যাক প্রসঙ্গটির সঙ্গে সংযুক্ত কিছু তথ্য, যেগুলি কংগ্রেসের নীতির মূল উৎস হয়ে আছে। একথা স্মরণ করা যেতে পারে যে, মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস দল অধিগ্রহণ করার পর দুটি জিনিস করেছিলেন যাতে দলের জনপ্রিয়তা বাড়ে। প্রথম হল আইন অমান্য আন্দোলন।

ভারতের রাজনীতিতে মিঃ গান্ধীর আবির্ভাবের পূর্বে ক্ষমতার দাবিদার দলগুলি ছিল কংগ্রেস, উদারপন্থীরা, ও বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবীরা। কংগ্রেস ও উদারপন্থীরা একটাই দল ছিল, তখন এত পার্থক্য তাদের মধ্যে ছিল না। আমরা তই নিশ্চিন্তে বলতে পারি যে, তখন দু'টিই দল ছিল—উদারপন্থীদের দল ও সন্ত্রাসবাদীদের দল। দু'টি দলেই যোগ দেওয়ার শর্ত খুব কঠিন ছিল। উদারপন্থী দলে যোগ দেওয়ার শর্ত শুধু শিক্ষাই ছিল না, ছিল জ্ঞানের এক উচ্চ ধাপে উন্নত হওয়া। সুতরাং জ্ঞানের পরিধি বিষয়ে খ্যাতি থাকলে, তবেই কেউ এই দলে যোগ দেওয়ার আশা করত। অ-শিক্ষিতদের ক্ষমতায় উত্তরণের পথে কার্যত বাধা ছিল। সন্ত্রাসবাদীরাও যতদূর সম্ভব শক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা রেখেছিল। যারা শুধু আদর্শের জন্যে প্রাণদানের ব্রত নিতে প্রস্তুত থাকত, তারাই শুধু দলের সদস্য হতে পারত। তাই কোনও দুষ্ট লোকের পক্ষে সন্ত্রাসবাদীদের দলে ঢোকা অসম্ভব ছিল। আইন অমান্যতে জ্ঞানের দরকার হয় না, জীবন বলিদানের দরকার হয় না। শিক্ষা নেই এবং আত্মত্যাগেরও তেমন সদিচ্ছা নেই, অথচ দেশপ্রেমিক হবার বাসনা আছে এমন বৃহৎ জনগণের কাছে আইন অমান্য আন্দোলন সহজ এক মধ্যপন্থা হয়ে উঠেছিল। এই মধ্যপন্থার ফলেই কংগ্রেস দল, উদারপন্থী ও সন্ত্রাসবাদীদের চেয়ে বেশি জনপ্রিয় হতে পেরেছিল।

দ্বিতীয় যে জিনিসটি মিঃ গান্ধী করেছিলেন তা হল, ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের নীতি প্রচলন। মিঃ গান্ধীর প্রেরণা ও সাহায্যে কংগ্রেস যে সংবিধান রচনা করেছিল, তাতে নিম্নলিখিত প্রদেশসমূহে ভারতকে বিভক্ত করার কথা বলা হয়েছিল :

প্রদেশ	ভাষা	প্রধান কেন্দ্র
আজমেড়-মারওয়ারা	হিন্দুস্তানি	আজমেড়
অন্ধ্র	তেলুগু	মাদ্রাজ
আসম	অসমীয়া	গৌহাটি

প্রদেশ	ভাষা	প্রধান কেন্দ্র
বিহার	হিন্দুস্তানি	পাটনা
বাংলা	বাংলা	কলকাতা
বোম্বাই (শহর)	মারাঠি-গুজরাটি	বোম্বাই
দিল্লি	হিন্দুস্তানি	দিল্লি
গুজরাট	গুজরাটি	আহমেদাবাদ
কর্ণাটক	কন্নড়	ধারওয়ার
কেরালা	মালয়ালম	কালিকট
মহাকোশল	হিন্দুস্তানি	জব্বলপুর
মহারাষ্ট্র	মারাঠি	পুণে
নাগপুর	মারাঠি	নাগপুর
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	পুশতু	পেশওয়ার
পঞ্জাব	পাঞ্জাবি	লাহোর
সিন্ধু	সিন্ধি	করাচি
তামিলনাড়ু	তামিল	মাদ্রাজ
যুক্তপ্রদেশ	হিন্দুস্তানি	লখনউ
উৎকল	ওড়িয়া	কটক
বিদর্ভ (বেরার)	মারাঠি	আকোলা

এই বিভাজনে অঞ্চল, জনসংখ্যা বা রাজস্বের দিকগুলিকে বিবেচনার মধ্যে আনা হয় নি। প্রত্যেকটি প্রশাসনিক এককের যে ন্যূনতম সভ্য জীবনের মান রক্ষা করার ক্ষমতা থাকবে এবং যে কারণে তার যথেষ্ট এলাকা, যথেষ্ট জনসংখ্যা এবং প্রচুর রাজস্ব থাকবে, এমন চিন্তার কোনও স্থান প্রদেশ গঠনের জন্যে অঞ্চল ভাগের সময় ছিল না। মূল নির্ধারক হয়েছিল ভাষা। এমন কোনও চিন্তা করা হয়নি যে, এই ধরনের প্রদেশ বিভাজনের ফলে ভারতীয় সমাজ-জীবনের শিথিল গঠনের

সুযোগ, বিভেদকামী শক্তির জন্ম দিতে পারে। সন্দেহ নেই যে, প্রকল্পটির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে কংগ্রেসের দিকে নিয়ে আসা। ভাষাগত প্রদেশ গঠনের এই চিন্তা দৃঢ় হয়েছে এবং এটিকে কার্যকরী করার দাবি এত প্রবল হয়েছে যে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর তাকে কার্যকরী করতে বাধ্য হয়েছে। উড়িশা ইতিমধ্যেই বিহার থেকে পৃথক হয়েছে।[১] অন্ধ্রও মাদ্রাজ থেকে আলাদা হওয়ার দাবি করছে। কর্ণাটক সরে যেতে চাইছে মহারাষ্ট্র থেকে।[২] একমাত্র ভাষাগত প্রদেশ যেটি মহারাষ্ট্র থেকে আলাদা হতে চাইছে না, সেটি হল গুজরাট। অন্যভাবে বললে, গুজরাট আপাতত আলাদা হওয়ার চিন্তা ছেড়েছে। তা সম্ভবত এই কারণে যে, মহারাষ্ট্রের সঙ্গে একত্র থাকা যে, রাজনীতি ও বাণিজ্যিক কারণে গুজরাটের পক্ষেই মঙ্গলকর।

যাই হোক, ব্যাপারটি এই দাঁড়াল যে, ভাষার ভিত্তিতে বিভাজন এখন সর্বসম্মত নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। একথা বলা অর্থহীন যে, ভাষাগত কারণে কর্ণাটক ও অন্ধ্রের বিযুক্তি দরকার, কিন্তু পাকিস্তানের আলাদা হওয়ার কারণ সাংস্কৃতিক পার্থক্য। কোনও পার্থক্য ছাড়াই এই প্রভেদ। সাংস্কৃতিক পার্থক্যের-ই অপর নাম ভাষাগত পার্থক্য।

কর্ণাটক ও অন্ধ্রের আলাদা হওয়ায় যদি আহত হওয়ার কোনও কারণ না থাকে, পাকিস্তানের আলাদা হওয়ার দাবির মধ্যেই বা আহত হওয়ার কী আছে? এর ফলাফল যদি বিভেদকামী হয়, তবে তা হিন্দু প্রদেশ মহারাষ্ট্র থেকে কর্ণাটকের বা মাদ্রাজ থেকে অন্ধ্রের বিভাজনের চেয়ে বেশি বিভেদকামী নয়। একটি সাংস্কৃতিক অংশের নিজস্ব উন্নতি ও বৃদ্ধির স্বাধীনতা দাবি করার-ই অন্য নাম হল পাকিস্তান।

১. এটি করা হয়েছে 'ভারত শাসন আইন' ১৯৩৫ অনুসারে।

২. কর্ণাটক এও চায় যে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির কিছু জেলা কর্ণাটকের সঙ্গে যুক্ত হোক।

অধ্যায় - ২

একটি জাতি চায় দেশ

বিভাজনের এই দাবির পেছনে যে কারণগুলি আছে অর্থাৎ প্রশাসনিক, ভাষাগত বা সংস্কৃতিগত, সেগুলির কথা সবাই স্বীকার করে ও বুঝেছে। এই দাবিগুলি সম্পর্কে কারও কিছু মনে করার কারণ নেই, এবং অনেকেই এই দাবিগুলি মেনে নিতেও রাজি আছে। কিন্তু হিন্দুরা বলছে যে মুসলমানরা শুধু বিভাজন নয় আরও কিছু চাইছে—আইনগত ভাবে তারা উভয়ের সাধারণ যোগটুকুও মুছে ফেলতে চাইছে এবং পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের বিভাজনের প্রশ্নটিও তোলা হচ্ছে।

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে মুসলিম লীগের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণায় যে ভারতের মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র জাতি। মুসলিম লীগের এই ঘোষণাটিকে হিন্দুরা শুধু নিন্দেই করছে না, বিদ্রূপও করছে।

হিন্দুদের এই ক্ষোভ স্বাভাবিক। ভারত একটি জাতি কি না এই বিষয়টি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ইঙ্গ-ভারতীয় ও হিন্দু রাজনীতিকদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। ইঙ্গ-ভারতীয়রা এই কথা বলতে কখনও দ্বিধা করেনি যে, ভারত একটি জাতি মাত্র নয়। ভারতীয় বলতে শুধু ভারতের অধিবাসীদেরই বুঝায়। একজন ইঙ্গ-ভারতীয়ের ভাষায়—'ভারতকে জানতে গেলে একথা ভুলে যেতে হয় যে, ভারত বলে কিছু আছে।' অন্যদিকে, হিন্দু রাজনেতা ও দেশব্রতীদের এটা বরাবরের বক্তব্য যে, ভারত একটি জাতি। ইঙ্গ-ভারতীয়রা যে ঠিক কথাই বলছে, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনকি বাংলার জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথও তাদের সঙ্গে একমত হয়েছেন। কিন্তু হিন্দুরা কখনও রবীন্দ্রনাথের কথাতেও হার মানতে চায়নি।

এর কারণ হল দ্বিবিধ। প্রথমত, হিন্দুরা স্বীকার করতে লজ্জা পায় যে, ভারত এক জাতি নয়। পৃথিবীতে যখন জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদ জনগণের বিশেষ গুণ হিসাবে পরিগণিত হয়, তখন এটা হিন্দুদের কাছে এই ধারণা খুব-ই স্বাভাবিক যে, এইচ. জি. ওয়েল্‌স-এর ভাষায়, প্রকাশ্য স্থানে বস্ত্রহীন অবস্থায় কোনও মানুষের যে দশা হয়, জাতীয়তাহীন অবস্থায় ভারতের দশাও তদ্রূপ অশোভন। দ্বিতীয়ত, সে অনুভব করেছে যে, স্বায়ত্ত-শাসনের দাবির সঙ্গে জাতীয়তার বিষয়টিও অঙ্গাঙ্গীভাবে

যুক্ত। সে জেনেছে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এটি সর্বজন স্বীকৃত নীতি যে, জনসাধারণ জাতি হিসাবে পরিগণিত হলে তাদের স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার জন্মে এবং কোনও দেশপ্রেমিককে স্বায়ত্ত-শাসন চাওয়ার সময় প্রমাণ করতে হয় যে তারা একটা জাতিতে পরিণত হয়েছে। এই কারণে একজন হিন্দু ভারত একটি জাতি কি না এই প্রশ্নকে সর্বদাই এড়িয়ে গেছে। কখনও সে চিন্তা করে দেখেনি যে জনসাধারণ নিজেদের জাতি হিসাবে মনে করলেই জাতীয়তা তৈরি হয় কিংবা জাতি হয়ে উঠলে তবেই জাতীয়তা প্রশ্ন ওঠে। সে একটি বিষয়-ই জানে যে ভারতে যদি স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত করার দাবিকে জয়যুক্ত করতে হয়, তাহলে তাকে, প্রমাণ সাপেক্ষ হলেও, একথা বলে যেতে হবে যে, ভারত একটি জাতি।

তার এই ঘোষণায় অন্য কোনও ভারতীয়ের কাছ থেকে বিরোধিতা আসেনি। সবাই এতটাই একমত যে ইতিহাসের বিচক্ষণ ভারতীয় ছাত্ররাও এর পক্ষে প্রচার-ধর্মী রচনা লিখতে এগিয়ে এসেছে। কোনও সন্দেহ নেই, এর পেছনে দেশপ্রেমের আবেগই কাজ করছে। হিন্দু সমাজ সংস্কারকরা এই তত্ত্বের ভ্রান্তি সম্পর্কে অবহিত থাকলে খোলাখুলিভাবে এর বিরোধিতা করেন নি। কারণ হল, এই চিন্তার বিরোধিতা যেই করবে, তাকে ব্রিটিশ শাসকদের হাতে ক্রীড়নক এবং দেশের শত্রু বলে চিহ্নিত করা হবে। হিন্দু রাজনীতিক অনেক দিন ধরে তার এই মতকে প্রচার করার সুযোগ পেয়েছে। তার বিরোধী, ইঙ্গ-ভারতীয়রাও প্রত্যুত্তর দেওয়া থেকে বিরত থেকেছে। ফলে তার প্রচার প্রায় সম্পূর্ণভাবেই সফল হয়ে এসেছিল, এমন সময়েই এসেছে মুসলিম লীগের এই ঘোষণা। এটি যেহেতু ইঙ্গ-ভারতীয়দের কাছ থেকে আসে নি, তাই তা মারাত্মক আঘাত হয়ে এসেছে। এতদিন ধরে হিন্দু রাজনীতিক যা তৈরি করেছেন তা ধ্বংস হবার মুখে। মুসলমানরা ভারতে যদি স্বতন্ত্র জাতি হয়, তা হলে ভারত নিশ্চয় এক জাতি নয়। এই ভাবনা হিন্দু রাজনীতিকের পায়ের নিচে থেকে সমস্ত মাটি সরিয়ে ফেলেছে। সুতরাং এটি স্বাভাবিক যে, তারা খুব বিরক্ত হবে এবং একে পিছন থেকে ছুরি মারার সঙ্গে তুলনা করবে।

ছুরি মারা হোক বা না হোক, কথা হল—মুসলমানদের কি একটা জাতি বলে মনে করা হবে? আর সব কিছু এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এবার প্রশ্ন তোলা যায়—জাতি কী? এই বিষয়ে গাদা গাদা লেখা হয়েছে। কেউ আগ্রহী হলে সেসব পড়ে দেখতে পারেন এবং এ সম্পর্কে যেসব ভাবনা আছে এবং তার নানা দিক আছে সেগুলি অধ্যয়ন করতে পারেন। তবে এটুকু জানা এখানে যথেষ্ট যে, জাতীয়তা একটি সামাজিক অনুভূতি। এটি একতার সামগ্রিক প্রকাশ—যারা এতে প্রাণিত, তারা অনুভব

করেন যে, সবাই আত্মীয় একে অপরের। এই জাতীয় অনুভূতি হল দ্বিমুখী। একদিকে, আত্মীয়তাসূত্রে সবার প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ, অন্যদিকে যারা আত্মীয় নয় তাদের প্রতি অ-ভ্রাতৃত্ববোধ। এটি এমন এক সচেতন ভাবনা যা একদিকে সমভাবাপন্ন সবাইকে এত দৃঢ়ভাবে বন্ধনে আবদ্ধ করে যে, সামাজিক বিভেদ বা সামাজিক শ্রেণীভেদের সব পার্থক্যের ঊর্ধ্বে তারা উঠতে পারে, অন্যদিকে, যারা সমভাবাপন্ন নয়, তাদের সঙ্গে সব সম্পর্কে ছিন্ন করায়। অন্য কোনও দলভুক্ত না থাকার ইচ্ছে এতে তৈরি হয়। এই হল জাতীয়তা বা জাতীয় ভাবনার মূল বিষয়।

এখন এই ভাবনাটিকে মুসলমানদের দাবির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাক। ভারতের মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী, এটি সত্য, না সত্য নয়? তাদের মধ্যে এক ধরনের চেতনা কাজ করে, এটি সত্য না সত্য নয়? প্রতিটি মুসলমানের আকাঙ্খা তার নিজস্ব গোষ্ঠীতে থাকা এবং অ-মুসলমান গোষ্ঠীতে না থাকা—এটি সত্য, না সত্য নয়?

যদি এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ-সূচক হয়, তবে বিতর্কের অবসান হওয়া দরকার এবং মুসলমানদের দাবি যে তারা একটি জাতি, তা মেনে নেওয়া উচিত।

হিন্দুদের প্রমাণ করতে হবে যে, সামান্য কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে, যাতে তারা একটি জাতি হিসাবে পরিচিত হতে পারে। অর্থাৎ সহজভাবে বলতে গেলে, এমন মিল রয়েছে যাতে তারা একত্বের আকাঙ্খা করতে পারে।

মুসলমানরা নিজেরাই আলাদা জাতি এই চিন্তার সঙ্গে সহমত পোষণ করে না যেসব হিন্দু, তারা ভারতীয় সমাজজীবনের এমন কতকগুলি বিশেষত্বের ওপর নির্ভর করে, যেগুলিকে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাধারণ ঐক্যের সূত্র বলে মনে করা হয়।

প্রথমত, একথা বলা হয় যে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে 'রেস' বা জাতিগত কোনও কি পার্থক্য নেই? বলা হয় যে, পঞ্জাবি মুসলমান ও পঞ্জাবি হিন্দু, ইউ পি-র মুসলমান ও ইউ পি-র হিন্দু, বিহারের মুসলমান ও বিহারের হিন্দু, বাংলার মুসলমান ও বাংলার হিন্দু, মাদ্রাজের মুসলমান ও মাদ্রাজের হিন্দু, বোম্বাইয়ের মুসলমান ও বোম্বাইয়ের হিন্দু জাতিগত ভাবে এক। কোনও সন্দেহ নেই যে 'রেস' বা এই জাতিগত দিক থেকে খুব-ই মিল রয়েছে একজন মাদ্রাজি মুসলমানের সঙ্গে মাদ্রাজি ব্রাহ্মণের, যতটা মিল একজন মাদ্রাজি ব্রাহ্মণের সঙ্গে একজন পঞ্জাবি ব্রাহ্মণের

নেই। দ্বিতীয়ত, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভাষাগত ঐক্যের ওপর জোর দেওয়া হয়। বলা হয় যে মুসলমানদের নিজের কোনও ভাষা নেই, যাতে ভাষাগত দিক থেকে তারা হিন্দুদের থেকে আলাদা গোষ্ঠীতে পরিণত হবে। বরং, উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাষাগত ঐক্য বিদ্যমান। পঞ্জাবের হিন্দু-মুসলমান উভয়েই পাঞ্জাবিতে কথা বলে। সিন্ধুতে উভয়েই কথা বলে সিন্ধিতে, বাংলায় উভয়েই বাংলায় কথা বলে। গুজরাটে তারা গুজরাটি বলে আর মহারাষ্ট্রে মারাঠি। সব প্রদেশেই এক-ই অবস্থা। শুধুমাত্র শহরগুলিতে, মুসলমানরা উর্দু বলে। আর হিন্দুরা বলে তাদের প্রদেশের ভাষা। কিন্তু বাইরে, মফঃস্বলে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাষাগত ঐক্য আছে। তৃতীয়ত, এও বলা হয়েছে যে, হিন্দু ও মুসলমান শত শত বছর ধরে ভারতে একসঙ্গে বসবাস করছে। এই দেশ শুধুমাত্র হিন্দুদের নয়, কিংবা শুধুমাত্র মুসলমানদেরও নয়।

জাতিগত ঐক্যের ওপর-ই শুধু জোর দেওয়া হয়নি, জোর দেওয়া হয়েছে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যেকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কিছু বৈশিষ্ট্যের ওপর, উভয় গোষ্ঠীতে যেগুলির দেখা মেলে।

একথা বলা হচ্ছে, যে অনেক মুসলমানের সামাজিক জীবন হিন্দু প্রথার সঙ্গে ঘনসন্নিবদ্ধ। যেমন হিন্দু নামের অনেক পদবি মুসলমানদের মধ্যেও দেখা যায়। চৌধুরি হিন্দু পদবি হলেও যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর ভারতের মুসলমানদের মধ্যেও দেখা যায়। বিবাহের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, কোনও কোনও মুসলমান নাম মাত্রই মুসলমান, রীতিগত কোনও প্রভেদ নেই। অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র হিন্দুরীতি অনুসরণ করে অথবা হিন্দুরীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠান সমাপ্ত করে কাজিকে ডাকে। কোনও কোনও মুসলমানের ক্ষেত্রে হিন্দু আইন প্রযোজ্য হয় বিবাহের সময় অভিভাবকত্ব ও উত্তরাধিকারের বিষয়ে। শরিয়ৎ আইন গৃহীত হওয়ার আগে একথা পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ক্ষেত্রেও সত্য ছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে জাত-পাতের শ্রেণী-ব্যবস্থা হিন্দু সমাজেও যেমন, মুসলমান সমাজেও তেমনি। ধর্মের ব্যাপারেও বলা হয়ে থাকে যে, অনেক মুসলমান পিরের হিন্দু শিষ্য ছিল; এবং তেমনিভাবে কিছু হিন্দু যোগীদেরও মুসলমান চেলা থেকেছে। বিরোধী দুই বিশ্বাসের গুরুদের মধ্যে বন্ধুত্বের ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

পঞ্জাবের গিরোটে জামালি সুলতান ও দিয়াল ভবন নামে দুই যোগীর কবর পাশাপাশি রয়েছে, এঁরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সদ্ভাবের সঙ্গে বাস করেছেন এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই দ্বারা পূজিত হয়েছেন। বাওয়া ফাতু নামে এক

মুসলমান যোগী যিনি ১৭০০ সাল নাগাদ বেঁচে ছিলেন, তার কবর আছে কাংড়া জেলার রানীতলে—তিনি হিন্দু যোগী, শোধি গুরু গুলাব সিংয়ের আশীর্বাদে 'ঈশ্বর প্রেরিত' উপাধি লাভ করেছিলেন। অন্যদিকে, বাবা সাহানা নামে একজন হিন্দু সাধু যার ধর্মমতের অনুগামীরা আছেন জঙ জেলায়, তিনি নাকি এক মুসলমান পিরের চেলা এবং তার হিন্দু শিষ্যের নাম পাল্টে নাম রেখেছিলেন মির শাহ।

এসব নিশ্চয় সত্যি। মুসলমানদের এক বৃহৎ অংশ যে হিন্দুরা যে গোত্রের সেই গোত্রেরই, তাতে সন্দেহ নেই। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, সমস্ত মুসলমান-ই একভাষাতে কথা বলে না এবং হিন্দুরা যে ভাষাতে কথা বলে, সেই ভাষাতেই তারা কথা বলে। একথাও ঠিক যে, উভয়ের-ই সামাজিক প্রথায় অনেক মিল আছে। কিছু কিছু ধর্মীয় আচারেও যে মিল আছে, এও সত্য। কিন্তু প্রশ্ন হল—এই সব কিছু থেকে কি এই সিদ্ধান্তে আসা যাবে যে হিন্দু ও মুসলমানরা এইকারণে এক জাতির অন্তর্গত এবং এই সব কিছু কি তাদের মনে এই অনুভূতি তৈরি করে যে তারা উভয়ে একে অপরের?

হিন্দুদের বক্তব্যে অনেক ত্রুটি আছে। প্রথমত, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যমূলক যেসব সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হচ্ছে, সেগুলি কিন্তু সামাজিক মিশ্রণ ঘটানোর লক্ষ্যে একে অপরের রীতি-নীতি গ্রহণ করার সচেতন প্রচেষ্টা নয়। পক্ষান্তরে, এই সাদৃশ্য হল শুধুমাত্র কিছু কৃত্রিম কারণের ফলশ্রুতি। এগুলির আংশিক কারণ হল অসমাপ্ত ধর্মান্তকরণ। ভারতের মতো দেশে যেখানে মুসলমান জনসংখ্যার বেশির ভাগ-ই উচ্চবর্ণ ও বর্ণবহির্ভূত হিন্দু দ্বারা গঠিত, ধর্মান্তরিত এইসব মানুষের ইসলামীকরণ সম্পূর্ণভাবে ফলপ্রসূ হয়নি—এর কারণ হতে পারে বিদ্রোহের ভীতি কিংবা যথেষ্ট প্রচারের অভাব। এই কারণে অবাক হবার কিছু নেই যদি মুসলমান জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশের মধ্যে তাদের ধর্ম ও সমাজজীবনে হিন্দু উৎসের কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। এটিকে অংশত ব্যাখ্যা করতে হবে এইভাবে, যে এসব উভয় সম্প্রদায়ের এক-ই পরিবেশে শতাব্দী ধরে বসবাসের ফল। সদৃশ পরিবেশের প্রভাবে সদৃশ বৈশিষ্ট্য দেখা দিতে বাধ্য। সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যকে অংশত এভাবেও ব্যাখ্যা করতে হবে, যে এগুলি সম্রাট আকবরের হাতে যার সূচনা সেই হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় মিশ্রণের যুগের অবশিষ্টাংশ।

ভাষা ও এক-ই দেশজাত ঐক্যের ভিত্তিতে জাতির যে যুক্তি তৈরি করা হয়েছে, সে সম্পর্কে বলা যায় যে বিষয়টির ক্ষেত্র ভিন্ন। এই সমস্ত বিবেচনাগুলি যদি কোনও 'নেশন' বা জাতিগঠনের নির্ধারক হত, তা হলে হিন্দুরা একথা বলতে

পারত যে 'জাতি', ভাষাগোষ্ঠী ও বাসস্থানের কারণে হিন্দু ও মুসলমানরা এক জাতির অন্তর্গত। ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে 'জাতি' বা ভাষা বা দেশ কিছুই জনগণকে একটা নেশন-এ পরিণত করতে পারেনি। এই যুক্তি এত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন রেনান, যে অন্য কোনও ভাবে তা এর চেয়ে ভালো করে প্রকাশ করা যাবে না। অনেক দিন আগে তাঁর 'জাতীয়তা' নামক প্রবন্ধে রেনান লিখেছেন :

'জাতি'-কে 'নেশন'-এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। সত্য হল এই যে, খাঁটি 'জাতি' বলে কিছু নেই; এবং রাজনীতিকে ধারাবাহিক বিশ্লেষণের কাজে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হল তাকে একটা দৈত্যের চেহারা দেওয়া... 'জাতি'-গত সত্য, প্রথমদিকে যত গুরুত্বপূর্ণই হোক, ক্রমশই তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলার প্রবণতা দেখা দেয়। মানব ইতিহাসের সঙ্গে প্রাণীবিদ্যার মৌলিক পার্থক্য আছে। 'জাতি'-ই সব কিছু নয়।...'

ভাষার বিষয় বলতে গিয়ে রেনান অভিমত প্রকাশ করেছেন :

'ভাষা পুনর্মিলনের আহ্বান জানায়, কিন্তু তাকে বাধ্য করে না। আমেরিকা ও ইংল্যান্ড, স্পেনীয় আমেরিকা ও স্পেন এক-ই ভাষায় কথা বলে অথচ একক ভাবে জাতি হয়ে ওঠেনি। পক্ষান্তরে, সুইজারল্যান্ডে জাতি তৈরি হয়েছিল তার অন্তর্গত তিন চারটি ভাষার সম্মতিতে। মানুষের মধ্যে ভাষার অধিক বড় কিছু আছে—ইচ্ছা। ভাষার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ইচ্ছেই সুইজারল্যান্ডকে এক করেছে, এটিই ভাষার সাদৃশ্যের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়'।

একই দেশে বসবাসের প্রশ্নে রেনান বলেছেন :

'কোনও ভূখণ্ড জাতি তৈরি করে না। দেশ একটি ভিত্তিমাত্র—যুদ্ধ ও কর্মের স্থান; মানুষ-ই তাকে প্রাণ দেয়; জনগণ নামক সেই পবিত্র বিষয়টি গঠনে মানুষ-ই সব। এর জন্য কোনও বস্তুই যথেষ্ট নয়'।

দেখা গেল যে 'জাতি' ভাষা ও দেশে জাতিগঠনের জন্য যথেষ্ট নয়। রেনান এবার খুব তীক্ষ্ণ প্রশ্ন রাখছেন, জাতিগঠনের জন্য তা হলে কী প্রয়োজন? তাঁর প্রশ্নের উত্তর তাঁর ভাষাতেই দেওয়া যেতে পারে :

একটি জাতি হল জীবন্ত আত্মা, এক আধ্যাত্মিক নীতি। দুটি জিনিস, যা সত্যের কাছে এক-ই, এই আত্মা, এই আধ্যাত্মিক নীতি প্রণয়নে সাহায্য করে। একটি আছে অতীতে, অন্যটি বর্তমানে। একটি হল স্মৃতির ভিতরের ঐশ্বর্যে মিল, অন্যটি হল

প্রকৃত সম্মতি, একত্রে বাস করার ইচ্ছা, এবং অবিভক্ত ঐতিহ্যে সংরক্ষণের যৌথ সংকল্প। ব্যক্তির মতো জাতিও দীর্ঘ অতীতের প্রচেষ্টা, আত্মত্যাগ ও বলিদানের ফসল। পূর্বপুরুষের পূজো তাই স্বাভাবিক, কেননা আমরা যা, তা তারাই তৈরি করেছে। বীরত্বপূর্ণ অতীত, মহান ব্যক্তি, গৌরব—এ সব হল সামাজিক পুঁজি—যার ওপর জাতীয়তার ধারণার ভিত্তি তৈরি হয়। অতীত গৌরবের সাদৃশ্য, বর্তমানে সংকল্পের সাদৃশ্য, একসঙ্গে ভাল কাজ করার ইচ্ছা—এ-সবই হল একটা জাতি তৈরির প্রয়োজনীয় শর্ত।

অতীতের গৌরব ও দুঃখবোধকে একত্রে ভাগ করে নেওয়ার ইচ্ছে থাকতে হবে, এবং একটা সদৃশ আদর্শ ভবিষ্যতের মধ্যে খুঁজে পেতে হবে, একসঙ্গে আনন্দ ও কষ্ট পাওয়ার, আশা আকাঙ্খার অভ্যাস থাকতে হবে। জাতি ও ভাষার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এসব কিছুকে অনুধাবন করতে হবে। আমি এই মাত্র বলেছি, একসঙ্গে কষ্ট সহ্য করতে হবে; হ্যাঁ আনন্দে অংশ নেওয়ার চেয়ে দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার মধ্যেই একতার বীজ। আর জাতীয় স্মৃতির বিষয়ে বলা যায় যে, বিনয়ের চেয়ে শোক প্রকাশ বেশি দামি, কেননা এর মধ্যে কর্তব্যের আহ্বান আছে, একই রকম প্রচেষ্টার দাবি থাকে'।

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এমন কোনও ঐতিহাসিক পরিচয়ের সাদৃশ্য আছে কি, যা নিয়ে তারা গর্ব করতে পারে বা দুঃখ করতে পারে? এটিই হল মূল কথা। হিন্দু ও মুসলমান মিলে একটা জাতি, একথা বললে এই প্রশ্নের উত্তর হিন্দুদের দিতেই হবে। তাদের সম্পর্কের এই দিকটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তারা অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত বিবাদমান দুই যুদ্ধদল। কোনও কৃতিত্বের অংশীদার হয়ে কোনও কিছুতে উভয়ের অংশগ্রহণ নেই। রাজনীতি ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদের অতীত হল পারস্পরিক ধ্বংসের অতীত—পারস্পরিক বিদ্বেষের অতীত। 'হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন' নামে পুস্তিকায় ভাই পরমানন্দ যেমন বলেছেন—'হিন্দুরা শ্রদ্ধা করে ইতিহাসের পৃথ্বীরাজ, প্রতাপ, শিবাজী ও বেরাগী বীরের স্মৃতিকে, যারা এই দেশের স্বাধীনতা ও সম্মানের জন্য লড়াই করেছিলেন, অন্যদিকে মুসলমানরা ভারত অভিযানকারীদের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেমন মহম্মদ-বিন-কাসিম এবং ঔরঙ্গজেব প্রমুখ শাসকদের দিকে, জাতীয় বীরের মতো'।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে দেখা যায়, হিন্দুরা প্রেরণা পায় রামায়ণ, মহাভারত ও গীতা থেকে; আর মুসলমানরা প্রেরণা পায় কুরআন ও হাদিস থেকে। সুতরাং উভয়কে একত্র করছে যা কিছু, তার চেয়ে বিভক্ত করার বিষয়গুলি অনেক বেশি। হিন্দু ও

মুসলমান সমাজজীবনের কিছু সাদৃশ্যের ওপর নির্ভর করে, ভাষা ও দেশের সাদৃশ্যে বেশি আস্থা রেখে হিন্দুরা যা প্রয়োজনীয় ও মৌলিকতার বদলে আকস্মিক ও অগভীর বিষয়গুলির চর্চা করে ভুল করছে। তথাকথিত সাদৃশ্য আছে এমন সব বিষয়গুলির উভয়কে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষমতা যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর বিভাজন তৈরির ক্ষমতা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিরুদ্ধতার। যদি উভয়েই তাদের অতীতকে ভুলতে পারে, তাহলে হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে। রেনান জাতিগঠনের একটি শর্ত হিসাবে স্মৃতি বিলোপের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন :

'জাতির সৃষ্টিতে পুরনো কথা ভুলে যাওয়া ও ইতিহাসের ত্রুটি মনে না করার একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। এই কারণে ইতিহাস চর্চার অগ্রগতির একটা বিপজ্জনক দিকও আছে জাতি চেতনা উন্মেষের ক্ষেত্রে। ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার সময় সংঘটিত সমস্ত হিংসার পাদপ্রদীপের সামনে উঠে আসে, এমনকি যার ফলে লাভ হয়েছে এমন ঘটনাও। নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে কখনওই ঐক্য তৈরি হয় না। বিনাশের দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ ফ্রান্সের মিলন হয়, আর এক সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি হয় যা চলেছিল প্রায় একশত বছর। ফ্রান্সের রাজা যিনি আমার মতে ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শস্বরূপ এবং যিনি প্রকৃতই জাতীয় ঐক্যের অস্তিত্ব দান করেছিলেন, তাঁকেও খুব কাছ থেকে দেখলে দেখা যাবে তিনি তাঁর সম্মান রাখতে পারছেন না। যে জাতি তিনি গড়েছিলেন তা তাঁকেই অভিশাপ দিয়েছে এবং আজ তাঁর মূল্য শুধু যারা জানে তাদের কাছেই'।

'বৈসাদৃশ্যের আলোকে পশ্চিম ইউরোপের ইতিহাসের এইসব বিখ্যাত আইনগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফ্রান্সের রাজার পথ নিতে গিয়ে অনেক দেশ ব্যর্থ হয়েছে। সেন্ট স্টিফেনের রাজত্বে ম্যাগইয়ার্স ও স্লাভরা অটাশত বছর আগে যেমন আলাদা ছিল, তেমনি থেকে গেছে। বোহেমিয়াতে চেক ও জার্মানরা তেল ও জলের মতো গ্লাসে মিশেছে। ধর্মানুসারে জাতীয়তা বিভাজনের যে তুর্কি নীতি তৈরি হয়েছিল, তার মারাত্মক ফল দেখা গেছে। এর ফলে প্রাচ্যেরই ক্ষতি হয়েছে। স্মিরনা বা সালোনিকার মতো শহরের কথা ধরা যাক। সেখানে দেখবে যে পাঁচটি বা ছয়টি গোষ্ঠী তাদের নিজের নিজের স্মৃতি আঁকড়ে বসে আছে, সাদৃশ্যের দিকে বিন্দু মাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। কিন্তু জাতির মূল বিষয় হল যে তার প্রত্যেকটি ব্যক্তির সাদৃশ্যমূলক অনেক কিছু থাকবে, আর প্রত্যেকেই অনেক কিছুই ভুলে যাবে। কোনও ফরাসি নাগরিকই জানে না সে বারগান্ডিয়ান, না অ্যালান না ভিসিগথ। প্রতি ফরাসীই সেন্ট বারথোলোমিউ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর দক্ষিণের নিধন যজ্ঞের কথা ভুলে গেছে। ফরাসিতে দশটি

পরিবারও নেই যাঁরা তাদের মূল যে ফরাসি তার প্রমাণ দেখাবে। আর এমন প্রমাণ দিলেও তা সঠিক হবে না, কেননা তা অনেক এদিক-ওদিকের মিশ্রণ'।

দুঃখের কথা হল এই যে, আমাদের দুই গোষ্ঠী কখনওই তাদের অতীতকে ভুলতে বা মুছে ফেলতে পারবে না। তাদের অতীত সম্পৃক্ত হয়ে আছে তাদের ধর্মে, তাই অতীতকে বিসর্জন দেওয়ার অর্থ ধর্মকে জলাঞ্জলি দেওয়া। এমন ঘটবে এ আশা করাও বৃথা।

সাদৃশ্য ঐতিহাসিক পরিচয়ের অভাবে, হিন্দুদের এই ধারণা ব্যর্থ হতে বাধ্য, যে হিন্দু ও মুসলমানরা একত্রে একটি জাতিতে পরিণত হবে। এই ধরণা জিইয়ে রাখার অর্থ হল দিবা স্বপ্ন দেখা। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে একত্র থাকার যে ইচ্ছা, তেমন একত্রে থাকার ইচ্ছা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে নেই।

একথা বলা বৃথা যে, তারা নিজেরাই একটি জাতি এ চিন্তা তাদের নেতাদের মনে পরে এসেছে। অভিযোগ হিসাবে এটি সত্য। মুসলমানরা এতদিন পর্যন্ত নিজেদের একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসাবে দেখে সন্তুষ্ট থেকেছে। শুধু এই সাম্প্রতিককালে, তারা ভাবতে শুরু করেছে যে তারা একটি জাতি। কিন্তু একজন লোকের উদ্দেশ্যকে আক্রমণ করলেই তার মতামতকে খণ্ডন করা যায় না। যদি এরকম বলা হয় যে যেহেতু মুসলমানরা এতদিন নিজেদের একটি গোষ্ঠী হিসাবে দেখে এসেছে এবং সেই কারণে এখন নিজেদের জাতি বলার কোনও অধিকার নেই, তা হলে কিন্তু জাতীয় ভাবনার মনস্তত্ত্বের রহস্যময় ক্রিয়াকলাপের দিকটি বুঝতে অসুবিধা হবে। এইরকম যুক্তির সাহায্যে ধরে নেওয়া হয়, যে যেখানে, জনগণের অস্তিত্ব আছে এবং তাদের মধ্যে জাতিগঠনের উপকরণগুলি আছে, সেখানে অবশ্যম্ভাবীরূপে জাতীয়তার আবেগ স্পষ্ট থাকতে হবে এবং যেখানে এই আবেগ স্পষ্ট হবে না সেখানেই ধরে নেওয়া হবে তাদের জাতিগঠনের দাবির কোনও যৌক্তিকতা নেই। এমন যুক্তির কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। অধ্যাপক টয়েনবি যেমন বলেছেন :

'জাতীয়তাবোধের অস্তিত্বের সহায়ক, এমন একটি বা অনেকগুলি শর্তের উপস্থিতি লক্ষ্য করে এমন যুক্তি দেখানো অসম্ভব, যে জাতীয়তা নেতৃত্বের দ্বারা আরোপিত। বরং বলা যায় যে এই শর্তগুলি আগে থেকেই ছিল, প্রজ্বলিত হবার অপেক্ষায়। কোনও একটি উদাহরণ দিয়ে তর্ক করা যাবে না; কেননা এক-ই ধরনের কিছু অবস্থা এখানে জাতীয়তাবাদ তৈরি করলেও অন্যত্র তা কার্যকরী নাও হতে পারে'।

এমন হতে পারে, যে মুসলমানরা এতদিন সচেতন ছিল না যে, তাদের মধ্যে আছে জাতীয়তার মর্মবাণী। এত দেরিতে কেন তারা জাতিগঠনের দাবি জানাচ্ছে,

এই প্রশ্নের উত্তর তা হলে পাওয়া যেতে পারে। দেরিতে দাবি করছে, এর অর্থ এই নয় যে জাতীয় জীবনের আত্মিক মর্ম তাদের মধ্যে ছিল না।

এমন উদাহরণ আছে, যেখানে জাতীয়তার চেতনা আছে অথচ স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বাসনা নেই—এই যুক্তি দেখানো যাবে না। কানাডার ফরাসিরা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরাজদের উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। স্বীকার করা ভালো যে, এমন উদাহরণ রয়েছে, যেখানে জনগণ তাদের জাতীয়তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, কিন্তু তা থেকে কোনও জাতীয়তাবাদের আবেগ জন্ম নিচ্ছে না। অর্থাৎ নিজেদের সম্পর্কে সচেতন এমন জাতিগুলির অস্তিত্ব সম্ভব, কিন্তু এই অস্তিত্ব জাতীয়তাবাদের আবেগবর্জিত। এই যুক্তিতে এ কথা বলা যায় মুসলমানরা মনে করতে পারে যে তারা একটি জাতি, কিন্তু তাই বলে তাদের পৃথক জাতীয় সত্তার দাবি করার প্রয়োজন নেই; কানাডাতে ফরাসিরা এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজরা যেমনভাবে আছে, তেমনিভাবে থাকতে তারা সন্তুষ্ট হতে পারছে না কেন? কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে এই অবস্থা আসতে পারে যদি মুসলমানদের অনুরোধ করে জানানো যায় যে দেশবিভাগ তারা করবে না। কিন্তু তারা যদি তা না জানে, তবে তাদের দাবির বিরুদ্ধে এটি কোনও যুক্তি হয়ে উঠবে না।

উপরোধের অর্থ যাতে প্রত্যাখ্যান বলে ভুল না হয়, সেইকারণে দুটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা দরকার। প্রথমত, জাতীয়তা (nationality) ও জাতীয়তাবাদের (nationalism) মধ্যে পার্থক্য আছে। মানুষের মনের দুটি ভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক দিক। জাতীয়তা বলতে বোঝায় 'বিষয় চেতনা, সম্পর্ক সূত্রের অস্তিত্ব বিষয়ে সচেতনতা'। জাতীয়তাবাদ হল 'সম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ এমন মানুষজনের জন্য পৃথক জাতীয় অস্তিত্বের আকাঙ্খা'। দ্বিতীয়ত, একথা সত্যি যে জাতীয়তার অনুভূতি বিনা জাতীয়তাবাদ তৈরি হতে পারে না। কিন্তু এও মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রতিজ্ঞা সমসময় সত্য হয় না। জাতীয়তার অনুভূতি থাকতে পারে, কিন্তু জাতীয়তাবাদের ধারণা নাও থাকতে পারে। অর্থাৎ, জাতীয়তা সব ক্ষেত্রেই জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয় না। জাতীয়তা জাতীয়তাবাদে প্রজ্জ্বলিত হওয়ার জন্য দুটি বিষয় জরুরি। প্রথমত, 'জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার প্রতিজ্ঞা'। জাতীয়তাবাদ হল ওই প্রতিজ্ঞার চঞ্চল প্রকাশ। দ্বিতীয়ত, এমন একটি ভূখণ্ড থাকা চাই, যেখানে জাতীয়তাবাদ তৈরি হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করবে এবং জাতির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থাকবে। এই ভূখণ্ড ব্যতীত জাতীয়তাবাদ, লর্ড অ্যাক্টনের ভাষায়, হয়ে দাঁড়াবে 'একটি আত্মা যা ঘুরে মরছে একটি দেহের সন্ধানে, যেখানে নতুন জীবন শুরু

করতে পারে, কিন্তু না পেয়ে মরে যায়'। মুসলমানদের মধ্যে 'জাতি হিসাবে বাস করার প্রতিজ্ঞা' জাগরিত হয়েছে। তাদের জন্য প্রকৃতি দিয়েছে ভূখণ্ড, যেখানে তারা দখল করে তাদের রাষ্ট্র নির্মাণ করতে পারবে এবং সাংস্কৃতিক গৃহ গড়ে তুলবে সদ্যজাত মুসলমান জাতির জন্য। অনুকূল সমস্ত অবস্থা মাথায় রাখলে অবাক হবার কিছু থাকবে, যদি মুসলমানরা বলে যে, তারা কানাডার ফরাসি বা দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজদের অবস্থায় সন্তুষ্ট নয় এবং তারা একটি জাতীয় আকাশ চায়, যা হবে তাদের একান্ত নিজের।

□ □ □

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অবনয়নের হাত থেকে মুক্তি

হিন্দুরা খুব রাগতভাবেই জিজ্ঞেস করছে, 'ভারতভাগের দাবি ও আলাদা মুসলমান প্রদেশ গঠনের দাবি করার পেছনে মুসলমানদের কী যুক্তি আছে? কেন এই বিদ্রোহ? কী ক্ষোভ তাদের?'

ইতিহাস জানা এমন যে কেউ-ই বুঝতে পারবে যে এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে জাতীয়তাবাদই জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি হতে পারে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক লর্ড অ্যাকটন যেমন বলেছেন :

'পুরনো ইউরোপীয় ব্যবস্থায়, জাতীয়তার দাবি সরকার যেমন স্বীকার করেনি, তেমনি জনগণও সে দাবি করেনি। জাতির নয়, শাসনকারী পরিবারগুলির স্বার্থই সবদিক নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং সাধারণ মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দিকটি না ভেবেই সাধারণত রাজ্যশাসন করা হত। যেখানে সব স্বাধীনতাই দমিত, সেখানে জাতীয় স্বাধীনতার দাবিও স্বাভাবিকভাবে গ্রাহ্য করা হত না এবং ফেনিলনের ভাষায়, একজন রাজকুমারী তার বিয়ের যৌতুকে রাজতন্ত্র বহন করেছে'।

জাতীয়তার বিষয়গুলি তখন অনবহিত ছিল। সচেতনা যখন এল—

'সবাই প্রথমে তাদের আইনত শাসকদের রক্ষা করতে বিজয়ী শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। তারা দখলকারী শক্তির দ্বারা শাসিত হতে চাইল না। তারপর একটি সময় এল, যখন তারা বিদ্রোহ করল শাসকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহের কারণ ছিল, কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগজাত ক্ষোভ। তারপর এল ফরাসি বিপ্লব, যার ফলে এক বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হল। জনগণ শিখল যে নিজেদের নিয়ে যা তারা করতে চায়, তা-ই তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার সর্বোচ্চ নির্ধারক হবে। জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণা ঘোষিত হল—যা অতীতের দ্বারা পরিচালিত এবং বর্তমানের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ফরাসি বিপ্লবের ফলে যে শিক্ষা সূচিত হল, তা সমস্ত উদারতাবাদী চিন্তাবিদদের আদর্শ হিসাবে গৃহীত হল। মিল, এতে তাঁর সম্মতি জানালেন। মিল বললেন, 'কেউ জানে না যে মানব জাতির কোন্ অংশ স্বাধীন

হয়ে কী করবে এবং মানুষের কোন্ অংশের সঙ্গে মেলামেশা করবে'।

তিনি আরও এগিয়ে একথাও বললেন :

'স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির এটি একটি সাধারণ শর্ত যে সরকারের সীমানা জাতীয়তার সীমনার সঙ্গে এক জায়গায় মিলবে'।

এইভাবে ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে যে জাতীয়তার তত্ত্ব জনগণের ইচ্ছার সার্বভৌমত্বের গণতান্ত্রিক তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত আছে। এর অর্থ হল, জাতীয় রাষ্ট্রের জন্য জাতীয়তার দাবি করার সময় কোনও অভিযোগের বা ক্ষোভের ফর্দের সহায়তার প্রয়োজন নেই। জনগণের ইচ্ছাই যুক্তি হিসাবে যথেষ্ট।

কিন্তু তাদের দাবির সমর্থনে ক্ষোভের কথা যদি বলতেই হয়, তবে মুসলমানরা বলবে, এমন ক্ষোভ তাদের অনেক আছে। এই সবকে এক কথায় সংক্ষেপ করা যায়—হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠের অত্যাচার থেকে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ তাদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

গোল টেবিল বৈঠকে মুসলমানরা তাদের চৌদ্দ-দফা বিষয় সম্বলিত রক্ষাকবচের একটি তালিকা পেশ করেছিল। বৈঠকের হিন্দু প্রতিনিধিরা তাতে সম্মত হয়নি। ফলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ সরকার মধ্যস্থতা করতে এসে 'সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত' দেয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে মুসলমানদের চৌদ্দটি বিষয়ই রক্ষিত হয়। এই 'সাম্প্রদায়িক অ্যাওয়ার্ড' নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে দারুণ তিক্ততার সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস কিন্তু এই দ্বন্দ্বের অংশীদার হয়নি, যদিও সাধারণভাবে সমস্ত হিন্দুরাই এর প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছিল। কংগ্রেস অবশ্য সিদ্ধান্তটিকে জাতি বিরোধী মনে করেছিল এবং চেয়েছিল মুসলমানদের সম্মতিতেই এর পরিবর্তন ঘটানো যাবে। কিন্তু কংগ্রেস এত সতর্ক ছিল মুসলমান অনুভূতিকে আহত না করার জন্য, যে 'কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ডে'র নিন্দা করে সেন্ট্রাল অ্যাসেমব্লিতে যখন এক সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, কংগ্রেস তখন নিরপেক্ষ থাকে, পক্ষে বা বিপক্ষে যায়নি। মুসলমানরা কংগ্রেসের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে এক বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ বলেই মনে করে।

হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলির নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়লাভ ঘটলেও মুসলমানরা মনে করেনি যে এতে তাদের শান্তি বিঘ্নিত হবে। তারা ধরে নিয়েছিল যে কংগ্রেসের কাছে তাদের ভয়ের কোনও কারণ নেই এবং সম্ভাবনা যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মিলিতভাবে সংবিধান রচনার কাজে হাত দেবে। কিন্তু হিন্দু প্রধান প্রদেশগুলিতে দু'বছর তিন মাস কংগ্রেসের শাসন অতিবাহিত হলে সম্পূর্ণভাবে মোহভঙ্গ হয়

তাদের—তারা কংগ্রেসের তীব্র বিরোধিতায় নামে। ১৯৩৯ সালের ২২ ডিসেম্বর 'ডেলিভারেন্স ডে' উদ্‌যাপনের সময় তাদের কংগ্রেস বিরোধিতার তীব্রতা ধরা পড়ল। খারাপ ব্যাপার হল, এই তিক্ততা শুধু কংগ্রেস সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। গোল টেবিল বৈঠকে যে মুসলমানরা স্বরাজের দাবিতে গলা মিলিয়েছিল, তারাই স্বরাজের তীব্র বিরোধিতায় নামল।

কংগ্রেসের ওপর মুসলমানদের এত ক্রুদ্ধ হবার কারণ কী? মুসলিম লীগ ঘোষণা করেছে যে মুসলমানরা কংগ্রেস শাসনে অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হয়েছে। লীগের গঠন করা দুটি কমিটি তদন্ত করে এই সম্পর্কে রিপোর্ট দিয়েছে। যদিও এই বিষয়গুলি নিরপেক্ষ ট্রাইবুনাল দ্বারা বিচার সাপেক্ষ, তবুও বলা যায় যে, দুটি জিনিস নিঃসন্দেহে এই দ্বন্দ্বের আবকাশ তৈরি করেছে—১) মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি বলে মেনে নিতে কংগ্রেসের অসম্মতি এবং ২) কংগ্রেস প্রদেশগুলিতে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব কংগ্রেস কর্তৃক নাকচ।

প্রথম প্রশ্নে, কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই অনড়। মুসলিম লীগকে অনেক মুসলমান রাজনৈতিক সংগঠনের একটি বলে মেনে নিতে কংগ্রেস প্রস্তুত, যেমন আরও সংগঠন আছে, আদ্‌রারস্‌, ন্যাশনাল মুসলিম্‌স ও জামায়েত-উল-উলেমা। কিন্তু লীগকে কখনওই একমাত্র মুসলমান প্রতিনিধি বলে মানতে রাজি নয়। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগও কোনও আলোচনায় যেতে রাজি নয়, যদি না, তাকে ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন বলে স্বীকার করা হয়।

হিন্দুরা লীগের দাবিকে 'অবিবেচনা প্রসূত' আখ্যা দিয়ে নিন্দিত করেছে। মুসলমানরা বলতে পারে যে বিভিন্ন নেশনের মধ্যে কীভাবে চুক্তি হয় তার অনুসন্ধান থেকে বিরত থাকলেই হিন্দুরা তাদের মতের অসারতা ধরতে পারবে। এই যুক্তি দেখানো যায় যে, একটি নেশন যখন অন্য কোনও নেশনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে যায় তখন সে অন্য নেশনের সরকারকে প্রতিনিধি বলে মেনে নিয়েই এগোয়। কোনও দেশেই সরকার সমস্ত লোকের প্রতিনিধিত্ব করে না। সর্বত্র সরকার সংখ্যা গরিষ্ঠেরই প্রতিনিধিত্ব করে। তাই বলে কোনও নেশন, বিবাদের মীমাংসার জন্য অন্য সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে অস্বীকার করে না এই যুক্তিতে যে, ওই সরকার সকলের প্রতিনিধি নয়। সরকার যদি দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনসাধারণের প্রতিনিধি হয় তবে তাই যথেষ্ট। মুসলমানরাও বলতে পারে যে, এই তুলনা কংগ্রেস-লীগ বিবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত। লীগ সমস্ত মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব না করলেও যদি সংখ্যা গরিষ্ঠের প্রতিনিধি হয়, তাহলে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নে লীগের

সঙ্গে সমঝোতায় যেতে, কংগ্রেসের আপত্তি থাকা উচিত নয়। কোনও দেশের সরকার অবশ্যই অন্য দেশের সরকারকে স্বীকৃতি না জানাতে পারে, যদি সেই দেশে একের বেশি দল, নিজেদের সরকার বলে দাবি করে। একইভাবে কংগ্রেস লীগকে স্বীকার নাও করতে পারে। তবে তার অবশ্যই উচিত ন্যাশনাল মুসলিম্‌স বা আদ্‌রারস্‌ বা জামায়েত-উল-উলেমাকে স্বীকার করা এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিটমাটের ব্যবস্থা করা। তবে এ ব্যাপারে অবশ্যই সচেতন হয়ে এগোতে হবে যে, লীগের সঙ্গে চুক্তি অথবা অন্য কোনও মুসলমান দলের সঙ্গে চুক্তি, কোনও চুক্তি মুসলমানরা মেনে নেবে না। কংগ্রেসকে যে কোনও একটি চুক্তিই করতে হবে। কিন্তু কোনও দলের সঙ্গেই চুক্তি না করাটা শুধু অবিবেচকের কাজ নয়, ক্ষতিকারকও হবে। কংগ্রেসের এই দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমানদের বিরক্তির কারণ হবে। তারা যথাযথভাবেই কংগ্রেসের এই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা এইভাবে করে যে, তাদেরকে দুর্বল করে তোলার উদ্দেশ্যেই এটি তাদের মধ্যে নানা বিভেদ তৈরির চেষ্টা মাত্র।

দ্বিতীয় বিষয়ে, মুসলমানদের দাবি হল যে, মন্ত্রিসভায় মুসলমান মন্ত্রী রাখতে হবে এবং তাদেরই, যাদের প্রতি বিধানসভার মুসলমান সদস্যদের আস্থা আছে। তারা আশা করেছিল কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে তাদের এই দাবি মানা হবে। কিন্তু তারা আশাহত হয়েছে। তাদের এই দাবি সম্পর্কে কংগ্রেস আইনি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় মুসলমান মন্ত্রী রাখতে রাজি হয়েছিল এই শর্তে যে, তারা তাদের দল থেকে পদত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দেবে এবং কংগ্রেসের নামে শপথ গ্রহণ করবে। তিনটি কারণে মুসলমানরা এই শর্ত মানতে চায়নি।

প্রথমত, তারা একে বিশ্বাসভঙ্গতা বলে মনে করেছিল। তারা বলে যে তাদের দাবি সংবিধানের প্রকৃতি বিরোধী ছিল না। গোল টেবিল বৈঠকে ঐকমত্য হয়েছিল যে, মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিত্ব থাকবে। সংখ্যালঘুরা চেয়েছিল যে, এই বিষয়ে আইনের বিধি তৈরি করতে হবে। পক্ষান্তরে, হিন্দুরা চেয়েছিল যে, এটিকে প্রথা নিয়ন্ত্রিত করা হোক। একটা মধ্যপন্থা খুঁজে পাওয়া গেছিল। ফলে সবাই একমত হয়ে মেনে নিয়েছিল যে, প্রদেশগুলির গভর্নরদের জন্য নির্ধারিত ইন্সট্রুমেন্ট অব ইনস্টাকসন্স-এ তা নথিবদ্ধ হবে, গভর্নররা দেখবেন যাতে এই প্রথা মন্ত্রিসভা গঠনের সময় অনুসরণ করা হয়। মুসলমানরা এটিকে আইনের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য, পীড়াপীড়ি করেনি কারণ, তারা হিন্দুদের ওপর বিশ্বাস রাখতে পেরেছিল। এই চুক্তি এমন এক দলের দ্বারা ভঙ্গ করা হয়েছে, যে দল মুসলমানদের এই ধারণা দিয়েছিল তাদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি শুধু সঠিক হবে না, বিবেচকের মতোও হবে।

দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের ধারণা হয়েছিল যে, চুক্তির যে আসল উদ্দেশ্য তার অপব্যাখ্যা করেছে কংগ্রেস। ইন্সট্রুমেন্ট অব ইনস্ট্রাকসন্স-এর ধারণার ভাষাগত অর্থ করে কংগ্রেস যুক্তি দেখাচ্ছে যে, 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য' কথাটির একটিই নাকি অর্থ হতে পারে, যা হল—এমন একজন যার প্রতি সম্প্রদায়ের আস্থা আছে। এই দিক থেকে কংগ্রেসের অবস্থান নির্দিষ্ট ধারার অর্থ-বিরোধী এবং চেষ্টা হল দেশের অন্য সব দলকে ভেঙে কংগ্রেসকে দেশের একমাত্র রাজনৈতিক দলে পরিণত করা। এ ছাড়া কংগ্রেসের শপথ বাক্যে স্বাক্ষর করার অন্য উদ্দেশ্য হতে পারে না। এই ধরনের একটি টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টাকে হিন্দুরা স্বাগত জানাতে পারে, কিন্তু স্বাধীন মানুষ হিসাবে মুসলমানদের রাজনৈতিক মৃত্যু তাতে অবধারিত।

মুসলমানদের বিদ্বেষ আর ঘনীভূত হল যখন তারা দেখল যে গভর্নররা, যাদের ওপর প্রথাভিত্তিক বিধি আরোপের দায়িত্ব ছিল, কার্যকর ব্যবস্থা নিলেন না। কোনও কোনও গভর্নর সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন কারণ তারা অসহায়—সংখ্যা গরিষ্ঠ দল কংগ্রেস একাই সরকার গঠন করতে পারবে, এবং সংবিধানকে মুলতুবি না রেখে কংগ্রেস ভিন্ন অন্য কোনও বিকল্পও ছিল না। কোনও কোনও গভর্নর প্রত্যাখ্যান করলেন, কারণ তারা সরাসরি কংগ্রেসের কর্মঠ সমর্থক হয়েছিলেন এবং তাদের কংগ্রেসের প্রতি তাদের পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিলেন কংগ্রেসের প্রশংসা করে বা কংগ্রেস দলের পোশাক খাদি পরে। কারণগুলি যাই হোক, মুসলমানরা দেখেছিল যে, একটি প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচ দিয়েও নিজেদের বাঁচানো গেল না।

মুসলমানদের এইসব অভিযোগ সম্পর্কে কংগ্রেসের উত্তর দু ধরনের। প্রথমত, বলে যে, কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা তারা 'মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্ব' ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। মুসলমানরা এই যুক্তিকে সৎ বলে মানতে চাইল না। ইংরাজরাই একমাত্র জাতি যারা, শাসনব্যবস্থায় এটিকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যেও প্রথাটির ব্যতিক্রমী উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই বিষয়ে বিতর্ক হয়েছে এবং তারা সিদ্ধান্তে এসেছে যে, প্রথাটির পবিত্রতা এত কঠোর নয় যে, কোনও ব্যতিক্রম ঘটলে সরকারি শাসনযন্ত্রের দক্ষতা কমে যাবে। দ্বিতীয়ত, বাস্তব সত্য হল, কংগ্রেস সরকারের মধ্যে কোনও যৌথ দায়িত্ব চেতনা ছিল না। সরকার নানা বিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক মন্ত্রীই অন্যের থেকে স্বাধীন এবং প্রধানমন্ত্রীও অন্য একজন মন্ত্রীর মতনই। সুতরাং কংগ্রেসের পক্ষে সম্মিলিত দায়িত্বের কথা বলা সত্যিই অসংগত ছিল। অজুহাতে সততা ছিল না, কেননা এটি সত্য যে, যেসব প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না, সেখানে তারা অন্য দলের মন্ত্রীকে

কংগ্রেসের শপথ না করিয়েও কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেছে। মুসলমানদের এ প্রশ্ন করার অধিকার আছে, 'কোয়ালিশন যদি খারাপ হয় তবে তা এক জায়গায় ভাল অন্য জায়গায় খারাপ হয় কী করে'।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় জবাব হল, সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানদের আস্থা নেই এমন মুসলমান মন্ত্রী মন্ত্রিসভায় না নিলেও তাদের স্বার্থ রক্ষার দিকটি কংগ্রেস পুরোপুরি দেখেছে। কংগ্রেস নিশ্চয়ই মুসলমানদের স্বার্থের দিকটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এটি সেই চিন্তা যা সরকার সম্পর্কে পোপ বলেছেন তার কবিতায়—

**"For forms of government let fools contest;
What is best administered is best."**

উত্তর দিতে গিয়ে কংগ্রেস হাই কমান্ড মনে হয় মুসলমান ও সংখ্যালঘুদের যুক্তিগুলি কী, তা ভুলে গেছে। বিবাদ এই বিষয়ে নয়, যে মুসলমান ও সংখ্যালঘুদের জন্য কংগ্রেস ভালো করেছে কি করেনি। বিবাদের বিষয়টিই স্বতন্ত্র। স্বরাজ ব্যবস্থায় হিন্দুরাই কি শাসক সম্প্রদায় হবে এবং মুসলমান ও অন্য সংখ্যালঘুরা হবে শাসিত সম্প্রদায়? কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার দাবির মধ্যে এই বিষয়টিই নিহিত। এক্ষেত্রে, মুসলমান ও অন্য সংখ্যালঘুদের অবস্থান খুবই স্পষ্ট। তারা শাসিত সম্প্রদায়ের অবস্থানটি মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

শাসক সম্প্রদায় শাসিতদের অনেক ভাল করেছে একথা অপ্রাসঙ্গিক এবং সংখ্যালঘুরা যখন শাসিত মানুষ হিসাবে গণ্য হতে চাইছেন না তখন তাদের যুক্তির উত্তর একথা নয়। ব্রিটিশরা ভারতে ভারতীয়দের জন্য অনেক ভাল কাজ করেছে। তারা রাস্তাঘাটের উন্নতি করেছে, ক্যানাল কাটিয়েছে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে, রেলওয়ে পরিবহনের ব্যবস্থা করেছে, পোনি পোস্ট চিঠি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছে, বিদ্যুৎগতিতে সংবাদ পৌঁছে দিয়েছে, মুদ্রার উন্নতি ঘটিয়েছে, ওজন ও মাপের নিয়ন্ত্রণ করেছে, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারণাকে সঠিক করেছে, ভারতীয়দের অন্তর্কলহ মিটিয়েছে এবং তাদের জাগতিক বিষয়ে অনেক উন্নতি ঘটিয়েছে। এইসব সরকারি ভাল কাজের জন্য কেউ কি ব্রিটিশদের কাছে ভারতীয়দের চিরকৃতজ্ঞ থাকতে এবং স্বায়ত্ত শাসনের জন্য আন্দোলন ত্যাগ করতে বলছে? অথবা, এইসব সামাজিক উন্নয়ন কর্মের জন্য ভারতীয়রা কি ব্রিটিশের অধীনস্থ হয়ে থাকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা বন্ধ করেছে? ভারতীয়রা সেসব কিছুই করেনি। ওইসব ভালো কাজে তারা সন্তুষ্ট থাকেনি, এবং স্ব-শাসনের জন্য আন্দোলন চালিয়ে গেছে। এরকম হওয়াই উচিত। আইরিশ দেশপ্রেমী কুরান যেমন বলেছেন—আত্মসম্মানের

বিনিময়ে কেউ কারো কাছে থাকতে পারে না, কোন নারী সম্ভ্রমের বিনিময়ে কারো কাছে কৃতজ্ঞ হবে না, এবং কোনও জাতি তার সম্মানের বিনিময়ে কৃতজ্ঞ থাকবে না। কেউ অন্যরকম করলে তার অর্থ হবে সেই লোকটির জীবনবোধ, কার্লাইলের ভাষায়, 'শূকরের জীবনবোধ'। কংগ্রেস হাইকমান্ড একথা উপলব্ধি করেছে বলে মনে হয় না যে, মুসলমান ও অন্য সংখ্যালঘুরা, কংগ্রেসের তরফ থেকে কিছু ভালো কাজের চেয়ে তাদের আত্মমর্যাদার স্বীকৃতিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তিরা শূকরছানা নয় যে, শুধু খাবারের খোঁজই করবে। তাদের অহঙ্কার আছে, যা তারা স্বর্ণের লোভেও ছাড়বে না। এককথায়, 'খাদ্যের চেয়ে জীবন অনেক বড়'।

একথা বলে লাভ হবে না যে, কংগ্রেস হিন্দু সংগঠন নয়। একটি সংগঠন, যা গঠনের দিক থেকে হিন্দু প্রধান, তা হিন্দুমনকে প্রতিফলিত করবে এবং হিন্দুদের আকাঙ্খাকেই সাহায্য করবে। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে, হিন্দু মহাসভা তার কথাবার্তায় অবশিষ্ট ও কাজকর্মে নিষ্ঠুর, আর কংগ্রেস হল চতুর ও মার্জিত। এই বাস্তবিক ফারাকটুকু ছাড়া, কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার মধ্যে অন্য কোনও পার্থক্য নেই।

তেমনিভাবে, একথাও বলা বৃথা যে, কংগ্রেস শাসক ও শাসিতের পার্থক্যকে স্বীকার করে না। যদি তা স্বীকার করে, তবে কংগ্রেস নিশ্চয় তার সততার প্রমাণ দেবে এটা দেখিয়ে যে, সে অন্যসব সম্প্রদায়কে স্বাধীন ও সনাতনী বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত। এই স্বীকৃতির প্রমাণ কোথায়? আমার মনে হয়, একটি মাত্র প্রমাণ আছে, তা হল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির কার্যকরী প্রতিনিধিদের সঙ্গে শাসন ক্ষমতা ভাগ করে নেওয়ার সম্মতি প্রদান। কংগ্রেস কি তার জন্য প্রস্তুত? এর উত্তর সবার জানা। কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য নেই, এমন কোনও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির সঙ্গে শাসন ক্ষমতা ভাগ করে নিতে কংগ্রেস প্রস্তুত নয়। কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য হল শাসন ক্ষমতায় অংশদানের প্রাক্ শর্ত। কংগ্রেসের এটিই নিয়ম বলে মনে হয় যে, কোনও সম্প্রদায়ের আনুগত্য না পেলে, সেই সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বাদ রাখা হবে।

রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বাদ রাখাই হল, শাসক সম্প্রদায় ও শাসিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্যের মূল কথা। এই নীতি যখন কংগ্রেস মেনে চলছে, তখন একথা বলা যাবে যে, শাসন ক্ষমতায় থাকার সময়, কংগ্রেস এই পার্থক্যটিকেই কার্যকরী করেছে। মুসলমানরা তাই অভিযোগ করতেই পারে যে, তারা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট

কষ্ট স্বীকার করেছে এবং শাসিত অংশ হিসাবে তাদের অবস্থানের এই অবনয়ন প্রবচনের সেই লাস্ট স্ট্রেজ হিসাবে উপস্থিত হয়েছে।

ভারতে তাদের অধোগতি ও পতন শুরু হয়েছে, যেদিন থেকে ব্রিটিশ অধীনে এসেছে এই দেশ। প্রশাসনিক বা আইনগত যে পরিবর্তনই ইংরাজরা এনেছে, তা মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর ক্রমাগত আঘাত করেছে। ভারতের মুসলমান শাসকরা দেওয়ানি বিষয়গুলিতে হিন্দু আইন কানুন টিকিয়ে রাখতে বাধা দেয়নি। কিন্তু হিন্দু ফৌজদারি আইন তারা বাতিল করেছিল এবং হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে সবাইকে মুসলমান ফৌজদারি আইন মানতে বাধ্য করে। ইংরাজরা প্রথমেই যা করেছে তা হল আস্তে আস্তে মুসলমান ফৌজদারি আইনকে হটিয়ে নিজেদের মতো আইন প্রণয়ন, যা শেষ অবধি ম্যাকলের পেনাল কোড প্রণয়নের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। ভারতে মুসলমানদের আত্মসম্মান ও অবস্থানের ওপর এটিই ছিল প্রথম আঘাত। এরপর এসেছিল শরিয়ৎ বা মুসলমান দেওয়ানি বিধির প্রয়োগ ক্ষেত্রের সঙ্কোচন। এই আইনের প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়গুলিতে, যেমন বিবাহ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি এবং তারপর শুধু ইংরেজদের অনুমতি সাপেক্ষ বিষয়ে। পাশাপাশি, ১৮৩৭ সালে প্রশাসন ও আদালতের অফিসিয়াল ভাষা হিসাবে ফার্সিকে অপসারিত করা হয়েছে এবং ইংরেজী ভাষাকে নিয়ে আসা হয়েছে, আর ফার্সির পরিবর্তে আনা হয়েছে মাতৃভাষাকে। তারপর কাজি পদের বিলোপ সাধন করা হয়েছে। অথচ এই কাজিরা মুসলমান শাসনে শরিয়তের শাসন রক্ষা করেছে। তাদের জায়গায় 'জাজ ও ল' অফিসারদের নিয়োগ করা হয়েছে; তাদের ধর্ম যাই হোক, মুসলমান আইন ব্যাখ্যা করার অধিকার তাদের দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সিদ্ধান্ত মুসলমানদের মানতে বাধ্য করা হয়েছে। এ সবই মুসলমানদের ওপর দারুণ আঘাত হয়ে এসেছে। ফলত, মুসলমানরা দেখল যে, তাদের সম্ভ্রম নেই, তাদের আইন বদলে দেওয়া হয়েছে, তাদের ভাষা অব্যবহৃত, এবং তাদের শিক্ষার কোনও আর্থিক মূল্য নেই। এসবের সঙ্গে সঙ্গে আরও আঘাত এল সিন্ধু প্রদেশের ওপর ব্রিটিশ দখল ও সিপাহি বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে। শেষটি অর্থাৎ বিদ্রোহের ফলে মুসলমানদের মধ্যেকার উচ্চশ্রেণী বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল—বিদ্রোহের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের সন্দেহে শাস্তি হিসাবে ব্রিটিশ কর্তৃক তাদের সম্পত্তি অধিগ্রহণের ফলে তারা প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হল। বিদ্রোহ শেষ হলে উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণী নির্বিশেষে মুসলমানদের বিখণ্ড অহংকার তলানিতে এসে ঠেকল। মানসম্মান নেই, শিক্ষা নেই, সম্পদ নেই—এই অবস্থায় মুসলমানরা হিন্দুদের সামনে দাঁড়াল। পক্ষপাতহীনতার ভান করে ইংরেজরা এই দুই সম্প্রদায়ের বিবাদের ফলাফলের দিক থেকে চোখ

ফিরিয়ে থাকল। এই ফলাফল হল, মুসলমানরা তাদের ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থার নিম্নপাদে দাঁড়িয়েছে। ব্রিটিশের ভারত অধিকারের ফলে, দুই সম্প্রদায়ের আপেক্ষিক অবস্থায় সম্পূর্ণ এক রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটেছে। ছয় শত বছর ধরে মুসলমানরা হিন্দুদের প্রভু হয়ে থেকেছে। ব্রিটিশ শাসন তাদের হিন্দুদের সম অবস্থায় নামিয়ে এনেছে। প্রভু থেকে সমশ্রেণীর প্রজায় পর্যবসিত হওয়াই যথেষ্ট অধোগতি, কিন্তু সমশ্রেণীর প্রজার অবস্থান থেকে হিন্দুদের অধস্তন হওয়া—এই পরিবর্তন সত্যিই অবমাননাকর। তারা যদি এই অসহ্য অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে, পৃথক জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করে, যেখানে মুসলমানরা তাদের নিজস্ব শান্তির গৃহ পাবে এবং যেখানে শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে শাসিত সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বের ফলে, তাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে না, তা হলে তা নিশ্চয় অস্বাভাবিক হবে না—মুসলমানরা এ কথা বলতেই পারে।

দ্বিতীয় খণ্ড

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হিন্দুদের বক্তব্য

পাকিস্তানের এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে হিন্দুরা তিনটি কারণে সোচ্চার হন বলে মনে করা হয়। তাঁরা এর প্রতিবাদ করেন, কারণ, তাঁদের মতে—

(১) পরিকল্পনাটি ভারতের ঐক্য ক্ষুণ্ণ করবে,

(২) ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করবে, এবং

(৩) সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হবে।

এই যুক্তিগুলির মধ্যে সারবত্তা কতখানি? আলোচ্য খণ্ডে এগুলির যুক্তিগ্রাহ্যতা পরীক্ষা করা হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঐক্যের বিপন্নতা

ভারতের ঐক্যের সম্ভাব্য বিপন্নতা, যা নিয়ে হিন্দুরা অভিযোগ করছেন, তা নিয়ে আলোচনার আগে দেখা দরকার, এই ঐক্য ভারতে বর্তমানে কতটুকু আছে এবং পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের মধ্যে ঐক্যই বা কতটুকু আছে।

হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা এই মতের পক্ষে, তাঁরা প্রধানত এই সত্যে বিশ্বাসী যে, ভারত থেকে যে সব অঞ্চলকে মুসলমানেরা বিচ্ছিন্ন করতে চান, সেগুলি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সন্দেহ নেই, এই বিশ্বাসের কারণটি ইতিহাস-স্বীকৃত। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল থেকে শুরু করে, সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক সুয়ান সাং-এর ভারতে আগমন পর্যন্ত, এই অঞ্চলগুলি ভারতেরই অংশ ছিল। সুয়ান সাং তাঁর দিনপঞ্জিতে লিখেছেন যে, তৎকালীন ভারত পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত ছিল : ১) উত্তর ভারত ২) পশ্চিম ভারত ৩) মধ্য ভারত ৪) পূর্ব ভারত এবং ৫) দক্ষিণ ভারত। এই পাঁচটি বিভাগে ৮০টি রাজ্য ছিল। সুয়ান সাং-এর মতে উত্তর ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও তার সংলগ্ন পার্বত্য রাজ্যগুলি এবং সিন্ধু নদের পর থেকে সমগ্র পূর্ব আফগানিস্তান ও সরস্বতী নদীর পশ্চিমে বর্তমান সিস-সাতলাজ রাজ্যগুলি। এইভাবে উত্তর ভারতে অবস্থিত জেলাগুলির মধ্যে ছিল কাবুল, জালালাবাদ, পেশোয়ার, গজনি ও বান্নু। এগুলি হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজা কপিসার অধীন ছিল। কপিসার রাজধানী ছিল খুব সম্ভবত কাবুল থেকে ২৭ মাইল দূরবর্তী চারিকরে। পাঞ্জাবের মধ্যে তক্ষশীলা, সিংহপুর, উরাসা, পুঞ্চ এবং রাজাওরি পার্বত্য জেলাগুলি কাশ্মীর রাজের অধীন ছিল। মুলতান ও সারকোট সমেত সমগ্র সমভূমি ছিল লাহোরের কাছে টাকি বা সাঙ্গালার রাজার অধীন। সুয়ান সাং-এর ভারত পরিভ্রমণকালে উত্তর ভারতের অবস্থান ছিল এরকমই। কিন্তু অধ্যাপক টয়েনবির মতে, ঐতিহাসিক ভাবাবেগ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। অতীতের অবস্থা কিংবা সম্ভাব্য অবস্থা, যার বর্তমানে কোনও অস্তিত্ব নেই, তার ওপর নির্ভরশীল যুক্তিগুলি সম্পর্কে ভাবাবেগের বশবর্তী হওয়া উচিত নয়। কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা যায়। এক, সময় রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে,

ত্রিপোলির সংযুক্তিকে ইটালির সংবাদপত্রে পিতৃভূমির পুনরুদ্ধার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সমগ্র ম্যাসিডোনিয়া অঞ্চলকে, উগ্র স্বদেশিকতা সম্পন্ন গ্রিক ও বুলগেরীয়রা উভয়েই নিজেদের দেশের অংশ বলে দাবি করে, কারণ খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজান্ডারের জন্মস্থান পেল্লা, এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত, অপর পক্ষে বুলগেরীয়দের যুক্তি—দশম শতাব্দীতে বুলগেরীয় জারতন্ত্রের রাজধানী অক্রিডা এই অঞ্চলেরই প্রান্তদেশে অবস্থিত। অবশ্য কালের অগ্রগতি প্রমাণ করেছে, গ্রিক জাতীয়তাবাদীরা যে এমেথীয় রাজ্যবিজেতাদের সাফল্য সম্পর্কে এত উৎসাহী, তা বুলগেরীয়দের দাবিকে ছাড়িয়ে গেছে।

টয়েনবির বক্তব্য এখানেও প্রযোজ্য। এখানেও যুক্তিগুলি যে অবস্থার ওপর নির্ভরশীল, তার অস্তিত্ব এক সময় ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা অবলুপ্ত। সুয়ান সাং-এর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রায় এক হাজার বছরের পরবর্তী ইতিহাস এখানে ধরাই হয়নি।

অবশ্য এটা সত্য যে সুয়ান সাং-এর ভারতে আগমনের সময় শুধু পাঞ্জাবে কেন, বর্তমান আফগানিস্তানও ভারতের অংশ ছিল। তা ছাড়া পাঞ্জাবে ও আফগানিস্তানের অধিবাসীরা বৈদিক কিংবা বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত ছিল। কিন্তু সুয়ান সাং-এর প্রত্যাবর্তনের পর কী ঘটেছে?

সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উত্তর-পশ্চিমের মুসলমান যাযাবর শ্রেণীর ভারত আক্রমণ। মহম্মদ-বিন-কাশিমের নেতৃত্বে আরবীয়দের ভারত আক্রমণ, এই পর্যায়ের প্রথম ঘটনা। ৭১১ খ্রিস্টাব্দে এই ঘটনায়, আক্রমণকারীরা সিন্ধু জয় করেন। অবশ্য এই প্রথম মুসলমান আক্রমণের ফলে, ভারতে কোন স্থায়ী মুসলমান রাজত্ব তৈরি হয়নি, কারণ এই আক্রমণ যাঁর আদেশে করা হয়, সেই বাগদাদের খলিফা নবম শতাব্দীতে সুদূর সিন্ধু প্রদেশ থেকে তাঁর নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নেন। এই প্রত্যাহারের পর ১০০১ খ্রিস্টাব্দে গজনির মামুদ বেশ কয়েকবার ভারত আক্রমণ করেন। ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে মামুদের মৃত্যু হয়, কিন্তু মাত্র ৩০ বছরের রাজত্বকালে, তিনি ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। মামুদের পর ১১৭৩ খ্রিস্টাব্দে আক্রমণ করেন মহম্মদ ঘোরি। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিহত হন। ৩০ বছর ধরে মামুদ যেমন ভারতকে বিধ্বস্ত করেন, একই ভাবে সেই ভূমিকা পালন করেন মহম্মদ ঘোরি। এরপর ১২২১ খ্রিস্টাব্দে ঘটল চেঙ্গিজ খানের নেতৃত্বে মোঙ্গোলদের বহিরাক্রমণ। তাঁরা তখন ভারতের সীমান্তে হানা দিয়েছিলেন, কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করেননি। কুড়ি বছর পর, লাহোরে প্রবেশ করে তাঁরা ধ্বংসের তাণ্ডব

চালান। ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে তৈমুরের নেতৃত্বে বহিরাক্রমণ ছিল এই পর্যায়ের ভয়ঙ্করতম ঘটনা। তারপর ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে আর এক আক্রমণকারীর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করলেন বাবর। সেটাই শেষ নয়, আরও দুটি আক্রমণ ঘটল। ১৭৩৮ খ্রিস্টাব্দে ঘটল উত্তাল সমুদ্রোচ্ছ্বাসের মত নাদির শাহের পাঞ্জাব আক্রমণ, আর ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে পানিপথে মারাঠা শক্তিকে বিচূর্ণ করে, মুসলমান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রতিরোধের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ করে, ঘটল আহম্মদ-শাহ্-আবদালির ভারত আক্রমণ।

শুধুমাত্র লুঠতরাজ কিংবা জয়ের আকাঙ্খা এই সব মুসলমান আক্রমণের কারণ ছিল না। এর পিছনে ছিল একটি ভিন্ন উদ্দেশ্য। মহম্মদ-বিন-কাশিমের সিন্ধু-অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল সিন্ধুরাজ দহিয়ের বিরুদ্ধে একটি শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া, কারণ সিন্ধু প্রদেশের অন্যতম সমুদ্র বন্দর দেবলে দাহির একটি আরবীয় জাহাজ দখল করেন এবং তা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু এটাও অনস্বীকার্য যে, হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা ও বহু ঈশ্বরবাদকে নির্মূল করে, ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাও ছিল এই সব আক্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য। হাজ্জাজকে লেখা মহম্মদ-বিন-কাশিমের একটি পত্র থেকে জানা যায় :

'রাজা দাহিরের ভ্রাতুষ্পুত্র, তাঁর সেনানী ও প্রধান সেনাপতিদের বধ করা হয়েছে এবং নাস্তিকদের হয় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে, নয় তো হত্যা করা হয়েছে। পুতুল পূজোর মন্দিরগুলির জায়গায় মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। পবিত্র কুতবা পাঠ করা হচ্ছে উচ্চগ্রামে এবং তা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে। প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় সর্বশক্তিমান আল্লার প্রতি তকবির ও স্তুতি নিবেদন করা হচ্ছে'।

এই সংবাদটির সঙ্গে পাঠানো হয় রাজার ছিন্নমুণ্ড। উত্তরে হাজ্জাজ তাঁর সেনাপ্রধানকে জানান :

'উচ্চ নীচ সকলকে রক্ষা করার সময় শত্রু ও মিত্রের মধ্যে কোনও বৈষম্য করবেন না। ঈশ্বর বলেন—নাস্তিকদের বিন্দুমাত্র ক্ষমা না করে তাদের শিরশ্ছেদ কর। এটাই মহান ঈশ্বরের আদেশ। রক্ষা করার ক্ষেত্রে বেশি প্রস্তুতির দরকার নেই, কারণ তা হলে আপনার কাজ পিছিয়ে যাবে। একমাত্র উচ্চপদাধিকারী ছাড়া কোনও শত্রুকে ক্ষমা করবেন না'।

গজনির মামুদও তাঁর অসংখ্যবার ভারত আক্রমণকে, পবিত্র ধর্মযুদ্ধ বলেই মনে করেছেন। মামুদ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিক আল উতবি তাঁর অভিযান সম্পর্কে লিখেছেন—

'তিনি মন্দির ধ্বংস করে ইসলামের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নগরগুলি অধিকার করেছেন, পৌত্তলিক ও বিধর্মীদের হত্যা করেছেন এবং মুসলমানদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। স্বদেশে ফিরে এবং তাঁর অভিযানের মূল্যায়ন করে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, প্রতি বছর তিনি হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ ঘোষণা করবেন'।

ভারত আক্রমণের ক্ষেত্রে মহম্মদ ঘোরিও একই ধর্মের উন্মাদনায় বিভোর ছিলেন। ঐতিহাসিক হাসান নাজামি তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন :

'নাস্তিকতা, পাপ, বহু ঈশ্বরবাদ ও পৌত্তলিকতা থেকে হিন্দুস্তানকে মুক্ত করতে তিনি তরবারি ধারণ করেছিলেন। একটি মন্দিরকেও তিনি অক্ষত রাখেননি'।

তৈমুর তাঁর স্মৃতি কথায় ভারত আক্রমণের কারণ উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেছেন :

'হিন্দুস্তান আক্রমণের ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার নাস্তিকদের বিরুদ্ধে প্রচার করা, মহম্মদের আদেশ অনুসারে তাদের সত্যে বিশ্বাসী করে তোলা—যে মহম্মদ ও তাঁর পরিবারের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও শান্তি বর্ষিত হোক—অবিশ্বাস ও বহু দেবতার ধারণা থেকে দেশটিকে মুক্ত করা এবং সব মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করা। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রেখে এ ব্যাপারে আমরা গাজি ও মুজাহিদরা এবং আমাদের সহযোগী ও সৈন্যবাহিনী এই কাজ করবো'।

মুসলমানদের দ্বারা ভারত আক্রমণের এই ঘটনাগুলি মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধগুলির সংখ্যার মতো বেশি। এই বিশেষ দিকটি অন্ধকারে রাখা হয়, কারণ ভারত আক্রমণকারী সব মুসলমানকে এক সম্প্রদায়ভুক্ত হিসাবে বর্ণনা করা হয়, তাঁদের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয় না। আসলে কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন তাতার, কেউ আফগান আবার কেউ মোঙ্গোল। গজনির মামুদ ও বাবর ছিলেন তাতার; মহম্মদ ঘোরি, নাদির-শাহ ও আহম্মদ-শাহ-আবদালি ছিলেন আফগান; তৈমুর ছিলেন মোঙ্গোল। ভারত অভিযান করে আফগানরা তাতারদের এবং মোঙ্গোলরা তাতার ও আফগান উভয় সম্প্রদায়কেই ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। ইসলামীয় ভ্রাতৃত্ব বোধের বাঁধনে তাঁরা কোন সুখী পরিবার ছিলেন না। একের সঙ্গে অপরের ছিল চির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। একের বিনাশ ছিল অন্যজনের কামনা। অবশ্য এটা মনে রাখতেই হবে যে, তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক অসূয়া থাকলেও হিন্দুত্বকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে তাঁরা ছিলেন ঐক্যবদ্ধ।

আক্রমণের উদ্দেশ্যের মত মুসলমানদের ভারত আক্রমণের পদ্ধতিও ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। মহম্মদ-বিন-কাশিমের ধর্মোন্মত্ততার প্রথম প্রকাশ ছিল, অধিকৃত দেবল

শহরের ব্রাহ্মণদের ধর্মান্তরিত করা এবং তা করতে গিয়ে যখন তিনি বাধা পেলেন তখন তিনি ১৭ বছরের বেশি বয়সের সবাইকে হত্যা করতে ও নারী ও শিশুসমেত বাকিদের ক্রীতদাসে পরিণত করতে উদ্যোগী হন। হিন্দুদের মন্দির তিনি লুঠ করেন। লুণ্ঠিত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ সরিয়ে রেখে বাকিটা তিনি সৈনিকদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দিতেন।

গজনির মামুদ শুরু থেকেই এমন সব পদ্ধতি অবলম্বন করেন, যা হিন্দুদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করবে। ১০০১ খ্রিস্টাব্দে রাজা জয়পালকে পরাজিত করে তিনি আদেশ দেন যে, রাজাকে বন্দী করে প্রকাশ্য রাস্তায় ঘোরানো হোক, যাতে তাঁর সন্তানরা ও সেনাপ্রধানরা তাঁর এই অপমানজনক বন্দিদশা প্রত্যক্ষ করতে পারেন এবং এভাবেই বিধর্মীদের দেশে ইসলামের হাওয়া বইতে থাকুক।

ড. টিটাস তাঁর 'ইন্ডিয়ান ইসলাম' গ্রন্থে বলেছেন,

'বিধর্মীদের হত্যা করে মামুদ বিশেষ আনন্দ পেতেন। ১০১৯ খ্রিস্টাব্দে চাঁদ রাইকে আক্রমণ করে অসংখ্য বিধর্মীকে হত্যা অথবা বন্দি করা হয়। বিধর্মী এবং সূর্য ও অগ্নির উপাসকদের বধ করে পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মুসলমানরা লুণ্ঠিত সম্পত্তির প্রতিও আগ্রহী হত না। ঐতিহাসিকরা সরলভাবে জানিয়েছেন যে, হিন্দু সৈন্যবাহিনীর হাতিগুলিও ইসলামের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে স্বেচ্ছায় মামুদের কাছে এসেছিল'।

মহম্মদ বখতিয়ার খিলজির বিহার বিজয়ের মত বিভিন্ন ঘটনায় ব্যাপক হিন্দু নিধনের ফলে হিন্দুদের নিজস্ব সংস্কৃতি ধারাবাহিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহম্মদ বখতিয়ার খিলজি যখন বিহারের নুডিয়া অধিকার করেন, তখন তাবাকাত-ই-নাসিরির রচনা থেকে জানা যায়—'বিজয়ীরা ব্যাপকভাবে লুঠপাট করে। অধিকাংশ অধিবাসীরাই সেখানে ছিলেন মুণ্ডিত মস্তক ব্রাহ্মণ। তাঁদের হত্যা করা হয়। সমস্ত শহরে ও দুর্গগুলিতে অনেক বই পাওয়া গেছে, কিন্তু কোনও মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা হয়নি বলে বইগুলির বিষয়বস্তু জানা যায়নি'।

এ বিষয়ে সমস্ত তথ্য একত্রিত করে ড. টিটাস তাঁর উপসংহারে বলেছেন :

'মন্দির ও মূর্তি ধ্বংসের ব্যাপারে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। আমরা দেখেছি, মহম্মদ-বিন-কাশিম পরিকল্পিত ভাবে সিন্ধু প্রদেশ ধ্বংস করেছেন। কিন্তু মুলতানের একটি মন্দির তিনি ধ্বংস করেননি একমাত্র আর্থিক কারণে। কারণ ঐ বিখ্যাত মন্দিরে ভক্তরা বিগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ উপহার দিত। কিন্তু নিজের অর্থ

লোলুপতা চরিতার্থ করার জন্য মন্দিরটির ক্ষতি না করলেও বিগ্রহের গলায় এক টুকরো গোমাংস ঝুলিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর বিদ্বেষকেই পোষণ করেছেন। কম করে এক হাজার মন্দির ধ্বংস করে, সোমনাথ মন্দির লুঠ করে বিগ্রহটিকে চার টুকরোয় খণ্ডিত করে মামুদ কিভাবে বিখ্যাত হয়েছিলেন সে কথা আমরা মিনহাজ-আস-সিরাজের বর্ণনা থেকে জানতে পারি। গজনির জামি মসজিদে তিনি একটি খণ্ড রেখেছিলেন, দ্বিতীয় খণ্ডটি ছিল রাজসভার প্রবেশদ্বার, তৃতীয়টি ও চতুর্থ খণ্ডটিকে তিনি পাঠান যথাক্রমে মক্কা ও মদিনাতে'।

লেন পুল বলেছেন, যে মামুদ শপথ নিয়েছিলেন প্রতি বছর বিধর্মী হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন, তিনি মূর্তি ধ্বংসের ব্যাপারে এতটুকু ক্লান্তি অনুভব করেননি, যতক্ষণ পর্যন্ত সোমনাথ মন্দির অক্ষত ছিল। শুধুমাত্র এই লক্ষ্যেই তিনি মরুভূমি অতিক্রম করে মুলতান থেকে উপকূলবর্তী আনহালওয়ারা অভিযান করেছেন, অক্লান্ত পরিশ্রম করে। যুদ্ধং দেহি মনোভাব নিয়ে তিনি এগিয়ে গেছেন যতক্ষণ না সোমনাথ মন্দির দেখতে পেয়েছেন। লেন পুলের কথায়, 'ঐ মন্দিরে হাজার হাজার ভক্ত উপস্থিত হতেন। হাজার হাজার ব্রাহ্মণ মন্দির ও ধনসম্পদ রক্ষা করতেন। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে থাকতেন শত শত গায়ক ও নৃত্যশিল্পী। মন্দিরের ভিতরে ছিল বিখ্যাত শিবলিঙ্গ। নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল মূল্যবান প্রস্তরখচিত ঝাড়বাতির আলোয় মণিমানিক্যখচিত শিবলিঙ্গটি ছিল অপূর্ব দ্যুতিময়। প্রাঙ্গণে ব্রাহ্মণরা সমবেত হয়ে বিদেশি নাস্তিকদের ব্যঙ্গ করে বলতেন যে, প্রভু সোমনাথ তাদের ধ্বংস করবেন। বিগ্রহটিকে অবশ্য চূর্ণ করে রাজপ্রাসাদের শোভাবর্ধন করতে নিয়ে যাওয়া হয়। গজনিতে স্থাপন করা হয় মন্দিরের তোরণগুলি এবং বিগ্রহচূর্ণকারীদের উপহার দেওয়া হয় লক্ষ লক্ষ পাউন্ড মূল্যের ধনসম্পদ'।

গজনির মামুদের এই কীর্তিকলাপ এক ধর্মীয় ঐতিহ্যে পরিণত হয়। মামুদের উত্তরসূরীরা ঐতিহ্যটি বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করে গেছেন।

ড. টিটাসের বক্তব্য অনুযায়ী :

'গজনির মামুদের অন্যতম উৎসাহী উত্তরাধিকারী মহম্মদ ঘোরি আজমেঢ় দখল করার সময়, বহু মন্দিরের স্তম্ভ ও ভিত্তি ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ তৈরি করেন। প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলাম ধর্ম ও আইনের শাসন। দিল্লি ও সংলগ্ন অঞ্চলকে মূর্তি ও মূর্তি উপাসকদের হাত থেকে মুক্ত করা হয়। বহু দেবতার জায়গায় একেশ্বরবাদী উপাসকেরা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন'।

'কথিত আছে, কুতুবুদ্দিন আইবকও প্রায় এক হাজার মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দিল্লিতে জামি মসজিদ নির্মাণ করে, যে সব দুর্মূল্য প্রস্তর খণ্ড দিয়ে তাঁর অলঙ্করণ করেন, সেগুলি ছিল হাতির সাহায্যে চূর্ণ করা মন্দিরের প্রস্তর খণ্ড। কোরান থেকে উদ্ধৃত ঈশ্বরের আদেশগুলি মসজিদের দেয়ালে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। দিল্লির এই মসজিদের পূর্ব তোরণ পর্যন্ত নির্মিত হয় ২৭টি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে, এরকম প্রমাণ আমাদের কাছে আছে'।

'আমির খসরুর মত অনুসারে, কুতুবুদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত জামি মসজিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্বিতীয় একটি মিনার নির্মাণ করতে আলাউদ্দিন শুধুমাত্র পাহাড় কেটেই পাথর আনেননি, বিধর্মীদের মন্দিরও ধ্বংস করে পাথর যোগান দিয়েছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তীরা উত্তর ভারতে যেমন মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, দক্ষিণ ভারত অভিযানে আলাউদ্দিনও একই পদ্ধতি অবলম্বন করেন'।

'যে সব, হিন্দু মন্দির নির্মাণের সাহস দেখাত, সুলতান ফিরোজ শাহ তাঁদের কী ভাবে শায়েস্তা করতেন তার বর্ণনা আছে। পবিত্র ধর্মের অনুশাসনে যে মন্দির নির্মাণ ছিল অন্যায়, তার বিরুদ্ধাচরণ করলে তিনি বিগ্রহ ধ্বংস করতেন। এই সব বিধর্মী ও মন্দিরগুলি সমূলে বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তিনি ঐ ধর্মীয় নেতাদের হত্যা করে যেতেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের জায়গায় মুসলমানরা তাঁদের প্রকৃত ঈশ্বরের উপাসনা করতেন'।

আমরা পড়েছি, এমন কি শাহজাহানের রাজত্বকালেও হিন্দুরা মন্দির নির্মাণের চেষ্টা করলে, তা ধ্বংস করা হত। বাদশাহনামাতে হিন্দুদের ওপর এরকম প্রত্যক্ষ আঘাতের বর্ণনা আছে :

'বাদশাহের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই তথ্য জানানো হয় যে, আকবরের রাজত্বের শেষভাগে ধর্মীয় গোঁড়ামির পীঠস্থান কাশীতে অনেক মন্দির নির্মাণ শুরু হয়েছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ হয়নি। হিন্দুধর্মের লোকেরা সেগুলির নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সত্যের রক্ষক বাদশাহ আদেশ দিলেন, তাঁর রাজ্যের সর্বত্র এ ধরনের মন্দিরগুলিকে ভূমিসাৎ করা হোক। এলাহাবাদ থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, এই আদেশবলে কাশী জেলার ৭৬টি মন্দির ধ্বংস করা হয়'।

পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সর্বশেষ আঘাত দেবার দায়িত্ব নেন ঔরঙ্গজেব। 'মা আথির-ই-আলমগিরি' গ্রন্থের লেখক হিন্দুধর্মের আদর্শ ও মন্দির ধ্বংস করার সপক্ষে এরকম বক্তব্য রাখেন :

'১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ঔরঙ্গজেব জানতে পারেন যে, থাটা, মুলতান এবং বিশেষত কাশীতে মূর্খ ব্রাহ্মণরা তাঁদের শিক্ষালয়ে অর্থহীন তুচ্ছ কিছু গ্রন্থ নিয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন এবং দূর দূরান্ত থেকে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা সেখানে যাচ্ছেন। সত্যের নিয়ন্তা বাদশাহ সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে আদেশ দিলেন ঐ সব শিক্ষালয় ও মন্দির যেন কঠোর হাতে ধ্বংস করা হয়। ফলে ঐ শাসনকর্তারা সমষ্টিগতভাবে পৌত্তলিকতার শিক্ষা ও আচারকে শেষ করতে সমবেত হন। পরে বাদশাহকে জানানো হয় যে, রাজপুরুষরা কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করেছে'।

ড. টিটাসের মতে, 'বল প্রয়োগ করে ধর্মান্তরিত করার চেয়ে মামুদ বা তৈমুরের মতো আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্য ছিল বিগ্রহ ধ্বংস করা, ধনসম্পদ লুঠ করা এবং বন্দিদের ক্রীতদাসে পরিণত করা। কিন্তু স্থায়ীভাবে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর ধর্মান্তরকরণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব এসে পড়ে। সমগ্র দেশের ধর্মজগতে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা তখন বাদশাহি নীতি হিসাবে স্বীকৃত'।

'দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, মন্দির ধ্বংসের কাজে মামুদের সমকক্ষ কুতুবুদ্দিন ধর্মান্তরকরণে বলপ্রয়োগ করেন। একটি নমুনা হল : ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে যখন তিনি কৈল (আলিগড়) অভিযান করেন, তখন দুর্গের চতুর সৈনিকরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, আর অন্য সৈনিকরা তরবারির আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন'।

ধর্ম বিশ্বাসকে বলপ্রয়োগে পরিবর্তন করার আরও বহু উদাহরণ আছে। ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রিস্টাব্দ) এরকম একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী হল, 'এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, তিনি তাঁর বাড়িতে মূর্তিপূজা করেন এবং এমন কি মুসলমান রমণীদেরও তাঁর ধর্ম মেনে চলতে বাধ্য করতেন। বিচারক, চিকিৎসক, বয়োজ্যেষ্ঠ ও আইনজীবীদের দরবারে তাঁকে বিচারের জন্য পাঠানো হল। তাঁরা এক বাক্যে বললেন, এক্ষেত্রে আইনের নির্দেশ অত্যন্ত স্পষ্ট। ব্রাহ্মণকে মুসলমান হতে হবে, অথবা তাঁকে পুড়িয়ে মারা হবে। ব্রাহ্মণকে এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হল, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাতে কর্ণপাত করলেন না। ফলশ্রুতি হিসাবে সুলতান তাঁকে পুড়িয়ে মারার আদেশ দেন। বর্ণনাকারী বিস্মিত হয়েছেন এই ভেবে যে, সুলতানের কঠোর আইন প্রয়োগের মধ্যেও ব্রাহ্মণ নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি'।

মামুদ শুধু মন্দির ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হননি, বিজিত হিন্দুদের দাসত্ব করতে বাধ্য করানোকে তাঁর নীতি হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। ড. টিটাসের ভাষায় :

'ভারত ও ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক পরিচয় পর্বে, আমরা শুধু হত্যা ও মন্দির ধ্বংসই দেখিনি, অনেক বন্দিকে দাসত্ব করতেও দেখেছি। এই সব অভিযানে নেতা ও সাধারণ সেনাবাহিনীর কাছে সব চেয়ে আকর্ষক ঘটনা ছিল অপহৃত সম্পত্তির বাঁটোয়ারা। বিধর্মী হত্যা, মন্দির ধ্বংস, বন্দিদের দাসে পরিণত করা ও সাধারণের বিশেষত মন্দিরের এবং পূজারীদের সম্পদ লুণ্ঠন করা ছিল মামুদের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রথমবার অভিযানে তিনি প্রচুর লুণ্ঠিত সম্পদ আত্মসাৎ করেন। এ ছাড়া প্রায় পঞ্চাশ হাজার সুদর্শন মহিলা ও পুরুষকে দাস হিসাবে গজনিতে পাঠিয়ে দেন বলেও শোনা যায়'।

পরবর্তীকালে ১০১৭ খ্রিস্টাব্দে মামুদ যখন কনৌজ অধিকার করেন, তখন তিনি এত অর্থ সংগ্রহ করেন যে, যাঁরা ঐ বিপুল অর্থ গণনা করেছিলেন, তাঁদের আঙুলগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। গজনি ও মধ্য এশিয়াতে কীভাবে ভারতীয়দের ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়েছিল, সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে তার প্রমাণ মেলে :

'বন্দিদের মাত্র দুই থেকে দশ দিরহাস মূল্যে বিক্রি করা হত। এদের পরে গজনিতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে দূর দূরান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা তাদের কিনতে আসতেন। সুদর্শন কিংবা কুশ্রী, গরীব কিংবা ধনী সবাইকেই একই শ্রেণীর দাস হিসাবে গণ্য করা হত'।

'১২০২ খ্রিস্টাব্দে যখন কুতুবুদ্দিন কালিঞ্জর অধিকার করেন তখন মন্দিরগুলিকে মসজিদে পরিণত করা হয়, পৌত্তলিকতা নির্মূল করা হয় এবং পঞ্চাশ হাজার হিন্দুকে দাস হিসাবে রূপান্তরিত করা হয়'।

পবিত্র যুদ্ধে হিন্দুদের অদৃষ্টে ছিল দাস জীবনযাপন। কিন্তু যুদ্ধ বিরতির সময়েও মুসলমান আক্রমণকারীদের গৃহীত ব্যবস্থা অনুসারে হিন্দুদের মর্যাদাহানির ধারাবাহিকতা কোনও অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে, হিন্দুরা কোনও কোনও অঞ্চলে সুলতানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। সুতরাং তিনি তাঁদের ওপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপালেন যাতে তাঁরা বিদ্রোহ করতে না পারেন।

ড. টিটাসের কথায়, 'ঘোড়ায় চড়া, অস্ত্র বহন করা, সৌখীন জামাকাপড় ব্যবহার করা এবং সামান্যতম বিলাসী জীবনযাপন করা তখন হিন্দুদের নিষিদ্ধ ছিল'।

জিজিয়া কর সম্পর্কে ড. টিটাস এইভাবে তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন :

'কিছু কিছু ক্ষেত্রে জিজিয়া করকে শুধুমাত্র আইন সম্মত ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করলেও অধিকাংশ সুলতান, সম্রাট ও রাজাদের রাজত্বকালে ভারতের বিভিন্ন অংশে হিন্দুদের ওপর এই কর চাপিয়ে দেওয়া হত, কারণ আইন কার্যকর করার বিষয়টি নির্ভর করত কেবলমাত্র শাসকদের ক্ষমতার ওপর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে আকবরের গৌরবোজ্জ্বল রাজত্বের নবম বছরে এই কর প্রত্যাহৃত হয়। পরবর্তী আট শতকেরও বেশি সময় এই নীতি মুসলমান শাসন ব্যবস্থার মৌলিক অংশ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল'।

লেন পুল বলেছেন, 'জমির উৎপন্ন মোট ফসলের অর্ধেক ভাগ হিন্দুদের কর হিসাবে দিতে হত। তাদের মহিষ, ছাগল এবং অন্যান্য দুগ্ধদায়ী গবাদি পশুর জন্য শুল্ক দিতে হত। জমির পরিমাণ ও গবাদি পশুর সংখ্যার ওপর, ধনী-দরিদ্র সকলকে সমহারে কর দিতে হত। কর আদায়কারী কোনও রাজকর্মচারী উৎকোচ নিলে, তাকে সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করা হত এবং লাঠি, সাঁড়াশি, দেহ টান টান করে শাস্তি দেবার যন্ত্র, কারাদণ্ড এবং শৃঙ্খলের সাহায্যে শাস্তি দেওয়া হত। নতুন আইনগুলি এত কঠোরভাবে প্রচলিত ছিল যে এক একজন রাজস্ব-আদায়কারী, ২০ জন বিশিষ্ট হিন্দুকে এক সঙ্গে বেঁধে প্রহার করত। হিন্দুদের বাড়িতে সোনা, রূপা, এমন কি চিত্তবিনোদনের জন্য সামান্য পানও দেখা যেত না। দুঃস্থ, নিঃস্ব হিন্দুদের স্ত্রীরা মুসলমান পরিবারে দাসীবৃত্তি করতে বাধ্য হত। রাজস্ব-আদায়কারীরা ছিল, প্লেগের চেয়েও ভয়ঙ্কর। সরকারী করণিকদের এতটাই ঘৃণার চোখে দেখা হত যে, কোনও হিন্দু তাদের সঙ্গে মেয়েদের বিবাহ দিত না'।

সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের মতে এই অনুশাসন এমন কঠোরভাবে পালিত হত যে চৌকিদার, মুকদ্দিম ইত্যাদি কর্মচারীরা ঘোড়ায় চড়তে পারত না, অস্ত্র ব্যবহার করতে পারত না, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরতে পারত না এমনকি পান খেতেও পারত না। কোনও হিন্দুকে মাথা তুলতেই দেওয়া হত না। কর আদায় না হলে, কারাগার ও শৃঙ্খলের ব্যবস্থা থাকত।

এত সব কাণ্ড কিন্তু শুধুমাত্র হিংসা ও নৈতিক বিকারের ফল ছিল না। পক্ষান্তরে যা করা হয়েছিল, তার মূলে ছিল শাসক মুসলমান চিন্তার বৃহত্তম পদক্ষেপ। মুসলমান

আইনের অধীনে হিন্দুদের আইনসম্মত অবস্থা কী ছিল, সুলতান আলাউদ্দিনের এই প্রশ্নের উত্তরে কাজি এই সব চিন্তা ধারা প্রকাশ করেছেন। কাজি বলেছেন :

'তাদের শুধু শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হত। তাদের কাছে যখন রাজস্ব-আদায়কারীরা রূপো দাবি করত, তাদের তখন বিনা প্রশ্নে এবং অতিরিক্ত নম্রতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সোনা দিতে হত। রাজকর্মচারীরা তাদের মুখে নোংরা ধুলো ছুঁড়ে দিলে, বিন্দুমাত্র আপত্তি না করে তাদের মুখব্যাদন করতে হত। বিধর্মীদের সবিনয় নিবেদনের পরিচয় পাওয়া যায়, এরকম বিনম্র দান ও মুখমধ্যে নোংরা ধুলো গ্রহণ করার মাধ্যমে। ইসলামের গৌরবীকরণ একটি কর্তব্য, ধর্মের অপমান হল পাপ। ঈশ্বর তাদের ঘৃণা করেন, কারণ তিনি বলেন—ওদের পদানত করে রাখো। হিন্দুদের মর্যাদাহানি করা একটি বিশিষ্ট ধর্মীয় কর্তব্য, কারণ তারা হল পয়গম্বরের সব চেয়ে ঘৃণিত শত্রু; কারণ পয়গম্বর তাদের হত্যা, লুণ্ঠন ও বন্দি করতে আদেশ দিয়ে, আমাদের বলেছেন—হয় তাদের ইসলাম ধর্ম নিতে বাধ্য কর, অথবা তাদের হত্যা কর। তাদের দাস করে সমস্ত ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর। একমাত্র হানিফ, যিনি শ্রেষ্ঠ নিদান দিয়ে থাকেন এবং আমরা যাঁর শিষ্য, তিনি হিন্দুদের ওপর জিজিয়া প্রয়োগ করতে আদেশ দিয়েছেন। হিন্দুদের হত্যা অথবা ইসলাম ধর্মগ্রহণে বাধ্য করা ছাড়া অন্য কোনও বিকল্পের কথা কোনও নিদানে নেই'।

এই হল গজনির মামুদের আগমন ও আহম্মদ-শাহ-আবদালির প্রত্যাবর্তনের মধ্যবর্তী ৭৬২ বছরের ইতিহাস।

তাহলে উত্তর ভারতকে আর্যাবর্তের অংশ হিসাবে হিন্দুদের দাবিকে কতখানি যুক্তিযুক্ত বলা যায়? ঐ অংশ তাদের অধীনে ছিল এবং সেই কারণে এটি ভারতের শাশ্বত অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এরকম দাবির পিছনেই বা কতটুকু যুক্তি আছে? যাঁরা বিভাজনের বিরুদ্ধে এবং ঐতিহাসিক ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে বলে থাকেন যে, আফগানিস্তান সমেত উত্তর ভারত এক সময় ভারতেরই অংশ ছিল এবং ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা বৌদ্ধ কিংবা হিন্দু ছিল, তাদের প্রশ্ন করা যায় যে ৭৬২ বছরের নিরবচ্ছিন্ন মুসলমান আক্রমণ যে উদ্দেশ্যে ও যে পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছে, তা কি অগ্রাহ্য করা যায়?

এই সব আক্রমণের অন্যান্য পরিণতির কথা বাদ দিলেও, আমার মতে, উত্তর ভারতের সংস্কৃতি ও চরিত্রকে এগুলি এমনভাবে পালটে দিয়েছে, যে আজ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যে উত্তর ভারতের কথা বলা হচ্ছে, সেই স্থানের সঙ্গে

ভারতের বাকি অংশের ঐক্য নেই তো বটেই, তা ছাড়া দুটি অঞ্চলের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে রয়েছে শুধুই পারস্পরিক ঘৃণা ও অসদ্ভাব।

এই সব আক্রমণের প্রথম ফলশ্রুতি হল উত্তর ভারতের সঙ্গে ভারতের অবশিষ্ট অংশের ঐক্য নাশ। উত্তর ভারত জয় করে, গজনির মামুদ ভারত থেকে ঐ অংশকে বিচ্ছিন্ন করে গজনি থেকে শাসন কাজ চালাতেন। বিজয়ী হিসাবে যখন মহম্মদ ঘোরি এলেন তখন তিনি ভারতের সঙ্গে এই অংশকে আবার সংযুক্ত করে, প্রথমে লাহোর ও পরে দিল্লি থেকে শাসন পরিচালনা করেন। আকবরের ভাই হাকিম উত্তর ভারত থেকে কাবুল ও কান্দাহারকে বিচ্ছিন্ন করেন। আকবর অবশ্য উত্তর ভারতের সঙ্গে এদের আবার সংযুক্ত করেন। ১৭৩৮ সালে নাদির শাহ আবার বিচ্ছেদ ঘটান এবং সমগ্র উত্তর ভারতই হয় তো সেদিন ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত, যদি শিখদের অভ্যুত্থান, এই প্রবণতাকে বন্ধ না করত। এইভাবে উত্তর ভারত যেন একটি ট্রেনের ওয়াগন, যাকে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কখনও ট্রেনটির সঙ্গে জোড়া লাগানো যায়, কখনও বিচ্ছিন্ন করা যায়। সাদৃশ্য খুঁজতে গেলে আলসেস-লোরেনের কথা বলা যায়। সুইজারল্যান্ডের অবশিষ্ট অংশ ও নিম্নভূমির মত আলসেস-লোরেন ছিল আসলে জার্মানির অংশ। ১৮৭১ সাল পর্যন্ত এটি ছিল ফ্রান্সের অধীন। এরপর এই অঞ্চল জার্মানির অংশে আসে। ১৯১৮ সালে এটি আবার জার্মানি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফ্রান্সের অধীনে আসে। ১৯৪০ সালে তা আবার জার্মানির অন্তর্ভুক্ত হয়।

মুসলমান আক্রমণকারীরা তাঁদের কৃতকর্মের কিছু ফলশ্রুতি রেখে যান। প্রথম ফলশ্রুতি হল, এর ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে স্থাপিত হয় একটি তিক্ত সম্পর্ক। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই তিক্ততা এত দীর্ঘস্থায়ী হয় যে, একশো বছরের রাজনৈতিক জীবনেও, এই বিদ্বেষ ঘোচেনি, মানুষ ভুলতে পারেনি সে তিক্ততার স্মৃতি। আক্রমণের সঙ্গে যেভাবে মিশে ছিল মন্দির ধ্বংস করা, জবরদস্তি ধর্মান্তরীকরণ, সম্পত্তি ধ্বংস, হত্যা, ক্রীতদাসে পরিণত করা ইত্যাদি, তাতে ঐ সব স্মৃতি মুসলমানদের কাছে গর্বের ও হিন্দুদের কাছে লজ্জার অনুভূতি জাগিয়ে রাখবে, এতে আর আশ্চর্য কি! কিন্তু এ সব ঘটনা বাদ দিলেও, ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশও ছিল যেন একটি নাট্যশালা, যেখানে অভিনীত হয়েছে নিষ্ঠুর এক নাটক। মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা সমুদ্র তরঙ্গের মত বারবার এখানে আক্রমণ করে ভারতের অবশিষ্ট অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। ক্ষীণ স্রোতের মত এই আক্রমণের ধারাটি অবশিষ্ট অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছে। কালক্রমে সেই ধারাটি শুকিয়ে গেছে,

কিন্তু তার স্বল্প পরিসরের মধ্যে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে আদি আর্য সভ্যতার মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছে গভীর ইসলাম সংস্কৃতি, যা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এনেছে ব্যাপক ভিন্নতা। হিন্দুদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার গান গেয়েই এসেছিল মুসলমান আক্রমণকারীরা। কিন্তু সেই সুর বেধে কিংবা ফেরার সময় কিছু মন্দির পুড়িয়ে দিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি। তাহলে তা হয়তো আশীর্বাদ হতে পারতো। তারা এরকম নেতিবাচক ফলে সন্তুষ্ট হয়নি। তারা ইতিবাচক যে কাজটি করে গেছে, তা হল ইসলামের বীজ বপন করা। বীজ থেকে চারা গাছটির বৃদ্ধিও লক্ষণীয়। এটি গ্রীষ্মের চারা নয়। ওক গাছের মত এটি বিশাল ও মজবুত। উত্তর ভারতে এর বৃদ্ধি সব চেয়ে বেশি। অন্য জায়গার তুলনায় এখানেই আক্রমণ-তরঙ্গের পলিমাটি জমেছে বেশি এবং নিষ্ঠাবান মালীর মত এই সব আক্রমণ সেই গাছে জলসিঞ্চনের কাজ করেছে। উত্তর ভারতে এর অরণ্য এত ঘন যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সামান্য তলানিটুকুকে এখানে লতাগুল্মের মতো মনে হয়। এমন কি শিখ ধর্মের কুঠারও এই ওক গাছকে কেটে ফেলতে পারেনি। সন্দেহ নেই, উত্তর ভারতের শিখরা শক্তিশালী হতে পেরেছিল, কিন্তু সুয়ান সাং-এর আগে ভারতের অবশিষ্ট অংশের সঙ্গে এই অংশ যে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যে আবদ্ধ ছিল, সে ঐক্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। শিখরা ভারতের সংহতির জন্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তবু উত্তর ভারত ছিল আলসেস-লোরেনের মত রাজনীতির দিক থেকে বিচ্ছেদ্য, আর আধ্যাত্মিক দিক থেকে ভারতের অবশিষ্ট অংশের কাছে পরদেশি। একমাত্র বাস্তবজ্ঞানশূন্য মানুষই এসব ঘটনা দেখতে পাবেন না, অথবা এরকম ভাববেন যে, কেবল পাকিস্তান সৃষ্টি মানেই হল ভারতের দুটি খণ্ডে বিভক্ত হওয়া।

পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের মধ্যে কী ধরনের ঐক্য হিন্দুরা দেখতে পান? যদি এটা ভৌগোলিক ঐক্য বোঝায়, তবে সেটা কোনও ঐক্যই নয়। ভৌগোলিক ঐক্য প্রকৃতির খেয়ালে গড়ে ওঠে। এরকম ঐক্যের ভিত্তিতে একটি জাতি গড়ে উঠলে মনে হবে প্রকৃতি ভাবে এক, মানুষ করে অন্য কিছু। যদি জীবনধারা বা অভ্যাসের মত বাহ্যিক কোনও কারণে এই ঐক্য গড়ে ওঠে, তবে তাও প্রকৃত ঐক্য হতে পারে না। এরকম ঐক্য তৈরি হয় সম পরিবেশে। যদি এই ঐক্য বলতে শাসনতান্ত্রিক ঐক্য বোঝান হয়, তবে তাকেও ঠিক ঐক্য বলা যায় না। ব্রহ্মদেশের উদাহরণ এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ইয়েনদাবুর চুক্তি আরাকান ও টেনাসোরিয়ামকে সংযুক্ত করেছিল। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে উচ্চতর বার্মাকে সংযুক্ত করা হয়। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ভারত ও ব্রহ্মদেশের শাসনতান্ত্রিক ঐক্য গঠিত হয়েছিল, যা ১১০ বছরেরও বেশি সময় অটুট ছিল। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে দুটি দেশের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় এবং

সেজন্য কেউ এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলেনি। ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তি কিন্তু কোনও অংশে কমজোরি ছিল না। ঐক্যকে দৃঢ় করতে হলে দরকার স্বজাত্যের অনুভূতি, আত্মীয়তাবোধ। এক কথায়, এই ঐক্য অবশ্যই হতে হবে আত্মিক। এই সব দিক বিচার করে বলা যায়, পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের ঐক্য শুধুই গল্প কথা। আসলে পাকিস্তানের চেয়ে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে হিন্দুস্তানের ঐক্য ছিল অনেক বেশি আত্মিক। সুতরাং ভারত থেকে ব্রহ্মদেশের বিযুক্তিতে হিন্দুরা যদি আপত্তি না করে থাকে, তবে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বিচ্ছেদকে হিন্দুরা কেন মেনে নেবে না, তা বোধগম্য নয়। অথচ পাকিস্তান অবশিষ্ট ভারতের থেকে রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন, সামাজিকভাবে শত্রুভাবাপন্ন ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে অনাত্মীয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুর্বল প্রতিরক্ষা

পাকিস্তান সৃষ্টি হলে হিন্দুস্তানের প্রতিরক্ষা দুর্বল হবে কেন? বিষয়টি অবশ্য খুব জরুরি নয়, কারণ পাকিস্তান তার জন্মলগ্ন থেকেই হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে, এটা মনে করার কোনও কারণ নেই। তবু প্রশ্ন যখন উঠবেই, তখন এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা এখনই করা যেতে পারে।

প্রশ্নটিকে তিন ভাবে রাখা যায় :

১) সীমান্ত সমস্যা।

২) সম্পদের সমস্যা এবং

৩) সশস্ত্র বাহিনীর সমস্যা।

১

সীমান্ত সমস্যা

হিন্দুরা নিশ্চিতভাবে দাবি করবেন যে, পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের মধ্যে কোনও বিজ্ঞানসম্মত সীমান্ত নেই। কিন্তু তাই বলে মুসলমানদের পাকিস্তান সৃষ্টির অধিকারকে অস্বীকার করা যায় না। রসিকতাটুকু বাদ দিয়েও অবশ্য বলা যায় যে, অন্তত দুটি যুক্তি বিচার করলে এটাই প্রমাণিত হবে, হিন্দুদের আশঙ্কা এক্ষেত্রে একেবারেই অবাঞ্ছিত।

প্রথমত, এমন কোনও সীমান্ত কি কোনও দেশ আশা করতে পারে, যাকে বৈজ্ঞানিক বলা যায়? 'নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার' গ্রন্থের লেখক ডেভিজ বলেছেন—

'ভারতীয় সাম্রাজ্যকে উত্তর-পশ্চিম দিকে এমন কোনও সীমান্ত দিয়ে চিহ্নিত করা অসম্ভব যার দ্বারা জাতিগত, রাজনৈতিক এবং সামরিক প্রয়োজন মেটানো যায়।

নিবিড় সম্পর্কযুক্ত উপজাতি-অঞ্চলগুলিকে পৃথকীকরণ করার সময় জাতিগত বিচার-বিবেচনা অক্ষুণ্ণ রেখে সহজে ব্যাখ্যা করা যায় এমন একটি ভৌগোলিক অঞ্চলকে সরাসরি উপস্থাপন করা একটি আকাশকুসুম কল্পনা।

ঐতিহাসিক সত্য অনুযায়ী, ভারতের একটি মাত্র বৈজ্ঞানিক সীমান্ত কখনওই ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভারতের বিভিন্ন সীমার কথা বলেছেন। সীমান্ত প্রশ্নটি দুটি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত—'অগ্রগতির নীতি' এবং 'সিন্ধু সভ্যতায় পিছিয়ে যাওয়ার নীতি'। স্যার জর্জ ম্যাকমানের অনুসরণে বলা যায়, অগ্রগতির নীতির বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর দুটি দিক আছে। বৃহত্তর দিকটি হল, আফগানিস্তানকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণে এনে আব্বাস পর্যন্ত ভারতের সীমানার বিস্তার করা। ক্ষুদ্রতর দিকটি হল, ডুরান্ড লাইনের ব্যাখ্যা মতো, ঐ রেখা বরাবর ব্রিটিশের নিয়ন্ত্রণ মেনে নিয়ে উপজাতি-অধ্যুষিত পর্বতশ্রেণী ও আফগানিস্তানের মধ্যে একটি সীমানা ঠিক করা। ভারতের নিরাপদ সীমান্তের ভিত্তি হিসাবে অগ্রগতির নীতি অনেক আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে। এর ফলে: ১) সিন্ধু নদ, ২) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল এবং ৩) ডুরান্ড লাইন থেকে একটিকে সীমান্ত হিসাবে বেছে নিতে হয়। পাকিস্তান নিঃসন্দেহে হিন্দুস্তানের সীমারেখাকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত, এমনকি সিন্ধু নদ ছাড়িয়ে শতদ্রু পর্যন্ত বিস্তৃত করতে চাইবে। কিন্তু এই 'সিন্ধু সভ্যতায় পিছিয়ে যাওয়া' নীতির সমর্থকের অভাব ছিল না। এদের মধ্যে সব চেয়ে উৎসাহী সমর্থক ছিলেন লর্ড লরেন্স, সিন্ধু নদের সীমানা পেরিয়ে পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত সীমানাকে অগ্রগতির নীতিমত বিস্তৃত করতে যাঁকে অনেক সমালোচনার মুখে দাঁড়াতে হয়েছে। তাঁর মতে, সিন্ধু অববাহিকা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে যুদ্ধ পরিচালনা সম্ভব নয়। এই দূরত্ব যতই বাড়বে, আক্রমণকারীকে আফগানিস্তান ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে ততই অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হবে। অন্য দিকে অনেকে এই ব্যাপারে অভিমত প্রকাশ করেন যে, নদী হল একটি দুর্বল প্রতিরক্ষা রেখা। কিন্তু সিন্ধু নদকে সীমান্ত হিসাবে গণ্য না করার পিছনে অন্য কারণ আছে। ডেভিজ আসল কারণটি এইভাবে ব্যক্ত করেছেন—'বর্তমান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের কথা চিন্তা করলে সিন্ধু নদের তত্ত্বটি অসার প্রতিপন্ন হয়। পিছিয়ে আসা মানে শুধু যে আত্মসম্মান বিসর্জন দেওয়া তাই নয়, এর ফলে যে—অধিবাসীদের আমরা কল্যাণমূলক শাসন ব্যবস্থা মঞ্জুর করেছি, তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে'।

আসলে কোনও বিশেষ সীমান্তকে সব চেয়ে নিরাপদ মনে করার কোনও অর্থ হয় না। কারণ বর্তমানে ভৌগোলিক অবস্থা শুধুই ছলনা নয় এবং আধুনিক প্রযুক্তি

প্রাকৃতিক সীমানার আগের গুরুত্ব অনেকটাই নষ্ট করে দিয়েছে, এমন কি যেখানে বিশাল পর্বত, বিস্তৃত নদী কিংবা সমুদ্র অথবা বিস্তীর্ণ মরুভূমি আছে, সেখানেও।

দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক সীমারেখা না থাকলেও একটি জাতি এই ঘাটতিটুকু পুষিয়ে নিতে পারে। প্রাকৃতিক সীমারেখা নেই, এমন অনেক দেশ আছে। তবু প্রাকৃতিক বাধার চেয়ে কম দুর্ভেদ্য নয়, এমন কৃত্রিম দুর্গ তৈরি করে তারা প্রাকৃতিক কৃপণতার মোকাবিলা করেছে। সুতরাং একই অবস্থার প্রেক্ষিতে অন্য দেশ যা পারে, হিন্দুরা তা পারবে না, এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে প্রাকৃতিক নিরাপদ সীমান্তের জন্য হিন্দুদের উদ্বেগ সম্পূর্ণ অর্থহীন।

২

প্রাকৃতিক সম্পদ

বিজ্ঞান সম্মত সীমান্তের চেয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রশ্নটি বরং বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনীয় সম্পদের প্রাচুর্য থাকলে অবৈজ্ঞানিক কিংবা দুর্বল সীমান্তের সমস্যা অনায়াসে দূর করা যায়। সুতরাং পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের তুলনামূলক সম্পদ বিবেচনা করতে হবে। দুটি দেশের এই পারস্পরিক সম্পদের একটি ধারণা তৈরি করা যাবে নিচের তথ্য থেকে :

পাকিস্তানের সম্পদ

প্রদেশ	আয়তন	জনসংখ্যা	রাজস্ব
			টাকা
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল	১৩,৫১৮	২,৪২৫,০০৩	১,৯০,১১,৮৪২
পাঞ্জাব	৯১,৯১৯	২৩,৫৫১,২১০	১২,৫৩,৮৭,৭৩০
সিন্ধু	৪৬,৩৭৮	৩,৮৮৭,০৭০	৯,৫৬,৭৬,২৬৯
বালুচিস্তান	৫৪,২২৮	৪২০,৬৪৮	...
বাংলা	৮২,৯৫৫	৫০,০০০,০০০	৩৬,৫৫,৬২,৪৮৫
মোট	২৮৮,৯৯৮	৮০,২৮৩,৯৩১	৬০,৫৬,৩৮,৩২৬

হিন্দুস্তানের সম্পদ

প্রদেশ	আয়তন	জনসংখ্যা	রাজস্ব
			টাকা
আজমেঢ়-মারোয়াড়	২,৭১১	৫৬০,২৯২	২১,০০,০০০
আসাম	৫৫,০১৪	৮,৬২২,২৫১	৪,৪৬,০৪,৪৪১
বিহার	৬৯,৩৪৮	৩২,৩৭১,৪৩৪	৬,৭৮,২১,৫৮৮
বোম্বাই	৭৭,২৭১	১৮,০০০,০০০	৩৪,৯৮,০৩,৮০০
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৯৯,৯৫৭	১৫,৫০৭,৭২৩	৪,৫৮,৮৩,৯৬২
কুর্গ	১,৫৯৩	১৬৩,৩২৭	১১,০০,০০০
দিল্লি	৫৭৩	৬৩৬,২৪৬	৭০,০০,০০০
মাদ্রাজ	১৪২,২৭৭	৪৬,০০০,০০০	২৫,৬৬,৭১,২৬৫
উড়িষ্যা	৩২,৬৯৫	৮,০৪৩,৬৮১	৮৭,৬৭,২৬৯
উত্তরপ্রদেশ	২০৬,২৪৮	৪৮,৪০৮,৭৬৩	১৬,৮৫,৫২,৮৮১
মোট	**৬০৭,৬৫৭**	**১৭৮,৫১৩,৯১৯**	**৯৬,২৪,০৫,২০৬**

এগুলি হল মোট সংখ্যা। এর মধ্যে কিছু হেরফের হতে পারে। রাজস্বের মধ্যে রেল, মুদ্রাব্যবস্থা এবং ডাক ও তার বিভাগ থেকে প্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, কারণ কোন্ রাজ্য থেকে কত রাজস্ব সংগৃহীত হয় তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। যদি সম্ভব হয় তবে রাজস্বের পরিমাণ আরও বাড়বে। এখানে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই যে রাজস্বখাতে হিন্দুস্তানের আয় পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেশি। সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হলে বেশির ভাগ হ্রাসের পরিমাণ পকিস্তানের দিকেই যাবে। পরবর্তী সময়ে দেখানো হবে যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাঞ্জাবের কিছু অংশ বাদ যাবে। একইভাবে বাংলার কিছু অংশ প্রস্তাবিত পূর্ববঙ্গ থেকে বাদ যাবে, যদিও আসামের একটি জেলা এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আমার মতে, বাংলা থেকে ১৫টি জেলা এবং পাঞ্জাব থেকে ১৩টি জেলা বেরিয়ে যাবে। এই সব জেলাগুলি বেরিয়ে যাবার ফলে মোট আয়তন, জনসংখ্যা ও রাজস্ব ঠিক কতটা

কমবে, তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। অবশ্য অনুমান করা যায়, পাঞ্জাব ও বাংলার ক্ষেত্রে রাজস্ব অর্ধেক কমে যাবে। তবে পাকিস্তান যা হারাবে সেটাই হবে হিন্দুস্তানের লাভ। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব যেখানে ৬০ কোটি - ২৪ কোটি = ৩৬ কোটি, হিন্দুস্তানের রাজস্ব সেখানে প্রায় ৯৬ কোটি + ২৪ কোটি = ১২০ কোটি।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যে সংখ্যাগুলি দেওয়া হল, তা থেকে বোঝা যাবে যে আয়তন, লোকসংখ্যা বা রাজস্বের বিচারে হিন্দুস্তানের সম্পদ পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং সম্পদের ক্ষেত্রে চিন্তার কোনও কারণ নেই। পাকিস্তানের সৃষ্টি হলে কোনও অবস্থাতেই হিন্দুস্তান দুর্বল হয়ে যাবে না।

৩

সশস্ত্র বাহিনীর প্রশ্ন

প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে যেমন, একটি দেশের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে তেমন কোনও প্রভাব নেই বৈজ্ঞানিক সীমান্তের। প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়েও সামরিক শক্তির ওপরে বেশি নির্ভর করে দেশের প্রতিরক্ষা।

পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের এই সামরিক শক্তির স্বরূপ কী?

ভারতের প্রতিরক্ষার সমস্যার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে সাইমন কমিশন মন্তব্য করেছিলেন যে, এখানে বিশেষ কিছু অঞ্চলে সামরিক বাহিনীর নিযুক্ত হতে আসে অধিবাসীরা, দেশের অন্যান্য অংশে এই নিয়োগ হয় খুবই কম, অথবা প্রায় একেবারেই হয় না। ভারতের প্রতিরক্ষা বিষয়ে যাঁরা চিন্তা করেন এবং গুরুত্ব দেন, সাইমন কমিশন থেকে পাওয়া নিচের ছকটি তাঁদের রীতিমত বিস্মিত করবে :

	নিয়োগ ক্ষেত্র	নিয়োগ সংখ্যা
১।	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল	৫,৬০০
২।	কাশ্মীর	৬,৫০০
৩।	পাঞ্জাব	৮৬,০০০
৪।	বালুচিস্তান	৩০০

৫।	নেপাল	১৯,০০০
৬।	যুক্তপ্রদেশ	১৬,৫০০
৭।	রাজপুতানা	৭,০০০
৮।	মধ্যভারত	২০০
৯।	বোম্বাই	৭,০০০
১০।	মধ্যপ্রদেশ	১০০
১১।	বিহার ও উড়িষ্যা	৩০০
১২।	বাংলা	...
১৩।	আসাম	...
১৪।	ব্রহ্মদেশ	৩,০০০
১৫।	হায়দ্রাবাদ	৭০০
১৬।	মহীশূর	১০০
১৭।	মাদ্রাজ	৪,০০০
১৮।	বিবিধ	১,৯০০
	মোট	**১৫৮,২০০**

সাইমন কমিশন বুঝেছিলেন যে ভারতে এটাই স্বাভাবিক। এর সমর্থনে বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের সংখ্যা উল্লেখ করে দেখিয়েছিলেন যে, বিশেষ কোনও নিয়োগক্ষেত্রে তখন কোনরকমের হতাশা ছড়ানো হয় নি।—

প্রদেশ	সামরিক নিয়োগ	অসামরিক নিয়োগ	মোট
মাদ্রাজ	৫১,২২৩	৪১,১১৭	৯২,৩৪০
বোম্বাই	৪১,২৭২	৩০,২১১	৭১,৪৮৩
বাংলা	৭,১১৭	৫১,৯৩৫	৫৯,০৫২

যুক্তপ্রদেশ	১৬৩,৫৭৮	১১৭,৫৬৫	২৮১,১৪৩
পাঞ্জাব	৩৪৯,৬৮৮	৯৭,২৮৮	৪৪৬,৯৭৬
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল	৩২,১৮১	১৩,০৫০	৪৫,২৩১
বালুচিস্তান	১,৭৬১	৩২৭	২,০৮৮
ব্রহ্মদেশ	১৪,০৯৪	৪,৫৭৯	১৮,৬৭৩
বিহার ও উড়িষ্যা	৮,৫৭৬	৩২,৯৭৬	৪১,৫৫২
মধ্যপ্রদেশ	৫,৩৭৬	৯,৬৩১	১৫,০০৭
আসাম	৯৪২	১৪,১৮২	১৫,১২৪
আজমেঢ়-মারোয়াড়	৭,৩৪১	১,৬৩২	৮,৯৭৩
নেপাল	৫৮,৯০৪	...	৫৮,৯০৪
মোট	**৭৪২,০৫৩**	**৪১৪,৪৯৩**	**১১০৬,৫৪৬**

এই হিসাব থেকে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক যা প্রকাশ পেয়েছে তা হল, ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দিতে বেশির ভাগ মানুষ আসেন সেই সব অঞ্চল থেকে, যেগুলিকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি উঠেছে। এর থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, পাকিস্তান ছাড়া হিন্দুস্তান কখনওই নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।

সাইমন কমিশনের তথ্যগুলি অবশ্য বিতর্কের ঊর্ধ্বে। কিন্তু একমাত্র পাকিস্তানই সৈনিক তৈরি করতে পারে, হিন্দুস্তান পারে না—সাইমন কমিশনের এরকম সিদ্ধান্তের কোনও ভিত্তি নেই। নিচের যুক্তিগুলি থেকে এই ভিত্তিহীনতার কারণ বোঝানো যেতে পারে।

প্রথমত, সাইমন কমিশন ভারতের ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন তা ঠিক সমর্থন করা যায় না। ভারতীয় জনসমষ্টির কোনও অন্তর্নিহিত ত্রুটি এই বৈশিষ্ট্যের কারণ নয়। বহু বছর ধরে ব্রিটিশ সরকার অনুসৃত নিয়োগ পদ্ধতি এই বৈশিষ্ট্যের কারণ। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীদের আধিপত্যের

কারণ হল এই যে তাঁরা জাতিগতভাবে সামরিক শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু মিস্টার চৌধুরি অভ্রান্ত তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে, এই ব্যাখ্যা একেবারেই সত্য নয়। তিনি দেখিয়েছেন যে, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীতে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মানুষদের প্রাধান্য ছিল। ১৮৭৯ সালে গঠিত বিশেষ সামরিক কমিটি অস্পষ্টভাবে এই সামরিক-অসামরিক জাতিতত্ত্ব প্রথম প্রকাশ করে। কিন্তু এই সামরিক জাতি তাদের লড়াই করার গুণ ছিল বলে প্রাধান্য পেয়েছিল তা নয়, বাঙ্গালি সেনাবাহিনী যে-মহাবিদ্রোহে সামগ্রিকভাবে জড়িত ছিল, তাকে দমন করতে ব্রিটিশকে সাহায্য করেছিল বলে।

মিস্টার চৌধুরির কথায় :

'মহাবিদ্রোহের আগে বাংলার সেনাবাহিনীতে বেশির ভাগ ছিলেন গাঙ্গেয় উপত্যকার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা। তিনটি বিভাগের সেনাবাহিনী, যাদের কথা এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই বলা হয়েছে, তারা তাদের অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রকৃত প্রতিনিধি ছিলেন। কিন্তু তাদের কাউকেই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জাতীয় সেনাবাহিনী বলা যায় না, কারণ কেবলমাত্র ঐতিহ্যগতভাবে সামরিক জাতি ছাড়া আর কোনও জাতিকে সৈন্যবাহিনীতে নিয়ে আসার কোন চেষ্টাই হয়নি। তারা তাদের স্বাভাবিক নিয়োগক্ষেত্র থেকেই নিযুক্ত হয়েছিল, যেমন, মাদ্রাজের বাহিনী নিযুক্ত হত তামিল ও তেলুগু অঞ্চল থেকে, বোম্বাইয়ের বাহিনী পশ্চিম ভারত থেকে এবং বাঙ্গালী বাহিনী মূলত বিহার ও উত্তর প্রদেশ এবং খুব কম বাংলা থেকে। প্রয়োজনীয় অন্যান্য যোগ্যতা থাকলে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়, জাতি ও ধর্মের মানুষের ওপর সামরিক বাহিনীতে যোগদানে কোনও সরকারী বিধিনিষেধ ছিল না। বোম্বাই ও মাদ্রাজের বাহিনীতে এ সম্পর্কে প্রচলিত পদ্ধতিকে এই মুহূর্তে আলোচনার বাইরে রাখলে এই সাধারণ পদ্ধতির একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল বাংলার বাহিনী, যেখানে পাঞ্জাবি ও শিখদের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সামরিক ঐতিহ্য সত্ত্বেও তাদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়নি। বিপরীতক্রমে, তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে কঠোর সরকারী নিষেধাজ্ঞা ছিল যে, একটি বাহিনীতে পাঞ্জাবী ও শিখদের সংখ্যা কোনমতেই যথাক্রমে ২০০ এবং ১০০-এর বেশি হবে না। একমাত্র বাংলা বাহিনীর হিন্দুস্তানী দলের বিদ্রোহ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঞ্জাবীদের পুনর্বাসনের সুযোগ এনে দেয়। তখন থেকে তাদের সন্দেহ ও নিষেধাজ্ঞার আওতায় রাখা হয় এবং প্রধানত অযোধ্যা, উত্তর ও দক্ষিণ বিহার, বিশেষত সাহাবাদ ও ভোজপুর, গঙ্গা-যমুনার সংযোগস্থলের অঞ্চল এবং রোহিলখণ্ড থেকে বাংলার বাহিনীতে সেনা নিয়োগ করা হয়। এই সব অঞ্চল থেকে যাদের

নিয়োগ করা হত তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত ও আহিরদের মত উচ্চবংশজাত। গড়ে ৭/২৪ ভাগ ব্রাহ্মণ, ১/৪ ভাগ রাজপুত, ১/৬ ভাগ নিম্নবর্ণের হিন্দু, ১/৬ ভাগ মুসলমান ও ১/৮ ভাগ পাঞ্জাবিদের নিয়ে এই বাহিনী গঠিত হত।

'এই সৈন্যবাহিনীতে, যেখানে বর্তমানে পাঞ্জাব, নেপাল, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল, কুমায়ুন ও গাড়োয়ালের পার্বত্য অঞ্চল ও রাজপুতানা সব চেয়ে বেশি সৈন্য সরবরাহ করে, সেখানে আগে এই সরবরাহ ছিল নগণ্য অথবা শূন্য। এখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্তম্ভ হিসাবে যাঁরা স্বীকৃত সেই শিখ, গুর্খা, পাঞ্জাবি মুসলমান, ডোগরা, জাঠ, পাঠান, গাড়োয়াল ইত্যাদি বিভিন্ন লড়াকু জাতিকে সেই সময় কার্যত বহিষ্কার করেছিল ব্রিটিশ সরকার। এক বছরে একটি মাত্র বিদ্রোহ গোটা ছবিটাকেই পালটে দিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ বাংলার পুরনো বাহিনীকে সরিয়ে দিয়ে পাঞ্জাবী প্রধান ও দুর্দ্ধর্ষ এক বাহিনীতে পরিণত করল, ঠিক যেমনটি বর্তমানে ভারতীয় বাহিনীকে করা হয়েছে'।

'হিন্দুস্তানিদের বিদ্রোহের ফলে তৈরি শূন্যস্থান ভারতীয় সেনাবাহিনীতে তৎক্ষণাৎ পূরণ করল শিখ, পাঞ্জাবি ও পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ যারা হিন্দুস্তানের শহরগুলি লুঠ হয়ে যাবার প্রতিশোধ নিতে ভীষণ আগ্রহী ছিল। হিন্দুস্তানি সৈন্যেরা, যারা অজ্ঞতার কারণে হিন্দুস্তানিদেরই আসল শত্রু বলে মনে করত, তাদের সাহায্যেই ব্রিটিশ সরকার এই বিদ্রোহ দমন করল। বিদ্রোহ দমনে এটি ছিল ব্রিটিশের সেরা সুযোগ সন্ধান। যখন লন্ডনে লর্ড ডালহৌসির কাছে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে গুর্খাদের অন্তর্ভুক্তির খবর পৌছাল, তখন তিনি তাঁর আনন্দ প্রকাশ করে এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন—অযোধ্যার সিপাইদের বিরুদ্ধে তারা শয়তানের মত যুদ্ধ করবে। বিদ্রোহের পর ভারতীয় বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ জেনারেল ম্যাসফিল্ড শিখদের সম্পর্কে লিখেছিলেন—শিখরা আমাদের ভালবাসত, এমন নয়। আসলে হিন্দুস্তান ও বাংলার বাহিনীর প্রতি তাদের ঘৃণার ফলেই তারা আমাদের পাশে এসেছিল স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা না করে। হিন্দুস্তানের শহরগুলি লুঠপাট করে, ধনসম্পদ সংগ্রহ করে তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই যেন প্রতিশোধ নিতে থাকে। দৈনিক মজুরীতে তারা আকৃষ্ট হত না, কারণ তারা চাইত লুণ্ঠন। সংক্ষেপে, রনজিৎ সিংহের পুরনো খালসা বাহিনীর ছায়া যেন বর্তমান বাহিনীতে পড়েছে'।

'বস্তুত এই সম্পর্ক ছিল দীর্ঘস্থায়ী। বিদ্রোহের সময় শিখ ও গুর্খাদের ভূমিকাকে মনে রেখে পাঞ্জাব ও নেপালকে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সম্মানজনক স্থান দেওয়া হয়'।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ফলেই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল, ভারতীয় বাহিনীতে আধিপত্য পায়—এ বিষয়ে মিস্টার চৌধুরী যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা নিঃসন্দেহে সত্য। এই আধিপত্যের কারণ তাদের রণনিপুণতা নয়। নিচের ছকটি থেকে বোঝা যাবে যে, মহাবিদ্রোহের আগে ও পরে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর উপাদান কী কী ছিল।—

ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর গঠনে পরিবর্তন
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিযুক্ত লোকদের শতকরা হিসাব

বছর	উত্তর পশ্চিম ভারত পাঞ্জাব, উঃ পঃ অঞ্চল কাশ্মীর	উত্তর পূর্ব ভারত নেপাল, গাড়ওয়াল কুমায়ুন	উত্তর প্রদেশ, বিহার	দক্ষিণ ভারত	ব্রহ্মদেশ,
১৮৫৬	১৩-এর	নগণ্য	৯০-এর কম নয়	...	শূন্য
১৮৫৮	৪৭	৬	৪৭	...	”
১৮৮৩	৪৮	১৭	৩৫	...	”
১৮৯৩	৫৩	২৪	২৩	...	”
১৯০৫	৪৭	১৫	২২	১৬	”
১৯১৯	৪৬	১৪.৮	২৫.৫	১২	১.৭
১৯৩০	৫৮.৫	২২	১১.০	৫.৫	৩

এই তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৮৫৬ সালে অর্থাৎ মহাবিদ্রোহের এক বছর আগে ভারতীয় বাহিনীতে উত্তর-পশ্চিম থেকে আগত মানুষদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। কিন্তু ১৮৫৮ সালে অর্থাৎ মহাবিদ্রোহের পরের বছর তাদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং এই সংখ্যা আর কখনও কমেনি।

এ ছাড়া ১৮৭৯ সালে সামরিক ও অসামরিক জনগণের পার্থক্য, যেটি সেই প্রথম গুরুত্ব পায় এবং লর্ড রবার্টস্ যাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় বাহিনীতে নিয়োগ পদ্ধতির মূল সূত্র বলে যাকে লর্ড কিচেনার বর্ণনা করেন, ভারতের সৈন্যবাহিনীতে উত্তর-পশ্চিম অংশের মানুষদের

প্রাধান্য সম্পর্কে তার কিন্তু কোনও ভূমিকা ছিল না। এ বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ নেই যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের মানুষদের সামরিক জাতি হিসাবে ভারত সরকারের ঘোষণা ও অবশিষ্ট ভারতের অধিকাংশ মানুষকে অসামরিক বলে বিবেচনা করার অনেকগুলি ফলশ্রুতি ছিল। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে নিয়মিত স্থান পাবার ফলে, উত্তর-পশ্চিম ভারতীয়দের মনে এই প্রত্যয় জন্মাল যে, নিরাপদ ও উন্নতির সম্ভাবনাপূর্ণ এই পেশা শুধুমাত্র তাদেরই জন্য, অবশিষ্ট ভারতীয়দের জন্য নয় সুতরাং উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে সর্বাধিক সংখ্যায় নিযুক্তির একটা মাত্রই কারণ ছিল, তা হল ব্রিটিশ সরকার অবশিষ্ট ভারতের মানুষদের সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগই করেননি। উত্তর-পশ্চিম ভারতের মানুষ ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের পেশাটিকে বংশানুক্রমিক বলে ধরে নিয়েছে। যখন মানুষ নতুন কোনও পেশায় নিযুক্ত না হয়, তখন তাকে সেই পেশায় অযোগ্য বলে ধরা যাবে না। একমাত্র এটাই হতে পারে যে পেশাটি তাদের বংশানুক্রমিক নয়।

সামরিক ও অসামরিক ভাগে জনসমষ্টিকে বিভক্ত করার বিষয়টি অবশ্য সম্পূর্ণ নীতি-বহির্ভূত ও কৃত্রিম। যোগ্যতাকে বিচার না করে শুধুমাত্র জন্মসূত্রে একজন মানুষের জাতিবিচার করার মূর্খতাপূর্ণ হিন্দু প্রথার মতই এটি একটি অবিবেচকী সিদ্ধান্ত। এক সময় সরকার দাবি করেছে যে, যুদ্ধ পরিচালনার গুণ সম্পর্কে তারা জনগণের মধ্যে যেভাবে পার্থক্য করেছে, তা সঠিক। যুদ্ধের ক্ষমতাকেই এক্ষেত্রে মূল্য দেওয়া হয়েছে এবং সে কারণেই তারা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে বেশি মানুষকে নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু এই পার্থক্য মানুষের লড়াই করার ক্ষমতার ওপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারে না—এটা আজ স্বীকৃত হয়েছে। লন্ডন থেকে এক বেতার সম্প্রচারে ভারতের প্রয়াত কমান্ডার-ইন-চিফ স্যার ফিলিপ চেটউড ভারতীয় সেনাবাহিনীর গঠন সম্পর্কে দুঃখের সঙ্গে বলেছেন, পাঞ্জাব থেকে অধিক সংখ্যায় লোক নিয়োগ করার অর্থ এই নয় যে, উপদ্বীপের মানুষদের কোনও সামরিক যোগ্যতা ছিল না। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্যার ফিলিপ চেটউড বলেছেন যে, দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ উত্তর ভারতের চরম উষ্ণতা ও চরম শীত সহ্য করতে পারত না। কোনও জাতি কখনও চিরস্থায়ীভাবে সামরিক যোগ্যতাহীন হতে পারে না। সামরিক যোগ্যতা মানুষের আদিম বা সহজাত ব্যাপার নয়। বিষয়টি নির্ভর করে প্রশিক্ষণের ওপর এবং যে কেউ এই বিদ্যায় শিক্ষিত হতে পারে।

এ ছাড়া, বিশেষ প্রশিক্ষণ বাদ দিলেও হিন্দুস্তানে যুদ্ধের উপকরণের কোনও অভাব নেই। এখানে শিখেরা আছে, যাদের যুদ্ধক্ষমতা সম্পর্কে কিছু না বললেও

চলে। এখানে রাজপুতেরা আছে, যাদের এখনও যোদ্ধা জাতি হিসাবে ধরা হয়। এ ছাড়া আছে মারাঠারা, যারা গত ইউরোপীয় যুদ্ধে যুদ্ধবিদ্যায় তাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। এমন কি মাদ্রাজ বিভাগের মানুষদেরও সামরিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। এক সময় ভারতের কম্যান্ডার-ইন-চিফ জেনারেল স্যার ফ্রেডারিক পি. হেইনস্ যোদ্ধা হিসাবে মাদ্রাজিদের সম্পর্কে বলেছিলেন :

'এরকম একটি ধারণা চালু আছে যে, মাদ্রাজবাহিনীতে নিযুক্ত সৈনিকেরা বাংলাবাহিনীর সৈনিকদের চেয়ে কম যোগ্যতা সম্পন্ন। শারীরিক গঠনই যদি এক্ষেত্রে একমাত্র বিবেচ্য হয়, তা হলে অবশ্য এরকম ধারণা ঠিক। এটাও বলা হয় যে প্রকৃত সৈনিক হতে গেলে যে পরিবেশগত অবস্থা ও মানসিকতা থাকা দরকার, তা এদের মধ্যে নেই। মাদ্রাজবাহিনী সম্পর্কে এ সব মূল্যায়নকে আমি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করি। সন্দেহ নেই, সাম্প্রতিক কালে সামরিক ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ ভূমিকা দেখা যায়নি, কারণ কিছু অনভিজ্ঞদের বাদ দিলে, তাদের অধিকাংশকেই এই বিশেষ ক্ষেত্র থেকে দূরে রাখা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে যোদ্ধা হিসাবে তারা একেবারে অযোগ্য, এমন ধারণা আমি এক মুহূর্তের জন্যেও করি না। বরং ইতিহাস এর বিপরীত ধারণাই তৈরি করে। কুচকাওয়াজ ও নিয়মানুবর্তিতায় একজন মাদ্রাজি সৈনিক কারোর চেয়ে কম যায় না। স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও প্রতিবেশী অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে সে প্রতিযোগিতা করতে পারে'।

সুতরাং নিজস্ব জনসমষ্টি থেকে পর্য্যপ্ত পরিমাণে যোদ্ধা পাবার ক্ষেত্রে হিন্দুস্তানের আশঙ্কার কোনও কারণ নেই। পাকিস্তান সৃষ্টি হলে তাকে এ ব্যাপারে দুর্বল হতে হবে না।

সাইমন কমিশন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কমিশন বলেছিল যে, ভারতে সামরিকবাহিনীর কাজ দু' রকমের—প্রথমত, ভারতের নিকটবর্তী আফগান সীমান্তে স্বাধীন উপজাতিদের সমভূমি অঞ্চলের শান্তিপ্রিয় মানুষদের ওপর আক্রমণ প্রতিহত করা; দ্বিতীয়ত, অসংগঠিত এই সব ভূখণ্ডের বাইরে থেকে কোনও দেশের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা। কমিশন এই ঘটনাগুলি মনে রেখেছিল, যে ১৮৫০ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত স্বাধীন উপজাতিদের আক্রমণ হয়েছে ৭২ বার অর্থাৎ বছরে গড়ে একবার এবং অসংগঠিত ভূখণ্ডের বাইরে থেকে, বহু যুগ ধরে ভারতের অখণ্ডতা বিপন্ন হয়েছে অসংখ্যবার। এই ভূখণ্ডগুলি, কমিশনের মতে, লীগ অফ নেশন্‌সের সদস্য নয়, সেজন্য আগের চেয়েও এটি ভারতের পক্ষে বেশি বিপজ্জনক। কমিশন এই পরিপ্রেক্ষিতে, একটি

বিষয়ে জোর দিয়েছে। সেটি হল, এই দুটি ঘটনা ভারতের সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এক অদ্ভুত সমস্যার সৃষ্টি করেছে, এবং এই সমস্যার গভীরতা ও ব্যাপকতা বিচার করলে সাম্রাজ্যের অন্য কোথাও এর নজির পাওয়া যায় না।–স্বায়ত্ত শাসন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই অবস্থা প্রতিকূল, যা স্বয়ং শাসিত অন্য কোনও রাজ্যে একেবারেই অনুপস্থিত।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কমিশন বলেছে :

'ভারতীয় সেনাবাহিনী শুধুমাত্র বহিরাক্রমণের মোকাবিলা করার জন্যই গঠিত হয়নি। স্থায়ী অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা ও পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রেও সারা ভারতে নিয়মিত ভাবে এই বাহিনীকে ব্যবহার করা হয়। অন্য কোনও দেশে সামরিকবাহিনীকে এইভাবে নিয়োগ করা হয় না। কিন্তু ভারত একটি ব্যতিক্রমী দেশ। এখানে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা প্রতিহত করতে ও শান্তি ফিরিয়ে আনতে বার বার সামরিকবাহিনীকে কাজে লাগানো হয়। সুসংগঠিত হলেও পুলিশবাহিনী ধর্মীয় উন্মাদনায় তাড়িত বিশৃঙ্খল জনতার আকস্মিক বিস্ফোরণ সামলাবে, এমন আশা করা যায় না। সেজন্য ভারতে এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার যে, পুলিশ ও সামরিকবাহিনী উভয়কেই পাঠাবার প্রয়োজন হতে পারে কোনও কোনও ক্ষেত্রে। অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা বা পুনরুদ্ধারের কাজে সেনাবাহিনীর ব্যবহার কমার পরিবর্তে ক্রমশ বেড়েই চলেছে, এবং সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে সর্বজনীন অনুরোধ করা হয় ব্রিটিশবাহিনীর জন্য। এই শতাব্দীর শেষ ভাগে এই বিশেষ কাজে ভারতীয়বাহিনীর অনুপাতে ব্রিটিশবাহিনীকে কাজে লাগানোর ঘটনা ঘটছে বেশি। এর কারণ অবশ্য এই যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের কিংবা হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতি কোনওরকম পক্ষপাত না দেখিয়ে, ব্রিটিশবাহিনী নিরপেক্ষভাবে কাজ করে। যেহেতু অধিকাংশ বিশৃঙ্খলার কারণ সাম্প্রদায়িক অথবা ধর্মীয়, তাই স্বাভাবিক ও অপরিহার্যভাবে এমন এক কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ দরকার হয়ে পড়ে, যাদের কোনও বিশেষ পক্ষপাত থাকবে না, কোনও বিশেষ পক্ষের দিকে। এটা খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে ভারতীয়বাহিনীতে ব্রিটিশ সৈন্যের অনুপাত সাধারণক্ষেত্রে মাত্র ১ থেকে ২১/২ ভাগ হলেও, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে অবস্থাটি সম্পূর্ণ বিপরীত। এক্ষেত্রে ৭ জন ভারতীয় সৈন্য পিছু ৮ জন ব্রিটিশ সৈন্যকে সংরক্ষিত রাখা হয়'।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই বৈশিষ্ট্যের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে কমিশন বলেছে :

'ভবিষ্যৎ ভারতে বর্তমান সৈন্যবাহিনীর পরিবর্তে দেশরক্ষা ও শান্তি বজায় রাখার কাজে যখন আমরা শুধুমাত্র ভারতীয়বাহিনীকে কাজে লাগানোর কথা ভাবি, যেমন কানাডা ও আয়ারল্যান্ড তাদের নিজস্ব বাহিনীর ওপরই নির্ভর করে তা হলে অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় সমস্যা এবং তার শ্রেণী ও গভীরতা বিচার করতে হবে। শান্তিপ্রিয় সরকারের সমর্থনে ব্রিটিশ সৈন্য দেশে সকলের সন্তুষ্টির মধ্যে যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে তাকেও মনে রাখতে হবে'।

ভারতীয়, সেনাবাহিনীর তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্যের কথা সাইমন কমিশন বলেছে, তা হল, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মানুষরা এই বাহিনীতে আধিপত্য বিস্তার করে আছে। এই আধিপত্যের কারণ এবং এ সম্পর্কে সরকারি ব্যাখ্যাগুলি ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে।

কিন্তু আর একটি বিশেষ দিকে কমিশন আলোকপাত করেনি। হয় তারা এ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল অথবা বিষয়টি এড়িয়ে গেছে। গুরুত্ব এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটি এতই জরুরি যে, কমিশন যে-তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছে, সেগুলি একেবারেই নিষ্প্রভ হয়ে যেতে পারে। এটি এমনই এক বৈশিষ্ট্য, যার ব্যাপক প্রচার হলে মানুষ গভীরভাবে ভাবতে বসবে। এর ফলে কিছু প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে, যেগুলির সমাধান অসম্ভব এবং যেগুলি সহজেই ভারতের রাজনৈতিক প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করবে। সৈন্যবাহিনীর ভারতীয়করণের চেয়েও প্রশ্নগুলির গুরুত্ব ও জটিলতা অনেক বেশি।

এই অবহেলিত বৈশিষ্ট্যটি হল, ভারতীয়বাহিনীতে সাম্প্রদায়িক পরিকাঠামো। ইতিপূর্বে উল্লিখিত প্রবন্ধে মিস্টার চৌধুরি প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই বৈশিষ্ট্যের দিকে যেগুলি প্রচুর আলোকপাত করতে পারে। নিচের ছক থেকে আঞ্চলিক ও সম্প্রদায়গতভাবে নিযুক্ত সৈন্যদের পারস্পরিক অনুপাত দেখানো হয়েছে :

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সাম্প্রদায়িক গঠনের পবিবর্তন

অঞ্চলওসম্প্রদায়	১৯১৪সালে শতকরা হিসাব	১৯১৮সালে শতকরা হিসাব	১৯১৯সালে শতকরা হিসাব	১৯৩০সালে শতকরা হিসাব
১) পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও কাশ্মীর	৪৭	৪৬.৫	৪৬	৫৮.৫
ক) শিখ	১৯.২	১৭.৪	১৫.৪	১৩.৫৭
খ) পাঞ্জাবি মুসলমান	১১.১	১১.৩	১২.৪	২২.৬
গ) পাঠান	৬.২	৫.৪২	৪.৫৪	৬.৩৫
২) নেপাল, কুমায়ুন ও গাড়োয়াল	১৫	১৮.৯	১৪.৯	২২.০
ক) গুর্খা	১৩.১	১৬.৬	১২.২	১৬.৪
৩) উত্তর ভারত	২২	২২.৭	২৫.৫	১১.০
ক) উত্তর প্রদেশের রাজপুত্র	৬.৪	৬.৮	৭.৭	২.৫৫
খ) হিন্দুস্তানি মুসলমান	৪.১	৩.৪২	৪.৪৫	—
গ) ব্রাহ্মণ	১.৮	১.৮৬	২.৫	—
৪) দক্ষিণ ভারত	১৬	১১.৯	১২	৫.৫
ক) মারাঠা	৪.৯	৩.৮৫	৩.৭	৫.৩৩
খ) মাদ্রাজি মুসলমান	৩.৫	২.৭১	২.১৩	—
গ) তামিল	২.৫	২.০	১.৬৭	—
৫) ব্রহ্মদেশ				
ক) বার্মার লোক	—	নগণ্য	১.৭	৩.০

বিশেষত ১৯১৯ সালের পর ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সম্প্রদায়গত কাঠামোর যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে ওপরের ছকটি তা অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করে। এই পরিবর্তনগুলি হল—১) পাঞ্জাবি মুসলমান ও পাঠানদের শক্তির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি, ২) প্রথম থেকে তৃতীয় শক্তিতে শিখদের অবনমন, ৩) রাজপুতদের চতুর্থ স্থানে অবনমন এবং ৪) উত্তর প্রদেশের ব্রাহ্মণ, মাদ্রাজি মুসলমান এবং ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ তামিলদের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি।

১৯৩০ সালের তথ্যগুলিকে মিস্টার চৌধুরি নিচের ছকে ভারতীয়বাহিনীতে সম্প্রদায়গত কাঠামোকে আরও ব্যাখ্যা করেছেন :

১৯৩০ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সাম্প্রদায়িক গঠন

শ্রেণী	অঞ্চল	পদাতিক বাহিনীতে শতকরা হিসাব		অশ্বারোহী বাহিনীতে শতকরা হিসাব
		গুর্খা বাদে	গুর্খা সমেত	
১. পাঞ্জাবি মুসলমান	পাঞ্জাব	২৭	২২.৬	১৪.২৮
২. গুর্খা	নেপাল	—	১৬.৪	—
৩. শিখ	পাঞ্জাব	১৬.২৪	১৩.৫৮	২৩.৮১
৪. জাঠ	রাজপুতানা, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব	৯.৫	৭.৯৪	১৯.০৬
৫. পাঠান	উঃ পঃ সীমান্ত	৭.৫৭	৬.৩৫	৪.৭৬
৬. ডোগরা	উঃ পাঞ্জাব ও কাশ্মীর	১১.৪	৯.৫৪	৯.৫৩
৭. মারাঠা	কঙ্কন	৬.৩৪	৫.৩৩	—
৮. গাড়োয়ালি	গাড়োয়াল	৪.৫৩	৩.৬৩	—
৯. উঃপ্রঃরাজপুত	উত্তরপ্রদেশ	৩.০৪	২.৫৪	—

১০. রাজপুতানার রাজপুত	রাজপুতানা	২.০৮	২.৩৫	—
১১. কুমায়ুনি	কুমায়ুন	২.৪৪	২.০৫	—
১২. গুর্জর	উঃপূঃরাজপুতানা	১.৫২	১.২৮	—
১৩. পাঞ্জাবি	হিন্দু পাঞ্জাব	১.৫২	১.২৮	—
১৪. আহির	ঐ	১.২২	১.০২৪	—
১৫. মুসলমান, রাজপুত ও রণঘর	দিল্লির সংলগ্ন অঞ্চল	১.২২	১.০২৪	৭.১৪
১৬. কইসখানি	রাজপুতানা	—	—	৪.৭৬
১৭. কাচিন	ব্রহ্মদেশ	১.২২	১.০২৪	—
১৮. চিন	ঐ	১.২২	১.০২৪	—
১৯. কারেন	ঐ	১.২২	১.০২৪	—
২০. ঢাকাই মুসলমান	ঢাকা	—	—	৪.৭৬
২১. হিন্দুস্তানি মুসলমান	উত্তর প্রদেশ	—	—	২.৩৮

শুধুমাত্র সম্প্রদায়গুলি বিচার করলে ১৯৩০ সালে আমরা শতকরা হিসাবের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পেতে পারি :

সম্প্রদায়	পদাতিক বাহিনীতে শতকরা হিসাব		অশ্বারোহী বাহিনীতে শতকরা হিসাব
	গুর্খা সমেত	গুর্খা বাদে	
১. হিন্দু ও শিখ	৬০.৫৫	৫০.৫৫৪	৬১.৯২
২. গুর্খা	—	১৬.৪	—
৩. মুসলমান	৩৫.৭৯	২৯.৯৭৪	৩০.০৮
৪ ব্রহ্মদেশীয়	৩.৬৬	৩.০৭২	—

তথ্যগুলি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সাম্প্রদায়িক গঠনের চিত্র তুলে ধরে। মিস্টার চৌধুরির মতে মুসলমানরা পদাতিক বাহিনীর শতকরা ৩৬ ভাগ ও অশ্বারোহী বাহিনীর শতকরা ৩০ ভাগ স্থান দখল করে ছিল। সংখ্যাগুলি অবশ্য ১৯৩০ সালের। এখন আমাদের দেখতে হবে, এই আনুপাতিক হিসাবের কী পরিবর্তন এসেছে।

ভারতের ইতিহাসের একটি রহস্যময় বৈশিষ্ট্য হল ১৯৩০ সালের পর সামরিক বাহিনীর ইতিহাস পাওয়া যায়নি। বর্তমানে ভারতীয়বাহিনীতে মুসলমানদের শতকরা হার কত, এটা কিছুতেই বলা সম্ভব নয়। এমন কোনও সরকারি প্রকাশনাও নেই যার থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। অতীতে এরকম তথ্য সম্বলিত প্রকাশনার অভাব ছিল না। খুবই আশ্চর্যের কথা, সে সব এখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। অথবা যদিও পাওয়া যায়, তাতে এসব কোনও তথ্য থাকে না। সরকারি প্রকাশনার অভাবই শুধু নয়, কেন্দ্রীয় বিধানসভার সদস্যেরা এই প্রশ্ন তুললে, সরকার এ বিষয়ে কোনও তথ্য সরবরাহে আপত্তি জানায়। কেন্দ্রীয় বিধান সভায় কার্যবিবরণী দেখলেই বোঝা যায় সরকার কী প্রবল ভাবে এই তথ্য সংগ্রহে বাধা দিয়েছে।

১৯৩৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর এক বিতর্কে নিম্নলিখত প্রশ্নোত্তরগুলি পর্যালোচনা করা যায় :

ভারতের প্রতিরক্ষা বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা :

প্রশ্ন ১৩৬০ : শ্রী বদ্রী দত্ত পাণ্ডে (অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে)

(ক) .. . .

(খ) .. ..

(গ) .. ..

(ঘ) ১৯৩৭-৩৮ সালে পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীতে কতজন ভারতীয় নিযুক্ত হয়? তাদের মধ্যে কতজনই বা পাঞ্জাবি, শিখ, পাঠান, গাড়োয়ালি, মারাঠা, বিহারি, বাঙ্গালি, যুক্তপ্রদেশের হিন্দুস্তানি এবং গুর্খা?

(ঙ) যদি পাঞ্জাবি, শিখ, পাঠান ও গাড়োয়ালী ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়কে নিযুক্ত না করা হয়, তবে তার কারণ কি বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নিয়োগের পর তাদের উপযুক্ত সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া?

(চ) প্রাদেশিক সরকারগুলিকে প্রাদেশিকবাহিনী গঠন ও প্রশিক্ষণ দেবার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে কি না, প্রতিরক্ষা সচিব দয়া করে জানাবেন কী? অন্যথায়, ভারতের প্রতিরক্ষায় দক্ষ সেনাবাহিনী গঠনে তাঁর পরিকল্পনাই বা কী?

মিঃ সি. এম. জি. অগিলভি :

(ক) মাননীয় সদস্য নিশ্চয় একমত হবেন যে, জনস্বার্থে এরকম ব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা সমীচীন নয়।

(খ) ১৯৩৭-৩৮ সালে ৫ জন ক্যাডেট ও ৩৩ জন ভারতীয় শিক্ষানবিশকে ভারতীয় বিমানবাহিনীতে নিযুক্ত করা হয়।

(গ) ১৯৩৭-৩৮ সালে ৫ জন ভারতীয়কে ইতিমধ্যেই রয়েল ইন্ডিয়ান নেভির কমিশন্ড পদে নিয়োগ করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ৪ জনকে নিয়োগ করা হবে এবং কেবলমাত্র ডাফরিন ক্যাডেটে আরও ৩ জনকে বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। একই সময়ের মধ্যে ৩১৪ জন ভারতীয়কে রয়াল ইন্ডিয়ান নেভির বিভিন্ন নন-কমিশন্ড পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

(ঘ) ১৯৩৮ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে ৫৪ জন ভারতীয়কে ভারতীয় কমিশন্ড অফিসার পদে উত্তীর্ণ করা হয়েছে। তারা এখন ব্রিটিশ ইউনিটের সঙ্গে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে যুক্ত। তাদের মধ্যে কতজনকে পদাতিক বা অশ্বারোহী নেওয়া হবে তা এখনই বলা শক্ত।

একই সময়ের মধ্যে অশ্বারোহী বিভাগে ৯৬১ এবং পদাতিক বিভাগে ৭,৯৭০ জন ভারতীয়কে নিয়োগ করা হয়েছে। সামরিকবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে তাদের শ্রেণীগত হিসাব পাওয়া যায়নি। সারা ভারতের বিভিন্ন নিয়োগ কেন্দ্র থেকে এই হিসাব পাওয়াও যথেষ্ট সময় ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

(ঙ) না।

(চ) প্রশ্নের প্রথম ভাগের উত্তর নঞর্থক, দ্বিতীয় ভাগের উত্তর হল এই যে, ইতিমধ্যেই ভারতে দক্ষ সেনাবাহিনী আছে এবং আর্থিক সংস্থান সাপেক্ষে একে যথাসম্ভব আধুনিক করার চেষ্টা হচ্ছে।

মিঃ এস. সত্যমূর্তি : (গ) ও (ঙ) সংখ্যক উত্তরের ভিত্তিতে আমি কি জানতে পারি, পাঞ্জাবের একটি মাত্র সম্প্রদায় থেকে সেনাবাহিনীর বিরাট অংশ পূর্ণ করা

সম্পর্কে জনগণের বিবৃতির প্রতি সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে কি না? এ সম্পর্কে সরকার কি কিছু চিন্তাভাবনা করেছেন, এবং একটি প্রকৃত জাতীয় সেনাবাহিনী গঠনের প্রশ্নে সমস্ত প্রদেশ ও সম্প্রদায় থেকে নিযুক্তির কথা ভেবেছেন কি, যাতে সব দেশেই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের যে বিপদ আছে তাকে প্রতিহত করা যায়?

মিঃ সি. এম. জি. অগিলভি : এ প্রশ্নের কারণ আমার কাছে বোধগম্য হচ্ছে না। সরকারের কাজে প্রাদেশিকতার বেড়াজাল আদৌ থাকে না। শ্রেষ্ঠ বাহিনী তৈরি করতে যে কোনও প্রদেশ থেকে শ্রেষ্ঠ সৈনিককেই নিতে হয় এবং এ ব্যাপারে জাতীয় চিন্তাকে প্রাদেশিক চিন্তার ঊর্ধ্বে রাখতেই হবে। যেখানেই আমরা শ্রেষ্ঠ সৈনিক পাবো। সেখান থেকেই নেবো, অন্য কোনও জায়গা থেকে নয়।

মিঃ এস. সত্যমূর্তি : আমি কি জানতে পারি, পাঞ্জাব থেকেই বেশি সৈন্য-নিয়োগ করা হচ্ছে কি না এবং আমার প্রদেশের লোকেরা ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে যে সাহসী ত্যাগ স্বীকার করেছে সরকার তা ভুলে গেছেন কি না, এবং মাদ্রাজ-সহ অনেক প্রদেশকেই কি সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি?

মিঃ সি. এম. জি. অগিলভি : মাদ্রাজকে সেনাবাহিনীর বাইরে অবশ্যই রাখা হয়নি। মাদ্রাজিদের বীরত্বপূর্ণ সেবার কথা সরকার আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করেন এবং যেখানেই অভিজ্ঞ লোক পাওয়া গেছে সেখান থেকেই নিয়োগ করা হচ্ছে। প্রাথমিক ক্ষেত্রে, মাইন পাতা ও গোলন্দাজ বাহিনীর কাজে প্রায় ৪৫০০ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে।

মিঃ এস. সত্যমূর্তি : ১২০,০০০ জনের মধ্যে?

মিঃ সি. এম. জি অগিলভি : প্রায়।

মিঃ এস. সত্যমূর্তি : মাদ্রাজের মোট জনসংখ্যা, কেন্দ্রীয় তহবিলে মাদ্রাজের দেয় রাজস্ব এবং সমস্ত প্রদেশ থেকে নিযুক্তির মাধ্যমে জাতীয় সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে এটা কি যথেষ্ট?

মিঃ সি. এম. জি. অগিলভি : শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তাটুকুই আমাদের স্বীকৃতি পায়।

মিঃ এস. সত্যমূর্তি : ভারতীয়বাহিনীতে পাঞ্জাব ছাড়া অন্য কোনও প্রদেশ দক্ষ সৈনিক সরবরাহ করতে পারে না—এরকম সরকারি সিদ্ধান্ত কোন্ পরীক্ষার মাধ্যমে করা হয়েছে জানতে পারি?

মিঃ অগলিভি : অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

ডঃ স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদ : এটা কি সত্য নয় যে, হিসাব পরীক্ষা বিভাগের সমস্ত শাখাগুলি মাদ্রাজিদের কুক্ষিগত এবং শীঘ্রই সরকার মাদ্রাজিদের সংখ্যা এক্ষেত্রে কমিয়ে দিতে চলেছেন?

মিঃ অগলিভি : এরকম প্রশ্ন কেন উঠছে আমি জানি না। তবে কোনও সাম্প্রদায়িক কারণে সরকার যোগ্যতাকে বিসর্জন দেবেন না।

নানা জাতির ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত ভারতীয় রেজিমেন্ট

প্রশ্ন ১০৭৮ : মিঃ অনন্ত শয়নম্ আয়েঙ্গার (মিঃ মানু সুবেদারের পক্ষে)

(ক) শিখ, মারাঠা, রাজপুত, ব্রাহ্মণ ও মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত এবং বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের নিয়ে একটি ভারতীয় রেজিমেন্ট গঠনের কোনও প্রচেষ্টা হয়েছে কি না, মাননীয় প্রতিরক্ষা সচিব জানাবেন কি?

(খ) যদি ঐ প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক হয়, তা হলে এরকম একটি পদক্ষেপ কেন নেওয়া হয়নি, এ সম্পর্কে একটি সরকারি বিবৃতি দেওয়া যেতে পারে কি?

(গ) মাননীয় কম্যান্ডার-ইন-চিফ কি, বিষয়টি নিয়ে মাননীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত আছেন?

(ঘ) মাননীয় সরকার কি অবগত আছেন, যে বিশ্ববিদ্যালয়বাহিনী, বোম্বাই স্কাউটবাহিনী এবং পুলিসবাহিনীতে এরকম জাতি অথবা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে কোনও বিভেদ নেই?

মিঃ সি. এম. জি. অগিলভি :

(ক) না।

(খ) সরকার মনে করেন যে, কোম্পানি এবং স্কোয়াড্রনের মতো সামরিক উপ-কেন্দ্রগুলির সমশ্রেণীভূক্ত হবার মৌলিক অধিকার আছে।

(গ) না। কারণ এইমাত্র বলা হয়েছে।

(ঘ) হ্যাঁ।

মিঃ এস. সত্যমূর্তি : 'সমশ্রেণীভূক্ত' বলতে সরকার কী বোঝাতে চাইছেন জানতে পারি কি? এর অর্থ কি একই প্রদেশ অথবা একই জাতি?

মিঃ সি. এম. জি. অগিলভি : এর অর্থ হল একই শ্রেণীভূক্ত মানুষ।

মিঃ এস. সত্যমূর্তি : বিষয়টির কিছু বিশদ ব্যাখ্যা আশা করতে পারি কি? এর দ্বারা কি এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর পার্থক্য বোঝানো হচ্ছে?

মিঃ সি. এম. জি. অগিলভি : নিশ্চয়।

মিঃ এস. সত্যমূর্তি : কিসের ভিত্তিতে? এটা কি ধর্মীয়, না কি জাতিগত অথবা প্রাদেশিক শ্রেণী?

মিঃ সি. এম. জি. অগিলভি : কোনওটাই না। এটা একটা ব্যাপক জাতিগত শ্রেণী।

মিঃ এস. সত্যমূর্তি : কোন্ শ্রেণীগুলিকে পছন্দ এবং কোন্গুলিকে অপছন্দ করা হচ্ছে?

মিঃ সি. এম. জি. অগিলভি : মাননীয় সদস্যকে আমি সামরিক তালিকাটি দেখতে অনুরোধ করছি।

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নিয়োগ

প্রশ্ন ১১৬২ : মিঃ ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী : প্রতিরক্ষা সচিব বলবেন কি,

(ক) অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়ার তথ্যের ভিত্তিতে ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ তারিখে হিন্দুস্তান টাইমস্ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ হল পাঞ্জাবের শাসক প্রধান মাননীয় স্যার সিকান্দার হায়াৎ খান তাঁর সহযোদ্ধাদের বলেছেন—'সামরিক বাহিনীতে পাঞ্জাবের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ করতে কোনও দেশপ্রেমিক পাঞ্জাবি অবশ্যই চাইবেন না'। এ বিষয়ে সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে কি?

(খ) পাঞ্জাব থেকে অধিকাংশ সৈন্য নিয়োগ করে সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবের আধিপত্য বজায় রাখার নীতি সরকার কি চালিয়ে যাবেন, অথবা জাতি বা প্রদেশ ভিত্তিক চিন্তাধারা বাদ দিয়ে সমস্ত প্রদেশ থেকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করবেন?

মিঃ সি. এম. জি. অগিলভি :

(ক) হ্যাঁ।

(খ) ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ তারিখে মিঃ অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উত্থাপিত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তরে আমি যা বলেছিলাম সে বিষয়ে মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মিঃ এস. সত্যমূর্তি : প্রশ্নটির (ক) অংশের উত্তরের জন্য আমার সম্মাননীয় বন্ধু পূর্ববর্তী উত্তরের উল্লেখ করছেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, এই সভায় এরকম বিবৃতি প্রকাশিত হবার পর সে সব উত্তর দেওয়া হয়নি। আমি কি জানতে পারি পাঞ্জাবের শাসকপ্রধানের উক্তি সরকার পরীক্ষা করেছেন কি না? আমি কি জানতে পারি, বিবৃতির বিপজ্জনক পরিণতি চিন্তা করে সরকার এমন কিছু পদক্ষেপ নেবেন কি, যাতে ভারতীয়সেনাবাহিনীতে প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক আধিপত্যের দাবি তোলা থেকে একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রীকে নিরস্ত করা যায় এবং ভারতীয়বাহিনী যেন প্রথমত ভারতীয় এবং শেষ পর্যন্ত ভারতীয় থাকে?

মিঃ সি. এম. জি. অগিলভি : গত ১৫ সেপ্টেম্বর মাননীয় সদস্যের উত্থাপিত একই প্রশ্নের উত্তরে আমি যা বলেছিলাম। এখনও শুধু তাই বলতে পারি। নিয়োগ সংক্রান্ত সরকারি নীতির কথা বহুবার স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

মিঃ এস. সত্যমূর্তি : নীতিটি হল শ্রেষ্ঠ সৈনিক সংগ্রহ করা। কিন্তু আমি বিশেষত আমার মাননীয় বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করছি, পাঞ্জাবপ্রধানের বিবৃতির পরিণতি সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল কি না। আমি জানতে চাই ভারতীয়বাহিনীতে প্রাদেশিক আধিপত্যের প্রশ্নে কোনও প্রাদেশিক প্রধানের দাবির ভয়াবহ পরিণতির কথা সরকার বিবেচনা করেছেন কি না এবং এ ধরনের ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার মোকাবিলা করতে কোনও ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না।

মিঃ সি. এম. জি. অগিলভি : সরকার এতে কোনও ভয়ঙ্কর পরিণতির সম্ভাবনা আছে বলে মনে করেন না, বরং তার উল্টোটাই মনে করেন।

মিঃ সত্যমূর্তি : সরকার কি তাহলে কোনও প্রাদেশিক অথবা সাম্প্রদায়িক আধিপত্যকে বাঞ্ছনীয় ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেন, একজন দায়িত্বশীল সরকারি ব্যক্তির দ্বারা উচ্চারিত হলেও? তা ছাড়া সরকার কি মনে করেন না, যে এর ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক কলহ ও ঈর্ষা দেশে সামরিক একনায়কতন্ত্র আসতে পারে?

মিঃ অগিলভি : সরকার মনে করেন যে, এইসব অমূলক চিন্তার একটিরও কোনও ভিত্তি নেই।

মিঃ এম. এস. অ্যানি : স্যার সিকিন্দার হায়াৎ খানের বিবৃতিতে যে নীতির কথা আছে, সরকার কি তাকেই মেনে নিয়েছেন?

মিঃ আগিলভি : সরকারি নীতি বহুবার স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

মিঃ এম. এস. অ্যানি : সেটা কি এই নীতি যে, সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবের আধিপত্য থাকবে?

মিঃ অগিলভি : সেটা এই নীতি যে, শ্রেষ্ঠ সৈনিককে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হবে।

মিঃ এম. এস. অ্যানি : আমি প্রশ্নটি আবার করছি। সরকারের কি এটাই নীতি যে, সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবের আধিপত্যই থাকবে?

মিঃ অগিলভি : আমি বারবার সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। এ বিষয়ে নীতি হল, সমস্ত প্রদেশ থেকে শ্রেষ্ঠ সৈনিকদের নিয়োগ করা এবং সরকার নিশ্চিত যে, বর্তমান বাহিনীতে সেই সব শ্রেষ্ঠ সৈনিকরাই আছেন।

মিঃ এম. এস. অ্যানি : সুতরাং স্যার সিকান্দার হায়াৎ খান যে নীতির কথা বলেছেন তা সংশোধন করা কি সরকারের উচিত নয়?

মিঃ অগিলভি : সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছেন তার পরিবর্তনের কোনও ইচ্ছা সরকারের নেই।

১৯৩৮ সালের ২৩ নভেম্বর এরকম আরও একটি বিতর্ক হয়েছিল যখন নিম্নলিখিত প্রশ্নটি সভায় উত্থাপিত হয় :

যুক্তরাজ্য ও বেরার থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নিয়োগ

প্রশ্ন ১৪০২ : মিঃ গোবিন্দ ভি. দেশমুখ : প্রতিরক্ষা সচিব কি দয়া করে জানাবেন :

(ক) ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নিয়োগের কেন্দ্রগুলি যুক্তরাজ্য ও বেরারে কোথায় আছে;

(খ) কোন্ কোন্ শ্রেণী থেকে এইসব লোক নিয়োগ করা হয়;

(গ) সেনাবাহিনীর মোট সৈন্যসংখ্যা ও এইসব প্রদেশের মোট জনসংখ্যার সঙ্গে

যুক্তরাজ্য ও বেরারের লোক, যাদের বাহিনীতে নিয়োগ করা হয়, তার অনুপাত কত;

(ঘ) বর্তমানে নিয়োগের নীতি কী এবং এই নীতির কোনও পরিবর্তন হচ্ছে কি না? যদি না হয়, তবে কেন হচ্ছে না?

মিঃ সি. এম. জি. অগিলভি :

(ক) যুক্তরাজ্য ও বেরারে এরকম কোনও নিয়োগ কেন্দ্র নেই। যুক্তরাজ্যের অধিবাসীরা দিল্লির এবং বেরারের অধিবাসীরা পুনার নিয়োগকারী অফিসারের অধীনে বাস করেন।

(খ) বেরারের মারাঠাদের আলাদা শ্রেণী হিসাবে নিয়োগ করা হয়। যুক্তরাজ্য ও বেরার থেকে নিযুক্ত অন্য লোকদের 'হিন্দু' ও 'মুসলমান' ছাড়া অন্য কোনও শ্রেণীতে ভাগ করা হয় না।

(গ) সেনাবাহিনীর সঙ্গে এর অনুপাত শতকরা ·০৩ ভাগ এবং এইসব রাজ্যের মোট পুরুষ জনসংখ্যার সঙ্গে এর অনুপাত শতকরা ·০০০৪ ভাগ।

(ঘ) বর্তমানে নীর্তি পরিবর্তনের কোনও ইচ্ছা সরকারের নেই। ১৯৩৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর মিঃ সত্যমূর্তি উত্থাপিত ১০৬০ নং তারকাখচিত প্রশ্নের উত্তরে আমি এর উত্তরগুলি জানিয়েছি। তা চাড়া মিঞা গোলাম কাদির মহম্মদ শাবান উত্থাপিত একই তারিখের ১০৮৬ নং তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের (ক) অংশের উত্তরে, ১৯৩৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভারতীয়দের সামরিক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে মাননীয় মিঃ সুশীলকুমার রায় চৌধুরির রাজ্য সভায় আনীত প্রস্তাবের উপর বিতর্ক প্রসঙ্গে মাননীয় কম্যান্ডার-ইন-চিফের উত্তরে, এবং ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সমস্ত সম্প্রদায়ের নিয়োগ সংক্রান্ত মাননীয় মিঃ পি. এন. সাপ্রুর প্রস্তাবে এর উত্তর দেওয়া আছে।

এরপর ১৯৩৯ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি যখন নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তখন আবার বিতর্কের ঝড় ওঠে :

ভারতীয় বাহিনীতে নিয়োগ

প্রশ্ন ১২৯ : মি এস. সত্যমূর্তি : প্রতিরক্ষা সচিব কি দয়া করে জানাবেন :

(ক) এ প্রশ্নের উত্তরে সরকারের বক্তব্য শেষবারের মতো দেবার পর সমস্ত

প্রদেশ এবং সমস্ত জাতি ও সম্প্রদায় থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার কিছু পুনর্বিবেচনা করেছেন কি না;

(খ) এ বিষয়ে তাঁরা কোনও সিদ্ধান্তে এসেছেন কি না,

(গ) সেনাবাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্য প্রদেশ ও সম্প্রদায়কে কেন অনুমতি দেওয়া হবে না তার সুনির্দিষ্ট কারণ সরকার জানাবেন কি না; এবং

(ঘ) বর্তমানে যে প্রদেশ থেকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হচ্ছে, সে প্রদেশ ছাড়া অন্য প্রদেশ বা সম্প্রদায়ের মানুষকে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ্যতার কোন্ মানের নিরিখে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হচ্ছে?

মিঃ সি. এম. জি. অগিলভি :

(ক) না।

(খ) প্রশ্নই নেই।

(গ) এবং (ঘ) ১৯৩৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ১০৬০ নং তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন, ২৩ নভেম্বর ১৯৩৮-এর ১৪০২ নং প্রশ্ন, রাজ্যসভায় সম্মাননীয় মিঃ পি. এন. সাপ্রুর প্রস্তাবের উপর বিতর্ক মাননীয় কম্যান্ডার-ইন-চিফের উত্তর এবং ১৩ মার্চ ও ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮ তারিখে ভারতীয়দের সামরিক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে মিঃ সুশীলকুমার রায় চৌধুরির প্রস্তাবে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে।

অতি সম্প্রতি ভারতের রাজ্য সচিব এই প্রসঙ্গে ভারত সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক নীরবতা ভঙ্গ করেছেন। কমন্স সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে এরকম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তেজনাপূর্ণ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য তিনি পেশ করেছেন। ১৯৪৩-এর ৮ জুলাই তাঁর উত্তর থেকে ভারতীয় বাহিনীর বর্তমান সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক গঠন আমরা এরকম জানতে পারি :

১. ভারতীয় সেনাবাহিনীতে প্রাদেশিক গঠন

	প্রদেশ	শতকরা ভাগ		প্রদেশ	শতকরা ভাগ
১	পাঞ্জাব	৫০	৭	বাংলা প্রেসিডেন্সি	২
২	উত্তর প্রদেশ	১৫	৮	যুক্তরাজ্য ও বেরার	—
৩	মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি	১০	৯	আসাম	৫
৪	বোম্বাই প্রেসিডেন্সি	১০	১০	বিহার	—
৫	উঃ পঃ সীমান্ত অঞ্চল	৫	১১	উড়িষ্যা	—
৬	আজমেঢ় ও মারোয়াড়	৩	১২	নেপাল	৮

২. ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাম্প্রদায়িক গঠন

১	মুসলমান	৩৪%
২	হিন্দু ও গুর্খা	৫০%
৩	শিখ	১০%
৪	খ্রিশ্চান ও অন্যান্য	৬%

রাজ্যসচিবের পেশ করা তথ্য নিশ্চয় অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু এটা হল যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর গঠন। শান্তির সময় অবশ্যই গঠন অন্য রকম হবে। সামরিক ও অসামরিক জাতির বহু আলোচিত পার্থক্যটির উপর তা নির্ভর করবে। যুদ্ধের সময় এরকম পার্থক্যের বিলোপ সাধন করা হয়। কিন্তু বর্তমানে শান্তি ফিরে আসার জন্য এর পুনরুজ্জীবন ঘটানো হবে না, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। আমাদের জ্ঞাতব্য হল শান্তির সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর গঠন। এখনও সেটি একটি অজ্ঞাত ও অনুমানের বিষয়।

কেউ কেউ বলেন, যুদ্ধ-পূর্ব স্বাভাবিক অবস্থায় মুসলমানদের অনুপাত ছিল ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ। আবার কেউ এটিকে ৫০ শতাংশের কাছাকাছি ভাবেন। সঠিক তথ্যের অভাবে প্রকৃত অবস্থা জানতে পরের সংখ্যাটিকেই গ্রহণীয় মনে করা যেতে পারে, কারণ বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বেরা অনুসন্ধানের সময় এরকম তথ্যই পেয়েছেন। যদি এটা ৫০ শতাংশও হয়ে থাকে,

তবে হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা অবশ্যই আশঙ্কার কারণ। যদি এই হিসাব সত্য হয়, তবে তা হবে মহাবিদ্রোহের পর ভারতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সুপ্রতিষ্ঠিত নীতির গুরুতর লঙ্ঘন।

মহাবিদ্রোহের পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর সংগঠন সম্পর্কে তদন্তের জন্য ব্রিটিশ সরকার দুটি আদেশ জারি করেছিলেন। ১৮৫৯ সালে পীল কমিশন (Peel Commission) প্রথম তদন্তটি পরিচালনা করেন। ১৮৭৯ সালে গঠিত বিশেষ সেনা কমিটি, যার সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে, দ্বিতীয় তদন্তটি পরিচালনা করেন।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের কারণ হিসাবে বাঙালি সৈনিকদের দুর্বলতাই ছিল পীল কমিশনের বিবেচ্য বিষয়। পীল কমিশনকে একের পর এক সাক্ষী বাঙালি সৈনিকদের দুর্বলতা সম্পর্কে যে তথ্য দেন তা হল—

'নিয়মিত বাহিনীতে মানুষ এলোমোলো মিশে দাঁড়িয়ে থাকত, পাছে সুযোগ চলে যায়। কোম্পানির মধ্যে শ্রেণী বা জাতিভেদে কোনও পৃথক ব্যবস্থা ছিল না। লাইনে হিন্দু, মুসলমান, শিখ এবং পুরবিয়ারা মিলে মিশে দাঁড়িয়ে থাকত। ফলে প্রায় সকলেই জাতিগত কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে একটি সাধারণ ভাবাবেগে অনুপ্রাণিত হত'।*

তাই স্যার জন লরেন্স প্রস্তাব করলেন যে, 'ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠনের সময় যে-বৈষম্য এত গুরুত্বপূর্ণ তাকে সুরক্ষা করতে হবে। যত দীর্ঘস্থায়ী হবে এই বৈষম্য, তত এক দেশের মুসলমান অন্য দেশের মুসলমানকে ঘৃণা, ভয় ও অপছন্দ করবে। ভবিষ্যতে বাহিনীগুলিকে প্রাদেশিক করতে হবে এবং ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে হবে। যার মধ্যে থাকবে তীব্র বৈষম্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। একটি প্রদেশের হিন্দু-মুসলমানদের একটি রেজিমেন্টে রাখা হোক, অন্য কোনও প্রদেশের নয়। প্রয়োজনের মুহূর্তে আমাদের এভাবেই তৈরি হতে হবে... এই পদ্ধতিতে দুটি সমস্যা দূর করা যাবে। প্রথমত, দেশীয় সৈনিকদের মধ্যে সমষ্টিগত একতা দূর করা যাবে; দ্বিতীয়ত, সংঘবদ্ধতার ফলে, যে ক্ষতিকর কার্যকলাপ ও ঐক্যবোধ অন্যান্য জাতির মধ্যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে, তাকেও প্রতিহত করা যাবে'।✢

পীল কমিশনের সামনে সামরিক বাহিনীর অনেক মানুষ এই প্রস্তাব সমর্থন

---

* 'দি আর্মিস্ অব্ ইন্ডিয়া', পৃ : ৮৪-৮৫; চৌধুরি কর্তৃক উদ্ধৃত।

✢ চৌধুরি যেমন উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

করে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে এটিকেই নীতি হিসাবে কার্যকর করার সুপারিশ করেন। এই নীতি শ্রেণী বিন্যাসের নীতি নামে পরিচিত।

১৮৭৯ সালে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ সামরিক কমিটিকে উদ্বেগের মধ্যে পড়তে হয়। কমিটির প্রশ্নমালা থেকে সমস্যাটি জানা যাবে। প্রশ্নমালাতে যে প্রশ্ন ছিল তা হল :

'যদি সাম্রাজ্যের নিরপত্তার প্রশ্নে দক্ষ ও সুলভ ভারতীয় সৈনিক প্রয়োজন বলে বিবেচিত হয়, তবে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ কোনও দুর্বল জাতি বা ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই, দেশের সেই সব অংশ থেকে সৈন্য নিয়োগ কি উচিত হবে না, যেখানকার অধিবাসীরা শ্রেষ্ঠ সেনানী উপহার দিতে পারবে?'

এই প্রশ্নের প্রধান অংশটি স্পষ্টতই 'কোনও বিশেষ জাতি বা ধর্মবলম্বীদের' খুব বেশি গুরুত্ব অথবা প্রাধান্য দেবার প্রয়োজনীয়তা আছে কিংবা নেই। এই প্রশ্নে কমিটির সামনে সরকারি মতামতটি ছিল সর্বসম্মত।

বোম্বাই সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধান লেফটেনান্ট জেনারেল এইচ. জে. ওয়ারেশ বলেন :

'এই দেশের সব জাতি ও ধর্মের প্রতি অযথা হলেও গুরুত্ব ও প্রাধান্য না দিয়ে ভারতের যে সব অংশ থেকে শ্রেষ্ঠ সৈনিক পাওয়া যায় বলে বলা হয়, একমাত্র সেই সব অংশ থেকেই ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নিয়োগ সম্ভব বলে আমি মনে করি না'।

সেনাপ্রধান স্যার ফ্রেডরিক পি. হেইন্স্ বলেছিলেন :

'বাংলার বাহিনীতে জাতি, ভাষা ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের স্পষ্ট অস্তিত্বের প্রেক্ষিতে আমার মতে এই বাহিনীগুলিকে (মাদ্রাজ ও বোম্বাই বাহিনী) ভারসাম্য হিসাবে বজায় রাখা সব চেয়ে রাজনৈতিক ও বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত। শ্রেষ্ঠ সৈনিকদের নিয়ে বাহিনী গঠন করা হবে বলে আমি তাদের শক্তিকে কোনওভাবেই তুচ্ছ ভাবি না। এই বিশেষ বাহিনী গঠন মানে যদি এই হয়, যে বাংলাবাহিনী থেকে এক-ই পদ ও শ্রেণী থেকে উন্নীত একদল সৈনিক এনে মাদ্রাজ এবং বোম্বাই বাহিনীর সিপাহিদের বাদ দেওয়া হবে, তবে আমি বলব, এত বড় অবিবেচক ও অরাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আর হবে না'।

পঞ্জাবের লেফটেনান্ট গভর্নরও এই মতই পোষণ করেছেন। তিনিও ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারতের সমস্ত সৈনিকদের জন্য একটি মাত্র নিয়োগ কেন্দ্রের তিনিও

বিরোধী। তাঁর কথায় 'রাজনৈতিক কারণে একটি জাতির আধিপত্য বন্ধ করা দরকার'।

বিশেষ সামরিক কমিটি এই মত গ্রহণ করেন এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর গঠন এমন হওয়া উচিত বলে সুপারিশ করেন, যাতে সেনাবাহিনীতে কোনও একটি সম্প্রদায় অথবা জাতির প্রাধান্য না থাকে।

ভারতীয় সেনাবাহিনী নীতির এগুলিই ছিল নির্দেশাত্মক নীতি। ১৮৭৯ সালের বিশেষ সামরিক কমিটির সুপারিশ করা নীতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ভারতের সেনাবাহিনীর সাম্প্রদায়িক গঠনে একটা সার্বিক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন করা হয়। এই বিরাট পরিবর্তন কিভাবে ঘটতে দিতে হল, তা কল্পনারও অতীত। দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি নীতির বিরুদ্ধে ছিল এই পরিবর্তন। ভারতীয় বাহিনীতে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মানুষদের প্রাধান্যের ক্রমবৃদ্ধির ভয় এবং এই প্রবণতাকে উচ্ছেদ করার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই নীতি সুপারিশ করা হয়। শুধু নির্দেশিকা হিসাবে নয়, এই নীতিকে কার্যকর করা হয় অত্যন্ত কঠোরভাবে। ভারতের সেনাপ্রধান লর্ড রবার্টস যিনি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে তাঁর অনুগত লোকদের নিযুক্ত করতেন, তাঁকেও বাধ্য হয়ে এই নীতিকেই নতমস্তকে মেনে নিতে হয়। এই নীতি এত বেশি সমর্থন পেয়েছিল যে, যখন ১৯০৩ সালে লর্ড কিচেনার পনেরোটি মাদ্রাজি রেজিমেন্টকে পঞ্জাব রেজিমেন্টে রূপান্তরিত করতে উদ্যোগী হন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি গুর্খা ও পাঠানদের অনুপাত বাড়িয়ে শিখ ও পঞ্জাবি মুসলমানদের মধ্যে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনেন। তাঁর জীবনীকার স্যার জর্জ আর্থারের কথায় :

'মহাবিদ্রোহের শিক্ষা মনে রেখে সরকার ভারতীয় বাহিনীতে একটি মাত্র উপাদানের অযথা অস্তিত্বের বিপদ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন। পঞ্জাববাহিনীতে সৈন্য বৃদ্ধির অর্থ হবে মূল্যবান গুর্খা বাহিনীতেও আরও সৈন্য নিয়োগ করা এবং সীমান্তবর্তী বাহিনীতে আরও পাঠানের সংখ্যা বাড়ানো'।

মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত এই নীতি এত সর্বসম্মত সমর্থন ও কঠোরভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে ধরে রাখা হল, যে মহাযুদ্ধের পর সেই নীতি বিনা অনুষ্ঠানে, বিনা অনুশোচনায়, অত্যন্ত গোপনে কিভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল তা সত্যিই চিন্তার বাইরে। ভারতীয় বাহিনীতে মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে ব্রিটিশ সরকার এত আগ্রহী হলেন কেন? সম্ভাব্য দুটি ব্যাখ্যার উল্লেখ করা যায়। এক, মহাযুদ্ধে মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে সৈনিক হিসাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিল। দুই, তাঁদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার ব্যাপারে হিন্দুদের আন্দোলনকে প্রতিহত করতে ব্রিটিশ সরকার প্রচলিত নিয়ম ভেঙে সেনাবাহিনীতে মুসলমান প্রাধান্য সৃষ্টি করে।

ব্যাখ্যা যাই হোক, এই ঘটনা দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রকাশ করে। একটি হল, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আজ মুসলমানদের প্রাধান্য। অন্যটি হল, আধিপত্যের অধিকারী এই মুসলমানেরা এসেছেন পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এরকম গঠনের অর্থ হল, পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের মুসলমানরাই বহিরাক্রমণ থেকে ভারতকে রক্ষার একমাত্র দায়িত্বে আছেন। ঘটনাটি এত বেশি প্রকাশ্যে ঘটেছে যে ঐ অঞ্চলের মুসলমানদের মনে তাঁদের ওপর দায়িত্বপূর্ণ গর্বের কাজ অর্পণ করার জন্য যথেষ্ট আত্মসচেতন হয়েছেন। এই কাজের এরকম অর্পণ কেন করা হল, তা ব্রিটিশরাই ভালো জানেন। মুসলমানদের প্রায়-ই বলতে শোনা যায় যে, তাঁরা হলেন ভারতের 'দ্বাররক্ষক'। এই বিপজ্জনক ঘটনার আলোকে হিন্দুদের অবশ্যই ভারতের প্রতিরক্ষার সমস্যাটিকে বিবেচনা করতে হবে।

ভারতের স্বাধীনতা সংরক্ষণে এই সব 'দ্বাররক্ষক'দের প্রতি হিন্দুরা কতটা নির্ভর করতে পারে? উত্তর নির্ভর করবে কে এই দ্বার ভাঙতে আসবে, তার ওপর। এটা খুবই স্পষ্ট যে, ভারতের সীমান্তরেখা স্পর্শ করেছে যে রাশিয়া এবং আফগানিস্তান, উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এই 'দ্বার' ভাঙার ক্ষেত্রে তারাই হল দুটি সম্ভাব্য বৈদেশিক শক্তি। তাদের মধ্যে কে কখন ভারত আক্রমণ ক'রে বসবে এ কথা কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না। যদি রাশিয়া থেকে আক্রমণ আসে, তাহলে অবশ্য আশা করা যায় যে, এই সব ভারতের 'দ্বাররক্ষকেরা' অত্যন্ত একনিষ্ঠ ও অনুগতভাবে আক্রমণকারীকে হঠিয়ে দিয়ে দ্বাররক্ষা করবে। কিন্তু ধরা যাক, আফগানিস্তান একাই কিংবা অন্য কিছু মুসলমান রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভারত অভিযান করল। এই দ্বাররক্ষকেরা তখন কি আক্রমণকারীদের বাধা দেবেন, না কি দ্বার মুক্ত করে দিয়ে তাদের আমন্ত্রণ জানাবেন? প্রশ্নটি কোনও হিন্দুর পক্ষে আগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। এর সদুত্তর হিন্দুদের পেতেই হবে, কারণ প্রশ্নটি অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনেকে বলতে পারেন যে, আফগানিস্তান ভারত আক্রমণের কথা কোনদিন চিন্তাই করবে না। কিন্তু নিকৃষ্টতম পরিস্থিতিকে একটি নীতি কিভাবে মোকাবিলা করতে পারে, তা পরীক্ষা করার পর তবেই নীতিটির যাথার্থ্য স্বীকার করা যায়। আফগানদের আক্রমণের সম্ভাব্য ক্ষেত্রে এইসব পঞ্জাবি ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের মুসলমানরা কেমন আচরণ করতে পারেন তা বিবেচনা করেই এদের আনুগত্য ও বিশ্বাসযোগ্যতা পরীক্ষা করতে হবে। চূড়ান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গেলে এই প্রশ্নটির উত্তর পেতেই হবে—তাঁরা তাঁদের জন্মভূমি অথবা ধর্ম—কার

আবেদনে সাড়া দেবেন? ভারত যতদিন ব্রিটিশদের অধীনে আছে, ততদিন বহিরাক্রমণ সম্পর্কে বিরক্তিকর ও অস্বস্তিকর প্রশ্নগুলি এড়িয়ে গেলেই তো হয়—এরকম চিন্তা কিন্তু মোটেই নিরাপদ নয়। এরকম আত্মসন্তুষ্টি অমার্জনীয়। প্রথমত, গত যুদ্ধে দেখা গেছে, এমন পরিস্থিতি আসতে পারে যখন গ্রেট ব্রিটেন ভারতকে রক্ষা করতেই পারবে না, যদিও সেই মুহূর্তে ভারতের পক্ষে সেটাই জরুরি। দ্বিতীয়ত, একটি প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা পরীক্ষিত হওয়া উচিত স্বাভাবিক অবস্থার ভিত্তিতে, কোনও কৃত্রিম অবস্থার মধ্যে নয়। ব্রিটিশের অধীনে থেকে ভারতীয় সৈনিকের ব্যবহারটি কৃত্রিম। যখন সে ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকবে তখনই তার আচরণ হবে স্বাভাবিক। সেনাবাহিনীতে স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি এবং মানুষের প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতিকে ব্রিটিশরা খুব একটা গুরুত্ব দেয় না। এজন্যই সৈনিকেরা এত ভালো আচরণ করে। কিন্তু এটি একটি কৃত্রিম অবস্থা, মোটেই স্বাভাবিক নয়। ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে ভালো আচরণ করছে বলে ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণেও তারা ভালো ব্যবহার করবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হলেও তারা এমন ব্যবহার করবে কি না এ ব্যাপারে হিন্দুদের নিশ্চিত হতে হবে।

যত অপ্রিয়ই হোক না কেন, যদি আফগানিস্তান ভারত আক্রমণ করে, তা হলে এই সব পঞ্জাবি এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের মুসলমানরা কি রকম আচরণ করবে—এই প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির মুখোমুখি আমাদের হতেই হবে।

কেউ কেউ বলতে পারেন—সেনাবাহিনীতে বিশাল অনুপাতে মুসলমান আছে, এই তথ্যটিকে অপরিবর্তনীয় বলে ধরাই বা হচ্ছে কেন, এটা তো পরিবর্তনও করা যায়। যাঁরা পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন, তাঁদের স্বাগত জানানো হচ্ছে। কিন্তু যা দেখা যাচ্ছে, এটা পরিবর্তন হচ্ছে না। অন্যদিকে, আমি বিস্মিত হব না, যদি সংবিধান সংশোধনের সময় এটিকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। মুসলমানরা এরকম দাবি অবশ্যই তুলবে, এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানেরা যে কোনও ভাবেই হোক, সব সময় সাফল্য পায়। সুতরাং আমরা এই ধারণার উপর নির্ভর করেই আলোচনা চালিয়ে যাবো যে, ভারতীয় বাহিনীর সাংগঠনিক রূপটি বর্তমানের মতই থাকবে। পরিস্থিতি যদি এক-ই থাকে, তা হলে সেই একই প্রশ্ন— আফগানিস্তানের আক্রমণ হলে তা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে হিন্দুরা এই বাহিনীর ওপর নির্ভর করতে পারে কি? কেবলমাত্র তথাকথিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা এর উত্তরে সম্মতি জানাবেন। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে সব চেয়ে সাহসী বাস্তববাদীকেও থমকে গিয়ে চিন্তা করতে হবে। বাস্তববাদী অবশ্যই

মনে রাখবেন যে, মুসলমানরা হিন্দুদের 'বিধর্মী' বা 'কাফের' বলে মনে করে, যাদের রক্ষা নয়—ধ্বংস করাই হল আসল কাজ। বাস্তববাদীকে আরও মনে রাখতে হবে যে, ইউরোপীয়দের উৎকৃষ্ট জাতি ভাবলেও হিন্দুদের তারা নিকৃষ্ট মনে করে। হিন্দু আধিকারিকদের নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে হলে মুসলমানবাহিনী তাঁদের কর্তৃত্ব কতটা মেনে নেবে, এটা খুব-ই সন্দেহজনক। বাস্তববাদী আরও মনে রাখবেন যে, সমস্ত মুসলমানের চেয়ে উত্তর-পশ্চিম অংশের মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে সব চেয়ে বেশি সম্পর্ক বিহীন। তাঁকে আরও মনে রাখতে হবে, যে প্যান-ইসলামির প্রচারের ব্যাপারে পঞ্জাবি মুসলমানরা যথেষ্ট স্পর্শকাতর। এত সব বিচার বিবেচনা করে নিঃসন্দেহে বলা যায়, একমাত্র একজন অতি-সাহসী হিন্দুই বলবেন যে, মুসলমান দেশ ভারত আক্রমণ করলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মুসলমানেরা অনুগত থাকবে এবং আক্রমণকারীদের পক্ষে তাদের যাবার কোনও বিপদই আসবে না।

এমন কি ১৮৯৯ সালে থিওডর মরিসন* এরকম মন্তব্য করেন :

'ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে আগ্রাসী ও নৃশংস মুসলমানদের অভিমত স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠাকে অসম্ভব করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। উত্তর দিক থেকে আফগানরা যদি স্বশাসিত ভারতের বুকে নেমে আসে, তবে মুসলমানরা শিখ ও হিন্দুদের সঙ্গে একযোগে তাকে ধ্বংস না করে রক্ত ও ধর্মের বন্ধনে তাদের পতাকার নিচেই সমবেত হবে'।

আবার ১৯১৯ সালে ভারতীয় মুসলমানরা খিলাফৎ আন্দোলন পরিচালনা করার সময় আফগানিস্তান-এর আমিরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ পর্যন্ত জানিয়েছিলেন—এ কথা স্মরণ করলে স্যার থিওডর মরিসনের অভিমতকে শুধু অনুমান মনে না করে অসম্ভব শক্তিশালী মনে হয়।

তবে আফগানিস্তান আক্রমণ করলে পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের মুসলমানদের নিয়ে গঠিত এই সেনাবাহিনী কি রকম আচরণ করবে, এটাই হিন্দুদের কাছে একমাত্র প্রশ্ন নয়। সমান গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি প্রশ্ন আছে, যা হিন্দুদের অবশ্যই চিন্তা করতে হবে।

সেই প্রশ্নটি হল : আনুগত্য থাক বা না থাক, এই সেনাবাহিনীকে ভারতীয় সরকার আক্রমণকারী আফগানদের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে কাজে লাগাতে পারবে কি? এই প্রসঙ্গে মুসলিম লীগের ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। মুসলমান

---

* ইম্পিরিয়াল রুল ইন ইন্ডিয়া, পৃ : ৫

শক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীকে ব্যবহার করা হবে না—এই দাবি মুসলিম লীগের আছে। এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। মুসলিম লীগের অনেক আগে খিলাফৎ কমিটিই এই নীতি প্রবর্তন করেছিল। এ ছাড়া ভারতীয় মুসলমানরা ভাবিষ্যতে কতটা বিশ্বস্ত থাকবে সেটাও প্রশ্ন। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে মুসলিম লীগ দাবি আদায় করতে পারেনি বলে ভারতীয় সরকারের কাছ থেকেও পারবে না, এমন কোনও কথা নেই। এরকম সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে যে, হিন্দুদের দিক থেকে ব্যাপারটি যতই দেশবিরোধী হোক, মুসলিম আবেগের সঙ্গে এটি সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ এবং ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের সাধারণ সমর্থনের মাধ্যমে লীগ তাদের দাবির অনুমোদন আদায় করে নিতে পারে। যদি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ ভারতের অধিকারে এরকম সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে সফল হয়, তবে হিন্দুদের অবস্থা কোথায় দাঁড়াবে? এ প্রশ্নটিও হিন্দুদের বিচার করতে হবে।

রাজনৈতিক দিক থেকে ভারত যদি অখণ্ড থাকে এবং পাকিস্তান-সৃষ্ট দ্বি-জাতিতত্ত্বও এক-ই সঙ্গে লালিত হতে থাকে, তবে অন্তত ভারতের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুদের অবস্থা হবে 'জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ'। সামরিক বাহিনীকে লীগের আপত্তির ফলে তাঁরা প্রয়োজন মতো স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারবেন না। আবার ব্যবহার করতে পারলেও এরকম বাহিনী খুব নির্ভরযোগ্য হবে না, কারণ এর আনুগত্যই সন্দেহজনক। অবস্থা নিঃসন্দেহে করুণ ও জটিল। যদি পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের মুসলমানদের প্রাধান্য বাহিনীতে অব্যাহত থাকে, তা হলে হিন্দুদের এজন্য ব্যয়নির্বাহ করতে হবে, অথচ মুসলমান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তাদের ব্যবহার করা যাবে না, কিংবা তাদের ওপর নির্ভর করাও যাবে না। যদি লীগের দৃষ্টিভঙ্গি এরকম থাকে এবং মুসলমান দেশের বিরুদ্ধে ভারত তার বাহিনীকে ব্যবহার করতে না পারে, তা হলে এমন কি সেনাবাহিনীতে যদি মুসলমানদের প্রাধান্য না-ও থাকে, তবু এইসব সামরিক সীমাবদ্ধতার জন্য ভারতকে তার সীমান্তে মুসলমান দেশের সঙ্গে অধীনতামূলক সহযোগিতার নীতি চালিয়ে যেতে হবে, ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতের রাজ্যগুলি যেমন চালাচ্ছে।

নিরাপদ সেনাবাহিনী অথবা নিরাপদ সীমান্ত—যে-কোনও একটিকে কঠিন হলেও বেছে নিতে হবে হিন্দুদের। এই কঠিন কাজে হিন্দুদের কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে? তাদের স্বার্থে তারা কি এটাই দাবি করবে যে মুসলমান ভারত থাক ভারতেরই অংশ, যাতে তারা নিরাপদ সীমান্ত পেতে পারে। অথবা তাদের স্বার্থে তারা এই অংশকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইবে, যাতে তারা নিরাপদ সেনাবাহিনী পেতে পারে? এই অঞ্চলের মুসলমানেরা হিন্দুদের প্রতি বরাবরই

অসহিষ্ণু, এতে কোন সন্দেহ নেই। হিন্দুদের পক্ষে তা হলে কোনটা অপেক্ষাকৃত ভালো? মুসলমানেরা বাইরে থেকে শত্রু থাকবে, অথবা ভিতরে থেকে শত্রু থাকবে? কোনও বোধবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে এ প্রশ্ন করা হলে তিনি একটি উত্তর-ই দেবেন—মুসলমানরা যদি হিন্দুদের বিরোধীই থাকে, তা হলে ভিতরে থাকার চেয়ে তারা বাইরেই থাকুক। বাস্তবিকপক্ষে এটা একটা সম্মিলিত প্রার্থনা যে, তারা বাইরেই থাক। ভারতীয় বাহিনীতে মুসলমান আধিপত্য নষ্ট করার এটাই একমাত্র রাস্তা।

কী করে এটা সম্ভব? এখানেও পথ একটাই এবং তা হল পাকিস্তানের পরিকল্পনাকে সমর্থন করা। পাকিস্তান সৃষ্টি হলে প্রচুর ধনসম্পদ ও জনসম্পদে পূর্ণ হিন্দুস্থান তাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী তৈরি করতে পারবে। কিভাবে কার বিরুদ্ধে এই বাহিনীকে ব্যবহার করা হবে, এ ব্যাপারে কারোর কোনও হুকুম দেবার অধিকার থাকবে না। এর ফলে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য ভারতের প্রতিরক্ষা দুর্বল হওয়া দূরের কথা, বরং অসম্ভব শক্তিশালী হবে।

সেনাবাহিনীর বাইরে রাখার ফলে হিন্দুরা কী রকম অসুবিধা ভোগ করছে, তা বোধ হয় তারা ঠিক বুঝতে পারছে না। তাদের এই কম বুঝার ব্যাপারটা বিস্ময়কর, কারণ তাদের চড়া দামে এই অসুবিধাগুলিই পেতে হচ্ছে।

বর্তমান সেনাবাহিনীর প্রধান নিয়োগ কেন্দ্র পাকিস্তানি অঞ্চলের কিন্তু কেন্দ্রীয় অর্থভাণ্ডারে অবদান অত্যন্ত কম। নিচের ছক থেকে ব্যাপারটি বুঝা যাবে :

কেন্দ্রীয় অর্থভাণ্ডারে অবদান

প্রদেশ		টাকা
পঞ্জাব	...	১,১৮,০১,৩৮৫
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	...	৯,২৮,২৯৪
সিন্ধু	...	৫,৮৬,৪৬,৯১৫
বালুচিস্তান	...	—
	মোট ...	৭,১৩,৭৬,৫৯৪

এবার হিন্দুস্থানের প্রদেশগুলির অবদান কত দেখা যাক :

প্রদেশ		টাকা
মাদ্রাজ	...	৯,৫৩,২৬,৭৪৫
বোম্বাই	...	২২,৫৩,৪৪,২৪৭
বাংলা	...	১২,০০,০০,০০০
যুক্তপ্রদেশ	...	৪,০৫,৫৩,০০০
বিহার	...	১,৫৪,৩৭,৭৪২
মধ্যপ্রদেশ ও বিদর্ভ	...	৩১,৪২,৬৮২
অসম	...	১,৮৭,৫৫,৯৬৭
উড়িশা	...	৫,৬৭,৩৪৬
	মোট ...	৫১,৯১,২৭,৭২৯

দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানি প্রদেশগুলি অবদান নিতান্তই সামান্য। হিন্দুস্থানের প্রদেশগুলি থেকেই বেশির ভাগ রাজস্ব আসে। আসলে হিন্দুস্থানের প্রদেশগুলি থেকে যে অর্থ পাওয়া যায়, তা দিয়েই ভারত সরকারকে পাকিস্তানি প্রদেশগুলিতে কাজকর্ম করতে হয়। হিন্দুস্থানি প্রদেশগুলির কাছে পাকিস্তানি প্রদেশগুলি নিষ্কাশনী নালা মাত্র। তারা শুধু যে কেন্দ্রীয় সরকারকে কম দেয়, তাই নয়—তারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে নেয়ও বেশি। কেন্দ্রীয় সরকারের মোট রাজস্ব প্রায় ১২১ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৫২ কোটি টাকা বছরে খরচ হয় সেনাবাহিনীর জন্য। কোন অঞ্চলে এটা খরচ করা হয়? এই বিশাল অঙ্কের টাকা কে দেয়? পাকিস্তানি অঞ্চলেই এই ৫২ কোটি টাকা খরচ করা হয় মুসলমান সেনাবাহিনী খাতে। আর হিন্দু রাজ্যগুলির দেওয়া এই টাকা খরচ করা হয় এমন বাহিনীর জন্য, যেটি প্রধানত অ-হিন্দু!! কতজন হিন্দু এই শোচনীয় অবস্থা জানেন? কতজন জানেন, কাদের খরচে এই বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হচ্ছে? হিন্দুদের দোষ নেই, কারণ তাঁরা এটাকে আটকাতে পারবেন না। প্রশ্ন হল, তাঁরা এটাকে চলতে দেবেন কি না। বন্ধ করতে হলে একটাই নিশ্চিত উপায়—পাকিস্তান সৃষ্টির পরিকল্পনা মেনে নেওয়া। এর বিরোধিতার অর্থ নিজেদের ধ্বংসকেই ডেকে আনা। নিরাপদ সেনাবাহিনী নিরাপদ সীমান্তের চেয়ে অনেক বেশি ভালো।

অধ্যায় ৬

পাকিস্তান ও সাম্প্রদায়িক শান্তি

প্রত্যেক হিন্দু অবশ্যই প্রশ্ন করবেন— পাকিস্তান কি সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের সমাধান করেছে? সঠিক উত্তর পেতে হলে ঘটনাটির ভিতরে ঢুকে গভীর বিশ্লেষণ করতে হবে। হিন্দু বা মুসলমানরা যে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন নিয়ে কথা বলেন, তার প্রকৃত স্বরূপটি অবশ্য জানা দরকার। অন্যথায়, পাকিস্তান এই প্রশ্নের সমাধান করেছে কি না, তার উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়।

এটা অবশ্য জানা নেই যে, সীমান্তের 'অগ্রবর্তী নীতি'র মত সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর ব্যাখ্যা আছে কি না। ক্ষুদ্রতর অর্থে এটি যা বুঝায়, বৃহত্তর অর্থে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু বুঝায়।

১

সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের ক্ষুদ্রতর অর্থটি নিয়ে শুরু করা যাক। ক্ষুদ্রতর অর্থে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নটি আইনসভায় হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কিত। এই অর্থে প্রশ্নটির মধ্যে দুটি ভিন্ন সমস্যা আছে :

১) বিভিন্ন আইনসভায় হিন্দু ও মুসলমানদের বরাদ্দ আসন সংখ্যা, এবং

২) এই আসনগুলি যাঁরা পূর্ণ করবেন সেই নির্বাচকমণ্ডলীর চরিত্র।

'গোলটেবিল বৈঠকে' মুসলমানরা দাবি করে যে :

১) সমস্ত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় তাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচকমণ্ডলী হবে আলাদা;

২) যে সমস্ত প্রদেশে সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হত, তা অব্যাহত রাখতে হবে এবং তা ছাড়া পঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল এবং বাংলা— যেখানে তারা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে তাদের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন সংখ্যা সুনিশ্চিত করতে হবে।

শুরু থেকেই হিন্দুরা দুটি দাবিতেই আপত্তি তোলে। তারা সমস্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায়, প্রতিনিধিত্বের জন্য জনসংখ্যার অনুপাত গঠনে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি জানিয়ে আইন করে কোনও সম্প্রদায়কে, সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন সংখ্যা পাইয়ে দেওয়া সুনিশ্চিত করার তীব্র বিরোধিতা করেছে।

হিন্দুদের আপত্তির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় মুসলমানদের সমস্ত দাবি মেনে নিয়ে মহামহিম সরকার বাহাদুর খুব সহজ সরলভাবে এই বিবাদের নিষ্পত্তি করলেন। মুসলমানদের জন্য বিশেষ সুযোগ ও স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী এবং যে সব জায়গায় তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল সেখানে তাদের জন্য সুনিশ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের ব্যবস্থা করা হল।

এই বাঁটোয়ারার মধ্যে কোন্ সমস্যা লুকিয়ে ছিল? সরকার বাহাদুরের এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রতিবাদের মধ্যে কতটা তীব্রতা ছিল? প্রতিবাদের সারবত্তাই বা কতটুকু ছিল তা জানতে হলে এই প্রশ্নগুলির উত্তর জানতে হবে।

প্রথমত, প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে মুসলমান সংখ্যালঘুদের বিশেষ সুযোগ দানের বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রতিবাদটি ধরা যাক। সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব ঠিক করার সঠিক মাপকাঠি যাই হোক না কেন, মুসলমান সংখ্যালঘুদের বিশেষ সুযোগ পাবার ব্যাপারে হিন্দুরা কিন্তু আপত্তি করতে পারে না, কারণ যে প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু, সেখানে তাদেরও এক-ই রকম সুবিধা, বরং অনেক বেশি পরিমাণে দেওয়া হয়েছে। সিন্ধুপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ক্ষেত্রে এরকম সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আইন সম্মতভাবে মুসলমানদের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের ব্যবস্থার বিষয়টি ধরা যাক। এর বিরুদ্ধে হিন্দুদের অভিযোগটিও খুব দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয় না। তাত্ত্বিক ও দার্শনিক কারণে সুনিশ্চিত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাটি হয়তো অন্যায় মনে হতে পারে। কিন্তু ভারতের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটিকে অপরিহার্য বলেই মনে হয়। যদি মেনে নেওয়া হয় যে, কোনও সংখ্যালঘুকে প্রতিনিধিত্বের সুবিধা দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত করা হবে এবং তাকে সংখ্যালঘু হতে দেওয়া হবে না, তবে এটা সুনিশ্চিত করতেই তাদের জন্য আইন সম্মতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের ব্যবস্থা করতে হবে। সংখ্যালঘুদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করার মধ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠদের আসনগুলিও নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং আইন সম্মতভাবে

মুসলমানদের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। এক্ষেত্রেও হিন্দুদের দাবির পিছনে খুব একটা জোরালো যুক্তি নেই। কারণ, এমনকি যে সব প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যাগুরু, সেখানেও তারা আইন সম্মত সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়েছে। এক-ই সুযোগ পাবার দরুন সম অবস্থায় হিন্দুদের আর কোনও অভিযোগের অবকাশ স্বভাবতই থাকে না।

তবে হিন্দুদের অভিযোগগুলি দুর্বল হলেও ব্রিটিশ সরকারের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে হিন্দুদের বিরোধিতারও কোনও ভিত্তি নেই, একথা বলা যাবে না। যদিও হিন্দুরা সরকারের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে আক্রমণের মূল বিষয় হিসাবে ব্যবহার করে নি, তবু এই আক্রমণের যথেষ্ট সারবত্তা আছে।

এই প্রতিবাদকে এভাবে সাজানো যেতে পারে। হিন্দু অধ্যুষিত প্রদেশে সংখ্যালঘু মুসলমানরা স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী দাবি করেছিল। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সে দাবি মঞ্জুর করেছে। প্রকৃত অবস্থা হল, সংখ্যালঘু মুসলমানদের সম্মতি ছাড়া পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করা যাবে না, এবং সংখ্যাগুরু হিন্দুদের তাদের সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হবে। মুসলমান প্রদেশগুলিতে সংখ্যালঘু হিন্দুরা যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী দাবি করেছিল। সে দাবি অগ্রাহ্য করে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হল। হিন্দু-অধ্যুষিত প্রদেশগুলিতে নির্বাচকমণ্ডলী নির্ধারণের ব্যাপারে সংখ্যালঘু মুসলমানদের যদি আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকে, তাহলে মুসলমান অধ্যুষিত প্রদেশগুলিতে নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের ব্যাপারে সংখ্যালঘু হিন্দুদের সে অধিকার থাকবে না কেন? কী উত্তর আছে এ প্রশ্নের? উত্তর যদি না থাকে, সরকার বাহাদুরের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মধ্যে তাহলে অবশ্যই গভীর বৈষম্য আছে, যার বিহিত করা প্রয়োজন।

যে সব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু, যেখানে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীভিত্তিক আইন সম্মত সংখ্যাগুরু আসন হিন্দুদের জন্যও আছে, এটা আসলে কোনও উত্তর নয়।* একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে, দুটি ক্ষেত্র অভিন্ন নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু-অধ্যুষিত প্রদেশগুলিতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠন তাদের ইচ্ছাধীন নয়। সংখ্যালঘু মুসলমানদের ক্ষেত্রে কিন্তু পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠন তাদের ইচ্ছাধীন। এক রকম পরিবেশে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভাবতে পারে যে, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ

* হিন্দু নির্বাচকমণ্ডলী বলাটাও সঠিক নয়। একটি সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীতে যারা স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত নয়, তারাও থাকে। কিন্তু যেহেতু সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীতে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে, তাই তাকে হিন্দু নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়।

উপায় এংব এই নির্বাচকমণ্ডলীর উপর ভিত্তি করে আইনসম্মত সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন সুনিশ্চিত করা যায়। অন্য রকম পরিবেশে অন্য এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা আইনসম্মত সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের পরিবর্তে যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীকে আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় বলে ভাবতে পারে। স্পষ্টতই যে নির্দেশাত্মক নীতি সংখ্যালঘুদের প্রভাবিত করবে, তা হল— সংখ্যাগুরুরা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কি সাম্প্রদায়িক কায়দায় এবং সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে? যদি তা হয়, তবে তারা যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী চাইবে, কারণ এই একটি মাত্র উপায়ে তারা আইনসভায় সংখ্যাগুরুদের প্রতিনিধি নির্বাচনকে প্রভাবিত করার আশা করবে। অন্য দিকে, একটি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের যদি সাম্প্রদায়িক স্বার্থে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে ব্যবহার করার ইচ্ছা না থাকে, তা হলে সেই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় নিজের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী চাইতে পারে। আরও পরিষ্কার করে এটা বলা যায়, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী পছন্দের ব্যাপারে সংখ্যালঘু মুসলমানরা হিন্দুদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীকে ভয় করে না, কারণ তারা নিশ্চিত যে জাতি ও বর্ণের দীর্ঘস্থায়ী বৈষম্যের জন্য হিন্দুরা কখনই মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে ব্যবহার করতে পারবে না। অন্য দিকে মুসলমান-অধ্যুষিত প্রদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে, সামাজিক ঐক্যের কারণে মুসলমানরা তাদের আইন সম্মত সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে এক দৃঢ় মুসলমান সরকার গঠনে ব্যবহার করবে। 'হোম রুল' বা স্ব-শাসনের বিকল্প হিসাবে আয়ার্লান্ডে লর্ড সেলিসবেরি যেমন পরিকল্পনা করেছিলেন। তফাত শুধু এই যে, সলিসবেরির 'সুদৃঢ়' সরকারের অস্তিত্ব ছিল মাত্র ২৫ বছর, আর মুসলমান দৃঢ় সরকার যতদিন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা পাওয়া যাবে, ততদিন টিকে থাকবে। অবস্থা, সুতরাং, দুটি ক্ষেত্রে এক নয়। পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ভিত্তিক হিন্দুদের বিধিসম্মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা মুসলমান সংখ্যালঘুদের পছন্দের ওপর নির্ভর করবে। পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ভিত্তিক মুসলমান বিধি সম্মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা কিন্তু হিন্দু সংখ্যালঘুদের পছন্দের ওপর নির্ভর করবে না। এক দিকে মুসলমান সংখ্যালঘুদের সম্মতি নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা সংখ্যালঘু মুসলমান সরকার গড়বে, অন্যদিকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠরা যে সংখ্যালঘু হিন্দু সরকার গঠন করবে, সেখানে হিন্দুদের সম্মতি লাগবে না, বরং ব্রিটিশ সরকার তা জোর করে চাপিয়ে দেবেন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে এই আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত করে বলা যায়, ক্ষুদ্রতর অর্থে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের সমাধান হিসাবে এই বাঁটোয়ারায় কোনও অসাম্য নেই, কারণ হিন্দু-অধ্যুষিত প্রদেশে এই পুরস্কার মুসলমান সংখ্যালঘুদের বিশেষ সুবিধা দেয়, আবার মুসলমান-অধ্যুষিত প্রদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদেরও এরকম সুবিধা দিয়ে

থাকে। একইভাবে বলা যায়, এই বাঁটোয়ারায় কোনও অসাম্য নেই, কারণ যে প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে তাদের আইন সম্মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেওয়া হয়। যদি তেমন কোনও কারণ ঘটে থাকে, তা হলে মুসলমানদের আসন সংখ্যার ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করে হিন্দু-অধ্যুষিত প্রদেশে হিন্দুদের আইন সম্মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলীর ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে এক-ই কথা বলা যাবে না। এক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে অসম আচরণের জন্য এই বাঁটোয়ারাকে বৈষম্যকারী হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের সময় হিন্দু-প্রধান প্রদেশে মুসলমানদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হয়েছে; কিন্তু মুসলমান প্রধান প্রদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের জন্য এই অধিকার দেওয়া হয়নি। হিন্দু-প্রধান প্রদেশে মুসলমান সংখ্যালঘুদের ইচ্ছামত নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সংখ্যাগুরু হিন্দুদের সেখানে কোনও বক্তব্য থাকবে না। কিন্তু মুসলমান প্রদেশগুলিতে সংখ্যালঘু হিন্দুদের কোনও বক্তব্য রাখার অনুমতি না দিয়ে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের ইচ্ছামতো নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মুসলমান প্রদেশে মুসলমানদের আইন সম্মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী দুটিই দেওয়া হচ্ছে আর এর ফলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপরে মুসলমান শাসন চাপিয়ে দিচ্ছে, যাকে হিন্দুরা প্রভাবিতও করতে পারছে না, পরিবর্তনও করতে পারছে না।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার এই দিকটিই মূলত ত্রুটিপূর্ণ। স্বীকার করতেই হবে, ত্রুটিটি মারাত্মক। যে সব রাজনৈতিক মূলনীতিগুলি এখন স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে গণ্য হয়, এটি তাদের বিরুদ্ধে কাজ করে। যেমন প্রথম নীতিটি হল, অবাধ রাজনৈতিক ক্ষমতা যার আছে, তাকে বিশ্বাস না করা। এ সম্পর্কে বলা হয় :

'কোনও রাষ্ট্রে যদি অসীম রাজনৈতিক ক্ষমতা বিশিষ্ট শাসক গোষ্ঠী থাকে, তবে যারা তাদের অধীনে আছে, তারা কখনও স্বাধীন হতে পারে না। ঐতিহাসিক গবেষণায় এটাও প্রমাণিত, অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা যাদের হাতে থাকে, তাদের পক্ষে এই ক্ষমতাই অবশ্যম্ভাবী বিষময় পরিণতি নিয়ে আসে। তারা তাদের মঙ্গলের কামানটি অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয় এবং চূড়ান্তভাবে এই ধারণাই করে থাকে যে তারা ক্ষমতায় থাকলে তবেই জনগণের মঙ্গল হবে। স্বাধীনতা সব সময় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের একটি সীমারেখা দাবি করে'...।

দ্বিতীয় নীতিটি হল, যেমন শাসনকার্যে রাজার কোনও ঐশ্বরিক অধিকার নেই, তেমন-ই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলেরও ঐশ্বরিক অধিকার নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নির্দিষ্ট

সময়ের জন্য পরিবর্তনশীলতার শর্তে সমর্থন করা যায়। তা ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মানে হল রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের চেয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটের কাছেই নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে থাকে অনেক সময়। তা হলে একটি রাজনৈতিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর কর্তৃত্ব করবে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় তাদের ক্ষমতাই যদি এত সীমাবদ্ধ হয়, তবে অন্য সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠের অধীনে সংখ্যালঘুরা কেমন থাকবে? সংখ্যালঘুদের ভোটের কাছে নিজেদের বিকিয়ে না দিয়ে এক সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে যদি অন্য সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘুদের শাসন করতে দেওয়া হয়, বিশেষত, যখন সংখ্যালঘুরা তা দাবি করে, তা হলে তার অর্থ হল গণতন্ত্রের মূলনীতিগুলির বিকৃতি এবং হিন্দু সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার প্রতি চূড়ান্ত অমর্যাদা।

২

এখন বৃহত্তর ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নটির আলোচনা করা যেতে পারে। হিন্দুদের সমস্যাটা কী? বৃহত্তর ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নটি সুচিন্তিতভাবে মুসলমান প্রদেশ সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত। 'লখনউ চুক্তি'র সময় মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক প্রশ্নটি তুলেছিল সঙ্কীর্ণ অর্থে। বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রশ্নটি মুসলমানরা প্রথম তোলে গোলটেবিল বৈঠকে। ১৯৩৫ সালের আইন চালু হবার আগে অধিকাংশ প্রদেশে হিন্দুরা ছিল সংখ্যাগুরু, মুসলমানরা সংখ্যালঘু। মাত্র তিনটি প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু ছিল। এগুলি হল পঞ্জাব, বাংলা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল। এদের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড পরিকল্পনায় রাজনৈতিক সংস্কার না হওয়ায় সেখানে কোনও দায়িত্বশীল সরকার ছিল না। সুতরাং বাস্তব ক্ষেত্রে পঞ্জাব ও বাংলাতেই মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, হিন্দুরা নয়। মুসলমানরা স্বাভাবিক ভাবেই চাইত মুসলমান প্রদেশ আরও বাড়ুক। এই উদ্দেশ্যে তারা বোম্বাই প্রেসিডেন্সি থেকে সিন্ধুপ্রদেশকে বিচ্ছিন্ন করে একটি নতুন স্ব-শাসিত প্রদেশ তৈরি করার এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকেও একটি স্ব-শাসিত প্রদেশ উন্নীত করার দাবি করল। কিন্তু অন্যান্য দিক বাদ দিলেও শুধু অর্থনৈতিক যুক্তিতেই এরকম দাবি মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। সিন্ধুপ্রদেশ* কিংবা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ✢ কোনটিওই আত্মনির্ভর ছিল না। কিন্তু মুসলমানদের দাবি মেটাতে ব্রিটিশ সরকার কেন্দ্রীয়

---

* সিন্ধু বার্ষিক ১,০৫,০০,০০০ টাকা অর্থ সাহায্য পায়।

✢ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ অর্থ সাহায্য পায় ১,০০,০০,০০০ টাকা।

রাজস্ব থেকে সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলকে অর্থ সাহায্যের দায়িত্ব নেন, যাতে আয়-ব্যয়কে (budget) ভারসাম্য এনে দুটি প্রদেশকে অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভর করা যায়।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ও সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিয়ে এই চারটি প্রদেশ, যেগুলি এখন স্ব-শাসিত, সেগুলি অবশ্যই শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য তৈরি হয়নি। মুসলমান ও হিন্দু প্রধান প্রদেশগুলির মধ্যে সমতা আনতেও তৈরি হয়নি। এটাও সত্য যে, সংখ্যাগুরু হিন্দুরা সংখ্যালঘু মুসলমানদের কাছ থেকে যে অপমান সহ্য করছে তার ক্ষতিপূরণের জন্য সেখানকার সংখ্যালঘু হিন্দুরা দাবি তুলে সেখানকার সংখ্যাগুরু মুসলমানদের মনে যে-গর্বের সঞ্চার করছে, তাকে তৃপ্ত করতেও এসব মুসলমান প্রদেশ তৈরি করা হয় নি। তা হলে এগুলি গঠনের উদ্দেশ্য কী? হিন্দুদের মতে এর উদ্দেশ্য হল, আইন সম্মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর জন্য মুসলমান দাবিকে মেনে নিয়ে ঐ সমস্ত প্রদেশে তাদের যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয়ে সাহায্য করা। এ রকম শক্তি সমাবেশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে হিন্দুরা বলে, হিন্দুদের প্রদেশে মুসলমান সংখ্যালঘুরা যাতে অত্যাচরিত না হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য মুসলমান প্রদেশে এরকম অস্ত্র তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনাটির পিছনে ছিল সংরক্ষণের উদ্দেশ্য এবং নীতি ছিল আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত, সন্ত্রাসের বদলে সন্ত্রাস, অত্যাচরের বদলে অত্যাচার। নিঃসন্দেহে ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা। ন্যায় ও শান্তি রক্ষার পরিকল্পনা, কিন্তু কীভাবে? প্রতিশোধের মাধ্যমে। একটি প্রদেশে সমধর্মাবলম্বী সংখ্যালঘু হিন্দু কিংবা সংখ্যাগুরু মুসলমানদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে অন্য প্রদেশের সংখ্যালঘু মুসলমান অথবা সংখ্যাগুরু হিন্দুরা। সাম্প্রদায়িক অশান্তির পথ ধরে সাম্প্রদায়িক শান্তির এ এক বিচিত্র পরিকল্পনা।

১৯২৭ সালে কলকাতায় মুসলমান লীগের অধিবেশনে সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ভাষণ থেকে বুঝা যায়, সাম্প্রদায়িকভাবে গঠিত প্রদেশগুলিতে এরকম অশান্তির সম্ভাবনা মুসলমানরা প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন। মৌলানা তাঁর ভাষণে বলেন :

'লখনউ চুক্তি'তে তারা তাদের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়েছে। গত মার্চ মাসের দিল্লি প্রস্তাবটিই ভারতে মুসলমানদের প্রকৃত অধিকারকে স্বীকৃতি জানানোর প্রথম পদক্ষেপ। ১৯১৬ সালের চুক্তিতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের অনুমোদন মুসলমানদের শুধুমাত্র প্রতিনিধিত্বটুকুর স্বীকৃতি। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষার সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এবং সংখ্যাগত শক্তির স্বীকৃতি। ভবিষ্যতে মুসলমানদের উপযুক্ত স্থান

নির্ধারণে দিল্লি একটি বিশেষ অবস্থা সৃষ্টির দ্বার উন্মোচন করেছে। বাংলা ও পঞ্জাবে তাদের সামান্য গরিষ্ঠতা জনগণনার সংখ্যা মাত্র। কিন্তু দিল্লি প্রস্তাব অনুযায়ী তারা পাঁচটি প্রদেশ পেয়েছে, যার মধ্যে কম করে তিনটিতে (সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান) মুসলমানদের সত্যিই প্রচুর সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। মুসলমানরা যদি এই বিশাল পদক্ষেপকে স্বীকার না করে, তবে তাদের এখানে বাস করার অধিকার নেই। এখন পাঁচটি মুসলমান প্রদেশের সঙ্গে ন'টি হিন্দু প্রদেশ থাকবে এবং ঐ ন'টি প্রদেশে হিন্দুরা যে রকম আচরণ করবে, পাঁচটি মুসলমান প্রদেশে তারা ঠিক সে রকম আচরণ-ই পাবে। এটা কি বিরাট লাভ নয়? মুসলমান অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে এটা কি নতুন হাতিয়ার নয়'?

বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জনাব ফজলুল হকের কিছুদিন আগের বক্তৃতা থেকেও এটা স্পষ্ট যে, মুসলমান প্রদেশের শাসনকর্তারা পরিকল্পনাটির এরকম সুবিধার কথা জানতেন এবং প্রয়োজনে সুবিধাগুলিকে কাজে লাগাতে দ্বিধা করেন নি।

সন্দেহের কোনও কারণ নেই যে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে, সাম্প্রদায়িক প্রদেশগুলি গঠনের পরিকল্পনাটিকে অত্যাচারের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার সম্ভাবনা আছে। পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক প্রদেশগুলির মূল ব্যাপার হল অশান্তি, যা কোনও মতেই সমর্থন করা যায় না। বেশি সংখ্যায় মুসলমান প্রদেশ গঠনের দাবির উদ্দেশ্য যদি এটাই হয়, তা হলে এর ফল হবে মারাত্মক।

বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী নির্ভর সাম্প্রদায়িক বিধি সম্মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং বিশেষত সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের জন্য বিধি সম্মত সংখ্যাগরিষ্ঠদের মদত দিতে, যে সাম্প্রদায়িক প্রদেশগুলি গঠিত হয়, এগুলিই সৃষ্টি করে 'সাম্প্রদায়িক সমস্যা'।

এই সমস্যার জন্য হিন্দু ও মুসলমানরা একে অপরের ওপর দোষারোপ করে। হিন্দুরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একগুঁয়েমির অভিযোগ করে। মুসলমানরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে সঙ্কীর্ণতার অভিযোগ করে। দু'জনেই কিন্তু ভুলে যায় যে মুসলমানরা তাদের দাবির প্রতি একগুঁয়ে কিংবা হিন্দুরা তাদের সুযোগ সুবিধা পাবার জন্য সঙ্কীর্ণতার শিকার বলেই কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যা তৈরি হয় নি। যেখানেই বিক্ষুব্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠের মুখোমুখি হবে বিক্ষুব্ধ সংখ্যালঘিষ্ঠেরা, সেখানেই এই সমস্যা আছে এবং থাকবে। পৃথক অথবা যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী, জনসংখ্যার আনুপাতিক সুবিধা দান ইত্যাদি বিষয়ে বিতর্ক থাকবে এমন একটি পরিস্থিতিতে, যেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামানো হবে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে। একটি মাত্র সরকারের লৌহ-আবেষ্টনীর মধ্যে একটি

সংখ্যাগুরু ও একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে মুখোমুখি লড়িয়ে দিলে কখনও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয় না।

সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের সমাধানে পাকিস্তান কতদূর এগিয়েছে?

উত্তর অত্যন্ত স্পষ্ট। যদি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এবং বাংলায় বর্তমান সীমান্ত রেখাকে অনুসরণ করাই তার পরিকল্পনা হয়ে থাকে, তবে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মূলে যে খারাপ দিকগুলি আছে তাকে নির্মূল করা যাবে না। সংখ্যাগুরুদের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিয়ে দেবার নীতিই তা হলে সে বহন করবে। বর্তমান সময়ের সব চেয়ে প্রকট সমস্যা হল, মুসলমান সংখ্যাগুরুদের সংখ্যালঘু হিন্দু শাসন এবং সংখ্যাগুরু হিন্দুদের সংখ্যালঘু মুসলমান শাসন। পাকিস্তানেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে যদি বর্তমানে যে সব প্রদেশ নিয়ে তার সীমানা স্থির করা আছে, সেগুলিই অন্তর্ভূক্ত থাকে। তা ছাড়া বৃহত্তর অর্থে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের জন্ম দেয় যে অশুভ দিকগুলি, সেগুলি শুধু যে বহাল থাকবে তাই নয়, নতুনভাবে বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে। বর্তমান ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক প্রদেশগুলি অন্যদের ক্ষতি করতে কতটা সচেষ্ট হবে, তা নির্ভর করবে কেন্দ্রীয় সরকার কতখানি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষেত্রে, তার ওপর। এখন কেন্দ্রীয় সরকার সাংগঠনিক দিক থেকে হিন্দু এবং হিন্দুদের রক্ষার জন্য হস্তক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে পূর্ণ সার্বভৌমত্ব নিয়ে পাকিস্তান যখন মুসলমান রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে, তখন সে তো কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন থাকবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাবও থাকবে না কিছু। চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হলেও বাইরের দেশের কোনও কর্তৃপক্ষ হিন্দু সংখ্যালঘুদের স্বার্থ দেখতে পারবে না, তাদের পক্ষে হস্তক্ষেপ করা বা তাদের ক্ষতি করার অধিকার ছাঁটাই করার ক্ষমতাও এই কর্তৃপক্ষের থাকবে না। সুতরাং তুর্কিদের অধীনে আর্মেনিয়ান কিংবা জারের রাশিয়া অথবা নাৎসীদের জার্মানিতে ইহুদিদের মত এক-ই অবস্থা হবে পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দুদের। এরকম অবস্থা হবে নিঃসন্দেহে অসহনীয়। হিন্দুরা বলতেই পারে যে, তাদের স্বধর্মের লোকজনদের তারা একটি মুসলমান জাতীয় রাষ্ট্রের ধর্মোন্মাদনার অসহায় শিকার হিসাবে ছেড়ে দেবে না।

৩

পাকিস্তান গঠনের পরিকল্পনা কার্যকর হলে যা যা ঘটনা ঘটবে এ হল তার খোলামেলা আলোচনা। কিন্তু এই সব ঘটনার উৎসগুলিকে অবশ্যই চিহ্নিত করতে

হবে। ঘটনাগুলি কি পাকিস্তান গঠনের পরিকল্পনা থেকেই উৎসারিত, না কি নির্ধারিত কোনও সীমান্ত থেকে এর সূত্রপাত? যদি গঠনের পরিকল্পনার থেকেই এর সূত্রপাত হয় অর্থাৎ ঘটনাগুলি যদি এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে, তা হলে এ বিষয়ে হিন্দুদের অযথা চিন্তা করে সময় নষ্ট করার দরকার নেই। অন্য দিকে সীমান্তের কোনও অঞ্চল যদি এ সব ঘটনার উৎস হয়, তা হলে পরিকল্পিত পাকিস্তানের সীমানা পরিবর্তনের প্রশ্ন আসবে।

বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, অশুভ দিকগুলি পাকিস্তান সৃষ্টির পরিকল্পনার সঙ্গে অচ্ছেদ্য নয়। কোনও অশুভ ঘটনা দেখা দিলে তার কারণ হবে সীমান্ত অঞ্চলগুলি। জনসংখ্যার বন্টনের দিকটি আলোচনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। পশ্চিম এবং পূর্ব পাকিস্তানে সমস্যাগুলি দেখা দেবে, কারণ বর্তমান সীমানা অনুসারে তারা একক ভাষাভাষী নয়। আগের মতোই তারা সংখ্যাধিক মুসলমান ও সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিয়ে মিশ্র রাষ্ট্র থাকছে। মিশ্র রাষ্ট্রের এরকম আকৃতির মধ্যেই লুকিয়ে থাকবে অবিচ্ছেদ্য সমস্যা। পাকিস্তানকে যদি একটি সংগঠিত একক ভাষী রাষ্ট্রে পরিণত করা যায়, তা হলে ত্রুটিগুলি স্বাভাবিকভাবেই অদৃশ্য হবে। পাকিস্তানের মধ্যে তখন আর পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর প্রশ্ন থাকবে না, কারণ সমশ্রেণীভুক্ত পাকিস্তানে কোনও সংখ্যালঘুকে শাসিত হতে হবে না কোনও সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা। একইভাবে, কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে না, আবার অসংরক্ষিত কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও থাকবে না।

সুতরাং প্রশ্ন হল, চিহ্নিত সীমানার পরিবর্তন। পাকিস্তানের সীমান্তরেখা কি এভাবে স্থির করা সম্ভব যে, সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের নিয়ে মিশ্র রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ না করে, পাকিস্তান একটি মাত্র সম্প্রদায় অর্থাৎ মুসলমানদের নিয়ে গঠিত হবে? উত্তর হল, লীগের পরিকল্পনা মত ও বিশাল ভূ-খণ্ডকে শুধুমাত্র সীমানা পরিবর্তন করেই সমশ্রেণীভুক্ত করা যায়, বাকিটুকু পরিবর্তন করা যায় জনসংখ্যার অদল বদল ঘটিয়ে।

এই প্রসঙ্গে আমি পরিশিষ্টের V, X, XI অংশের সংখ্যাগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনসংখ্যার বন্টন দেখান হয়েছে এবং এ ছাড়া সীমান্ত পরিবর্তনের সাহায্যে কেমন করে একটি সমশ্রেণীভুক্ত মুসলমান রাষ্ট্র গঠন করা যায় তার মানচিত্র দেখান হয়েছে।

পঞ্জাবকে নিয়ে দু'টি জিনিস দেখা যাবে :

ক) কিছু জেলা আছে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যায় বেশি। কিছু জেলায় হিন্দুরা বেশি। খুব কম অঞ্চলেই এদের সমভাবে ভাগ করে দেওয়া আছে।

খ) মুসলমান ও হিন্দু অধ্যুষিত জেলাগুলি খুব একটা বিচ্ছিন্ন নয়। দুটি জেলা দু'টি ভিন্ন অঞ্চলের চেহারা নিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান গড়তে হলে বাংলা ও অসমের জনসংখ্যার বণ্টন করতে হবে। জনসংখ্যার একটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে :

১) বাংলায় কিছু জেলায় মুসলমান, কিছু জেলায় হিন্দুদের প্রাধান্য,

২) অসমেও কিছু জেলায় মুসলমানদের, কিছু জেলায় হিন্দুদের আধিপত্য,

৩) হিন্দু ও মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলি অবিচ্ছিন্ন থেকেও পৃথক অঞ্চল গঠন করেছে,

৪) বাংলা ও অসমের জেলাগুলি, যেখানে মুসলমানদের প্রাধান্য, সেগুলি পরস্পর সংলগ্ন।

এই পরিস্থিতিতে পঞ্জাব, বাংলা ও আসামের হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে বাদ দিয়ে একটি সীমান্তরেখা টানলে সমশ্রেণীভূক্ত মুসলমান রাষ্ট্র খুব সহজেই গঠন করা যাবে। এটা যে সম্ভব তা পরিশিষ্টের মানচিত্র থেকে দেখা যেতে পারে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ও সিন্ধুপ্রদেশে বরং অবস্থা একটু জটিল। পরিশিষ্টের VI থেকে IX নং অংশের সারণি থেকে সেখানকার অবস্থা বুঝানো হয়েছে। পরিশিষ্ট থেকে দেখা যাবে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ও সিন্ধুতে হিন্দুরা কোনও জেলাতেই কেন্দ্রীভূত নয়। দু'টি প্রদেশের প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই তারা অত্যন্ত অল্প, প্রায় নগণ্য সংখ্যায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। হিন্দুরা ঐ দুটি প্রদেশের প্রধানত শহরাঞ্চলে আছে। সিন্ধুতে হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে শহরে আছে অনেক বেশি। অন্যদিকে মুসলমানরা গ্রামে হিন্দুদের কোণঠাসা করেছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অবশ্য মুসলমানরা গ্রামে ও শহরে সব জায়গায় হিন্দুদের কোণঠাসা করেছে।

সুতরাং পঞ্জাব ও বাংলার চেয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুপ্রদেশের অবস্থা ভিন্নতর। পঞ্জাব ও বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমানদের স্বাভাবিক দলবদ্ধ বসবাসের জন্য জনসংখ্যার সামান্য রদবদল করে কিংবা সীমানার পরিবর্তন করে সমশ্রেণীভূক্ত রাষ্ট্র গঠন করা যায়। কিন্তু সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হিন্দু জনসমষ্টির বিক্ষিপ্ত অবস্থানের জন্য শুধু সীমানার পরিবর্তন করলেই সমশ্রেণীভূক্ত রাষ্ট্র গঠন করা যাবে না। সেক্ষেত্রে জনসমষ্টিকে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।

জনসমষ্টির অপসারণ এবং পরিবর্তনের চিন্তাধারাকে অনেকে উপহাস করেন। কিন্তু সংখ্যালঘুদের সমস্যা এবং তাদের সংরক্ষণ সম্পর্কে সমাধানের গুরুত্ব যাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন না, তাঁরাই উপহাস করেন। যুদ্ধ পূর্ব রাষ্ট্রগুলির সংবিধান এবং ইউরোপের প্রাচীন রাষ্ট্রগুলি, যাদের মধ্যেও সংখ্যালঘু সমস্যা ছিল, তাদের সংবিধানেও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে মৌলিক অধিকারের দীর্ঘ তালিকার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে সংখ্যাগুরুরা সে অধিকার ভঙ্গ করতে না পারে। অভিজ্ঞতা কী ছিল এর পিছনে? অভিজ্ঞতা এটাই প্রমাণ করেছিল যে রক্ষাকবচ সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে পারেনি। অভিজ্ঞতা দেখিয়েছিল, এমন কি নির্মম যুদ্ধও সংখ্যালঘুদের সমস্যার সমাধান করে নি। রাষ্ট্রগুলি একটি মতৈক্যে পৌঁছালো যে, এ সমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায় হল পরস্পরের সংখ্যালঘুদের সীমান্ত অতিক্রম করে বিনিময় করা যাতে একটি সমশ্রেণীভূক্ত রাষ্ট্রের গঠন সম্ভব হয়। তুর্কিস্থান, গ্রিস ও বুলগেরিয়ার এরকম-ই ঘটেছিল। যাঁরা জনসমষ্টির বিনিময়কে উপহাস করেন, তাঁরা যদি তুর্কিস্থান, গ্রিস ও বুলগেরিয়ার সংখ্যালঘু সমস্যার ইতিহাস পর্যালোচনা করেন, তা হলে ভাল করবেন। তাঁরা দেখতে পাবেন, সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের একমাত্র কার্যকরী উপায় হল জন-বিনিময়। এ বিষয়ে তিনটি দেশের ভূমিকা কোনমতেই নগণ্য নয়। ঐ সময় এক দেশ থেকে অন্য দেশে ২০ লক্ষ মানুষকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কিন্তু তিনটি দেশ নির্ভয়ে কাজটিকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে গেছে, কারণ তারা অনুভব করেছে, সাম্প্রদায়িক শান্তি সম্পর্কে চিন্তা, অন্য সব চিন্তাকে দূরে সরিয়ে দেবে।

জনবিনিময় যে সাম্প্রদায়িক শান্তির স্থায়ী সমাধান, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তা হলে হিন্দু ও মুসলমানদের রক্ষাকবচ নিয়ে এত দর কষাকষি অর্থহীন, কারণ ওগুলি তো নিরাপদ নয় বলেই প্রমাণ হয়েছে। যদি সীমাবদ্ধ সম্পদ নিয়ে গ্রিস, তুর্কি এবং বুলগেরিয়ার মত ছোট দেশ এরকম উদ্যোগ নিতে পারে তা হলে অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই যে, ভারতও তা করতে পারে। অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা বেশি নয় এবং যেহেতু এক্ষেত্রে কিছু বাধা আছে, সেই কারণে সাম্প্রদায়িক শান্তির এমন একটি নিশ্চিত সমাধানকে অগ্রাহ্য করা হবে চরম মূর্খামি।

এ পর্যন্ত কোনও উল্লেখ হয়নি, এমন একটি বিরূপ দিক আছে অবশ্য। এটি আলোচিত হতে পারে ভেবে এখানে উল্লেখ করছি। প্রশ্ন উঠতেই পারে, হিন্দুস্থানে যে মুসলমানরা থেকে যাবে তাদের কীভাবে পাকিস্তান রক্ষা করবে? প্রশ্নটি স্বাভাবিক, কারণ পাকিস্তান পরিকল্পনা সংখ্যাগুরু মুসলমানদের স্বার্থে রচিত, যাদের সংরক্ষণের কোনও দরকারই নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, এ দাবি তুলবে কে? হিন্দুরা অবশ্যই নয়।

শুধু পাকিস্তান বা হিন্দুস্থানের মুসলমানরাই এ দাবি তুলতে পারে। পাকিস্তানের অধিবক্তা রেহমত আলিকে এ প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন :

'হিন্দুস্তানের ৪৫ লক্ষ মুসলমানের রক্ষার ব্যবস্থা কে করবে?

সত্যি কথা বলতে কি, ওদের চিন্তায় আমার বুকে ব্যথার মোচড় লাগে। ওরা আমাদের মাংসের মাংস, আত্মার আত্মা। আমরা ওদের ভুলতে পারব না, ওরাও পারবে না আমাদের ভুলতে। ওদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও বর্তমান অবস্থা আমাদের কাছে এখন এবং ভবিষ্যতেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সাময়িক অবস্থা অনুসারে পাকিস্তানের অবস্থান হিন্দুস্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। জনসংখ্যার ভিত্তিতে (একজন মুসলমান = চারজন হিন্দু) আইনসভা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তারা যে প্রতিনিধিত্ব পাচ্ছে, তাই পাবে। ভবিষ্যতের একমাত্র নিশ্চয়তা হল সমানুপাতিক হার। সুতরাং পাকিস্তানের সব রকমের অ-মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আমরা সব রকমের রক্ষাকবচ দেব, যা হিন্দুস্থানের সংখ্যালঘু মুসলমানদের দেওয়া হবে স্বাভাবিক ভাবে।

'কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, ওরা জানে যে সামান্য কয়েকজনের বৃহত্তর স্বার্থে আমরা পাকিস্তানের দাবি করেছি। আমাদের চেয়েও ওদের কাছে এই দাবি অনেক বেশি সময় সাপেক্ষ। আমাদের কাছে এটি হল জাতীয় দুর্গ; তাদের কাছে নৈতিকতার নোঙ্গর। নোঙ্গর যতদিন থাকে, ততদিন সব কিছু নিরাপদ থাকে। কিন্তু না থাকলে সবই হারিয়ে যায়'।

হিন্দুস্থানের মুসলমানদের উত্তরও খুব পরিষ্কার। তারা বলে, 'পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের মধ্যে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন হবার ফলে আমরা দুর্বল হই নি। হিন্দুস্থানে আমাদের উত্থানের চেয়েও পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে একটি পৃথক ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের ফলে আমরা আরও বেশি সংরক্ষিত'। তারা ভ্রান্ত, এ কথা কে বলবে? চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতান জর্মনরা নিজেরা যতখানি পারেনি, বাইরে থেকে জর্মানি তাদের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাই পেরেছিল, এ তো সবাই জানে।*

কিন্তু সে যাই হোক, প্রশ্নটি হিন্দুদের ক্ষেত্রে খাটে না। যেটি তাদের ক্ষেত্রে উদ্বেগের কারণ, তা হল : হিন্দুস্থানের সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের সমাধান পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে কতখানি সম্ভব? খুবই বৈধ ও বিবেচ্য প্রশ্ন। এটা অবশ্যই স্বীকার করতে

---

* মুসলিম লীগের নেতারা হিটলারের চেকোস্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে অসঙ্গত অনুশাসন যা সুদেতান জর্মনদের স্বার্থে করা হয়েছিল, তা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং জানতে পেরেছেন, এই ধরনের নীতির পরিণতি কি। ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত তাঁদের করাচি অধিবেশনে ভয়প্রদ ভাষণ লক্ষ্য করুন।

হবে, পাকিস্তান সৃষ্টি হলেই হিন্দুস্থানে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের সমাধান হবে না। সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে পাকিস্তানকে সমশ্রেণীভূক্ত রাষ্ট্র হিসাবে গঠন করা যায়, কিন্তু হিন্দুস্থান একটি মিশ্র রাষ্ট্র হিসাবেই থেকে যাবে। সারা হিন্দুস্থানে মুসলমানরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সীমানা পুনর্বণ্টন করলে এ দেশ সমশ্রেণীভূক্ত হবে না। হিন্দুস্থানকে সমশ্রেণীভূক্ত করতে হলে একমাত্র পথ জন বিনিময়। সেটা না হওয়া পর্যন্ত হিন্দুস্থানে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সমস্যা আগের মতই থাকবে এবং হিন্দুস্থানের রাজনীতির মধ্যে অনৈক্য চলতেই থাকবে।

পাকিস্তান সৃষ্টি হলেই হিন্দুস্থানের সাম্প্রদায়িক সমস্যা দূর হবে না, এ কথা মেনে নিয়েই প্রশ্ন করা যায়, তার মানে কি এটাই দাঁড়ায় যে, সেই কারণে হিন্দুরা পাকিস্তান গঠন বাতিল করবে? এ ব্যাপারে কোনও তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেবার আগে পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েকটি সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনা করতে হবে।

প্রথমত, সাম্প্রদায়িক সমস্যার ওপর এর ফলে কী প্রভাব পড়বে? পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের মধ্যে দলবদ্ধ মুসলমানদের জনসংখ্যার কথা আলোচনা করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসা যায়।

পাকিস্তানে মুসলমান জনসংখ্যা			হিন্দুস্থানে মুসলিম জনসংখ্যা
১ পঞ্জাব	...	১৩,৩৩২,৪৬০	১ ব্রিটিশ ভারতে বর্মা ও
২ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	...	২,২২৭,৩০৩	এডেন ছাড়া মোট
৩ সিন্ধু	...	২,৮৩০,৮০০	মুসলমান ... ৬৬,৪৪২,৭৬৬
৪ বেলুচিস্তান	...	৪০৫,৩০৯	২ পাকিস্তান ও পূর্ববঙ্গের
৫ পূর্ববঙ্গের মুসলমান রাজ্য :			মুসলমান ... ৪৭,৮৯৭,৩০১
(ক) পূর্ববঙ্গ	...	২৭,৪৯৭,৬২৪	৩ ব্রিটিশ হিন্দুস্থানে বাকি
(খ) শ্রীহট্ট	...	১,৬০৩,৮০৫	মুসলমান ... ১৮,৫৪৫,৪৬৫
মোট	...	৪৭,৮৯৭,৩০১	

এই সংখ্যাগুলি কীসের নির্দেশ করে? ব্রিটিশ হিন্দুস্থানে ১৮,৫৪৫,৪৬৫ জন মুসলমান থেকে গিয়ে, এক বিশাল মুসলমান জনসমষ্টি তৈরি করবে, অথচ তারা

পাকিস্তানের নাগরিক হবে। সাম্প্রদায়িক সমস্যার ক্ষেত্রে মুসলমান জনসংখ্যার এরকম বণ্টনের অর্থ হল, পাকিস্তান না থাকলে হিন্দুস্থানকে সাড়ে ৬ কোটি মুসলমান নিয়ে থাকতে হবে, আর পাকিস্তান হলে ২ কোটি মুসলমান নিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু যে সব হিন্দু সাম্প্রদায়িক শান্তি চান, তাঁদের ধরা হবে না? আমাদের কাছে, যদি পাকিস্তান হিন্দুস্থানের অভ্যন্তরীণ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না করে, তবে অন্তত এর আনুপাতিক হার অনেকটা কমিয়ে দিয়ে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য সহজ পথ খুলে দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় আইনসভায় সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ওপর পাকিস্তানের প্রভাব কেমন হবে, হিন্দুদের তাও বিচার করতে হবে। ১৯৩৫ সালের 'ভারত শাসন আইন' অনুসারে পাকিস্তান গঠিত হলে কেন্দ্রীয় আইনসভায় আসন বণ্টন হবে এরকমভাবে :

কক্ষের নাম	আসন বণ্টন			আসন বণ্টন		
	১. বর্তমান সংখ্যা			২. পাকিস্তান সৃষ্টির পর		
	মোট আসন	অ-মুসলমান (হিন্দু) আঞ্চলিক আসন	মুসলমান আঞ্চলিক আসন	মোট আসন	অ-মুসলমান (হিন্দু) আঞ্চলিক আসন	মুসলমান আঞ্চলিক আসন
রাজ্যসভা (Council of State)	১৫০	৭৫	৪৯	১২৬	৭৫	২৫
যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানসভা (Federal Assembly)	২৫০	১০৫	৮২	২১১	১০৫	৪৩

পাকিস্তান সৃষ্টি হলে সাম্প্রদায়িক আসন বণ্টনের এই হারকে যেভাবে শতকরা হিসাবে কমাতে হবে তা হল :

কক্ষের নাম	আসন বন্টন		আসন বন্টন	
	বর্তমান সংখ্যা		পাকিস্তান সৃষ্টির পর	
	হিন্দু আসনের তুলনায় মুসলমান আসনের শতকরা হার	মোট আসনের তুলনায় মুসলমান আসনের শতকরা হার	হিন্দু আসনের তুলনায় মুসলমান আসনের শতকরা হার	মোট আসনের তুলনায় মুসলমান আসনের শতকরা হার
রাজ্যসভা	৩৩	৬৬	২৫	৩৩
যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানসভা	৩৩	৮০	২১	৪০

এই সারণি থেকে বুঝা যাবে পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে কী বিরাট পরিবর্তন আসবে। 'ভারত শাসন আইন' অনুসারে উভয় কক্ষে মোট আসনের মধ্যে মুসলমান আসনের অনুপাত হল ৩৩%। কিন্তু হিন্দু আসনের অনুপাত হল ৬৬% রাজ্যসভায় এবং ৮০% বিধানসভায়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মোট আসনের তুলনায় মুসলমান আসনের অনুপাত ৩৩১/৩% থেকে কমে ২৫% দাঁড়াবে রাজ্যসভায়, আর বিধানসভায় হবে ২১%। হিন্দু আসনের অনুপাত ৬৬% থেকে কমে ৩৩১/৩% হবে রাজ্যসভায় এবং বিধানসভায় এই অনুপাত ৮০% থেকে কমে হবে ৪০%। অনুমান করা যায় হিন্দুস্থান থেকে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেও মুসলমানরা যে বিশেষ সুবিধা পাচ্ছে তা অব্যাহত থাকবে। যদি এই সুবিধা বাতিল করা হয় কিংবা কমিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে হিন্দুদের প্রতিনিধিত্বের আরও উন্নতি হবে। কিন্তু এই সুবিধার পরিবর্তন হবে না ধরে নিলেও, কেন্দ্রে প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে এটা কি হিন্দুদের পক্ষে কম লাভ? আমার মতে, কেন্দ্রে নিজেদের অবস্থার উন্নতির ব্যাপারে এটা হিন্দুদের এক বিশেষ সম্ভাবনা, পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করলে যা তারা কোনওদিনই পাবে না।

পাকিস্তান সৃষ্টির এগুলি হল বাস্তব সুবিধার দিক। এ ছাড়া একটি মনস্তাত্ত্বিক দিক আছে। উত্তর ও পূর্বের মুসলমানদের থেকে দক্ষিণ ও মধ্যভারতের মুসলমানরা অনুপ্রেরণা পায়। যদি পাকিস্তান সৃষ্টির পর উত্তর ও পূর্ব ভারতে সাম্প্রদায়িক শান্তি বজায় থাকে, যেমন থাকা উচিত, তা হলে সেখানে কোনও সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু সমস্যা না থাকায় হিন্দুরা স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুস্থানে সাম্প্রদায়িক শান্তি আশা করতে পারে। উত্তর ও পূর্বের মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুস্থানের মুসলমানদের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া হিন্দুস্থানের হিন্দুদের আরও একটি লাভ।

পাকিস্তান সৃষ্টির এই সব প্রতিক্রিয়া আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, এর ফলে হিন্দুস্থানে সাম্প্রদায়িক সমস্যার হয়তো পুরোপুরি সমাধান হবে না, তবু হিন্দুরা মুসলমানদের চূড়ান্ত আধিপত্য থেকে রক্ষা পাবে। কাজেই সম্পূর্ণ সমাধান হচ্ছে না বলে এ প্রস্তাব তারা মেনে নেবে কি নেবে না, এটা নিতান্তই হিন্দুদের ব্যাপার। অনেক ক্ষতির চেয়ে একটু লাভও তো ভালো।

৪

সাম্প্রদায়িক শান্তি ও পাকিস্তান সম্পর্কিত প্রসঙ্গে এবার শেষ প্রশ্নের আলোচনা। প্রশ্ন হল, পাকিস্তান সৃষ্টির নিখুঁত পরিকল্পনার স্বার্থে পঞ্জাব ও বাংলার হিন্দু-মুসলমানরা কি তাদের প্রদেশের সীমানা পুনর্নির্ধারণের ব্যাপারে রাজি হবে?

মুসলমানদের পক্ষে অবশ্য সীমানা পরিবর্তনে আপত্তির কোনও কারণ নেই। যদি তারা আপত্তি করে, তা হলে এটাই বুঝাবে যে নিজেদের দাবি সম্পর্কে তারা নিজেরাই অজ্ঞ। এটা খুব-ই সম্ভব, কারণ পাকিস্তান সৃষ্টির মুসলমান অভিবক্তাদের মধ্যে যে আলোচনা চলছে তা খুবই লঘু প্রকৃতির। কেউ কেউ পাকিস্তানকে বলছেন মুসলমান জাতীয় রাষ্ট্র, আবার অন্যেরা বলছেন—এটি হল মুসলমান জাতীয় আশ্রয়স্থল। জাতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয় আশ্রয়স্থলের মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে কি না এ ব্যাপারে কারোর কোনও মাথাব্যথা নেই। কিন্তু সন্দেহ নেই, এখানে গুরুতর পার্থক্য আছে। প্যালেস্টাইনকে ইহুদিদের জাতীয় আশ্রয়স্থল হিসাবে গঠনের সময় এই পার্থক্য নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। সীমানা পুনর্নির্ধারণে মুসলমানদের সম্ভাব্য প্রতিবাদের মোকাবিলা করতে হলে এই পার্থক্য কী, তা জানা দরকার।

জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে :

'জাতীয় আশ্রয়স্থল হল একটি ভূ-খণ্ড, যাতে কিছু জনসমষ্টির রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের অধিকার না থাকলেও স্বীকৃত আইনসম্মত অবস্থান আছে এবং এর নৈতিক, সামাজিক ও বৌদ্ধিক চিন্তাধারার উন্নতির সুযোগ আছে'।

১৯২২ সালে প্যালেস্টাইন সম্পর্কে নীতি ব্যাখ্যা করা প্রসঙ্গে ব্রিটিশ সরকার জাতীয় আশ্রয়স্থলের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে :

'প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের জাতীয় আশ্রয়স্থল বলতে কী বুঝানো হয়, এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, সামগ্রিকভাবে প্যালেস্টাইনের অধিবাসীদের ওপর ইহুদি জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দেওয়া নয়, বরং পৃথিবীর অন্য অংশের ইহুদিদের সাহচর্যে বর্তমান ইহুদি

জনসমাজের আরও উন্নতি করা যাতে ধর্ম ও জাতিগত কারণে ইহুদিদের কাছে এটি আকর্ষণ ও গর্বের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। কিন্তু ইহুদিদের অবাধ উন্নতি ও সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করতে প্যালেস্টাইনকে কষ্ট স্বীকারের মধ্যে দিয়ে নয়, অধিকারের স্বীকৃতি হিসাবে পেতে হবে। এ কারণেই ইহুদিদের একটি জাতীয় আশ্রয়স্থলের আন্তর্জাতিক নিশ্চয়তা থাকা দরকার এবং প্রাচীন ইতিহাসের সংযোগকারী হিসাবে একে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিতে হবে'।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জাতীয় আশ্রয়স্থল ও জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। পার্থক্যটি হল : জাতীয় আশ্রয়স্থলের ক্ষেত্রে, অধিবাসীদের ভূ-খণ্ডের ওপর রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের অধিকার থাকে না এবং সেই ভূ-খণ্ডে অবস্থানকারী অন্যদের ওপরও তাদের জাতীয়তাবাদ আরোপের অধিকার থাকে না। তাদের যেটুকু থাকে, তা হল একটি স্বীকৃত আইনসম্মত অবস্থা, যেখানে নাগরিক হিসাবে তারা তাদের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অধিকার ভোগ করতে পারে। জাতীয় রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, সেখানকার অধিবাসীদের যেমন রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের অধিকার থাকে, তেমন-ই থাকে অন্যদের ওপর তাদের জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দেবার অধিকার।

পার্থক্যটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এর-ই পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সৃষ্টির দাবির পর্যালোচনা করতে হবে। মুসলমানরা পাকিস্তান চায় কেন? যদি তারা মুসলমানদের জন্য একটি জাতীয় আশ্রয়স্থল চায়, তবে পাকিস্তান সৃষ্টির কোনও প্রয়োজন নেই। পাকিস্তানের প্রদেশে তারা তাদের বসবাসের এবং কৃষ্টির উন্নতির অধিকার নিয়ে জাতীয় আশ্রয়স্থলের সুযোগ ইতিমধ্যেই পেয়ে আসছে। যদি তারা পাকিস্তানকে জাতীয় মুসলমান রাষ্ট্র হিসাবে পেতে চায়, তবে স্বাভাবিকভাবে এই ভূ-খণ্ডের মধ্যে তারা রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের দাবি করে এবং এ দাবি করার অধিকার তাদের আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল : এই মুসলমান রাষ্ট্রের মধ্যে অ-মুসলমান সংখ্যালঘুদের ওপর মুসলমান জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দেবার চেষ্টা কি সমর্থন যোগ্য? এরকম অধিকারের সঙ্গে নিঃসন্দেহভাবে মিশে থাকে রাজনৈতিক সার্বভোমত্ব। কিন্তু এটাও সমান সত্য যে, এই ধরণের মিশ্র রাষ্ট্রে বর্তমানে এই অধিকারই যত নষ্টের মূল। পাকিস্তান সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে এরকম ক্ষতির আশঙ্কাকে অগ্রাহ্য করার অর্থ হবে ইতিহাসের সেই সব রক্তাক্ত পাতা ভুলে যাওয়া, যে পাতায় সংখ্যালঘুদের উপর তুর্কি, গ্রিক, বুলগেরীয় ও চেকদের নির্যাতন, হত্যা ও লুণ্ঠনের ভয়াবহ কাহিনী লেখা আছে। একটি ভূ-খণ্ডের ওপর, তার প্রজাদের উপর জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দেবার অধিকারকে সরিয়ে নেওয়া উচিত, কারণ এটি রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের অনুসারী। কিন্তু এরকম অধিকার প্রয়োগের সুযোগে সৃষ্টির সম্ভাবনাকে বন্ধ করা সম্ভব। চূড়ান্ত সমশ্রেণীভূক্ত

ও চরম জাতিগত জাতীয় মুসলমান রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে মুসলমানদের অনুমতি দিয়ে এই সম্ভাবনাকে বন্ধ করা যায়। অন্য কোনও পরিস্থিতিতে সংখ্যাগুরু মুসলমান ও সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিয়ে গঠিত মিশ্র রাষ্ট্রে তাদের আধিপত্য খর্ব করা যাবে না।

পাকিস্তান সৃষ্টির রূপকারেরা বোধ হয় এ সব চিন্তা করেন নি, বিশেষত এই পরিকল্পনার স্রষ্টা স্যার এম. ইকবালও করেননি। ১৯৩০ সালে মুসলমান লীগের সভাপতির ভাষণে তিনি আম্বালা বিভাগ ও আরও কিছু জেলা যেখানে অ-মুসলমানরা প্রধান, ছেড়ে দিতে সম্মতি প্রকাশ করেছেন এই যুক্তিতে যে, এর ফলে অ-মুসলমানদের ব্যাপকতা কমবে ও জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমান বাড়বে। অন্য দিকে পাকিস্তানের রূপকারদের ধারণা থাকতে পারে যে, পঞ্জাব ও বাংলাকে তাদের বর্তমান সীমানা নিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাদের কাছে এটি পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, সীমান্ত নিয়ে বেশি দাবি করলে এমনকি খোলা মনে যে-সব হিন্দু, প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনায় রাজি, তারাও ক্ষুব্ধ হয়ে যাবে। মুসলমান বিশ্বাস ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও প্রসারণের উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত একটি মুসলমান রাষ্ট্রে হিন্দুরা খুব স্বেচ্ছায় নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইবে, এটা কখনও আশা করা যায় না। হিন্দুরা অবশ্যই বিরোধিতা করবে। মুসলমানরা তাড়াতাড়িই তা দেখতে পাবে। মুসলমানরা যদি বর্তমান সীমানার ওপরে বেশি জোর দেয় তা হলে এই অভিযোগই জোরদার হবে যে শুধুমাত্র জাতীয় আশ্রয়স্থল বা জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের জন্য নয়, অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে পাকিস্তান সৃষ্টির দাবির মধ্যে। মুসলমান সংখ্যাধিক্যতাকে তাদের অঞ্চলে হিন্দু সংখ্যালঘুত্বের ওপর চাপিয়ে দেবার রূপরেখা সৃষ্টির অভিযোগ উঠবে তাদের বিরুদ্ধে। এতটাই তীব্র হবে সে অভিযোগ যে, পাকিস্তান সৃষ্টির ব্যাপারে প্রাদেশিক সীমানা পরিবর্তনের মুসলমান চিন্তাধারার মূল্যায়ন করতে হবে।

এখন পঞ্জাব ও বাংলার হিন্দুদের কথা ধরা যাক। এ প্রসঙ্গে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া আলোচনা করলেই চলবে। কারণ তারাই হিন্দুদের পরিচালিত করে এবং হিন্দু জনমত তৈরি করে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের নেতাদের মতোই উচ্চ বর্ণের হিন্দুরাও খারাপ। তাদের চরিত্রের কিছু বিশেষ দিক প্রায়-ই হিন্দুদের বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেয়। জীবনের নানা সুফলকে সমানভাবে ভাগ না করে সব কিছুকে গ্রাস করার মানসিকতা থেকেই এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। তারা শিক্ষা ও সম্পদের একচেটিয়া অধিকার নিয়ে থাকে এবং এভাবে তারা রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করে। এই একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখাই তাদের জীবনের উচ্চাকাঙ্খা ও লক্ষ্য। শ্রেণী শোষণের এই স্বার্থপরতার অভিযোগ থাকে তাদের ওপর। কারণ শাস্ত্ররচনার

অধিকার নিয়ে ও উচ্চবর্ণের সেবা করাই নিম্নবর্ণের হিন্দুদের পবিত্র কর্তব্য— এরকম প্রচার করে ধন, শিক্ষা ও ক্ষমতা থেকে নিম্নবর্ণদের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রে তারা লিপ্ত। বহু কাল ধরে উচ্চবর্ণের লোকেরা এইভাবে সব কিছুর ওপর নিজেদের একচেটিয়া অধিকার কায়েম রেখে সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বঞ্চিত রেখেছে। সম্প্রতি এর ফলে মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ও মধ্যপ্রদেশের অ-ব্রাহ্মণ দলগুলি এই অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে। তবু উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাদের সুবিধাভোগী অবস্থানটি সাফল্যের সঙ্গে বজায় রেখে চলেছেন। শিক্ষা, সম্পদ ও ক্ষমতাকে নিজেদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত রেখে তারা মুসলমানদেরও বঞ্চিত রেখেছেন। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মত ও মুসলমানদেরও অবহেলিত রাখতে চায় তারা। হিন্দুদের রাজনীতি বুঝতে গেলে উচ্চবর্ণীদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

দুটি উদাহরণ দেওয়া যায় এক্ষেত্রে। ১৯২৯ সালে সাইমন আয়োগের সামনে হিন্দুরা বোম্বাই বিভাগ থেকে সিন্ধুপ্রদেশের বিচ্ছেদের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু ১৯১৫ সালে সিন্ধুপ্রদেশের হিন্দুরাই ভিন্ন মত প্রকাশ করে বোম্বাই থেকে সিন্ধুপ্রদেশের বিচ্ছিন্নতা দাবি করেছিল। দুটি ক্ষেত্রেই এক-ই কারণ। ১৯২৫ সালে সিন্ধুপ্রদেশে কোনও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ছিল না। থাকলে তা অবশ্যই মুসলমান সরকার হত। হিন্দুরা তখন বিচ্ছেদ চেয়েছিল এই কারণে, যে মুসলমান সরকার না থাকায় তারা আরও বেশি করে সরকারি পদে নিযুক্ত হতে পারছিল। ১৯২৯ সালে তাদের আপত্তির কারণ হল, তারা জানত যে পৃথক সিন্ধু মুসলমান সরকারের অধীনস্থ হবে এবং মুসলমানরা তাদের প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য হিন্দুদের একচ্ছত্র আধিপত্য নষ্ট করবে। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বৈশিষ্ট্যের আর একটি উদাহরণ হল বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা। বাঙালি হিন্দুদের অধীনে ছিল সমগ্র বাংলা, বিহার, ওড়িশা, অসম এবং এমনকি যুক্তপ্রদেশ। প্রায় সব প্রদেশেই সরকারি চাকরিতে তাদের ছিল সিংহভাগ। বঙ্গভঙ্গের অর্থ ছিল তাদের এই সু-অবস্থার অবনতি। এর অর্থ বাঙালি হিন্দুদের পূর্ববঙ্গ থেকে অপসারণ এবং এতাবৎকাল অবহেলিত বাঙালি মুসলমানদের সরকারি চাকরিতে যোগদান। পূর্ববঙ্গে বাঙালি মুসলমানরা যাতে স্থান না পায় প্রধানত সেই কারণেই হয়েছিল বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা। বাঙালি হিন্দুরা চিন্তাই করতে পারেনি যে, একদিকে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা ও অন্যদিকে স্বরাজ দাবি করে তারা পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদেরই শাসক হবার পথ প্রশস্ত করছিল।

এসব চিন্তা খুব স্বাভাবিকভাবেই আসে, কারণ ভয় হয় উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করবে একমাত্র তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। অবাক হবার কিছু নেই, যদি দেখা যায় উচ্চবর্ণের হিন্দুদের স্বার্থপরতাই পাকিস্তান সৃষ্টিতে অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পঞ্জাব ও বাংলার হিন্দুদের কাছে দুটি বিকল্প আছে। তাদের মুখোমুখি হতে হবে খুব সহজে ও সাবলীলভাবে। পঞ্জাবে মুসলমানদের সংখ্যা হল ১৩,৩৩২,৪৬০ এবং শিখ ও অবশিষ্টদের নিয়ে হিন্দুর সংখ্যা হল ১১,৩৯২,৭৩২। অর্থাৎ পার্থক্য হল ১,৯৩৯,৭২৮। এর অর্থ পঞ্জাবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা মাত্র ৮ শতাংশ। এই অবস্থায় কোনটি গ্রহণযোগ্য : পঞ্জাবের ঐক্য বজায় রেখে ৫৪% মুসলমানের হাতে ৪৬% হিন্দুর শাসন কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া অথবা সীমানা পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে রেখে মুসলমান রাজত্বের ত্রাস থেকে হিন্দুদের মুক্ত করা?

বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা ২৭,৪৯৭,৬২৪ এবং হিন্দু সংখ্যা ২১,৫৭০,৪০৭, অর্থাৎ পার্থক্য হল মাত্র ৫,৯২৭,২১৭। এর অর্থ বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার শতকরা হার মাত্র ১২। এই অবস্থায় কোনটি গ্রহণযোগ্য : সীমান্ত পুনর্বণ্টনের বিরোধিতার মাধ্যমে পূর্ববঙ্গ ও শ্রীহট্ট সহ একটি জাতীয় মুসলমান রাষ্ট্র গঠনে বাধা দিয়ে মাত্র ১২% সংখ্যাধিক মুসলমানের হাতে ৪৪% সংখ্যালঘু হিন্দুদের শাসন করার অধিকার স্বীকার করে নেওয়া, অথবা সীমানা পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে মুসলমান ও হিন্দুদের পৃথক জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে রেখে ৪৪% হিন্দুকে মুসলমান শাসনের সন্ত্রাস থেকে মুক্ত করা?

বাংলা ও পঞ্জাবের হিন্দুরাই ঠিক করুন কোন পথ তাঁরা গ্রহণ করবেন। আমার মনে হয় বাংলা ও পঞ্জাবের উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বলার সময় এসেছে যে, চাকরির ক্ষেত্র সংকোচনের সম্ভাবনা আছে বলে পাকিস্তান সৃষ্টিতে তাঁরা যদি বাধা দেন, তবে মারাত্মক ভুল করবেন। তাঁদের নিজেদের হাতে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত রাখার দিনও শেষ। জাতীয়তাবোধের নামে তাঁরা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতাড়িত করতে পারেন, কিন্তু মুসলমান প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রতাড়িত করে তাঁরা ক্ষমতার একাধিপত্য ভোগ করতে পারবেন না। যদি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরব হয় তা হলে হিন্দুদের সিদ্ধান্ত হবে এই রকম। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্যে বাস করে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের বিরোধিতা করার মধ্যে সাহসিকতা আছে। কিন্তু মুসলমানদের বোকা বানিয়ে নিজেরা সব ক্ষমতা ভোগ করার চিন্তা করলে হিন্দুরাই বোকামি করবে। লিঙ্কন তো বলেই ছিলেন, সব সময়ের জন্য সব লোককে বোকা বানানো যায় না। হিন্দুরা যদি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধীনে থাকতে চায়, তা হলে তাদের সব কিছু হারাতে হবে। অন্যদিকে, বাংলা ও পঞ্জাবে হিন্দুরা যদি পৃথক হতে চায়, তবে তারা হয়তো বেশি পাবে না, কিন্তু নিশ্চিতভাবে তাদের সব কিছু হারাতে হবে না।

অংশ III

পাকিস্তানের বিকল্প কি?

পাকিস্তানের পক্ষে মুসলমানদের যুক্তি ও এর বিরুদ্ধে হিন্দুদের যুক্তি আলোচনার পর দেখা দরকার পাকিস্তানের কোনও বিকল্প আছে কি না। পাকিস্তানের সপক্ষে যুক্তিগুলি বিচার করার সময় তার বিকল্প চিন্তাভাবনাও অবশ্যই করতে হবে। এখানে হয় কোনও বিকল্প থাকবে না, নয় তো থাকবে, কিন্তু তা হবে পাকিস্তান সৃষ্টির চেয়েও খারাপ। তৃতীয়ত, সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পাকিস্তান কিংবা তার বিকল্প কোনওটিই গ্রহণযোগ্য না হলে সম্ভাব্য অন্য চিন্তাগুলিকেও বিচার করতে হবে। এই সব আলোচনা সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে এই অংশে ভাগ করা হয়েছে :

(১) পাকিস্তানের বিকল্প হিসাবে হিন্দুদের যুক্তি,

(২) পাকিস্তানের বিকল্প হিসাবে মুসলমানদের যুক্তি, এবং

(৩) বিদেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ।

এই যুক্তিগুলির মধ্যে সারবত্তা কতখানি? আলোচ্য অংশে এগুলির যুক্তিগ্রাহ্যতা পরীক্ষা করা হয়েছে।

অধ্যায় ৭

পাকিস্তানের বিকল্প হিসাবে হিন্দুদের মত

১

পাকিস্তানের বিকল্প হিসাবে হিন্দুদের যুক্তিগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে ১৯২৫ সালে প্রয়াত লালা হরদয়ালের কথা, যা লাহোরে 'প্রতাপ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বিবৃতির আকারে। এই বিবৃতিতে, যাকে তিনি বলেছেন তাঁর রাজনৈতিক দলিল, হরদয়াল বলেছেন :

'আমি ঘোষণা করতে পারি যে হিন্দু জাতি, হিন্দুস্থান ও পঞ্জাবের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে চারটি বিষয়ের উপর : ১) হিন্দু সংগঠন, ২) হিন্দুরাজ, ৩) মুসলমানদের শুদ্ধি, এবং ৪) আফগানিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের বিজয় ও শুদ্ধি। হিন্দু জাতির মধ্যে এই চারটি জিনিস না থাকলে আমাদের সন্তানদেরও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিপদ কোনওদিন কাটবে না এবং হিন্দু জাতির নিরাপত্তা কোনওদিন সম্ভব হবে না। হিন্দু জাতির একটিই ইতিহাস, এবং এই জাতির প্রাতিষ্ঠানিক ঐক্য আছে। কিন্তু হিন্দুদের মতোও মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের এই ঐক্য নেই, কারণ তারা পারসিক, আরবীয় এবং ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অনুরক্ত এবং তাদের ধর্মও ভিন্ন দেশের সঙ্গে সংযুক্ত। সুতরাং ভিন্ন দেশীয় ভাবধারাকে দূর করতে এই দুটি ধর্মের শুদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে ইসলাম-শাসিত হলেও আফগানিস্তান ও সীমান্তের পার্বত্য অঞ্চলগুলি এক সময় ভারতের-ই অংশ ছিল, যেমন নেপালে যেহেতু হিন্দু ধর্মের আধিক্য, সেহেতু আফগানিস্তান ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে অবশ্যই হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে, নইলে স্বরাজ অর্থহীন হয়ে যাবে। পার্বত্য জাতি স্বভাবতই যুদ্ধবাজ ও আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন। যদি তারা আমাদের শত্রু হয়ে যায়, তবে নাদিরশাহ ও জামানশাহের যুগ আবার ফিরে আসবে। এখন সীমান্ত অঞ্চল রক্ষা করছে ব্রিটিশ বাহিনীর অফিসাররা, কিন্তু এটা তো চিরকাল চলবে না।... যদি হিন্দুরা নিজেদের রক্ষা করতে চায়। তবে তাদের অবশ্যই আফগানিস্তান ও সীমান্তবর্তী অঞ্চল দখল করে সমস্ত পার্বত্য উপজাতিদের বশে আনতে হবে'।

আমি জানি না, পাকিস্তানের পরিবর্ত হিসাবে লালা হরদয়ালের এই প্রস্তাব কতজন হিন্দু সমর্থন করবেন।

প্রথমত, হিন্দুত্ব কোনও ধর্মান্তরিত ধর্ম নয়। কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তাঁর ভাষণে মৌলানা মহম্মদ আলি সঠিকভাবেই বলেছিলেন :

'হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে আমার এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের। ১৯০৭ সালে ইলাহাবাদে ভাষণ প্রসঙ্গে আমি হিন্দু ও মুসলমানদের বৈষম্য সম্পর্কে বলেছিলাম, একজন মুসলমান বড় জোর এতটা খারাপ হতে পারে যে, রাজকীয় খাদ্য বস্তু প্রস্তুতের দাবি জানিয়ে কিছু বিস্বাদ খাদ্যকে সকলের সঙ্গে ভাগ করে খাবে এবং হয়তো এমনভাবে গলাধঃকরণ করবে যাতে মনে হবে নিতান্ত অনিচ্ছায় সে ঐ খাদ্য খাচ্ছে। অন্যদিকে, তার হিন্দু ভাই নিজের তৈরি খাদ্য সম্পর্কে এতটাই গর্বিত হবে যে, রান্নাঘরের যাবতীয় খাদ্য লোভীর মতো নিজেই উদরসাৎ করবে এবং তার ভাইয়ের ছায়া পড়তে দেবে না সেখানে, সামান্য খাদ্য কণাও দেবে না তাকে। হালকা চালে কিন্তু এটা আমি বলিনি। একবার মহাত্মা গান্ধীকে আমি আমার এই বিশ্লেষণ সম্পর্কে তাঁর মতামত জানাতে বলেছিলাম'।*

মহাত্মা এ প্রশ্নের কী উত্তর দিয়েছিলেন, তা অবশ্য মহম্মদ আলি প্রকাশ করেননি। আসল ঘটনা হল, হিন্দুরা যতই আশা করুক, হিন্দু ধর্ম কখনও ইসলাম বা খ্রিস্টান ধর্মের মতো ব্যাপক প্রচারিত ছিল না। বিপরীতক্রমে, অন্তত এক সময় এটি ব্যাপক প্রচারিত ধর্ম ছিল, নইলে বিশাল ভারতীয় উপমহাদেশে এটি ছড়িয়ে পড়েছিল কীভাবে। কিন্তু হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা চালু হবার পর থেকে এই ধর্মের ব্যাপকতা কমে যায়। জাতিভেদ কখনও ধর্মান্তরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। একজনকে ধর্মান্তরিত করা যায়। কিন্তু সেই ধর্মের সংস্কৃতি তাকে দেওয়া যায় না। ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে নতুন সমাজ জীবনে নতুন মানুষজনের সঙ্গে একাত্ম করতে হবে। হিন্দু সমাজের পক্ষে ধর্মান্তরীকরণের এরকম পূর্বশর্ত মেটানো সম্ভব নয়। হিন্দু ধর্মের প্রচারক একজন ভিন্নধর্মীকে হিন্দু বিশ্বাসে বিশ্বস্ত করে তোলার জন্য সচেষ্ট হবেই। কিন্তু এই ভিন্নধর্মীকে হিন্দু করার আগে তাকে এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতেই হবে: মানুষটির ধর্ম কী হবে? হিন্দু মতে, একজন মানুষ যে জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করবে তারাই অন্তর্ভূক্ত হবে। কিন্তু ধর্মান্তরিত মানুষটি তো সেই জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে নি। সুতরাং তার কোনও জাত থাকতে পারে না। এই প্রশ্নটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতি বা ধর্মের দিক ছাড়াও মানুষ সামাজিক জীব। তার

*'টাইমস অব্ ইন্ডিয়া', ২৫-৭-১৯২৫ তারিখে প্রকাশিত 'ভারতীয়ের চোখে' দ্রষ্টব্য।

ধর্মের প্রয়োজন না থাকতে পারে, রাজনীতির প্রয়োজন না থাকতে পারে, কিন্তু একটি সমাজে তাকে থাকতেই হবে, সমাজ ছাড়া সে তো থাকতে পারবে না। হিন্দু সমাজে যার জাত নেই, সে সমাজচ্যুত। ধর্মান্তরিত মানুষটির যদি কোনও সমাজ না থাকে, তাহলে ধর্মান্তরীকরণ সম্ভব হবে কীভাবে? হিন্দু সমাজ যতদিন স্বশাসিত নানা জাতে বিভক্ত থাকবে, ততদিন এটি প্রচারোপযোগী ধর্ম হতে পারে না। তাই আফগান অথবা সীমান্তের উপজাতিদের হিন্দু ধর্মে নিয়ে আসা অলস কল্পনা ছাড়া কিছু নয়।

দ্বিতীয়ত, লালা হরদয়ালের পরিকল্পনার মধ্যে আর্থিক উৎসের ব্যাপার আছে, যা নির্বাহ করা নিতান্তই অসম্ভব। আফগান ও সীমান্তবর্তী উপজাতিদের হিন্দু ধর্মে রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দেবে কে? দীর্ঘদিন নিজেদের বিশ্বাসে অপরকে বিশ্বাসী করে তোলার কাজে অভ্যস্ত না থাকায় হিন্দুরা এ কাজে উৎসাহও হারিয়েছে। এই উৎসাহের অভাবের প্রতিফলন ঘটবে অর্থসংগ্রহের ক্ষেত্রেও। তা ছাড়া হিন্দু সমাজে চাতুর্বর্ণ চালু থাকায় অতি প্রাচীন কাল থেকে ধনবন্টনে ব্যাপক অসাম্য আছে। হিন্দুদের মধ্যে একমাত্র বেনিয়া বা ব্যবসায়ীরা ধনসম্পদের উত্তরাধিকার পেয়ে আসছে। অবশ্য বৈদেশিক আক্রমণকারী অথবা দেশি বিদ্রোহীদের সৃষ্ট জমিদার শ্রেণীও আছে। কিন্তু বেনিয়াদের তুলনায় তাদের সংখ্যা বেশি নয়। বেনিয়ারা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মুনাফায় আগ্রহী। টাকা সঞ্চয় করা এবং উত্তরপুরুষকে হস্তান্তর করা ছাড়া তারা কিছু জানে না। ধর্মের প্রসার কিংবা সংস্কৃতির উন্নতি তাদের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করে না। এমনকি একটু সুন্দরভাবে জীবন যাপন করার পরিকল্পনাও তাদের বাজেটে নেই। যুগ যুগ ধরে এই হল এদের ঐতিহ্য। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকলে তারা পশুর চেয়েও অধম জীবনযাপন করতে ইতস্তত করবে না। তার আয়-ব্যয়কে খরচার দিকে অবশ্য একটি নতুন দিক দেখা যাচ্ছে, তা হল রাজনীতি। গান্ধীজির রাজনৈতিক নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর থেকে এটা ঘটছে। গান্ধীবাদী রাজনীতি তাদের সমর্থন করছে। এটা অবশ্য রাজনীতিকে ভালবাসার জন্য নয়। জনগণের কাজে ব্যক্তিগত মুনাফা করাই এর উদ্দেশ্য। তা হলে আফগান বা সীমান্তের উপজাতিদের মধ্যে হিন্দু ধর্ম প্রসারের মতো এমন নিষ্ফল কারণে তারা টাকা খরচ করবে, এটা আশা করা যায় কি?

তৃতীয়ত, আফগানিস্তানে ধর্মান্তরীকরণের সুবিধার প্রশ্নটিও আছে। লালা হরদয়াল স্পষ্টতই ভেবেছিলেন যে কোনও শাস্তির আশঙ্কা না করে তুর্কিতে যেমন কুরআনকে ভ্রান্ত কিংবা সেকেলে বলা যায়, আফগানিস্তানেও বোধ হয় সেটা সম্ভব। ১৯২৪ সালে, অর্থাৎ লালা হরদয়ালের এই রাজনৈতিক বিবৃতি প্রকাশিত হবার মাত্র এক

বছর আগে কাদিয়ানের মির্জা গুলাম আমেদের অনুগামী জনৈক নিয়ামতুল্লাকে আফগানিস্তানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় বিচারালয়ের নির্দেশে কাবুলে* পাথর ছুঁড়ে মারা হয়েছিল, কারণ তিনি নিজেকে মানব জাতির ত্রাণকর্তা ও ভবিষ্যতদ্বক্তা হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। একটি খিলাফৎ সংবাদপত্র অনুযায়ী লোকটির অপরাধ ছিল এই যে, সে ইসলাম ও শরিয়তের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ তার মতাদর্শ ও ধর্ম বিশ্বাস প্রচার করছিল। এই সংবাদপত্রের মতে, প্রথম শরিয়ত বিচারালয়, কেন্দ্রীয় আপিল আদালত এবং ন্যায় মন্ত্রকের চূড়ান্ত আপিল কমিটির উলেমা ও ঐশ্বরিক গুণসম্পন্ন মানুষদের মতৈক্যে লোকটিকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়। এই সব অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনাটিকে তত্ত্বগতভাবে হঠকারী ও বাস্তবক্ষেত্রে অকার্যকর হিসাবেই বর্ণনা করতে হয়। এটির একটি রোমাঞ্চকর চরিত্র আছে হয়তো, তবে পঞ্জাবের ধর্মোন্মাদ কিছু আর্য সমাজের লোক ছাড়া অন্য যুক্তিপূর্ণ মানুষের কাছে এর যথেষ্ট আবেদন আছে।

২

হিন্দু মহাসভার বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে শ্রী ভি. ডি. সভারকর এ সম্পর্কে হিন্দু মহাসভার বক্তব্য ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, হিন্দু মহাসভা পাকিস্তান সৃষ্টির বিপক্ষে এবং যে কোনও মূল্যে এর প্রতিরোধে দৃঢ়সংকল্প। এই মূল্য যে কী, তা আমাদের জানা নেই। যদি বলপ্রয়োগ ও দমন-পীড়ন বুঝানো হয়, তবে তা হবে নিতান্ত নেতিবাচক বিকল্প এবং শ্রী সভারকর ও হিন্দু মহাসভা-ই বলতে পারে এই বিকল্প কতদূর কার্যকর হবে।

যাই হোক, ভারতের মুসলমানদের কাছে শ্রী সভারকর একটি নেতিবাচক বিকল্প দেবেন, এটাও শোভন নয়। তিনি ইতিবাচক প্রস্তাব-ই দিয়েছেন, যা বুঝতে গেলে তাঁর মূল বক্তব্যগুলিকে ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে। হিন্দু ধর্ম, হিন্দুত্ব এবং হিন্দুরাজ শব্দগুলির উপর শ্রী সভারকর বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন :✣

'হিন্দু ভাবাদর্শ ব্যাখ্যা করতে গেলে এই তিনটি শব্দের যথাযথ অর্থ বুঝতে হবে। 'হিন্দু' শব্দ থেকে ইংরাজিতে 'হিন্দু ধর্ম' করা হয়েছে, যার অর্থ একটি বিশেষ ধর্মীয় প্রথা, যা হিন্দুরা অনুসরণ করে। 'হিন্দুত্ব' শব্দটি অনেক বেশি ব্যাপক, যা 'হিন্দু ধর্মের' মতো হিন্দুদের ধর্মীয় দিকটিকেই শুধু বুঝায় না, তাদের সাংস্কৃতিক, ভাষাগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকগুলিকেও বুঝায়। 'হিন্দু সংগঠিত রাষ্ট্রের'

* 'টাইমস্ অব্ ইন্ডিয়া', ২৭-১১-২৪ তারিখে প্রকাশিত 'ভারতীয়দের চোখে' দ্রষ্টব্য

✣ কলকাতায় ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ।

সঙ্গে শব্দটির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে এবং এর যথার্থ পরিচয় হল 'হিন্দুতা'। তৃতীয় শব্দ 'হিন্দুরাজ'-এর অর্থ হল সামগ্রিকভাবে হিন্দু জনতা। হিন্দু দুনিয়ার এটি একটি সার্বিক নাম, যেমন মুসলমান দুনিয়ার সামগ্রিক নাম হল 'ইসলাম'।

হিন্দু মহাসভাকে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বর্ণনা করাকে শ্রী সভারকর চরম অপব্যাখ্যা গণ্য করেছেন। এরকম অপব্যাখ্যার বিরোধিতা করে তিনি বলেছেন :*

'আমি লক্ষ্য করেছি, ইংরেজি শিক্ষিত বিশাল এক হিন্দু সম্প্রদায়, হিন্দু মহাসভা খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক সংস্থার মতও একটি নিছক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান— এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এই সংস্থায় যোগদান থেকে বিরত থাকেন। এর চেয়ে মারাত্মক সত্যের অপলাপ আর হয় না। হিন্দু মহাসভা কখনওই হিন্দু ধর্মের প্রচার সংস্থা নয়। আস্তিক্যবাদ, একেশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ এমন কি নাস্তিক্যবাদের মতো ধর্মীয় বিষয়গুলি হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধারার প্রবক্তাদের মধ্যে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে হিন্দু মহাসভা সমস্ত সুযোগ উন্মুক্ত রেখেছে। হিন্দু ধর্ম মহাসভা নয়, এটি হল হিন্দু জাতীয় মহাসভা। সৃষ্টি কাল থেকেই যে কোনও ধর্মীয় মতবাদ এমনকি যে কোনও হিন্দু গোষ্ঠীর মতবাদের প্রতিও অন্ধ আনুগত্যের বিরোধী এই সংস্থা। হিন্দু জাতীয় সংস্থা হিসাবে এটি অবশ্য কোনও অ-হিন্দু আক্রমণ অথবা অনুপ্রবেশ থেকে হিন্দুস্থান-উদ্ভূত সমস্ত ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় হিন্দু ধর্মকে রক্ষা ও এর প্রচার করবে। কিন্তু নিছক ধর্মীয় সংস্থার চেয়ে এর কাজের পরিধি অনেক বেশি ব্যাপক। হিন্দু রাজত্বের সমস্ত সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক এবং সবার ওপরে রাজনৈতিক বিষয়ে হিন্দু মহাসভা একাত্মতা দাবি করে এবং হিন্দু জাতির স্বাধীনতা, শক্তি ও গৌরব রক্ষায় সাহায্যকারী যে কোনও উপাদানকে রক্ষা করার শপথ নেয়। পূর্ণ স্বরাজ প্রাপ্তির সেই লক্ষ্যে পৌছবার অপরিহার্য উপায় হিসাবে হিন্দু মহাসভা সমস্ত বৈধ ও সঠিক পদ্ধতিতে হিন্দুস্থানের অবাধ রাজনৈতিক স্বাধীনতা দাবি করে'।

শ্রী সভারকর স্বীকার করেন নি যে, মুসলমান লীগকে প্রতিহত করতে হিন্দু মহাসভার জন্ম হয়েছিল এবং সাম্প্রদায়িক পুরস্কার সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সমাধানের মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট হলেই হিন্দু মহাসভা লুপ্ত হয়ে যাবে। তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাবার পরেও হিন্দু মহাসভা তার কাজ চালিয়ে যাবে। তাঁর কথায় :✢

---

* বক্তৃতা : কলকাতায় ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার অধিবেশন।

✢ তদেব

'অনেক অজ্ঞ সমালোচক কল্পনা করেন যে হিন্দু মহাসভা শুধুমাত্র মুসলমান লীগ বা কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃবৃন্দের হিন্দু-বিরোধী নীতিকে প্রতিহত করতেই সৃষ্টি হয়েছিল এবং যখন-ই এর অস্তিত্বের কারণগুলি দূরীভূত হবে, তখন-ই স্বয়ংক্রিয়ভাবে এর অবলুপ্তি ঘটবে। কিন্তু হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যদি ভিন্নতর হয়, তবে এটা পরিষ্কার যে এই সংস্থা কোনও শূন্যগর্ভ আবেগ-নির্ঝরের ফলশ্রুতি নয়, যার উদ্দেশ্য কোনও বিক্ষোভ প্রশমন করা অথবা কোনও মরশুমি দলকে প্রতিহত করা। আসলে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এসে পড়লে ব্যক্তিগত বা সামাজিক কোনও জীবন্ত প্রতিষ্ঠান, অস্তিত্ব রক্ষায় যার অধিকার আছে, অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক প্রচেষ্টা চালাবেই। হিন্দু জাতিও কংগ্রেসের মেকি জাতীয়তাবাদের শ্বাসরোধকারী কবল থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক যুগের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নতুন হাতিয়ার তুলে নিয়েছে। এই হাতিয়ার-ই হিন্দু মহাসভা। কোনও ক্ষণজীবী ঘটনা হিসাবে নয়, জাতীয় জীবনের মৌলিক প্রয়োজন হিসাবে এর উৎপত্তি। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের গঠনমূলক দিকগুলি পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করে যে জাতীয় জীবনের মতই অবিচ্ছেদ্য এই সংস্থা। তা ছাড়া পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক ঘটনা স্রোতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হিন্দু সমাজের এমন-ই একটি একান্ত হিন্দু সংগঠনের প্রয়োজন ছিল যা হিন্দু স্বার্থ রক্ষা করবে এবং হিন্দু ধর্মকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবে, অথচ কোনও নৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তিগত অধীন হবে না কারোর কাছে এবং অ-হিন্দু কোনও প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতাও করবে না। হিন্দুস্থানের শুধুমাত্র বর্তমান রাজনৈতিক পরাধীনতার সময়েই নয়, আগামী কয়েক শতাব্দী ধরে, এমনকি হিন্দুস্থানের আংশিক বা পূর্ণ স্বাধীনতা এলেও, এর রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণে কোনও জাতীয় সংসদের সৃষ্টি হলেও, হিন্দুস্থানের প্রবেশদ্বার নজর মিনারের কাজ করার জন্য হিন্দু মহাসভার মতো সংস্থার প্রয়োজনীয়তা থাকবে'।

পৃথিবীতে কোনও মহাপ্লাবনের মতোও শক্তি যতদিন না অপ্রত্যাশিতভাবে সব কিছু রাজনৈতিক অবস্থাকে তছনছ করে দিচ্ছে, ততদিন আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে আশা করতে পারি যে, হিন্দুরা ইংল্যান্ডের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং ওয়েস্ট মিন্স্টার ধরনের স্বায়ত্ত শাসন ভারতের জন্য মঞ্জুর করতে বাধ্য করবে। এমন-ই এক স্বায়ত্ত শাসিত ভারতবর্ষে কোনও একটি জাতীয় সংসদ-ই হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি বা অবনতি প্রতিফলিত করবে। কোনও বস্তুবাদী অন্ধভাবে এই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিতে পারবে না যে অঞ্চল-বহির্ভূত আকৃতি এবং ভারতকে একটি মুসলমান রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার ইচ্ছা মুসলমানদের ও হিন্দুদের মুখোমুখি সংঘর্ষের মধ্যে নিয়ে আসবে এবং এমনকি স্বায়ত্ত শাসনের মধ্যেও গৃহযুদ্ধ ঘটতে

পারে অথবা মুসলমানদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আমন্ত্রিত হয়ে বহিঃশত্রু আক্রমণ করতে পারে। আবার এমন সম্ভাবনাও আছে যে অন্তত শতাব্দীকাল ধরে চলবে ধর্মোন্মাদ দাঙ্গা-হাঙ্গামা কিংবা আইনসভা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক সুযোগ দাবির হুড়োহুড়ি, অথবা অভ্যন্তরীণ শান্তি বিঘ্নকারী দীর্ঘস্থায়ী বিপদের আশঙ্কা। এই সম্ভাবনাকে নির্মূল করতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে হিন্দুস্থান একটি স্বশাসিত রাষ্ট্রের মর্যাদা পেলেও হিন্দু মহাসভার মতো শক্তিশালী ও হিন্দু সংগঠন সমস্ত শক্তির উৎস হিসাবে বিবেচিত হবে। যৌথ সংসদ যা পারে না, হিন্দুদের বিক্ষোভকে সোচ্চার করে, তাদের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে এবং বিদেশি শক্তির বিশ্বাসঘাতক আমন্ত্রণকে প্রতিহত করে হিন্দু মহাসভা তাই করতে পারে।

'কানাডা, প্যালেস্টাইন অথবা তরুণ তুর্কিদের আন্দোলনের ইতিহাস প্রমাণ করে যে প্রত্যেক দেশে, যেখানে ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মতো দুটি বা তার বেশি জাতি আছে, সেখানে যারা বুদ্ধিমান তারা তাদের কঠোরভাবে নিজস্ব একটি শক্তিশালী ও সতর্ক সংগঠন প্রস্তুত রাখে, যাতে বিরোধী দলের ক্ষমতা দখল বা বিশ্বাসঘাতকতার মোকাবিলা করা যায়, বিশেষত সেই বিরোধী দলের যদি অঞ্চল-বহির্ভূত কোনও রাষ্ট্রের প্রতি ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক দুর্বলতা থাকে'।

হিন্দুস্থান ও হিন্দু মহাসভার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে শ্রী সভারকর স্বরাজ সম্পর্কে তাঁর মতামত জানিয়েছেন। তাঁর মতে :*

'ভারতে বসবাসকারী অথবা অনাবাসী কারও কর্তৃত্ব না মেনে যে অবস্থায় হিন্দুর 'হিন্দুত্ব' স্বাভাবিকভাবে স্ফুরণের সুযোগ পায়, সেই অবস্থাকেই বলা যায় হিন্দুদের স্বরাজ। আঞ্চলিক জন্মসূত্রে কোনও কোনও ইংরেজও ভারতীয় হতে পারে, কিন্তু সেজন্য কি তাদের কর্তৃত্ব মেনে হিন্দুর স্বরাজ আসবে? ঔরঙ্গজেব অথবা টিপু ছিলেন বংশানুক্রমিকভাবে ভারতীয়, কারণ তাঁরা ছিলেন তাঁদের ধর্মান্তরিতা মাতার সন্তান। তার অর্থ কি এটা হতে পারে যে, ঔরঙ্গজেব বা টিপুর শাসন-ই হিন্দুদের কাছে স্বরাজ? না। যদিও তাঁরা আঞ্চলিকতার হিসাবে ছিলেন ভারতীয়, কিন্তু তাঁরা ছিলেন হিন্দু রাজত্বের নিকৃষ্ট শত্রু এবং সেজন্যই মুসলমান আধিপত্য খর্ব করে প্রকৃত হিন্দু স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে শিবাজি, গোবিন্দ সিং, প্রতাপ অথবা পেশোয়াদের প্রয়োজন হয়েছিল'।

স্বরাজের অংশ হিসাবে শ্রী সভারকর দুটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন। প্রথমত, ভারতের সঠিক নামকরণ 'হিন্দুস্থান' করার ব্যাপারে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

---

* ভাষণ : কলকাতায় ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে।

'আমাদের দেশের নামকরণ অবশ্যই 'হিন্দুস্থান' হবে। মূল শব্দ 'সিন্ধু' থেকে ইন্ডিয়া, হিন্দু ইত্যাদি যে সব নাম এসেছে, সেগুলি ব্যবহার করা যায়, তবে সব-ই নির্দেশ করে সেই এক-ই দেশকে, যা হল হিন্দুদের স্থান, অর্থাৎ হিন্দুদের আবাসস্থল। আর্যভট্ট, ভারতভূমি ইত্যাদি কয়েকটি প্রাচীন নাম মাতৃভূমির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন করবে এবং সাংস্কৃতিক আলোক প্রাপ্ত মানুষের কাছে তার আবেদন অব্যাহত থাকবে। সুতরাং হিন্দুদের মাতৃভূমিকে 'হিন্দুস্থান' ছাড়া অন্য কিছু ভাবাই যায় না। অ-হিন্দু মানুষের কাছে এটি অবশ্যই কোনও অপমান বা অনুপ্রবেশ নয়। যুক্তিটি এত বৈধ যে পার্সি ও খ্রিস্টানরা সাংস্কৃতিক দিক থেকে আমাদের সঙ্গে একাত্ম বোধ করে এবং ইঙ্গ-ভারতীয়রাও এরকম অনুভূতিকে অস্বীকার করতে পারে না। গোপন করে লাভ নেই, আমাদের কিছু কিছু মুসলমান ভাই হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ক্ষেত্রে তিলকে তাল করে দেখে। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত, মুসলমানরা শুধু ভারতেই বাস করে না, এবং ভারতীয় মুসলমানরাই কেবলমাত্র ইসলামে বিশ্বাসী নির্ভীক জনসমষ্টির অবশিষ্টাংশ নয়। চিনে কোটি কোটি মুসলমান আছে। গ্রিস, প্যালেস্টাইন এবং এমনকি হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডেও হাজার হাজার মুসলমান বাস করে। কিন্তু এই সব দেশে তারা এতটাই সংখ্যালঘু যে তাদের বসবাসের হেতু হিসাবে তারা ঐ সব দেশের নাম পরিবর্তনের দাবি করতে পারে না। পোলদের দেশ পোল্যান্ড এবং গ্রিসিয়ানদের দেশ গ্রিস। সেখানকার মুসলমানরা সে দেশের নাম বিকৃত করতে সাহস পায় নি, ক্ষেত্র বিশেষে তারা পোলিস মুসলমান, গ্রিসিয়ান মুসলমান অথবা চাইনিজ মুসলমান হিসাবে পরিচিতি নিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছে। আমাদের মুসলমানরাও তেমনি জাতীয়তা ও আঞ্চলিকতার দিক থেকে তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে তারা যেমন চায় তেমনি নিজেদের হিন্দুস্থানি মুসলমান নামে পরিচিত হতে পারে। কিন্তু ভারতে তাদের অভিযানের সময় থেকেই স্বেচ্ছায় তারা নিজেদের শুধু 'হিন্দুস্থানি' বলে আসছে'।

'কিন্তু এ সব সত্ত্বেও কিছু কোপন স্বভাবের মুসলমান আমাদের দেশের নামকরণ নিয়ে আপত্তি তুলছে। নিজেদের বিবেকের কাছে এজন্য আমাদের ভীরুতা প্রকাশের কোনও প্রয়োজন নেই। ঋক্‌বেদের সময়কার সিন্ধু থেকে আধুনিক সময়কার হিন্দু পর্যন্ত যে ধারাবাহিকতা আছে, তাকে মেনেই আমাদের মাতৃভূমির নামকরণ অবশ্যই হবে 'হিন্দুস্থান'। যেমন জার্মানদের জন্মভূমি জার্মানি, ইংরেজদের ইংল্যান্ড, তুর্কিদের তুর্কিস্তান, আফগানদের আফগানিস্তান, ঠিক সেই কারণেই পৃথিবীর মানচিত্রে সর্বকালের জন্য অবশ্যই থাকবে হিন্দুদের দেশ 'হিন্দুস্থানের' নাম। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতকে পবিত্র ভাষা হিসাবে, হিন্দিকে জাতীয় ভাষা হিসাবে ও নাগরী অক্ষরকে হিন্দু রাজত্বে

অপরিবর্তিত রাখতে হবে।

'সংস্কৃত হবে আমাদের দেবভাষা* বা পবিত্র ভাষা, সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন ও লালিত সংস্কৃত-নিষ্ঠ হিন্দি আমাদের রাষ্ট্রভাষা,** আমাদের প্রচলিত জাতীয় ভাষা। বিশ্বের সমৃদ্ধতম ও প্রাচীনতম রুচিসম্পন্ন ভাষা হিসাবেই নয়, হিন্দুদের কাছে সংস্কৃত পবিত্রতম ভাষা। আমাদের শাস্ত্র, ইতিহাস, দর্শন এবং কৃষ্টির মূল সংস্কৃত সাহিত্যের এত গভীরে বিস্তৃত হয়ে গেছে যে, এই ভাষা আমাদের জাতির মস্তিষ্ক গঠন করে। আমাদের অধিকাংশ মাতৃভাষাকেই সংস্কৃত স্তন্যদানে লালিত করেছে। আজ সব হিন্দু ভাষা সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন অথবা লালিত হোক না কেন, এই ভাষার উপরেই নির্ভরশীল। হিন্দু যুবকদের ঐতিহ্য শিক্ষাক্রমে তাই সংস্কৃত একটি অপরিহার্য উপাদান'।

'হিন্দিকে হিন্দুরাজত্বের জাতীয় ভাষা* হিসাবে গ্রহণের মধ্যে কিন্তু অন্য কোনও প্রাদেশিক ভাষাকে অমর্যাদা করা হবে না। হিন্দির মতোই সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাগুলির সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠ এবং এগুলি তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে বিকশিত হয়ে উঠবে। বাস্তবিক পক্ষে এদের মধ্যে কিছু ভাষা আজ সাহিত্যে অনেক অগ্রণী ও সমৃদ্ধ। কিন্তু সব দিক বিচার করে বলা যায় হিন্দিই পারে শ্রেষ্ঠ হিন্দু ভাষা হিসাবে তার উদ্দেশ্য সফল করতে। এ সঙ্গে এটাও মেনে নিতে হবে যে, হিন্দিকে জাতীয় ভাষার নামে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। ইংরেজদের অথবা মুসলমানদের ভারতে আগমনের বহু আগে থেকে সারা হিন্দুস্থানে জাতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে হিন্দি। হিন্দু তীর্থযাত্রী, ব্যবসায়ী, সৈনিক, পর্যটক কিংবা পণ্ডিতরা বাংলা থেকে সিন্ধুপ্রদেশে এবং কাশ্মীর থেকে রামেশ্বর পর্যন্ত পরিভ্রমণ করলেও এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলের ভাষাগত সমস্যার সমাধান করে হিন্দি। হিন্দু বৌদ্ধিক জগতে সংস্কৃত যেমন জাতীয় ভাষা, তেমন-ই অন্তত এক হাজার বছর ধরে হিন্দু সমাজে হিন্দিই হল জাতীয় ভাষা'...।

'হিন্দি বলতে অবশ্য সংস্কৃত-নিষ্ঠ হিন্দিকেই বুঝানো হচ্ছে, মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী রচিত 'সত্যার্থ প্রকাশ' যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একটিও অপ্রয়োজনীয় বিদেশি শব্দ না নিয়ে কত সহজ ও অমলিন এবং প্রকাশযোগ্য ভাষা হল হিন্দি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় স্বামী দয়ানন্দজি ছিলেন প্রথম হিন্দু নেতা যিনি এই মত অত্যন্ত সচেতন ও স্পষ্টভাবে পোষণ করতেন যে, হিন্দিই ভারতের জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত।

* দেবতাদের ভাষা।

** মূলত সংস্কৃত।

*** National Language.

বর্ণসংকর হিন্দুস্থানি ভাষার সঙ্গে অবশ্য সংস্কৃত-নিষ্ঠ হিন্দির কোনও সম্পর্ক নেই, যদিও সেটি 'ওয়ার্ধা পরিকল্পনা'র দ্বারা লালিত ছিল। এটির ভাষাগত দৈত্যাকৃতি থাকলেও নির্মমভাবে এটিকে দমন করা উচিত। শুধু তাই নয়, সমস্ত হিন্দু প্রাদেশিক অথবা স্থানিক ভাষা থেকে আরবীয় অথবা ইংরেজি শব্দগুলি, যেগুলি অপ্রয়োজনীয় বিদেশি শব্দ, সেগুলিকে উচ্ছেদ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য'।...

'... আমাদের সংস্কৃত বর্ণমালার ক্রমবিন্যাস ধ্বনিবিজ্ঞানের দিক থেকে এত বেশি নিখুঁত যে বিশ্বে এমনটি এখনও তৈরি হয়নি। আমাদের সাম্প্রতিক ভারতীয় লিপিগুলিও এর অনুসারী। নাগরী লিপিও এই ক্রমের অনুসরণ করে। হিন্দি ভাষার মতোই নাগরী লিপিও হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তত দু'হাজার বছর ধরে এত জনপ্রিয়ভাবে প্রচলিত যে একে 'শাস্ত্রী লিপি' অর্থাৎ হিন্দু শাস্ত্রের লিপি বলা হয়। ... সাধারণ জ্ঞান থেকে এটা বলা যায় যে বাংলা কিংবা গুজরাটি যদি নাগরী লিপিতে ছাপা হয়, তা হলে অন্য অনেক প্রদেশের পাঠকের কাছে তা বোধগম্য হবে। সারা হিন্দুস্থানে একটি মাত্র সাধারণ ভাষা প্রচলিত থাকবে—এমন ধারণা অবাস্তব এবং অবিবেচনা প্রসূত। কিন্তু সারা হিন্দু রাজত্বে একটি মাত্র লিপি হিসাবে নাগরী লিপির অস্তিত্বের কথা চিন্তা করা হবে খুব-ই বাস্তব। তবু একথা মনে রাখতে হবে, যে আমাদের বিভিন্ন প্রদেশে যে বিভিন্ন হিন্দু লিপি প্রচলিত আছে, তাদের নিজস্ব ভবিষ্যৎ আছে এবং নাগরীর সঙ্গে তারাও ক্রমোন্নত হতে পারে। হিন্দুরাজের স্বার্থে যা এখনই দরকার তা হল হিন্দু ছাত্র সমাজের কাছে হিন্দিভাষার সঙ্গে নাগরী লিপিকে একটি অবশ্যপাঠ্য বিষয় হিসাবে ঘোষণা করা'।

স্বরাজের অধীনে অ-হিন্দু সংখ্যালঘুদের কথা শ্রী সভারকর* কী চিন্তা করেছিলেন? এই প্রশ্নে তাঁর বক্তব্য হল :

'হিন্দু মহাসভা যখন 'এক ব্যক্তি এক ভোট' নীতি শুধু গ্রহণই করেনি, তাকে অব্যাহত রাখারও ব্যবস্থা নিয়েছে, এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকের মধ্যে মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য সমবণ্টনের মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে কেবলমাত্র মেধাভিত্তিক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তখন নীতিগতভাবে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার কথা আবার বলা শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, পরস্পর বিরোধীও। কারণ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আবার সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর চেতনা জেগে উঠবে তাতে। কিন্তু বাস্তব রাজনীতি যেহেতু দাবি করে এবং হিন্দু সাংগঠনিক নেতারা সংখ্যালঘুদের মনে সামান্যতম সন্দেহও রাখতে চান না, সেহেতু আমরা যথেষ্ট জোর দিয়েই

* হিন্দু মহাসভার ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত অধিবেশনে ভাষণ।

বলতে চাই যে, ধর্ম সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে সংখ্যালঘুদের বৈধ অধিকারগুলি সুরক্ষিত থাকবে এই শর্তে যে, সংখ্যাগুরুদের সমান অধিকারগুলিও কোনওভাবে লঙ্ঘিত বা উচ্ছেদ হবে না। প্রত্যেক সংখ্যালঘু স্বতন্ত্র শিক্ষালয়ে তাঁর সন্তান সন্ততিকে তাঁর নিজস্ব ভাষা, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ভাবধারায় শিক্ষিত করে তুলতে পারবেন সরকারি তহবিলে তিনি যে অনুপাতে কর দিচ্ছেন সেই পরিমাণে। অবশ্য সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও এই একই নীতি প্রযোজ্য হবে।

'এ ছাড়া যদি সংবিধান যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীরও 'এক ব্যক্তি এক ভোট'-এর অবিমিশ্র জাতীয় নীতির ভিত্তিতে গঠিত না হয়ে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত হয়, তবে যে সংখ্যালঘু পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী অথবা সংরক্ষিত আসন .চাইবেন, তাঁদের জনসংখ্যার সঙ্গে সমানুপাতিক ভিত্তিতে তা দেওয়া হবে এই শর্তে যে, জনসংখ্যার সমানুপাতিক বিচারে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ও এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে না'।

সংখ্যালঘুদের জন্য এই রকম ব্যবস্থার কথা বলে শ্রী সভারকর* উপসংহারে বলেছেন স্বরাজ সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনায় :

'জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানরা ভারতে সমান সংরক্ষণ ও নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারবে। সংখ্যাগুরু হিন্দুরা কোনও সংখ্যালঘু অ-হিন্দুর ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই হিন্দুরা তাদের ন্যায্য অধিকার ছাড়বে না, যে-অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুবাদে যে-কোনও গণতান্ত্রিক ও বৈধ সংবিধানে তারা ভোগ করার অধিকারী। সংখ্যালঘু হবার কারণে মুসলমানরা হিন্দুদের বাধিত করেনি, তাই আনুপাতিক পরিমাণে তারা যে মর্যাদা, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করছে, তাতেই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠদের বৈধ অধিকার বা সুযোগ সুবিধার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে তাকে স্বরাজ্য আখ্যা দেবার কোনও অধিকার মুসলমান সংখ্যালঘুদের থাকবে না। হিন্দুরা শুধু শাসক বদল চায় না। কোনও এক ঔরঙ্গজেব যেহেতু ভারতের সীমানার মধ্যে জন্মেছেন, সুতরাং কোনও এক এডওয়ার্ডের জায়গায় তাঁকে অভিষিক্ত করা হবে না। তাদের নিজভূমিতে, নিজগৃহে তারা এখন থেকে নিজেদেরই প্রভু হতে চায়'।

এ ছাড়া যেহেতু শ্রী সভারকর হিন্দুরাজের ছাপ স্বরাজের মধ্যে দেখতে চান, তাই তাঁরও ইচ্ছা, ভারতের নাম হোক হিন্দুস্থান। এই পরিকাঠামোর সমর্থনে শ্রী সভারকর দুটি যুক্তির কথা বলেছেন, যা তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ মৌলিক।

---

* ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত অধিবেশনে ভাষণ।

প্রথম যুক্তি হল, হিন্দুরা নিজেরাই একটি জাতি। বিশদ ব্যাখ্যা ও তীব্র যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলেছেন :

'নাগপুর সভাপতির ভাষণে আমি নির্ভয়ে সাম্প্রতিক রাজনীতির ইতিহাসে প্রথম বলেছি যে, আঞ্চলিক ঐক্য ও সাধারণ বাসস্থান একটি জাতিগঠনে একমাত্র উপাদান—এরকম অবিবেচক ধারণা পোষণ করে কংগ্রেসি আদর্শ শুরু থেকেই কলঙ্কিত হয়েছে। যে-ইউরোপ থেকে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব ভারতে আমদানি করা হয়েছিল, সেই ইউরোপেই এই তত্ত্ব প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে এবং বর্তমান যুদ্ধ এই ধারণাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে আমার মতকেই সমর্থন করেছে। অন্য কোনও মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ না থেকে শুধুমাত্র আঞ্চলিক ঐক্যের ভিত্তিতে জাতিগঠনের প্রত্যেকটি চেষ্টা তাসের প্রাসাদের মত ভেঙে পড়েছে। কোনও সাংস্কৃতিক, জাতিগত বা ঐতিহাসিক মিল ছাড়া এবং একটি জাতিতে পরিণত হবার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া শুধুমাত্র আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের চোরাবালির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত একটি খিঁচুড়ি জাতিগঠনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে পোল্যান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া মূর্তিমান সর্তকবাণী। চুক্তি-ভিত্তিক এই সব জাতি প্রথম সুযোগেই ভেঙে পড়েছিল। তাদের মধ্যে জর্মন অংশ জার্মানিতে, রাশিয়ানদের অংশ রাশিয়াতে, চেকদের অংশ চেকে এবং পোলদের অংশ পোলে মিশে গেছে। আঞ্চলিকতার চেয়েও সাংস্কৃতিক, ভাষাগত, ঐতিহাসিক এবং এরকমের ঘনিষ্ঠতাই বেশি শক্তিশালী প্রমাণ হয়েছে। গত তিন-চার শতাব্দী ধরে ইউরোপে কেবল সেই সব জাতিই তাদের ঐক্য ও অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে, যারা আঞ্চলিক ঐক্য ছাড়াও জাতিগত, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক এবং এরকম ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখতে পেরেছে এবং এসব ছাড়াও একটি সমশ্রেণীভূক্ত জাতিতে পরিণত হয়ে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, পর্তুগাল ইত্যাদি দেশে জাতি গঠন করেছে'।

'এমন একটি সমশ্রেণীভূক্ত ও জীবনীশক্তি সম্পন্ন জাতি গঠনে এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে বলা যায়, ভারতে হিন্দুরা নিজেরাই একটি স্থায়ী জাতি। শুধু একটি সাধারণ আঞ্চলিক ঐক্যের দ্বারাই আমরা আবদ্ধ নই, আমরা এক মহান দেশের অধিবাসী বলে নিজেদের মনে করি, যাকে পিতৃভূমি বলা যায়। এই ভারতভূমি, এই হিন্দুস্থানে ভারত আমাদের একদিকে 'পিতৃভূ' আবার অন্যদিকে 'পুণ্যভূ'। আমাদের দেশাত্মবোধের সুতরাং কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সংখ্যাতীত শতাব্দী ধরে আমরা পরস্পরের সঙ্গে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, ঐতিহাসিক, ভাষাগত এবং জাতিগত বন্ধনে এমনভাবে ঘনিষ্ঠ যে, একটি সমশ্রেণীভূক্ত প্রাণোচ্ছল জাতি গঠন করে আমরা একটি সাধারণ জাতীয় জীবনে সংঘবদ্ধ হতে ইচ্ছুক। হিন্দুরা কোনও চুক্তিভিত্তিক

জাতি নয়—এক জীবন্ত জাতীয় সত্তা'।

'আর একটি প্রাসঙ্গিক দিক এখানে উল্লেখ করা দরকার, যেটি বিশেষত আমাদের কংগ্রেসি হিন্দু ভাইদের বিভ্রান্ত করে। যে একাত্মবোধ মানুষকে একটি জাতীয় জীবনে আবদ্ধ করে তার অর্থ শুধু যে নিজেদের মধ্যে ধর্মীয়, ভাষাগত বা জাতিগত বৈষম্যের অবসান তাই নয়, তার অর্থ হল অপর জাতির সঙ্গে নিজেদের পার্থক্য বজায় রাখা। এমনকি ব্রিটিশ অথবা ফরাসিদের মতো ঐক্যবদ্ধ জাতির মধ্যেও ধর্মীয় ভাষাগত বা সাংস্কৃতিক বৈষম্য এবং নিজেদের মধ্যে সহানুভূতির অভাব আছে। অন্য জনসমষ্টি থেকে নিজেদের পৃথক করে সমজাতীয়তা প্রকাশ করার নাম-ই জাতীয় সমগোত্রতা'।

'যখন-ই কোনও অ-হিন্দু জনসমষ্টি, যেমন ইংরেজ, জাপানি অথবা এমনকি ভারতীয় মুসলমান, এদের বিপক্ষে নিজেদের দাঁড় করাই, তখনই আমাদের মধ্যে হিন্দু হিসাবে হাজার একটি পার্থক্য থাকলেও ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, জাতিগত অথবা ভাষাগত বন্ধনে আমরা আবদ্ধ হয়ে যাই। এজন্যই আজ আমরা হিন্দুরা কাশ্মীর থেকে মাদ্রাজ, সিন্ধু থেকে অসম পর্যন্ত একটি মাত্র জাতিতে পরিণত'। ...

দ্বিতীয় যে যুক্তির উপর শ্রী সভারকর তাঁর পরিকল্পনা গঠন করেছেন তা হল, 'হিন্দু' শব্দের সংজ্ঞা সংক্রান্ত। তাঁর মতে 'হিন্দু' হল এমন এক জন :

'... যে সিন্ধু থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিশাল ভারতভূমিকে নিজের পবিত্র পিতৃভূমি অর্থাৎ তার ধর্মের উৎপত্তিস্থল ও বিশ্বাসের জন্মভূমি বলে মনে করে'।

সুতরাং বৈদিক ধর্ম, সনাতন ধর্ম, জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, শিখ, আর্য সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ, দেব সমাজ এবং ভারতের অন্যান্য ধর্ম—সব মিলেই হিন্দুরাজ অর্থাৎ হিন্দু জনসমষ্টি।

একইভাবে তথাকথিত আদিবাসী বা পার্বত্য উপজাতিরাও হিন্দু, কারণ তারা যে ধর্মেরই উপাসক হোক না, ভারত তাদের কাছেও পবিত্র পিতৃভূমি।

সংস্কৃতে এই সংজ্ঞাটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় :

'আসিন্ধু সিন্ধ পত্যংতা যস্ম ভারত ভূমিকা।
পিতৃভূঃ পুণ্যভূ শ্চৈব স বৈ হিন্দুরিতিস্মৃতঃ'।।

'সরকারের উচিত এই সংজ্ঞাকে স্বীকৃতি দেওয়া যাতে ভবিষ্যতে সরকারি আদম শুমারিতে হিন্দু জনসংখ্যা গণনায় 'হিন্দুত্ব'কে বিচার করা যায়'।

যথেষ্ট যত্ন ও সাবধানতার সঙ্গে 'হিন্দু' শব্দের এরকম সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। শ্রী সভারকরের দুটি উদ্দেশ্য এখানে খুব-ই স্পষ্ট। প্রথমত, হিন্দুত্ব অর্জনের পক্ষে ভারতকে একটি পবিত্র দেশ হিসাবে গণ্য করার শর্তের মাধ্যমে মুসলমান, খ্রিস্টান, পার্সি ও ইহুদিদের বহির্ভূত করা। দ্বিতীয়ত, বেদের পবিত্রতা সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন না তুলে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ইত্যাদিদের হিন্দু শ্রেণীভূক্ত করা।

শ্রী সভারকর ও হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য ছিল এই রকম। কিন্তু এই পরিকল্পনার কিছু অসুবিধার দিকটিও সহজেই নজরে পড়ে।

প্রথম কথা, হিন্দু নিজেরাই একটি জাতি, এরকম সিদ্ধান্তের অর্থ হল মুসলমানদেরও একটি জাতি হিসাবে স্বীকার করা। এটি যে শ্রী সভারকরের মত, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। কোনও দ্বিধা নিয়ে তিনি এ মত প্রকাশ করেননি, বরং যথেষ্ট জোর দিয়ে বলেছেন, যা তিনি অবশ্যই করতে পারেন। আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে ভাষণ প্রসঙ্গে শ্রী সভারকর বলেন :

'কিছু অবিবেচক রাজনীতিক ভুল করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ভারত ইতিমধ্যেই এক ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়েছে। অথবা শুধুমাত্র ইচ্ছার সাহায্যে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করা সম্ভব। আমাদের অ-চিন্তাশীল বন্ধুরা তাঁদের স্বপ্নকে বাস্তব বলে মনে করেন। এ জন্যই তাঁরা সাম্প্রদায়িক বন্ধন সম্পর্কে অধৈর্য এবং এ জন্যই তাঁরা সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলিতে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু নির্মম বাস্তব সত্য হল, তথাকথিত সাম্প্রদায়িক প্রশ্নগুলি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে শতাব্দীব্যাপী সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও জাতীয় অসহিষ্ণুতার ফলশ্রুতি। সময় পূর্ণ হলে এগুলির সমাধান হতে পারে। কিন্তু এদের শুধুমাত্র অস্বীকার করলেই এগুলি দূরীভূত হবে না। একটি গভীর অসুখকে অগ্রাহ্য করার চেয়ে তা নির্ণয় করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই বেশি নিরাপদ। আসুন, অপ্রিয় ঘটনাগুলিকে আমরা সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করি। আজ ভারতে একটি মাত্র সমশ্রেণীভূক্ত জাতি আছে বলে ধরে নেওয়া যায় না। বিপরীতক্রমে, ভারতে প্রধানত দুটি জাতির অস্তিত্ব মানতেই হবে—হিন্দু ও মুসলমান'।

আশ্চর্যের ব্যাপার, এক জাতি বনাম দ্বি-জাতি তত্ত্বে কোনওরকম পারস্পরিক মতভেদ না রেখে শ্রী সভারকর ও শ্রী জিন্না সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করেছেন। দু'জনেই এ ব্যাপারে শুধু সম্মতই হননি, দাবিও করেছেন যে, ভারতে দুটি জাতি বর্তমান—হিন্দু ও মুসলমান। দুটি জাতি কী কী শর্তাধীনে বসবাস করবে সে ব্যাপারে

অবশ্য দু'জনের মধ্যে মতানৈক্য আছে। শ্রী জিন্না পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান এই দুই ভাগে ভারতকে বিভক্ত করে পাকিস্তানে মুসলমানদের ও হিন্দুস্থানে হিন্দুদের আবাস দেখতে চান। অন্যদিকে শ্রী সভারকর দুটি জাতির জন্য দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন না করে এক-ই দেশে একই সংবিধানের আওতায় দুটি জাতিকে রাখতে চান, সেই সংবিধান এমন হবে যাতে হিন্দুরা প্রভুত্ব করার মতো মর্যাদা পাবে এবং তাদের সঙ্গে মুসলমানদের অধীনতামূলক সহযোগিতার সম্পর্ক নিয়ে বাস করতে হবে। দুটি জাতির মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে শ্রী সভারকর 'এক ব্যক্তি এক ভোট' নীতিতেই বিশ্বাসী—সে ব্যক্তি হিন্দু হোক কিংবা মুসলমান। তাঁর পরিকল্পনায় হিন্দুরা যে সুযোগ পাবে না, মুসলমানরাও তা পাবে না। সংখ্যালঘুত্ব যেমন কোনও সুযোগ পাবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ হতে পারে না, তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে কাউকে শাস্তি দেওয়াও চলবে না। মুসলমান ধর্ম ও মুসলমান সংস্কৃতির অনুসারী রাজনৈতিক ক্ষমতা মুসলমানরা যাতে পায়, তার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা সরকার করবেন। কিন্তু প্রশাসন কিংবা আইনসভায় নিশ্চিত আসনের কোনও ব্যবস্থা সরকার মুসলমানদের জন্য করবেন না।* যদি তাঁরা এ ব্যাপারে বিশেষভাবে দাবি করেন, তবে মোট জনসংখ্যার আনুপাতিক হিসাবে এই আসন সংখ্যা স্থির করা হবে। এইভাবে যে রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা মুসলমানরা পেয়ে আসছেন, তা থেকেও তাঁদের বঞ্চিত করতে চাইছেন শ্রী সভারকর।

সংখ্যালঘুদের অধিকার সংক্রান্ত কংগ্রেসের ঘোষণা যেমন অনিয়মিত, অসার ও অনিশ্চিত, পাকিস্তানের বিকল্প হিসাবে শ্রী সভারকরের প্রস্তাবটি কিন্তু তার তুলনায় অনেক বেশি খোলামেলা, সাহসী ও নিশ্চিত। শ্রী সভারকরের প্রস্তাবে মুসলমানদের অন্তত বলা যাবে—তোমাদের জন্য এ পর্যন্ত, আর একটুও নয়। হিন্দু মহাসভার কার্যকারিতার মধ্যে মুসলমানরা তাদের প্রকৃত অবস্থানও বুঝতে পারবে। অন্যদিকে কংগ্রেসের অধীনে মুসলমানরা তাদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত নয়। কারণ কংগ্রেস মুসলমান ও সংখ্যালঘুদের প্রশ্নটিতে দু'মুখো নীতি না হলেও কূটনীতির খেলায় মেতেছে।

এক-ই সঙ্গে এটা অবশ্য বলতে হবে যে, শ্রী সভারকরের বক্তব্য যুক্তিহীন। তিনি স্বীকার করেছেন যে মুসলমানরা একটি পৃথক জাতি। তাদের সাংস্কৃতিক স্বায়ত্ত

উল্লেখ্য যে, শ্রী সভারকর মুসলমানদের জন্য আলাদা নির্বাচকমণ্ডলীর বিরোধিতা করেন নি। কিন্তু মুসলমানদের জন্য তিনি আলাদা নির্বাচকমণ্ডলী চান কি না হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্যে, সে ব্যাপারেও স্পষ্ট বক্তব্য রাখেন নি।

শাসনকেও তিনি মেনে নিয়েছেন। তাদের একটি জাতীয় পতাকাতেও তাঁর আপত্তি নেই। তবু মুসলমানদের একটি পৃথক রাষ্ট্রের দাবি তিনি মানছেন না। যদি হিন্দু জাতির জন্য তিনি একটি জাতীয় আবাসস্থল চান, তাহলে মুসলমানদের দাবি তিনি অগ্রাহ্য করবেন কী করে?

অসামঞ্জস্যতাই কিন্তু শ্রী সভারকরের বক্তব্যের একমাত্র ত্রুটি নয়। শ্রী সভারকর তাঁর বক্তব্য প্রচারকালে ভারতের নিরাপত্তাকেও বিপজ্জনক অবস্থায় ফেলে দিয়েছেন। এক-ই দেশে এক-ই সংবিধানের অধীনে থেকে একটি সংখ্যাগুরু জাতি সংখ্যালঘু জাতির সঙ্গে কিরকম আচরণ করবে এ বিষয়ে ইতিহাসের দুটি পথ নির্দেশ আছে। একটি হল, সংখ্যালঘু জাতির জাতীয়তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে সংখ্যাগুরুর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া, যাতে দুটির বদলে মাত্র একটি জাতির অস্তিত্ব থাকে। সংখ্যালঘুদের ভাষাগত, ধর্মগত বা সাংস্কৃতিক কোনও অধিকার না দিয়ে সংখ্যাগুরুর ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে এটা সম্ভব করা যায়। অন্য উপায় হল, দেশকে দু'টুকরো করে সংখ্যালঘুদের পৃথক, স্বয়ং শাসিত ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের অনুমতি দেওয়া ও সংখ্যাগরিষ্ঠদের কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা। অস্ট্রিয়া ও তুর্কিস্তানে প্রথমে আগেরটি এবং সেটি ব্যর্থ হলে পরে দ্বিতীয় উপায়টি প্রয়োগ করা হয়।

শ্রী সভারকর দুটি পথের কোনওটিকেই গ্রহণ করেননি। মুসলমান জাতির ওপর দমন পীড়নে তাঁর সমর্থন নেই। বরং তাদের ধর্ম, ভাষা এবং কৃষ্টি—যা একটি জাতির গঠনে সাহায্য করে—সেগুলিকে লালন করেছেন। এক-ই সঙ্গে তিনি দেশকে খণ্ডিত করতে রাজি হননি, যাতে দুটি জাতির প্রত্যেকেই পৃথক, স্বশাসিত এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে পারে। তিনি চান, হিন্দু ও মুসলমানেরা দুটি পৃথক জাতি হিসাবে এক-ই দেশে বাস করুক। প্রত্যেকের-ই থাক নিজস্ব ধর্ম, ভাষা ও কৃষ্টির অধিকার। একটি মাত্র জাতির লক্ষ্যে সংখ্যালঘুদের ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠদের দমনমূলক তত্ত্বটি বুঝা যায়, এমনকি এই তত্ত্বের চাতুর্যের দিকটির প্রশংসার যোগ্য। কারণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দমন করে এই তত্ত্বে, একটি মাত্র জাতির গঠনে প্রয়াস আছে। কিন্তু এই তত্ত্বে যা দুর্বোধ্য তা হল, দুটি পৃথক জাতির কথা স্বীকার করেও তাদের বিচ্ছেদের কথাটি এখানে বলা হয়নি। তত্ত্বটি বোধগম্য হত যদি দুটি জাতি পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও শ্রদ্ধা নিয়ে বাস করত। কিন্তু তা তো হবার নয়, কারণ শ্রী সভারকরই মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের সমকর্তৃত্ব দিতে রাজি নন। হিন্দু জাতিকে প্রধান ও মুসলমানদের অপ্রধান হিসাবেই দেখতে চান তিনি। দুটি জাতির মধ্যে এভাবে বিদ্বেষের বীজ বপন করে শ্রী সভারকর কীভাবে আশা করল যে তারা এক-ই দেশে এক সংবিধানের আওতায় বসবাস করবে?

কোনও নতুন সমাধানসূত্র খুঁজে বার করার কোনও কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন না শ্রী সভারকর। তবে এটা বুঝাই কষ্টকর, কী করে তিনি নিজের সূত্রটিকে সঠিক বলে মনে করলেন। পুরনো অস্ট্রিয়া এবং তুর্কিস্তানকে তিনি তাঁর স্বরাজের মডেল বা আদর্শ হিসাবে বেছে নিয়েছেন। ঐ দুটি দেশে দুই জাতির অস্তিত্ব দেখে এবং প্রধান সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি ও অপ্রধান সংখ্যালঘু জাতিকে এক-ই সংবিধানের অধীনে বাস করতে দেখে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন অস্ট্রিয়া ও তুর্কিস্তানে যদি এটা সম্ভব হয়, তাহলে ভারতেই বা হবে না কেন?

শ্রী সভারকর তাঁর তত্ত্বের সমর্থনে প্রাচীন অস্ট্রিয়া এবং তুর্কিস্তানকে আদর্শ হিসাবে বেছে নিয়েছেন—এটা খুব-ই বিস্ময়কর। তিনি সম্ভবত অবগত নন যে, ঐ দুটি দেশের এখন আর অস্তিত্ব নেই। দুটি দেশের ধ্বংসের মূলে যে শক্তিগুলি ছিল, তার সম্পর্কেও শ্রী সভারকরের কিছু জানা আছে বলে মনে হয় না। যে প্রাচীন ইতিহাস তাঁর খুব প্রিয়, তার সম্পর্কে পড়াশোনার বদলে তিনি যদি বর্তমানের দিকে বেশি মনোনিবেশ করতেন, তাহলে তিনি দেখতে পেতেন, একটি প্রধান জাতির প্রভুত্বে প্রধান ও অপ্রধান জাতি দুটির এক-ই সংবিধানের অধীনে বাস করার স্বরাজ সম্পর্কিত পরিকল্পনার ফলেই দেশ দুটি ধ্বংস হয়েছে, যে পরিকল্পনাকে হিন্দু রাজত্বে গ্রহণ করতে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন।

ভারতের কাছে অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং তুর্কিস্তানের বিপর্যয়ের ইতিহাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু মহাসভার সদস্যদের এই ইতিহাস ভালো করে পড়া দরকার। এ সম্পর্কে আমি বিস্তৃত কিছু বলব না, কারণ তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অন্য পরিচ্ছেদে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এটা বলাই এখানে যথেষ্ট হবে যে, শ্রী সাভারকরের স্বরাজ চিন্তা মুসলমানদের উপর হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে হিন্দুদের গর্বই বাড়িয়ে তুলবে এবং তাদের একটি সাম্রাজ্যবাদী জাতিতে পরিণত করবে। কিন্তু হিন্দুদের সম্পর্কে এতে কোনও স্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হবে না। এর সহজ কারণ হল, এমন ভয়ঙ্কর এক বিকল্পের প্রতি মুসলমানরা স্বেচ্ছায় আনুগত্য প্রকাশ করবে না।

৩

তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে মুসলমান প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, এ ব্যাপারে শ্রী সভারকরের কোনও ধারণা ছিল না। পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করে তিনি মুসলমানদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছেন যেন একটি চিঠির মোড়কে, যার ওপর লেখা—'গ্রহণ কর অথবা বর্জন কর'। স্বরাজ অর্জনের প্রশ্নে মুসলমানদের অংশ গ্রহণে অস্বীকারকে

তিনি আমল-ই দেননি। হিন্দুদের এবং হিন্দু মহাসভার ক্ষমতার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছেন, ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বরাজ ছিনিয়ে আনতে হিন্দুরা কোনও রকম সাহায্য ছাড়া নিজেরাই সক্ষম হবে। শ্রী সভারকর মুসলমানদের উদ্দেশে বলেছেন :

'যদি তোমরা আসো, তবে তোমাদের নিয়ে, যদি না আসো তবে তোমাদের বাদ দিয়ে এবং যদি প্রতিবাদ কর তবে সে প্রতিবাদ সত্ত্বেও হিন্দুরা তাদের জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে আপ্রাণ সংগ্রাম চালিয়ে যাবে'।

গান্ধীজি কিন্তু এমনটি করেননি। ভারতের রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরুর মুহূর্তেই যখন তিনি ছয় মাসের মধ্যে স্বরাজ অর্জনের শপথ নিয়ে চমকের সৃষ্টি করেন, তখন তিনি বলেন যে, কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে তিনি এই অলৌকিক কাণ্ড সম্ভব করতে পারেন। অন্যতম শর্ত ছিল হিন্দু-মুসলমান ঐক্য। অক্লান্তভাবে গান্ধীজি এই মতই প্রকাশ করেছেন যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য না হলে, স্বরাজ কখনই আসবে না। ভারতীয় রাজনীতিতে এই মতকে তিনি স্লোগান হিসাবে ব্যবহার করেননি, বরং কঠোর প্রয়াসে একে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। বলা যায়, ১৯১৯ সালের ২ মার্চ 'রাউলাট আইনে'র বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও তাঁর আন্দোলনে সকলকে সামিল হবার আহ্বান জানিয়ে গান্ধীজি রাজনৈতিক নেতা হিসাবে জীবন শুরু করেন। অবশ্য এটি ছিল স্বল্পস্থায়ী আন্দোলন। ঐ বছরেই ১৮ এপ্রিল তিনি এই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। তাঁর কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে গান্ধীজি ১৯১৯ সালের ৬ মার্চ তারিখটিকে* রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবস হিসাবে পালনের জন্য নির্দিষ্ট করেন। ঐ দিন বহু জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। জনগণ ঐ সভায় এই মর্মে শপথ নেবেন :

'ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে আমরা হিন্দু ও মুসলমানরা ঘোষণা করছি যে, আমরা পরস্পরের প্রতি সহোদর ভাইয়ের মতো আচরণ করব। আমাদের মধ্যে কোনও মত পার্থক্য থাকবে না। একের দুঃখকে আমরা অপরের দুঃখ বলে মনে করব এবং সেই দুঃখ দূর কবতে সকলে মিলে চেষ্টা করব। আমরা একে অপরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব এবং কেউ কারোর ধর্মীয় আচারে হস্তক্ষেপ করব না। ধর্মের নামে আমরা পরস্পরের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ থেকে বিরত থাকব'।

'রাউলাট আইনে'র বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে এমন কিছু ছিল না যাতে হিন্দু

* মার্চ ২৩, ১৯১৯-এর ইস্তাহার দ্রষ্টব্য।

ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধতে পারে। তবু শ্রী গান্ধী তাঁর অনুগামীদের এরকম শপথ গ্রহণ করিয়েছেন। এ থেকেই প্রমাণ হয়, একেবারে প্রথম থেকেই তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতি কতটা আগ্রহী ছিলেন।

১৯১৯ সালে মুসলমানরা 'খিলাফৎ আন্দোলন' শুরু করেন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল দুটি—খিলাফৎকে সংরক্ষণ করা এবং তুর্কি সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় রাখা। দুটি উদ্দেশ্যই সমর্থনযোগ্য নয়। যাদের স্বার্থে এই আন্দোলন, সেই তুর্কিরা সুলতানকে না চাইলেই খিলাফৎ সংরক্ষিত হবে—এ ধারণা ভিত্তিহীন। তারা চায় একটি প্রজাতন্ত্র। তাই তুর্কিস্তানকে রাজতন্ত্রের অধীনে থাকতে বাধ্য করা অযৌক্তিক। তুর্কি সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করার ব্যাপারে এত জোর দেওয়া সঠিক নয়, কারণ তার অর্থ হল বিশেষত আরবীয়দের মত বিভিন্ন জাতিদের ক্রমাগত অধীন করে রাখা, বিশেষ করে যখন এটা সর্বস্বীকৃত যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার শান্তি-চুক্তির ভিত্তি হওয়া উচিত।

মুসলমানরা এই আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু গান্ধীজি এত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে এই আন্দোলনে সামিল হন যে, মুসলমানরাও বিস্মিত হয়। অনেকে খিলাফৎ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তির প্রতি সংশয় প্রকাশ করে, গান্ধীজিকে এরকম একটি নৈতিক ভিত্তিহীন আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন। কিন্তু খিলাফৎ আন্দোলনের ন্যায়গ্রাহ্যতা সম্পর্কে তিনি এত নিশ্চিত ছিলেন যে ঐ সব পরামর্শ তিনি গ্রহণ করেননি। বারবার তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন যে, আন্দোলনটি যথেষ্ট ন্যায্য এবং এতে যোগদান করা তাঁর কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে তাঁর গৃহীত ব্যবস্থাগুলি তাঁর-ই কথায় এভাবে সংক্ষেপিত করা যায়* :

'(১) আমার মতে তুর্কিদের দাবি শুধু যে অনৈতিক বা অন্যায় নয় তাই নয়, বরং বলা যায়, এটা যথার্থ ন্যায্য একমাত্র এই কারণে যে তুর্কিস্তান তার নিজেরটুকুই রক্ষা করতে চায়। মুসলমানদের ইস্তাহার নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করেছে যে, অ-মুসলমান ও অ-তুর্কি জাতির সংরক্ষণের জন্য যে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যাতে খ্রিস্টান ও আরবরা তুর্কি সার্বভৌমত্বের অধীনেও স্বশাসিত থাকতে পারে।

(২) আমি তুর্কিদের দুর্বল, অযোগ্য বা নিষ্ঠুর মনে করি না। তারা নিশ্চয় অসংগঠিত এবং সম্ভবত উপযুক্ত নেতৃত্ববিহীন। যাদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার চেষ্টা করা হয়, তাদের বিরুদ্ধেই এই দুর্বলতা, অক্ষমতা ও নিষ্ঠুরতার অভিযোগ

* 'ইয়ং ইন্ডিয়া', জুন ২, ১৯২০

করা হয়ে থাকে। অভিযুক্ত গণহত্যা সম্পর্কে একটি তদন্ত কমিশন চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা কখনই মঞ্জুর হয়নি। যে কোনও ভাবেই নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

(৩) আমি ইতিমধ্যেই জানিয়েছি যে, ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে আমার যদি আগ্রহ না থাকত, তবে আমি অস্ট্রিয়ার অধিবাসী কিংবা পোলদের ব্যাপারে যতটা আগ্রহী, তুর্কিদের কল্যাণের ব্যাপারে তার বেশি আগ্রহী হতাম না। কিন্তু একজন ভারতীয় হিসাবে আমার স্বজাতির দুঃখ কষ্টের অংশ নিতে আমি বাধ্য। যদি আমি মুসলমানদের ভাই মনে করি, তবে সর্বশক্তি দিয়ে তার বিপদের সময় সাহায্য করতে আসা আমার কর্তব্য, যদি তাকে সমর্থন করার যুক্তিগুলি আমার কাছে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হয়।

(৪) চতুর্থত, মুসলমানদের দিকে হিন্দুরা কতটা হাত বাড়িয়ে দেয় তা দেখতে হবে। এটা তাই এখন অনুভূতি ও ব্যক্তিগত অভিমতের ব্যাপার। মহৎ কারণে মুসলমান ভাইয়ের জন্য কষ্ট করা এবং তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যতদিন তাদের কর্মসূচির মতো মহৎ থাকবে ততদিন তাদের সঙ্গে পথ চলতে আমার কোনও আপত্তি নেই। মুসলমান অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি অবশ্যই এ ব্যাপারে তাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করি যে, খিলাফৎ-এর মধ্যে একটি ধর্মীয় প্রশ্ন আছে এই অর্থে, যে এই ধর্মীয় প্রশ্ন তাদের লক্ষ্য অর্জনে জীবন দান করতেও প্রেরণা জোগায়'।

গান্ধীজি শুধু যে খিলাফৎ প্রশ্নে মুসলমানদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন তাই নয়, অন্য দিকে তিনি ছিলেন তাদের প্রকৃত পথপ্রদর্শক ও বন্ধু। খিলাফৎ আন্দোলন তাঁর ভূমিকা এবং এই আন্দোলনের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন জড়িয়ে পড়েছিল, কারণ লোকে বিশ্বাস করত যে, স্বরাজ অর্জনের স্বার্থে কংগ্রেসই অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। এই রকম চিন্তাধারা যে থাকা উচিত এটা সহজেই বুঝা যায়, কারণ অধিকাংশ মানুষ ১৯২০ সালের ৭ এবং ৮ সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন ও অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে যোগসূত্রটি লক্ষ্য করেই এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট থেকেছেন। কিন্তু কেউ যদি ১৯২০ সালের পরবর্তী অবস্থার কথা চিন্তা করেন তাহলে বুঝবেন যে, এটি আদৌ সত্য নয়। আসল সত্যটি হল, স্বরাজের জন্য কংগ্রেসের আন্দোলনে নয়, অসহযোগের উৎসটি লুকিয়ে আছে খিলাফৎ আন্দোলনের মধ্যে। খিলাফৎ-সমর্থকরা তুর্কিদের সাহায্য করতে এই আন্দোলন শুরু করেন এবং তাদের সাহায্য করতে কংগ্রেস এই আন্দোলনে সামিল হয়। খিলাফৎও

ছিল এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বরাজকে গৌণ উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাতে হিন্দুরাও এই আন্দোলন সমর্থন করে, সেই কারণে। নিচের ঘটনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

খিলাফৎ আন্দোলন শুরু হয়েছে ১৯১৯ সালের ২৭ অক্টোবর, যে দিনটি সারা ভারতে খিলাফৎ দিবস হিসাবে পালিত হয়েছিল। দিল্লিতে প্রথম খিলাফৎ সম্মেলন বসে ১৯১৯ সালের ২৩ নভেম্বর। খিলাফৎ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের অপকর্মের প্রতিকার করতে মুসলমানরা এই সম্মেলনেই অসহযোগ আন্দোলনের কার্যকারিতা উপলব্ধি করে। ১৯২০ সালের ১০ মার্চ কলকাতায় খিলাফৎ সম্মেলন হল এবং সিদ্ধান্ত হল যে, তাদের বিক্ষোভকে দূরীভূত করতে অসহযোগকেই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র হিসাবে বেছে নেওয়া হবে।

১৯২০ সালের ৯ জুন ইলাহাবাদের খিলাফৎ সম্মেলনে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল অসহযোগের পক্ষে এবং একটি বিশদ কর্মসূচি স্থির করতে একটি শাসনতান্ত্রিক কমিটি নিয়োগ করা হল। ঐ বছর ২২ জুন মুসলমানরা বড়লাটের কাছে এই মর্মে প্রতিবাদ জানাল যে, ১৯২০ সালের ১ আগস্টের মধ্যে তুর্কিদের বিক্ষোভ দূর করা না হলে তারা অসহযোগ আন্দোলনে নামবেন। ১৯২০ সালের ৩০ জুন ইলাহাবাদে খিলাফৎ কমিটির সভায় ঠিক হল, বড়লাটকে এক মাসের নোটিশ দেবার পর অসহযোগ শুরু করা হবে। ১ জুলাই নোটিশ দেওয়া হয় এবং ১ আগস্ট, ১৯২০ তারিখে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে এটাই সুস্পষ্ট যে, খিলাফৎ কমিটিই অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে এবং কংগ্রেস যা করে তা হল কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে খিলাফৎ কমিটির সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করা; তবে তা স্বরাজের স্বার্থে নয়, খিলাফতের স্বার্থে মুসলমানদের আরও একটু সাহায্য করতে। কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাব থেকে বিষয়টি পরিস্কার হবে।

যদিও 'অসহযোগ আন্দোলন' খিলাফৎ কমিটি আরম্ভ করে এবং কংগ্রেস শুধুমাত্র খিলাফৎ আন্দোলনের স্বার্থে তা গ্রহণ করে, তবু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, যে ব্যক্তি খিলাফৎ কমিটিকে অসহযোগের ব্যাপারে পরামর্শ দেন এবং কংগ্রেসকে তা বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব নেন, তিনি হলেন গান্ধীজি।

২৩ নভেম্বর, ১৯১৯ দিল্লির প্রথম খিলাফৎ সম্মেলনে গান্ধীজি উপস্থিত ছিলেন। শুধু তাই নয়, খিলাফৎ সম্পর্কে দাবিগুলি ব্রিটিশ সরকার যাতে মানতে বাধ্য হয় সেজন্য অসহযোগ আন্দোলনের পথ অবলম্বন করতে তিনি মুসলমানদের উপদেশ

দিয়েছিলেন। খিলাফৎ আন্দোলনে গান্ধীজির অংশ গ্রহণ ছিল রীতিমত তাৎপর্যপূর্ণ। এ সম্পর্কে হিন্দুদের সমর্থন পেতে মুসলমানরা খুবই আগ্রহী ছিল। ১৯১৯ সালের ২৩ নভেম্বরের সম্মেলনে হিন্দুদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়। আবার ১৯২০ সালের ৩ জুন ইলাহাবাদে হিন্দু ও খিলাফৎপন্থী মুসলমানদের একটি যৌথ অধিবেশন বসে। অন্য অনেকের সঙ্গে ঐ অধিবেশনে যোগ দেন সাপ্রু, মতিলাল নেহরু ও অ্যানি বেসান্ট। অবশ্য মুসলমানদের সঙ্গে অংশ নিতে হিন্দুরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। একমাত্র গান্ধীজিই প্রথম অংশ নিলেন। শুধু অংশ নেবার সাহসটুকুই দেখালেন না, আন্দোলনে নেতৃত্বও দিলেন। ১৯২০ সালের ৯ জুন ইলাহাবাদের খিলাফৎ সম্মেলনে যখন বিস্তৃত কর্মসূচী গ্রহণের জন্য একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হল তখন সেই পরিষদের একমাত্র হিন্দু প্রতিনিধি ছিলেন গান্ধীজি। ১৯২০ সালের ২২ জুন মুসলমানরা বড়লাটকে এই বার্তা পাঠাল যে তুর্কি অভিযোগগুলির প্রতিকার ১ আগস্টের মধ্যে না হলে তারা অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবে। একই দিনে খিলাফতের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে গান্ধীজি বড়লাটকে একটি চিঠি পাঠালেন, তাতে জানালেন কেন তিনি এই আন্দোলন গ্রহণ করেছেন ও খিলাফৎপন্থীদের হাত নিরাপদ করতে তিনি ঐ আন্দোলনকে সমর্থন করেন। উদাহরণ স্বরূপ, বড়লাটকে নোটিশ দেন গান্ধীজি, খিলাফৎপন্থীরা নয়। আবার ১৯২০ সালের ৩১ আগস্ট খিলাফৎপন্থীরা যখন অসহযোগ শুরু করল তখন নিজের পদক প্রত্যাখ্যান করে তিনি আন্দোলনে সামিল হন। খিলাফৎ কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে অসহযোগ আন্দোলন চালু করার পর গান্ধীজি এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য কংগ্রেসের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন। খিলাফৎ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে ১ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর এই উদ্দেশ্যে সারা দেশে সফর করে তিনি জনগণকে এই আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন। গান্ধীজি ও আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের বক্তব্যের মধ্যে কিন্তু ঐকমত্যের অভাব ছিল। 'মর্ডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় লেখা হল : 'তাঁদের বক্তৃতাগুলি পড়লে এটা বুঝা কষ্টকর হবে না যে, একজনের বক্তব্যের কেন্দ্রে সুদূর তুর্কিস্তানে খিলাফৎ-এর করুণ অবস্থা, অপর জনের মধ্যে ভারতের স্বরাজ প্রাপ্তির লক্ষ্যটিই প্রধান'। চরম লক্ষ্যের সাফল্য পেতে এই মতানৈক্য* শুভ ফল দেয়নি।

* 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার মন্তব্য শ্রী গান্ধী মেনে নেন নি কঠোর মনে করে। 'মডার্ন রিভিউ'-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁর 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকার ২০ অক্টোবর ১৯২১ সালে শ্রী গান্ধী লেখেন : খিলাফৎ মূল ঘটনা, মৌলানা মহম্মদ আলির ক্ষেত্রে তার কারণ ধর্ম, আমার ক্ষেত্রে খিলাফতের প্রতি, আমি মুসলমান ছোড়া থেকে গো-জীবন রক্ষার সমর্থক, এ আমার ধর্ম।

তবুও খিলাফতের স্বার্থে* গান্ধীজি কংগ্রেসকে তাঁর সঙ্গে আনতে পেরেছিলেন।

দীর্ঘদিন ধরে হিন্দুরা তাদের দিকে মুসলমানদের নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। কংগ্রেসও মুসলমান লীগের সঙ্গে নিজের দূরত্ব ঘোচাতে উদ্‌গ্রীব ছিল। ১৯১৬ সালে নৈকট্য সম্ভব করতে যে পথ অবলম্বন করা হল তারই ফল কংগ্রেস ও মুসলমান লীগের মধ্যে 'লখনউ চুক্তি' স্বাক্ষর। সে বছর লখনউতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশন সম্পর্কে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বলেছেন **:

'লখনউ কংগ্রেসের মঞ্চে বসে যে জিনিসটি আমি প্রথম লক্ষ্য করলাম তা হল, ১৮৯৩ সালে লাহোর কংগ্রেসের তুলনায় এখানে চারগুণ বেশি মুসলমান প্রতিনিধি। সাধারণ পোশাকের ওপরে অধিকাংশ মুসলমান প্রতিনিধির পরনে ছিল সোনা, রূপো এবং সিল্কের এমব্রয়ডারি করা চোগা। জোর গুজব ছড়িয়ে পড়ল—কংগ্রেস তামাশার জন্য হিন্দু ধনকুবেররা এইসব চোগা বিতরণ করেছেন। ৪৩৩ জন মুসলমান প্রতিনিধিদের মধ্যে মাত্র ৩০ জনের মত এসেছিলেন বাইরে থেকে, বাকি সকলেই লখনউ শহরের অধিবাসী ছিলেন। এদের মধ্যে অধিকাংশ প্রতিনিধিকেই বিনামূল্যে খাবার ও বাসস্থান দেওয়া হয়েছিল। স্যার সৈয়দ আহমেদের কংগ্রেস-বিরোধী লীগ একটি সভায় মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানে বাধা দেয়। পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে কংগ্রেস শিবিরকে অধিবেশনের চার দিন আগে থেকে রাতে আলোক সজ্জিত করা হয় এবং প্রচার করা হয় যে অধিবেশনের রাতে সব কিছু বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। ফলে লখনউতে সব জায়গায় 'চান্দুল খানা' নিঃশেষ হয়ে গেল এবং প্রায় তিরিশ হাজার হিন্দু ও মুসলমানের কাছে বক্তৃতা দেবার জন্য আধ ডজন মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। তখনই মুসলমান প্রতিনিধিদের নির্বাচিত ও মনোনীত করা হয়। আমার কাছে লখনউ কংগ্রেসের সংগঠনকরা গোপনে এ সব স্বীকার করেছে'।

'মুসলমান প্রতিনিধিদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল। তাঁরা উর্দুতে একটি প্রস্তাব সমর্থন করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। একজন বললেন : হযরত, 'আমি একজন মুসলমান প্রতিনিধি'। কিছু হিন্দু প্রতিনিধি উঠে দাঁড়িয়ে মুসলমান প্রতিনিধিদের জানালেন উষ্ণ অভ্যর্থনা। উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল বর্ণনার অতীত'।

---

* অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে ১৮৮৬ ও বিপক্ষে ৮৮৪টি ভোট পড়ে। প্রয়াত তৈয়রজি একবার আমাকে বলেছিলেন যে ভোটারদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন কলকাতার ট্যাক্সি ড্রাইভার যাদেরকে অসহযোগের সমর্থনে ভোট দেবার জন্য অর্থ দেওয়া হয়েছিল।

** লিবারেটর, ২২ এপ্রিল, ১৯২৬।

খিলাফৎ আন্দোলনে অংশ নিয়ে গান্ধীজি দু'টি উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করেন। মুসলমানদের সমর্থন পাবার জন্য কংগ্রেসের পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং দ্বিতীয়ত, তিনি কংগ্রেসকে একটি শক্তিতে পরিণত করেছিলেন, মুসলমানরা যোগ না দিলে যা সম্ভব হত না। রাজনৈতিক রক্ষাকবচ হিসাবে ততটা না হলেও খিলাফৎ আন্দোলনের আবেদন ছিল অন্যরকম। ফলে যে সব মুসলমান বাইরে ছিল তারাও কংগ্রেসে ভিড় জমাল। হিন্দুরা তাদের অভ্যর্থনা জানাল, কারণ তারা এর মধ্যে একটি যৌথ মঞ্চ দেখতে পেয়েছিল, যা তাদের ছিল প্রধান লক্ষ্য। সব কৃতিত্ব অবশ্যই গান্ধীজির কারণ এটা ছিল নিঃসন্দেহে সাহসী সিদ্ধান্ত।

১৯১৯ সালে মুসলমানরা যখন অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে হিন্দুদের আহ্বান জানাল, যে অসহযোগ আন্দোলন তাঁরা তুর্কিস্তান ও খিলাফৎকে সাহায্য করার জন্য শুরু করেছিল, তখন হিন্দুরা তিনটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদল ছিল নীতিগতভাবে অসহযোগের বিরোধী। দ্বিতীয় দলে ছিল সেই সব হিন্দু, যারা মুসলমানদের একমাত্র গো-হত্যা বন্ধ করার শর্তে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে রাজি ছিল, আর তৃতীয় জনের হিন্দুরা ভয় পেত যে, মুসলমানরা অসহযোগ করে আফগানদের ভারত আক্রমণের পথ সুগম করে দেবে, যার ফলে স্বরাজের পরিবর্তে ভারত মুসলমান রাজের অধীন হয়ে পড়বে।

অসহযোগ আন্দোলনে মুসলমানদের সঙ্গে যোগ না দিতে যে সব হিন্দুদের বাধ্য করা হয় তাদের ব্যাপারে গান্ধীজির কোনও চিন্তা ছিল না। কিন্তু অন্যদের আচরণকে তিনি দুঃখজনক বলেছেন। গো-হত্যা বন্ধের শর্তে যেসব হিন্দু সমর্থন করতে চেয়েছিল, তাদের উদ্দেশ্যে গান্ধীজি* বলেছেন :

'আমার মতে হিন্দুদের এখন গো-রক্ষা বা গো-সংরক্ষণের প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। বন্ধুত্বের পরীক্ষা হল দুঃসময়ে, তাও নিঃশর্তে। যে সহযোগিতায় বিচার-বিবেচনা করতে হয়, তাতে বন্ধুত্ব থাকে না, থাকে ব্যবসায়িক চুক্তি। শর্তাধীন সহযোগিতা ভেজাল-দেওয়া নিয়মের মতো, যা জমাট বাঁধতে পারে না। মুসলমানদের বক্তব্য যুক্তিপূর্ণ মনে হলে হিন্দুদের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়া কর্তব্য। আবার হিন্দুদের বক্তব্যকে গুরুত্ব দেওয়া যুক্তিপূর্ণ মনে করলে মুসলমানদের উচিত গো-হত্যা বন্ধ করা, তাতে হিন্দুরা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুক বা নাই করুক। সুতরাং আমি কোনও হিন্দুকে আমার গো-পূজা অনুসরণ করতে না বললেও গো-

* 'ইয়ং ইন্ডিয়া', জুন ১০ ডিসেম্বর, ১৯১৯।

হত্যা বন্ধ করাকে সহযোগিতার পূর্বশর্ত হিসাবে ভাবতে চাই না। নিঃশর্ত সহযোগিতা গো-রক্ষাই করবে'।

যে সব হিন্দু ভাবত যে অসহযোগ আন্দোলনের সুযোগে মুসলমানরা আফগানিস্তানকে ভারত আক্রমণ করতে বলবে, তাদের উদ্দেশ্যে গান্ধীজি বলেছেন[৫] :

'হিন্দুদের সতর্ক হবার পিছনে যে যুক্তি আছে তা বুঝা খুব-ই সহজ। আমার মতে, ইসলাম ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধের ক্ষেত্র হিসাবে ভারতকে তৈরি না করে, হিন্দুদের উচিত অসহযোগ আন্দোলনকে সম্পূর্ণ সফল করে তোলা এবং আমার কোনও সন্দেহ নেই যে, মুসলমানরা যদি তাদের ঘোষিত আদর্শে সত্যানিষ্ঠ হয় এবং আত্মসংযম ও আত্মবলিদানে সক্ষম হয়, তবে হিন্দুরা তাদের অসহযোগ কর্মসূচিতে সামিল হবেই। আমি এক-ই সঙ্গে এটাও নিশ্চিত বলে মনে করি যে, ব্রিটিশ সরকার ও তার বন্ধু দেশের সঙ্গে আফগানিস্তানের যুদ্ধ বাধাবার মুসলমান প্রয়াসকে হিন্দুরা সমর্থন করবে না। ভারতীয় সীমান্তে যে কোনও আক্রমণের মোকাবিলা করতে ব্রিটিশবাহিনী যথেষ্ট সুসংগঠিত। সুতরাং ইসলামের সম্মানের জন্য মুসলমানদের উচিত প্রকৃত অর্থে অসহযোগকে গ্রহণ করা। ব্যাপকভাবে লোক একে গ্রহণ করলে এটি যে সম্পূর্ণ কার্যকরী হবে তাই নয়, ব্যক্তি চেতনার পূর্ণ বিকাশের সুযোগও এনে দেবে। যদি আমি কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অন্যায়কে সমর্থন না করতে পারি এবং সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কিছু করতেও সক্ষম না হই, তবে বিধাতার কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু এরকমভাবে অন্যায়কে সমর্থন করা থেকে বিরত হলেও সেই সব নৈতিক বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে আমি সাধ্যের অতিরিক্ত চেষ্টা করেছি, যে বিধানে এমন কি অন্যায়কারীর প্রতিও কোনও ক্ষতি করতে নিষেধ করা হয়েছে। এরকম বিশাল এক শক্তিকে প্রয়োগ করার সময় কোনও অস্থিরতা বা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করা উচিত নয়। অসহযোগ অবশ্যই একটি সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক প্রয়াস। সুতরাং সমস্ত বিষয়টি মুসলমানদের উপরেই নির্ভর করছে। তারা যদি নিজেদের সাহায্য করে, তবে হিন্দু সাহায্যও আসবে এবং মহাশক্তিশালী হলেও সরকারকে একটি জাতির সামগ্রিক রক্তপাতহীন বিরোধিতার কাছে হার মানতেই হবে'।

দুর্ভাগ্যক্রমে একটি সমগ্র জাতির রক্তপাতহীন বিরোধিতা কোনও সরকার মোকাবিলা করতে পারে না— গান্ধীজির এই তত্ত্ব সত্য প্রমাণিত হয়নি। অসহযোগ আন্দোলন

[৫] তদেব, ৯ জুন, ১৯২০।

শুরুর এক বছরের মধ্যে তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল যে, মুসলমানরা অধৈর্য হয়ে উঠছে এবং

'অধৈর্য ক্রোধে মুসলমানরা কংগ্রেস ও খিলাফৎ সংগঠনগুলির কাছে আরও বেশি শক্তিশালী ও আরও দ্রুত কার্যক্রম দাবি করেছে। মুসলমানদের কাছে স্বরাজের অর্থ হল, খিলাফৎ প্রশ্নে ভারতের কার্যকর ব্যবস্থা নেবার ক্ষমতা। সুতরাং স্বরাজের অর্থ যদি একটি কর্মসূচির অনির্দিষ্টকাল চলতে থাকা বুঝায় যাতে ভারতীয় মুসলমানদের শক্তিহীন দর্শক হয়ে তুর্কিস্তানের ধ্বংস দেখা ছাড়া কিছু করার থাকে না, তা হলে এরকম অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতে মুসলমানরা স্বভাবতই রাজি হবে না'।

'এই প্রশ্নে সহানুভূতিশীল না হয়ে উপায় নেই। কোনও কার্যকর ব্যবস্থার কথা জানা থাকলে আমি তার দ্রুত প্রয়োগের কথা বলতাম। খিলাফৎদের স্বার্থরক্ষা করা দ্রুত সম্ভব হলে স্বরাজের কাজকর্ম মুলতুবি রাখতেও আমি সানন্দে রাজি হতাম। অসহযোগ ছাড়াও লক্ষ লক্ষ মুসলমানের কষ্ট লাঘবের অন্য কোনও উপায় থাকলে আমি সানন্দে তা গ্রহণ করতাম'।

'কিন্তু আমার সবিনয় মন্তব্য, খিলাফৎ সম্পর্কে অন্যায়ের প্রতিবিধানের উপায় হল দ্রুততম পদ্ধতিতে স্বরাজ প্রাপ্তি আমাদের ত্বরান্বিত করা। তাই আমার মতে খিলাফৎ প্রশ্নের সমাধান ও স্বরাজ, সমার্থক ও অচ্ছেদ্য। তুর্কিদের সাহায্যের জন্য ভারত যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু সময় মত না পারলে, যা অপরিহার্য তাই ঘটবে। যে নিজে পক্ষাঘাত-আক্রান্ত সে প্রতিবেশীর দিকে হাত বাড়ালেই কি তাঁকে সাহায্য করা হবে? সেক্ষেত্রে নিজের পক্ষাঘাতের চিকিৎসা করাই কি তার উচিত হবে না? শুধুমাত্র অজ্ঞতাযুক্ত চিন্তা এবং হিংসার ব্যাপক বিস্ফোরণ ঘটলেই তা তুর্কিস্তানের পক্ষে শুভ হবে কি না কে জানে, যদিও তাতে হিংসাই বাড়বে'।

গান্ধীজির উপদেশ শোনার মতো মনের অবস্থা মুসলমানদের ছিল না। তারা অহিংস নীতি আর সমর্থন করল না। স্বরাজের জন্য অপেক্ষা করতেও তারা রাজি ছিল না। খিলাফৎ রক্ষা করতে তুর্কিস্তানকে সাহায্য করার দ্রুততম ব্যবস্থাটি তারা তখন খুঁজছিল। সেই অধৈর্য অবস্থায় মুসলমানরা আফগানদের ভারত আক্রমণ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে বসলো, যার আশঙ্কায় হিন্দুরা এতদিন শঙ্কিত ছিল। খিলাফৎপন্থীরা এ ব্যাপারে আফগানিস্তানের আমিরের সঙ্গে আলোচনায় কতটা অগ্রসর হয়েছিল, তা অবশ্য জানা যায়নি। কিন্তু এ রকম একটি পরিকল্পনা

যে চলছিল, এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। এটা অবশ্য বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভারত আক্রমণের মতো একটি পরিকল্পনা সমর্থন করা কোনও সুস্থ ভারতীয়ের পক্ষে সম্ভব নয়, এবং প্রত্যেক ভারতীয় চাইবে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে। এ অবস্থায় গান্ধীজির ভূমিকা কী ছিল, তা জানার উপায় নেই। তবে নিশ্চিতভাবে তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি। বিপরীতক্রমে তিনি স্বরাজ সম্পর্কে আগ্রহকে বিপথগামী করেন। হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত প্রয়াসে স্বরাজ আসবে— এরকম ধারণা থেকে তিনি ঐ পরিকল্পনাটিকে সমর্থন করেন। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোনও চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে তিনি আমিরকে শুধু উপদেশ* দেন তা-ই নয়, কিন্তু ঘোষণা করলেন :

'ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে আমি অবশ্যই আফগনিস্তানের আমিরকে সমর্থন করব। আমি আমার দেশবাসীকে প্রকাশ্যে বলব, যে সরকারের ওপর মানুষের কোনও আস্থা নেই, সে সরকারকে সাহায্য করা পাপ'।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের স্বার্থে কোনও সুস্থ প্রকৃতির মানুষ কি এত দূর চিন্তা করতে পারে? কিন্তু গান্ধীজি হিন্দু-মুসলমান ঐক্য নিয়ে এত বেশি জড়িয়ে পড়েছিলেন যে, এরকম অপ্রকৃতিস্থ প্রয়াসে তিনি যে কি করতে চলেছেন, সেটাই বুঝে উঠতে পারেন নি। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে স্থায়ী এবং দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করতে জাতীয় বিপর্যয় সম্পর্কে তিনি তাঁর অনুগামীদের সতর্ক করতে ভোলেন নি। ১৯২০ সালের ৮ সেপ্টেম্বর 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় একটি নিবন্ধে তিনি বললেন :

'মাদ্রাজ সফরকালে বেজোয়াদায় জাতীয় সংকট সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আমি বলেছিলাম, মানুষের চেয়ে আদর্শের সমালোচনা করাই সমীচীন। 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' অথবা 'মহম্মদ আলি শওকৎ আলি কি জয়' এই শ্লোগানের বদলে 'হিন্দু-মুসলমান কি জয়'— এই শ্লোগান তুলতে আমি শ্রোতাদের অনুরোধ করেছিলাম। শওকৎ আলি ভাই আবেদনে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সত্ত্বেও তিনি লক্ষ্য করেছেন, হিন্দুরা 'বন্দে মাতরম্' আর মুসলমানরা 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনিতেই অভ্যস্ত। এরকম ধ্বনিতে আমাদের কান ঝালপালা হয়ে যায় এবং এটি প্রমাণ হয় যে, মানুষ একটি মন নিয়ে কাজ করতে এখনও শেখেনি। সুতরাং এখন থেকে তিনটি ধ্বনি স্বীকৃত হওয়া উচিত। হিন্দু-মুসলমান দ্বৈত কণ্ঠে গাওয়া উচিত—আল্লা হো আকবর, অর্থাৎ আল্লাই মহান, আর কিছু নয়। দ্বিতীয়টি হল বন্দে মাতরম্ (মাতাকে বন্দনা করি) অথবা ভারত মাতা কি জয় (মাতা হিন্দুস্থানের

* 'ইয়ং ইন্ডিয়া', ৪ মে, ১৯২১

জয় হোক)। তৃতীয়টি হওয়া উচিত 'হিন্দু-মুসলমান কি জয়', যার অভাবে ভারতের জয় হতে পারে না এবং ঈশ্বরের মহত্ত্বও প্রকট হয় না। আমি চাই সংবাদপত্র এবং জননেতাগণ মৌলানার পরামর্শ গ্রহণ করে জনগণকে তিনটি ধ্বনি দিতে নেতৃত্ব দিন। তারা যথেষ্ট অর্থবহ। প্রথমটি হল প্রার্থনা এবং আমাদের ক্ষুদ্রতার স্বীকৃতি তার মানে বিনয়ের প্রতীক। এই ধ্বনিতে হিন্দু-মুসলমান সবার অংশ গ্রহণ দরকার শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে ও প্রার্থনার ভঙ্গিতে। আরবি শব্দ বলে হিন্দুদের কুণ্ঠিত হবার কারণ নেই, কারণ এই শব্দের অর্থ শুধু যে আপত্তিকর নয় তাই নয়, বরং যথেষ্ট উদ্দীপক। ঈশ্বরকে বিশেষ কোনও ভাষায় শ্রদ্ধা জানানো যায় না। বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের আশ্চর্য পারিপার্শ্বিকতা ছাড়াও এটি একমাত্র জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, তা হল ভারতের সকল উত্থান! 'ভারত মাতা কি জয়'-এর চেয়ে আমি 'বন্দে মাতরম্'-কেই সমর্থন করি, কারণ এর ফলে বাংলার বৌদ্ধিক ও আবেগ প্রবণতার শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। যেহেতু হিন্দু ও মুসলমানের হৃদয়ের মিল না হলে ভারতের উন্নতি অসম্ভব, তাই 'হিন্দু-মুসলমান কি জয়'-ধ্বনি আমরা কোনদিন ভুলব না।

'এই ধ্বনিগুলির মধ্যে একতার কোনও অভাব থাকা উচিত নয়। তিনটি ধ্বনির মধ্যে হয়তো কেউ একটি গ্রহণ করল, কিন্তু বাকিগুলির প্রতি কোনওরকম বিরূপতা দেখানো উচিত নয়। যাঁরা যোগ দেবে না, তারা তো নিশ্চয় বিরত থাকবে, কিন্তু যে ধ্বনি ইতিমধ্যে উত্থাপিত হয়েছে তার প্রেক্ষিতে নিজেদের মতকে চাপিয়ে দেওয়া হবে সহমর্মিতার অভাব। আগে বর্ণিতক্রম অনুসারে তিনটি ধ্বনিকেই সব সময় অনুসরণ করতে হবে'।

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি নির্মাণে গান্ধীজি এ ছাড়া আরও অনেক কিছু করেছেন। হিন্দুদের বিরুদ্ধে চরম অপরাধ করলেও তিনি মুসলমানদের অনেক সময় দোষারোপই করেন নি।

এটা খুবই নিন্দনীয় ঘটনা যে অনেক বিশিষ্ট হিন্দু, যাঁরা তাঁদের রচনায় বা শুদ্ধি আন্দোলনে মুসলমানদের বিচারে অপরাধ করেছেন, তাঁরা কিছু ধর্মান্ধ মুসলমানের দ্বারা নিহত হয়েছেন। এ ব্যাপারে প্রথমেই নাম করতে হয় স্বামী শ্রদ্ধানন্দের, যিনি রোগশয্যায় ২৩ ডিসেম্বর, ১৯২৬ সালে আব্দুল রশিদের গুলিতে প্রাণ দেন। এরপর দিল্লির আর্য সমাজের বিশিষ্ট নেতা লালা নানকচাঁদ নিহত হন। ১৯২৯ সালের ৬ এপ্রিল 'রঙ্গিলা রসুল'-এর লেখক রাজপাল যখন তাঁর দোকানে বসেছিলেন, তখন জনৈক ইলামদিন তাঁকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। ১৯৩৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে আব্দুল কায়ুম হত্যা করে নাথুরামল শর্মাকে। অত্যন্ত দুঃসাহসিক

এই হত্যাকাণ্ড, কারণ ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে প্রকাশিত তাঁর একটি পুস্তিকার বিরুদ্ধে ১৯৫ নং ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে রুজু করা একটি মামলায় তাঁর আপিলের শুনানি শোনার জন্য শর্মা যখন সিন্ধুর বিচার বিভাগীয় কমিশনারের আদালতে বসেছিলেন, তখনই তাঁকে ছুরিকাঘাত করা হয়। ১৯৩৮ সালে আমেদাবাদে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন শেষে ঐ সংস্থার সম্পাদক খান্নাকে মুসলমানরা বিপজ্জনকভাবে আক্রমণ করে এবং তিনি অল্পের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান।

এটি অবশ্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত তালিকা। অনায়াসে এটিকে আরও বাড়ানো যায়। কিন্তু ধর্মান্ধ মুসলমানদের দ্বারা কতজন বিশিষ্ট হিন্দু নিহত হলেন, তার সংখ্যাটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, যারা এই সব হত্যার জন্য দায়ী, তাদের মনোভাব কীরকম ছিল। যেখানে আইন প্রয়োগ করা হয়েছে সেখানে হত্যাকারীর শাস্তি হয়েছে। কিন্তু মুসলমান নেতারা এই সব অপরাধীদের কখনও নিন্দা করেন নি। অন্য দিকে, ধর্মীয় শহিদ হিসাবে তাদের স্বাগত জানানো হয়েছে এবং তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবার জন্য আন্দোলন হয়েছে। এ ধরনের মনোভাবের ব্যাখ্যা করার জন্য আব্দুল কায়ুমের আপিল মামলায় লাহোরের ব্যারিস্টার বরকত আলির মন্তব্যটি উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন, যেহেতু কায়ুম কুরআনের নির্দেশ মেনেই কাজ করেছেন, সেহেতু নাথুরামলের হত্যাকারী হলেও তিনি অপরাধী নন। মুসলমানদের মনোভাব অতএব সুস্পষ্ট। কিন্তু যা স্পষ্ট নয়, তা হল গান্ধীজির মনোভাব।

যে কোনও রকম হিংসার বিরুদ্ধে নিন্দা করার ব্যাপারে গান্ধীজি ছিলেন খুব-ই নিয়মনিষ্ঠ এবং অনেক সময় কংগ্রেসকেও নিন্দা প্রকাশে তিনি বাধ্য করেছেন। কিন্তু এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের কোনও প্রতিবাদ করেন নি তিনি। শুধু মুসলমানরাই এ ব্যাপারে নিন্দা* করেন নি তা নয়, গান্ধীজিও কখনও মুসলমান নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এর নিন্দা করেন নি! এ বিষয়ে তিনি আশ্চর্য মৌন পালন করেছেন। তাঁর এরকম আচরণের ব্যাখ্যা হিসাবে বলতে হয়, তিনি হয়তো হিন্দু-মুসলমান ঐক্য রক্ষা করতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন, কিছু হিন্দুর জীবন দিয়েও যদি সেই ঐক্য রক্ষা করা যায়, সেই ভেবেই তিনি হয়তো এসব হিন্দু-হত্যাকে গুরুত্ব দেননি।

---

* 'সংবাদে প্রকাশ যে, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকারী আব্দুল কায়ুমের আত্মা পরজগতে গতি পাবার জন্য বিখ্যাত ভুবন্দ কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকরা কুরআন থেকে পাঁচটি অংশ পাঠ করেন এবং প্রতিদিন কুরআন থেকে ১.২৫ লাখ ছত্র পাঠের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁদের প্রার্থনা ছিল : আল্লাহ্ যেন মরহুমকে (অর্থাৎ রশিদ) আলা-এ-আলাইহি-এ স্থান দেন। (টাইমস্ অব্ ইন্ডিয়া, ৩০.১১.২৭ : ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে।)

মোপলা-দাঙ্গা সম্পর্কে গান্ধীজির বক্তব্য থেকেই এটা পরিষ্কার যে তিনি মুসলমানদের অন্যায়কেও মার্জনা করেছেন এই ঐক্য রক্ষার স্বার্থে।

মালাবারের মোপলারা হিন্দুদের ওপর যে রক্ত-হিম করা অত্যাচার চালাত তা অবর্ণনীয়। সারা দক্ষিণ ভারতে সমস্ত মতাবলম্বী হিন্দুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল তীব্র সন্ত্রাসের ঢেউ, .যার গভীরতা আরও বেড়ে গেল যখন কিছু খিলাফৎ নেতা এমন-ই বিপথগামী হয়ে গেলেন যে, তাঁরা 'ধর্মের স্বার্থে মোপলারা যে সাহসিকতাপূর্ণ লড়াই চালাচ্ছিল তাকে অভিনন্দন' জানালেন। যে কেউ অবশ্যই বলবেন, হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের জন্য এরকম মূল্য অনেক বেশি। কিন্তু এই ঐক্য রক্ষায় গান্ধীজি এতটাই আবিষ্ট ছিলেন যে, মোপলাদের কাজকে হালকা করে দেখা বা খিলাফৎদের এ ব্যাপারে অভিনন্দন জানানোকে তিনি সহজভাবেই নিয়েছেন। মোপলাদের তিনি বলেছেন ধর্মভীরু; তারা যা ধর্ম বলে জেনেছে তার জন্যই লড়াই করছে, যে পদ্ধতিকে তারা ধর্মীয় মনে করছে, সেই পদ্ধতিতে। মোপলাদের অত্যাচার সম্পর্কে মুসলমানদের নীরবতা প্রসঙ্গে গান্ধীজি বলেছেন :

'হিন্দুদের এমন সাহস ও বিশ্বাস থাকতে হবে যে, এরকম ধর্মীয় উন্মাদনা সত্ত্বেও তারা তাদের ধর্ম রক্ষা করতে পারবে। মোপলাদের উন্মাদনা সম্পর্কে মুসলমানদের মৌখিক অস্বীকৃতি বন্ধুত্বের কোনও পরীক্ষাই নয়। জোর করে ধর্মান্তরকরণ ও লুঠপাট করে মোপলারা যেমন আচরণ করেছে, সেজন্য মুসলমানদের লজ্জা ও বিনয়ের সঙ্গে তা স্মরণ ও অনুভব করা উচিত। হিন্দুদের এমন নীরবে অথচ কার্যকরভাবে কাজ করা উচিত যাতে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধর্মোন্মাদদের পক্ষেও এমন কাজ করা সম্ভব না হয়। আমার বিশ্বাস, হিন্দুরা একযোগে মোপলা উন্মাদনাকে সমমানসিকতার স্থিরতা নিয়ে গ্রহণ করেছে এবং সংস্কৃতি সম্পন্ন মুসলমানরা নবির শিক্ষাকে মোপলারা বিকৃত করায় আন্তরিকভাবে দুঃখবোধ করছে'।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে মোপলাদের অত্যাচার সম্পর্কে যে প্রস্তাব* গ্রহণ করা হয় তা প্রমাণ করে মুসলমানদের মনে যাতে ব্যথা না লাগে সে ব্যাপারে কত যত্ন নেওয়া হয়েছে।

'মালবারের কয়েকটি অঞ্চলে মোপলাদের হিংসাত্মক কাজের জন্য ওয়ার্কিং কমিটি

---

* প্রস্তাবে বলা হয়েছে, জোর করে ধর্মান্তরীকরণের মাত্র তিনটি ঘটনা ঘটেছে!! কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলে একটি প্রশ্নের উত্তরে (১৬ জানুয়ারি, ১৯২২) স্যার উইলিয়ম ভিনসেন্ট বলেন, 'মাদ্রাজ সরকারের প্রতিবেদন বলা হয়েছে, জোর করে ধর্মান্তরীকরণের ঘটনা হাজারের মতো হবে, কিন্তু সুস্পষ্ট কারণেই তার সঠিক বিবরণ কখনও পাওয়া যাবে না।'

গভীর দুঃখ প্রকাশ করছে। ঘটনাগুলি প্রমাণ করছে যে, ভারতে এখনও এরকম অনেক লোক আছে, যারা কংগ্রেস বা কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটির বাণী উপলব্ধি করতে পারেনি। ভারতের সর্বত্র ব্যাপক ও গভীরতম প্ররোচনা সত্ত্বেও প্রতিটি কংগ্রেস ও খিলাফৎ কর্মীর উচিত সেই বাণীকে ছড়িয়ে দেওয়া।'

'যাই হোক, মোপলাদের হিংসাত্মক কার্যাবলীর নিন্দা করে ওয়ার্কিং কমিটি অবশ্য এই ব্যাপারটি উল্লেখ না করে পারে না যে, মোপলাদের সহ্য শক্তির বাইরে তাদের প্ররোচনা দেওয়া হয়েছিল এবং সরকারের তরফে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সেটি পক্ষপাতমূলক ও মোপলাদের অত্যাচার সম্পর্কে অতিরঞ্জিত তথ্য সমৃদ্ধ। অথচ শান্তি-শৃঙ্খলার নামে সরকার যে অকারণ প্রাণহানি ঘটিয়েছে তা অনায়াসে দাবি করা যেতে পারে।'

'ওয়ার্কিং কমিটি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে যে, মোপলাদের মধ্যে কিছু গোঁড়া লোক তথাকথিত বলপূর্বক ধর্মান্তর করছে। তবে এ সম্পর্কে সরকারি ও উৎসাহী-মহলের বক্তব্য সম্পর্কেও সাবধান থাকা উচিত। কমিটির কাছে যে রিপোর্ট করা হয় তা এরকম:'

'মানজেরির প্রতিবেশি অঞ্চলে বসবাসকারী কিছু পরিবারকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। এটা পরিষ্কার যে এক শ্রেণীর গোঁড়া ধর্মান্ধ মানুষ এই ধর্মান্তর করেছে যা খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের পরিপন্থী। তবে আমাদের কাছে এরকম মাত্র তিনটি ঘটনার বিবরণ আছে'।

মুসলমানদের আপস বিরোধী মনোভাবের কয়েকটি উদাহরণ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সাপ্তাহিক 'লিবারেটর' পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করেছেন, যে সম্পর্কে গান্ধীজি সম্পূর্ণ মৌন ছিলেন। ১৯২৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় স্বামীজি লিখেছেন :

'অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ প্রসঙ্গে প্রশাসনিকভাবে অনেকবার বলা হয়েছে যে, অতীতের কৃতকর্মের জন্য এ ব্যাপারে হিন্দুদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এবং অ-হিন্দুদের এক্ষেত্রে কিছু করণীয় নেই। কিন্তু ভাইকম ও অন্যান্য জায়গায় মুসলমান এবং খ্রিস্টান কংগ্রেস কর্মীরা গান্ধীজির বাণীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছেন। এমনকি ইয়াকুব হাসানের মত একজন সমদর্শী নেতা মাদ্রাজে একটি সভায় সভাপতিত্ব করার সময় ভারতে সমস্ত অস্পৃশ্যদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য মুসলমানদের দায়ী করেছেন।'

কিন্তু গান্ধীজি মুসলমান বা খ্রিস্টান কারোর মন্তব্যের বিরুদ্ধেই তীব্র আপত্তি

জানাননি। ১৯২৬ সালের জুলাই সংখ্যায় স্বামী লিখেছেন :

'আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতি আমি মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। নাগপুর খিলাফৎ সম্মেলনে এক রাত্রিতে আমরা দুজনেই গিয়েছিলাম। এই উপলক্ষে কুরআন থেকে যে সব অংশ পড়া হচ্ছিল, তাতে বারবার জিহাদের কথা এবং কাফেরদের হত্যা করার কথা ছিল। কিন্তু খিলাফৎ আন্দোলনের এই দিকটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি স্মিতহাস্যে বললেন— ও সব পরোক্ষ ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে। উত্তরে আমি বলেছিলাম যে, এ সব অহিংসার নীতি বিরোধী। যখন তাদের মনে অন্যরকম চিন্তা আসবে তখন মুসলমানরা কুরআন-এ সব অংশ হিন্দুদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করবে'।

স্বামীর তৃতীয় উদাহরণটি মোপলাদের দাঙ্গা সংক্রান্ত। ২৬ আগস্ট, ১৯২৬ তারিখে 'লিবারেটর' পত্রিকায় তিনি লিখেছেন :

'বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে মোপলাদের অত্যাচার সংক্রান্ত বিষয়টিকে নিন্দা করার প্রশ্নে প্রথম সতর্ক বাণী শোনা গেল। মূল প্রস্তাবে হিন্দুদের হত্যা, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া কিংবা তাদের ধর্মান্তরীকরণের জন্য মোপলাদের নিন্দা করা হয়েছিল। হিন্দু সদস্যরাই এর সংশোধনী চেয়ে বললেন, একমাত্র কিছু ব্যক্তি যারা এ সব অপরাধের জন্য দায়ী তাদের নিন্দা করা হোক। কিন্তু কিছু মুসলমান নেতা এমন কি এটুকুও সহ্য করতে পারলেন না। সুতরাং মৌলানা ফকিরের মতো কিছু মুসলমান এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন, এতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেলাম যখন মৌলানা হাসরত মোহানির মত জাতীয়তাবাদী এই কারণে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন যে, মোপলাদের অঞ্চল আর দার-উল-আমান নয়, বরং এটি দার-উল-হারাব হয়ে গেছে এবং তারা মোপলাদের ব্রিটিশ শত্রুর সঙ্গে হিন্দুদের ষড়যন্ত্রে যোগ দেবার ব্যাপারে সন্দেহ করছে। সুতরাং তরবারির আঘাত অথবা কুরআন— যে কোনও একটি গ্রহণ করতে হিন্দুদের বাধ্য করে মোপলারা সঠিক কাজ-ই করেছে। আর হিন্দুরা যদি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে মুসলমান হয়, তবে এটাকে বলতে হয় বিশ্বাসের স্বেচ্ছায় পরিবর্তন— জবরদস্তি ধর্মান্তর নয়। এমনকি কিছু মোপলাদের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাবও সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত হয়েছিল, সর্বসম্মতভাবে হয়নি। আরও অনেক উদাহরণ আছে, যা থেকে দেখানো যায় যে, মুসলমানরা ভাবতো তাদের অভাব-অভিযোগ দূর করতেই কংগ্রেসের অস্তিত্ব এবং তাদের মেজাজের প্রতি সামান্য অবজ্ঞা দেখানোর চেষ্টা হলে কমজোরি ঐক্য সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে যাবে'।

শেষ উদাহরণটি গান্ধীজির নেতৃত্বে বিদেশি কাপড় পোড়ানো সম্পর্কে। ৩১ আগস্ট, ১৯২৬ সংখ্যায় 'লিবারেটর' পত্রিকায় স্বামীজি বলেছেন :

'যখন ভারতের মানুষ এই সিদ্ধান্তে এল যে, শ্রী দাস (চিত্তরঞ্জন) নেহরু ও অন্য নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে সকলের ধর্মীয় কর্তব্য হল বিদেশি কাপড় পোড়ানো, তখন খিলাফৎ মুসলমানরা তুর্কিস্তানের মুসলমানদের ব্যবহারের জন্য বিদেশি কাপড় পাঠাতে মহাত্মাজির অনুমতি পেয়েছিল। এটা আমার কাছে ছিল বড় আঘাত। নীতির প্রশ্নে মহাত্মাজি হিন্দুদের আবেগকে কোনওদিন বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা দেখাননি, অথচ মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কর্তব্যের বিচ্যুতি ঘটলেও তাদের জন্য তাঁর মন ছিল কোমল।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ইতিহাসে তাঁর প্রচেষ্টার ব্যাপারে দু'টি ঘটনার উল্লেখ করতে হয়। একটি হল ১৯২৪ সালে গান্ধীজির একুশ দিনের অনশন। অনশনের আগে এর কারণ জানিয়ে গান্ধীজি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়:

'দু'বছর আগেও হিন্দু-মুসলমানরা আপাত বন্ধুর মতো এক সঙ্গে কাজ করে গেলেও এখন তারা কোনও কোনও জায়গায় কুকুর-বিড়ালের মতো লড়াই করছে। এই ঘটনা থেকে নিশ্চিতভাবে বুঝা যায়, যে অসহযোগ আন্দোলন তারা করেছিল তা অহিংস ছিল না। আমি বোম্বাই, চৌরিচোরা এবং অনেক ছোট ছোট ঘটনায় এর লক্ষণ দেখেছি। আমি তখন প্রায়শ্চিত্ত করেছি। ততক্ষণ পর্যন্ত এর ফল থাকত। কিন্তু এই হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষমূলক অবস্থা ছিল চিন্তার বাইরে। কোহাটের শোচনীয় ঘটনার পর তা অসহ্য হয়ে ওঠে। দিল্লির উদ্দেশ্যে সবরমতী থেকে আমার রওনা দেবার ঠিক আগে সরোজিনী দেবী আমাকে চিঠিতে জানালেন যে, শান্তির জন্য বক্তৃতা ও উপদেশই যথেষ্ট নয়। কার্যকর ব্যবস্থা আমাকে খুঁজতেই হবে। আমার ওপরে দায়িত্ব ন্যস্ত করে তিনি ঠিক-ই করেছেন। জনগণের বিশাল শক্তিকে সার্থক করে তুলতে আমি কি পারব না? এই শক্তি যদি আত্মহননকারী হয়, তবে প্রতিবিধান আমাকে করতেই হবে।'

'আমেথি, সম্ভল ও গুলবার্গের ঘটনায় আমি ভীষণভাবে আহত। হিন্দু ও মুসলমান বন্ধুদের তৈরি আমেথি ও সম্ভল সম্পর্কে প্রতিবেদন আমি পড়েছি। গুলবার্গে যে সব হিন্দু ও মুসলমান বন্ধু গিয়েছিলেন, তাঁদের বিবরণীও আমি পড়েছি। যন্ত্রণায় আমি কুঁকড়ে গেছি, অথচ কোনও প্রতিকার আমার হাতে নেই। কোহাটের সংবাদ ধূমায়িত জনরোষকে অগ্নিশিখায় পরিণত করল। কিছু একটা করতেই হবে। তীব্র

যন্ত্রণা ও চাঞ্চল্যে আমি দু'টি রাত কাটালাম। বুধবার আমি প্রতিকারের সন্ধানে পেলাম। আমাকে অবশ্যই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

'হিন্দু ও মুসলমান যাঁরা আমাকে ভালবাসার কথা বলেন, তাঁদের প্রতি একটি সতর্ক বাণী। যদি তাঁরা আমাকে সত্যই ভালবাসেন এবং আমি যদি তাঁদের ভালবাসার যোগ্য হই, তবে তাঁদের অন্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তাঁরা যে পাপ করেছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত করবেন আমারই সঙ্গে।

'অনশনের মাধ্যমে নয়, এ প্রায়শ্চিত্ত হবে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক পদক্ষেপকে সঠিক করার কাজে। হিন্দু ও মুসলমান একে অপরের প্রতি যদি বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করে, তবে সেটিই হবে সেরা প্রায়শ্চিত্ত!

'গত বুধবার যে হাকিম সাহেব আমার সঙ্গে দীর্ঘ সময় ছিলেন, কিংবা মৌলানা মহম্মদ আলি, যাঁর বাড়িতে থেকে আতিথেয়তা উপভোগ করছি, তাদের সঙ্গে আমি কোনও যুক্তি করিনি'।

'কিন্তু একজন মুসলমানের বাড়িতে বসে অনশন করা কি যায়? (তিনি তখন দিল্লিতে মহম্মদ আলির বাড়িতে অতিথি) হ্যাঁ যায়। অনশন একটি প্রাণীরও অমঙ্গলের জন্য নয়। যে কোনও রকম ব্যাখ্যার হাত থেকে আমি বাঁচতে পারি, কারণ আমি একজন মুসলমানের বাড়িতে বাস করছি। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে একজন মুসলমানের বাড়িতে অনশন শুরু ও সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা অন্যায় নয়।

'মহম্মদ আলিই বা কে? অনশনের মাত্র দু'দিন আগে একটি গোপনীয় বিষয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম যেখানে আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমার যা কিছু, সব-ই তাঁর, আবার তাঁর যা কিছু সবই আমার। আমি জনসমক্ষে কৃতজ্ঞচিত্তে জানাতে চাই মহম্মদ আলির বাড়িতে আমি যে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছি, তা আর কোথাও পাইনি। আমার প্রতিটি অভাবের কথা যেন আগে থেকেই তাঁরা বুঝতে পারতেন। তাঁর বাড়ির প্রত্যেকের-ই প্রধান চিন্তা ছিল আমাকে কী করে সুখ ও আরামে রাখা যায়। ডক্টর আনসারি ও আব্দুর রহমান আমার স্বাস্থ্য উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেছেন। তাঁরা আমাকে রোজ পরীক্ষা করতেন। আমার জীবনে আমি অনেক সুখী মুহূর্ত পেয়েছি। এগুলি আগের সুখের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। খাদ্যই সব নয়। আমি এখানে ঐশ্বর্যময় ভালবাসার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। খাদ্যের চেয়ে তা অনেক বড় আমার কাছে।

'এরকম গুঞ্জন অবশ্য শোনা যায় যে, এত বেশি মুসলমান বন্ধুদের সঙ্গে

মেশার ফলে আমি হিন্দু মানসিকতা বোঝার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছি। আসলে আমার নিজেরই তো হিন্দু মন। আমার প্রতিটি তন্তু যখন হিন্দু, তখন হিন্দু মানসিকতা জানার জন্য শুধু হিন্দুদের মধ্যেই আমি বাস করি না। প্রতিকূলতা কাটিয়ে আমার হিন্দুত্ব যদি বিকশিত হতে না পারে তবে তা অবশ্যই খুবই দুর্বল। আমি স্বতঃ-প্রণোদিতভাবেই জানি হিন্দুত্বের জন্য কী দরকার। কিন্তু একটি মুসলমানের মন জানতে আমাকে চেষ্টা করতে হবে। মুসলমানদের যত কাছে আমি যেতে পারব, তত নিখুঁতভাবে তাদের সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে পারব। দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ মেলবন্ধন হতে চাই। দরকার হলে দুটিকে আমার রক্ত দিয়েও মিলিত করতে চাই। কিন্তু মুসলমানদের কাছে তার আগে আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে, হিন্দুদের মতই আমি তাদেরও ভালবাসি। আমার ধর্ম সবাইকে সমান ভালবাসতে শিখিয়েছে। ঈশ্বর আমাকে এ কাজে সহায়তা করুন! আমার অনশনের অন্যতম উদ্দেশ্য হন সেই নিঃস্বার্থ ও সম-ভালবাসা পাবার জন্য নিজেকে যোগ্য করে তোলা।

অনশনের ফলে অনুষ্ঠিত হয়েছে একতা সম্মেলন। কিন্তু একতা সম্মেলনে কিছু নিরীহ সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। যেগুলি আবার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট হয়ে যায়।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্য গঠনে গান্ধীজি যে ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েছিলেন তার সংক্ষিপ্ত চিত্র হল এরকম এবং এর সমাপ্তি টানা যায় সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে গান্ধীজির ভূমিকা আলোচনার মাধ্যমে। তিনি মুসলমানদের চরম স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এই স্বাধীনতা সমস্যাটি এড়িয়ে যেতে মুসলমানদের উৎসাহিত করে। 'গোল টেবিল বৈঠকে' গান্ধীজি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মাধ্যমে যখন মুসলমানদের এটি দেওয়া হল তখন গান্ধীজি ও কংগ্রেস তা অনুমোদন করেননি। কিন্তু এ ব্যাপারে যখন ভোটাভুটির দরকার হল, তখন তাঁরা একে বিরোধিতা বা সমর্থন কিছুই না করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ব্যাপারে এই হল গান্ধীজির প্রচেষ্টার ইতিহাস। এই সব প্রচেষ্টার ফল কী হয়েছিল? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে ১৯২০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত এই দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক পর্যালোচনা করতে হবে, যখন গান্ধীজি এই সম্পর্কের উন্নতিতে প্রচুর পরিশ্রম করেন। পুরনো 'ভারত শাসন আইন'-এ ধারা অনুযায়ী ভারত সরকার সংসদে প্রতি বছর ভারতের ঘটনাবলী সম্পর্কে যে বাৎসরিক বিবরণ দিয়ে থাকেন তা থেকে এই সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যাবে। এই সব

বিবরণ* থেকে আমি নিচের তথ্যগুলি তৈরি করেছি।

১৯২০ সালের প্রথম দিকেই মালাবারে মোপলা বিদ্রোহ হয়েছে। খুদ্দাম-ই-কাবা (পবিত্র মক্কার ভৃত্য) এবং কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটির বিক্ষোভ এর কারণ। বিক্ষোভকারীরা এই তত্ত্ব প্রচার করে যে, ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ভারত 'দার-উল-হারাব' হয়ে গেছে এবং মুসলমানরা এর বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়াই করবে এবং যদি তা না পারে তবে তারা বিকল্প 'হিজারৎ'-এর নীতি মেনে চলবে। এই বিক্ষোভে মোপলারা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অনিবার্যভাবে ঘটে যায় এক বিদ্রোহ। উদ্দেশ্য ছিল, ব্রিটিশ সরকারকে উচ্ছেদ করে ভারতে ইসলামের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। ছুরি, তরবারি, বর্শা ইত্যাদি গোপনে তৈরি হতে লাগল। দলে দলে হিংস্র স্বভাবের মানুষ সংগ্রহ করা হতে লাগল ব্রিটিশ শক্তিকে আক্রমণ করতে। ২০ আগস্ট পিরুয়াংডিতে মোপলা ও ব্রিটিশবাহিনীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হল। রাস্তা অবরোধ করা হল, টেলিগ্রাফের তার কেটে ফেলা হল এবং অনেক জায়গায় রেললাইন ধ্বংস করা হল। প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়তেই মোপলারা ঘোষণা করল যে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। জনৈক আলি মুদালিয়ারকে রাজা ঘোষণা করা হল, খিলাফৎ পতাকা উত্তোলন করা হল এবং এরনাদ ও ওয়ালুরানাকে খিলাফৎ রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করা হল। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের কারণ বুঝা যায়, কিন্তু যা বুঝা যায় না তা হল, মালাবারের হিন্দুদের ওপর মোপলাদের ব্যবহার। মোপলাদের ভয়াবহ শিকার হল হিন্দুদের ভাগ্য। দেশের দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেনাবাহিনীকে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কাজে নিয়োগ না করা পর্যন্ত হিন্দুদের ওপর মোপলাদের চরম অত্যাচার, যেমন— গণহত্যা, ধর্মান্তরীকরণ, মন্দির ধ্বংস করা, নারী-নিগ্রহ, গর্ভবতী রমণীদের পেট চিরে দেওয়া, লুঠতরাজ, ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ড ইত্যাদি চরম পাশবিক বল্গাহীন অত্যাচার চলল। এটা হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা নয়। এটা সর্বাত্মক ধ্বংসকাণ্ড। কত হিন্দু নিহত, আহত বা ধর্মান্তরিত হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে সংখ্যাটি যে বিশাল অঙ্কের সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

১৯২১-২২ সালেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ শেষ হয়নি। বাংলা এবং পঞ্জাবে মহরম অনুষ্ঠানের সময় ব্যাপক দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়। বিশেষত পঞ্জাবের মুলতানে সাম্প্রদায়িকতা ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ে। প্রাণহানির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হলেও সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছিল প্রচুর।

১৯২২-২৩ সালে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ হলেও ১৯২৩-২৪

* এগুলি 'ভারত ১৯২০' নামে খ্যাত।

সালে সম্পর্কের আবার অবনতি ঘটে। কিন্তু কোহাটের মত বেদনাদায়ক ঘটনা আর কোনও জায়গায় ঘটেনি। গণ্ডগোলের সূত্রপাত ইসলাম-বিরোধী একটি কবিতাসহ একটি পুস্তিকার প্রকাশ ও প্রচারে। ১৯২৪ সালের ৯ এবং ১০ সেপ্টেম্বর ভয়ঙ্কর দাঙ্গা বেধে গেল। ১৫৫ জন নিহত ও আহত হল। ৯ লাখ টাকা মূল্যের বাড়ি ও সম্পত্তি এবং প্রচুর জিনিসপত্র লুঠ হল। এই সন্ত্রাসের রাজত্বে সমগ্র হিন্দু জনসমষ্টি কোহাট শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। দাঙ্গায় জড়িতদের কিছু অংশ বাদ দিয়ে অধিকাংশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার সরকারি আশ্বাসের পর বহু আলাপ আলোচনার ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি চুক্তি হল। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে আবার ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করতে পারে ও বাড়ি ঘর তৈরি করতে পারে সেজন্য সরকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিনা সুদে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিলেন। কিন্তু সমাধানসূত্রে পৌঁছেও এবং ঘরছাড়া মানুষ কোহাটে আবার ফিরে এলেও ১৯২৪-২৫ সালের মধ্যে শান্তি তো এলই না, বরং দেশের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে উত্তেজনা চলল অব্যাহতভাবে। গ্রীষ্মের মাসগুলিতে চলল প্রচুর দাঙ্গা-হাঙ্গামা। জুলাই মাসে দিল্লিতে প্রচণ্ড সংঘর্ষে অনেক লোক মারা গেল। এক-ই মাসে নাগপুরে এক-ই ঘটনা ঘটল। আগস্ট মাসে অবস্থা আরও খারাপ হল যখন লাহোর, লখনউ, মোরাদাবাদ, ভাগলপুর ও নাগপুরে দেখা দিল ব্যাপক দাঙ্গা। নিজামের রাজ্য গুলবার্গে দেখা দিল শান্তি শৃঙ্খলার ভয়ঙ্কর অবনতি। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে লখনউ, শাহজাহানপুর, কাঁকিনাড়া এবং ইলাহাবাদে জোর সংঘর্ষ। বছরের ভয়ঙ্করতম ঘটনা ঘটল কোহাটে হত্যা ও লুণ্ঠনের ব্যাপক তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে।

১৯২৫-২৬ সালে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে হিংসা ছড়িয়ে পড়ল আরও বেশি। এই সময়কার দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর ব্যাপকতা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলেও এর প্রসার। কলকাতা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই— সর্বত্র দাঙ্গার এক-ই দৃশ্য। কয়েকটিতে জীবনহানির সংখ্যা শোচনীয়। অগাস্টের শেষে কিছু ছোটখাটো স্থানীয় হিন্দু উৎসবের সময় কলকাতা, বিদর্ভ, গুজরাট, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটে গেল। এ সব জায়গায় কোনও কোনও অংশে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ হলেও অন্যত্র, বিশেষ করে কলকাতার অন্যতম পাটকলের কেন্দ্র জনাকীর্ণ কাঁকিনাড়ায় পুলিশের হস্তক্ষেপে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা থামানো গেল। গুজরাটে এ সময় হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষমূলক মনোভাবের ফলে অন্তত একটি মন্দির ধ্বংস হল। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে যুক্তপ্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ আলিগড় শহরে এবং রামলীলা উৎসবকে কেন্দ্র করে বছরের নিকৃষ্টতম দাঙ্গা হল। দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে আনতে, শৃঙ্খলার স্বার্থে পুলিশকে গুলি চালাতে হল। গুলিতে অথবা হাঙ্গামায়

মারা গেল ৫ জন। এক সময় লখনউতে এক-ই উৎসবের সময় ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি দেখা দিল, তবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দাঙ্গা আটকাতে সমর্থ হল। বোম্বাই বিভাগের কোলাপুরে আরও একটি বড় দাঙ্গা হল অক্টোবর মাসে। সেখানে স্থানীয় হিন্দুরা দেবমূর্তিসহ একটি গাড়ি নিয়ে শহরে যাচ্ছিল। তারা যখন একটি মসজিদের কাছে আসে, তখন তাদের সঙ্গে কিছু মুসলমানের বচসা হয়, এ থেকেই শুরু হয় দাঙ্গা-হাঙ্গামা।

এপ্রিলের শুরুতে কলকাতায় একটি মসজিদের সামনে এক শোচনীয় দাঙ্গা হয় মুসলমান ও কিছু আর্য সমাজের লোকেদের মধ্যে। ৫ এপ্রিল পর্যন্ত চলেছিল এই দাঙ্গা। ৫ এপ্রিল দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করে এক বিশাল জনতা, তখন গুলি চালাতে হয়। অগ্নি সংযোগের ঘটনাও বহু ঘটে। প্রথম তিন দিন দমকলবাহিনীকে ১১০টি অগ্নিকাণ্ডের মোকাবিলা করতে হয়। এই দাঙ্গার অভাবনীয় ঘটনা হল মুসলমানদের মন্দির আক্রমণ ও হিন্দুদের মসজিদ আক্রমণ, যার ফলে তিক্ততা আরও বেড়ে গেল। ৪৪ জনের মৃত্যু এবং ৫৮৪ জনের আহত হবার ঘটনা ঘটল। লুঠতরাজও চলল কিছু, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হল। কলকাতা এক তীব্র অর্থনৈতিক ক্ষতির মধ্যে পড়ে। ৫ এপ্রিলের পরেই দোকানপাট খুলতে থাকে, কিন্তু ১৩ এপ্রিল হিন্দুদের একটি উৎসব ও ১৪ এপ্রিল ঈদ থাকায় উত্তেজনা দীর্ঘায়ত হল। ১৩ এপ্রিল শিখরা একটি মিছিল বার করতে চাইল, কিন্তু সরকার তাদের প্রয়োজনীয় অনুমতি দিতে অক্ষমতা জানালেন। ১৩ ও ১৪ তারিখের জন্য আশঙ্কার কারণ অবশ্য ঐ দু'দিন হল না। ২২ এপ্রিল পর্যন্ত শান্তি অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু রাস্তায় একটি সামান্য ঝগড়াকে কেন্দ্র করে হঠাৎ গোলমাল শুরু হয়ে গেল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এরকম লড়াই অবশ্য ছোটখাটো ধরনের ছিল এবং এটি ছদিন স্থায়ী ছিল। এ সময়ের মধ্যে মন্দির বা মসজিদের ওপর তেমন আক্রমণ হয়নি, তবে কিছু পরিমাণ লুঠতরাজ হয়েছে। বহু ঘটনায় উত্তেজিত জনতা পুলিশ এলেও সঙ্গে সঙ্গে সরে যায় নি, এবং প্রায় ১২টি ঘটনায় গুলি চালাতে হয়েছে। দ্বিতীয় দফার এই দাঙ্গায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৬ এবং আহতদের সংখ্যা ৩৯১। প্রথম দাঙ্গায় দোকানপাট বন্ধ হয়ে ব্যবসা সংক্রান্ত কেনা-বেচার যথেষ্ট বিপর্যয় ঘটে ছিল। মাড়োয়ারিদের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি বন্ধ হবার ফল পড়েছিল ইউরোপের বাণিজ্য কেন্দ্রেও। সন্ত্রাসের ফলে বহু বাজার অংশত বা পূর্ণ বন্ধ থাকে। দু'দিন ধরে মাংস সরবরাহ বন্ধ ছিল। মানুষের মধ্যে ভয় এত বেড়ে গিয়েছিল যে, উপদ্রুত অঞ্চলে আবর্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থাও বন্ধ হয়ে গেল। বণ্টন ব্যবস্থা নিয়মিত করতে ব্যবস্থা নেওয়া হল। পৌরসভা পুলিশের কাছে আবেদন জানালে পৌরসভার ঝাড়ুদার সংক্রান্ত সমস্যারও সমাধান করা হল। দাঙ্গার প্রসার হল কিছু এলাকায়, কিন্তু কলকাতার চারপাশে শিল্পাঞ্চলের

কোনও ক্ষতি হল না। উপদ্রুত অঞ্চলে যথাযথ আক্রমণ, গুণ্ডা বদমাসদের গ্রেপ্তার, অস্ত্রশস্ত্র দখল ও ব্রিটিশ সৈন্যকে পুলিশের বদলে নিয়োগ করে তাদের বিশেষ আধিকারিক পদে উন্নীত করার ফল ভালই হল। বিচ্ছিন্ন কিছু হত্যা ও আক্রমণের ঘটনা সত্ত্বেও অবস্থার উন্নতি হল। বিচ্ছিন্ন হত্যাকাণ্ডগুলির জন্য দায়ী ছিল উভয় সম্প্রদায়ের কিছু গুণ্ডা শ্রেণীর লোক। প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় তাদের কাজের ফলে এরকম একটি সাধারণ বিশ্বাস তৈরি হয় যে তারা ছিল ভাড়াটে খুনি। দাঙ্গার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল উভয় পক্ষের জ্বালাময়ী প্রচার পুস্তিকা বিতরণ ও ভাড়াটে গুণ্ডা নিয়োগ। এতে এমন ধারণা জোরদার হয় যে, দাঙ্গাকে চালু রাখতে টাকার খেলা চলছিল।

১৯২৬-২৭ সাল ছিল সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার নিরবিচ্ছিন্ন বছর। এপ্রিল ১৯২৬ থেকেই প্রতি মাসেই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর মধ্যে কম বেশি হাঙ্গামা হয়েছে শুধুমাত্র দু'টি মাস বাদ দিয়ে। এই দুই মাসে আক্ষরিক অর্থে এবং আইনগত অর্থে কোনও হাঙ্গামা হয়নি। এরকম অসংখ্য দাঙ্গার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তারা হয় কোনও তুচ্ছ কোনও কারণে শুরু হয়েছিল, যেমন— একজন হিন্দু দোকানদার ও একজন মুসলমান ক্রেতা, অথবা কোনও ধর্মীয় উৎসব পালন, অথবা মুসলমানদের উপাসনার জায়গা দিয়ে হিন্দু শোভাযাত্রাকারীদের বাজনা বাজিয়ে যাওয়া। দু'টি একটি দাঙ্গার শুধু স্নায়ুর চাপ ও সাধারণ উত্তেজনা ছাড়া আর কোনও কারণ ছিল না। এগুলির মধ্যে ২৪ জুন দিল্লিতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। যখন একটি টাট্টু ঘোড়ার পায়ে বল্টু লাগানো হচ্ছিল তখন জনাকীর্ণ রাস্তায় মানুষের মনে ধারণা হল যে, দাঙ্গা লেগে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ইঁট-পাটকেল ও কাঠের ডাণ্ডা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে মারামারি শুরু করে দেয়।

১৯২৬ সালের এপ্রিল ও মে মাসে কলকাতায় দু'টি দাঙ্গা ঘটল। ১ এপ্রিল ১৯২৭ সালের মধ্যে বারো মাসের মধ্যে ৪০টি দাঙ্গার ফলে ১৯৭ জন মৃত ও বহু আহত হল, তাদের সংখ্যা প্রায় ১৫৯৮। বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে সব জায়গাতেই, তবে বাংলা, পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশই সব চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দাঙ্গাতে সব চেয়ে ক্ষতি হল বাংলার, কিন্তু বোম্বাই বিভাগ ও সিন্ধুতেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ বিস্ফোরিত হয়েছে বারবার।। সারা গ্রীষ্মকালটাই কলকাতা অস্বস্তির মধ্যে কাটাল। ১ জুন সামান্য বচসা থেকে ছড়িয়ে পড়ল দাঙ্গা, আহত হল ৪০ জন মানুষ। এর পর ১৫ জুলাই পর্যন্ত এই সব ইচ্ছাকৃত দাঙ্গা ঘটানো হল না। একটা থমথমে ভাব বজায় রইল। ১৫ জুলাই ছিল হিন্দুদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব। এ সময় শোভাযাত্রীদের বাজনা বাজিয়ে যখন একটি মসজিদের পাশ দিয়ে

যাচ্ছিল, তখন হাঙ্গামা শুরু হয়। ১৪ জন নিহত ও ১১৬ জন আহত হল। পরের দিন ছিল মুসলমানদের বড় উৎসব মহরম। সেদিন দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। কিছু দিন ঠাণ্ডা থাকার পর ১৯, ২০, ২১ এবং ২২ জুন আবার অশান্তি শুরু হল। ২৩, ২৪ এবং ২৫ তারিখে ঘটল বিচ্ছিন্ন আক্রমণ ও ছুরিকাঘাতের ঘটনা। এই পর্যায়ে মৃত্যু ও আঘাতের নিশ্চিত সংখ্যা যথাক্রমে ২৮ ও ২২৬। ১৫ সেপ্টেম্বর ও ১৬ অক্টোবর আবার দাঙ্গা কলকাতায়। পরের দিন সংলগ্ন শহর হাওড়াতেও ছড়িয়ে পড়ল যার ফলে দু' একজন নিহত ও ৩০ জন আহত হল। এপ্রিল ও মে মাসের দাঙ্গাগুলি ব্যাপক অগ্নি সংযোগের ফলে মারাত্মক হয়ে উঠল, কিন্তু সুখের কথা, জুলাই মাসের পরবর্তী দাঙ্গাগুলিতে অগ্নি সংযোগের ঘটনা বেশ কমে গিয়েছিল। মাত্র চারটি ক্ষেত্রে দমকল বাহিনীকে ডাকতে হয়েছিল।

১৯২৭-২৮ সালে ঘটল আরও অনেক ঘটনা। এপ্রিলের শুরু থেকে ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কম করে ২৫টি দাঙ্গার খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১০টি যুক্তপ্রদেশে, ৬টি বোম্বাই বিভাগে, ২টি করে পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, বাংলা ও বিহার ওড়িশায় এবং দিল্লিতে একটি। এই সব দাঙ্গার কারণ ছিল ধর্মীয় উৎসব প্রতিপালন, মসজিদের সামনে হিন্দু শোভাযাত্রীদের বাজনা বাদ্য অথবা মুসলমানদের গো-হত্যা। এ সব ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১০৩ এবং আহতের সংখ্যা প্রায় ১০৮৪।

১৯২৭ সালের ৪ থেকে ৭ মে পর্যন্ত সময়ের মধ্যে লাহোরের দাঙ্গাই ছিল ভয়ঙ্করতম। দাঙ্গার কয়েক দিন আগে থেকেই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে চলছিল একটা উত্তেজনাপূর্ণ থমথমে অবস্থা। একজন মুসলমান ও দু'জন শিখের মধ্যে আচমকা এক সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে বিস্ফোরিত হল সেই বারুদের স্তূপ। দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যুৎগতিতে। ২৭ জন হত ও ১৭২ জন আহত হল। এরা সবাই ছিল অসংগঠিত আক্রমণের শিকার। ঘটনাস্থলে পুলিশ এবং সামরিক বাহিনী ছুটে যেতে অবশ্য দাঙ্গার প্রসার কমল। লাহোরের রাস্তাঘাট নিরাপদ হতে সময় লাগল আরও দু' তিন দিন যার মধ্যে এখানে ওখানে হত্যা ও আক্রমণের ঘটনা ঘটল কিছু কিছু।

মে মাসের লাহোর-দাঙ্গার পর সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বন্ধ ছিল দু মাস। মাঝে অবশ্য জুনের মাঝামাঝি বিহার ও ওড়িশায় একটি ছোট ঘটনা ঘটল। কিন্তু জুলাই মাসে কম করে ৮টি দাঙ্গার ঘটনা ঘটল যার মধ্যে সব চেয়ে মারাত্মক ছিল পঞ্জাবের মুলতানে মহরমের উপলক্ষে। এতে ১৩ জন মারা যায় এবং ২৪ জন আহত হয়। অগাস্ট মাসে অবস্থার আরও অবনতি হল। ৯টি দাঙ্গার ঘটনায় অন্তত

২টি ক্ষেত্রে প্রচুর প্রাণহানি হল। বিহার-ওড়িশার শহরে বেতিয়াতে একটি ধর্মীয় শোভাযাত্রা সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে দাঙ্গায় ১১ জন মারা যায় ও ১০০ জনেরও বেশি আহত হয়। যুক্তপ্রদেশের বেরিলিতে একটি মসজিদের সামনে হিন্দুদের শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে বাধলো আরও একটি দাঙ্গা যাতে ১৪ জন মারা গেল এবং ১৬৫ জন আহত হল। ভাগ্যক্রমে এই ঘটনাই সে বছরের সাম্প্রদায়িকতার ঘটনায় নতুন মোড় তৈরি করল। সেপ্টেম্বরে মাত্র ৪টি দাঙ্গা হল। এর মধ্যে মধ্যপ্রদেশে নাগপুরে ৪ঠা সেপ্টেম্বর যে দাঙ্গা হল, ভয়াবহতার দিক থেকে তা লাহোরের পরেই। মুসলমানদের একটি মিছিলকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত হলেও বেশ কিছু সময় ধরে এর প্রস্তুতি চলেছে। এই দাঙ্গায় ১৯ জন মৃত ও ১২৩ জন আহত হয়। অনেক মুসলমান তাদের বাড়ি ছেড়ে নাগপুর থেকে পালিয়ে যায়।

এ সময় হিন্দু-মুসলমানদের সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল দাঙ্গার চেয়েও বীভৎস ছিল দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্তাক্ত হানাহানি। এই সব ভয়াবহ দাঙ্গার মধ্যে কিছু হয় 'রঙ্গিলা রসুল' এবং 'রিশল বর্তমান' নামে দুটি বই প্রকাশের ব্যাপারে বিক্ষোভ দেখানোর সূত্রে। বই দুটিতে পয়গম্বর মহম্মদ সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য ছিল এবং তারই ফলে বেশ কিছু নিরপরাধ মানুষ শোচনীয়ভাবে প্রাণ হারায়। ১৯২৭ সালের গ্রীষ্মে লাহোরে বেশ কিছু ব্যক্তিহত্যার ঘটনা যথেষ্ট উত্তেজনা এবং নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়।

'রঙ্গিলা রসুল' সম্পর্কিত উত্তেজনা এটির উৎপত্তিস্থল থেকে ছড়িয়ে পড়ল বহু দূরে এবং জুলাই মাসের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। জুনের শুরুতেই এখানে অশান্তির লক্ষণ ফুটে ওঠে। জুলাইয়ের শেষে উত্তেজনা চরমে ওঠে। সীমান্তের ব্রিটিশ অঞ্চলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দৃঢ় ও কৌশলী হয়ে শান্তি ভঙ্গ রুখে দিল। ব্রিটিশ সীমান্তে বিশেষত পেশোয়ার অঞ্চলে হিন্দুদের অর্থনৈতিক প্রতিরোধের জন্য অবাধে প্রচার চলল। কিন্তু এই আন্দোলন তেমন সফল হয়নি এবং যদিও দু একটি গ্রামে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে, তবু অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে অবস্থা আয়ত্তে আসে। কিন্তু সীমান্ত বরাবর পয়গম্বরের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার ফলে ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ অবস্থাকে খারাপ করে তুলল। ধর্মের আহ্বানে সীমান্তবর্তী আদিবাসীরা খুব-ই স্পর্শকাতর। খাইবার পাশ অঞ্চলে আফ্রিদি ও সিনওয়ারি সম্প্রদায়ের কাছে যখন একজন সুপরিচিত মোল্লা হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রচার করতে লাগলেন, তখন তাঁর ভাষণ বৃথা গেল না। তিনি আফ্রিদি ও সিনওয়ারিদের ডেকে ঠিক করলেন

যে তাদের মধ্যে যে সব হিন্দু বাস করে তারা যদি লিখিতভাবে না ঘোষণা করে যে তারা তাদের স্বধর্মীদের আচার-ব্যবহারের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে দেবে, তবে তাদের বহিষ্কার করা হবে। ২২ জুলাই প্রথম যে হিন্দুদের বহিষ্কার করা হল তারা খাইবার আফ্রিদিদের দুটি উপজাতি—কুইখেল (Kuikhel) ও জাক্কাখেল (Zakkakhel)। সিনওয়ারি জাতিরাও এতে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের হিন্দু প্রতিবেশিদের কিছু দিন পরেই চলে যাবার নোটিশ দিল। কিছু হিন্দু চলে যাবার পর অবশ্য সিনওয়ারিরা বাকি হিন্দুদের থাকার অনুমতি দিল। খাইবার অতিক্রম করার সময় কিছু হিন্দুকে অত্যাচার করা হয়েছে। দু'টি ঘটনায় তাদের প্রতি পাথর ছোঁড়া হয়েছে, যদিও কোনও ক্ষতি হয়নি কারোর। তৃতীয় আর একটি ঘটনায় একজন হিন্দু আহত হয় এবং তার বিশাল সম্পত্তি লুঠ করা হচ্ছিল, যখন আফ্রিদি খাস্যাদার (Khassadar) সম্প্রদায়ের লোকেরা তা সম্পূর্ণ উদ্ধার করে এবং অপরাধীদের জরিমানা করা হয়। এর পর আদিবাসী অঞ্চল ছেড়ে হিন্দুদের চলে যাবার জন্য রাস্তায় খুঁটি পুঁতে জায়গা করে দেওয়া হয়। রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের চাপে জুলাইয়ের শেষে এক আফ্রিদি জিরগা (Jirga) রিসালা বর্তমানের (Risala Vartaman) ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্তে আসা সাপেক্ষে হিন্দুদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক প্রতিরোধ বন্ধ করতে মনস্থির করেন। পরের সপ্তাহে যে সব হিন্দু পরিবার খাইবার পাশের উচ্চভূমি লান্ডি কোটালে বাস করছিল, তারা পেশোয়ারে চলে গেল। তারা উপজাতীয় প্রধানের আশ্বাসে সন্তুষ্ট না হয়ে প্রত্যেক পরিবারের একজনকে তাদের স্বার্থ দেখার জন্য রেখে গেল। অগাস্টের মাঝামাঝি যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে, তখন প্রায় সাড়ে চারশো হিন্দু নর নারী ও শিশু পেশোয়ারে চলে গেল। কিছু হিন্দুকে বহিষ্কার করা হল, কাউকে বাড়ি ছাড়তে ভয় দেখানো হল, কেউ কেউ ভয়েই পালিয়ে গেল। আবার কেউ কেউ প্রতিবেশীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে বাড়ি ছাড়লো। উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে এত বেশি সংখ্যায় বাধ্যতামূলক ও স্বেচ্ছায় জনস্রোত বইতে লাগলো যে, এটিকে একটি নজিরবিহীন ঘটনা বলা যায়। হিন্দুরা এখানে কয়েক পুরুষ ধরে বাস করার দরুণ একটি সম্মানজনক প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছিল এবং উপজাতীয় সমাজ ব্যবস্থার-ই একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছিল। যে উপজাতির স্বার্থ পূরণের ব্যাপারে আদিবাসীরা বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে গিয়েছিল এবং যাদের সামন্ততান্ত্রিক রক্তে নিজেদের আত্মীকরণ করেছিল। এই অস্থির অবস্থায় প্রায় ৪৫০ জন হিন্দু খাইবার ত্যাগ করে। এদের মধ্যে প্রায় ৩৩০ জন ১৯২৭ সালের শেষের দিকে তাদের বাড়িতে আবার ফিরে আসে। বাকিদের অধিকাংশ অন্তত বর্তমানের জন্য হলেও ব্রিটিশ ভারতে নিরাপদ পরিস্থিতিতে

বসবাসের সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯২৮-২৯ সাল অবশ্য ১৯২৭-২৮ সালের তুলনায় শান্তিপূর্ণ ছিল। কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং তার বাইরেও বড়লাট লর্ড আরউইন তাঁর ভাষণে রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ যে সব প্রশ্নে দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্ককে খারাপ করেছিল, সে সব প্রশ্নের সমাধান করে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তির পক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করেন। সৌভাগ্যক্রমে ১৯২৯ সালে নিযুক্ত 'সাইমন আয়োগ' তদন্ত থেকে যে সব বিষয় বেরিয়ে আসে সেগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তির ভারসাম্যের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যার ফলে স্থানীয় ছোটখাটো সংঘর্ষের চেয়েও সাংবিধানিক নীতি নির্ধারণের মতো বিশাল ব্যাপারে আরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। তা ছাড়া ১৯২৭ সালে ভারতীয় আইন সভার শরৎকালীন অধিবেশনে আন্তঃ-সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রসারে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আইন পাশ হবার ফলে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা অনেক কমে আসে। ১৯২৯ সালের ৩১ মার্চ যে বছর শেষ হয়, সে সময়ের মধ্যে দাঙ্গার সংখ্যা ছিল ২২টি। যদিও এ সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, বোম্বাইয়ের দাঙ্গায় নিহতের সংখ্যা কম করে দাঁড়িয়েছিল ২০৪ এবং আহত হয়েছিল প্রায় এক হাজার। এক পক্ষের মধ্যে বোম্বাইতে নিহত ও আহতের সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৪৯ এবং ৭৩৯। মে মাসের শেষে বাৎসরিক মুসলমান উৎসব বকর-ই-ঈদের দিন-ই ২২টির মধ্যে ৭টি অর্থাৎ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দাঙ্গা ঘটে গেল। এই উৎসবটিতে প্রতি বছর-ই হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ঘটে। মুসলমানদের কাছে দিনটি প্রাণী হত্যার দিন, এবং সব সময় এক্ষেত্রে গোরুকেই বেছে নেওয়া হয়, যার ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্ফোরক সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। বকর-ই-ঈদের মধ্যে দুটি ছিল ভয়ঙ্কর এবং দুটিই ঘটে পঞ্জাবে। প্রথমটি ঘটে আম্বালা জেলার একটি গ্রামে, যেখানে ১০ জন হত ও ৯ জন আহত হয়। দক্ষিণ পঞ্জাবে গুরগাঁও জেলার সকটা গ্রামের দ্বিতীয় দাঙ্গাটি উত্তেজনার দিক থেকে আরও বেশি উল্লেখযোগ্য ছিল। সকটা গ্রামটি দিল্লি থেকে ২৭ মাইল দক্ষিণে মুসলমান অধ্যুষিত। এই গ্রামের চারপাশের গ্রামগুলিতে থাকত হিন্দু চাষীরা, যারা ঈদের দিন সকটার মুসলমানরা গো-হত্যা করবে শুনে এই মর্মে আপত্তি করল যে, তাদের মাঠে নির্দিষ্ট গোরুটি চরে বেড়ায়। গণ্ডগোল যখন ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে এসে গেল, তখন জেলার আরক্ষা-অধীক্ষক (Superintendent of Police) কিছু পুলিশ নিয়ে শান্তি রক্ষা করতে এলেন। তিনি বিতর্কিত গোরুটির দায়িত্ব নিয়ে তাকে আটকে ফেললেন। কিন্তু তাঁর উপস্থিতিতে একটুও বিচলিত না হয়ে হিন্দু চাষীরা পাশাপাশি গ্রাম থেকে বর্শা, তীর ধনুক ও আরও বিশিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সকটার

উদ্দেশে রওনা দিল। আরক্ষা-অধীক্ষক ও একজন ভারতীয় রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক জনসাধারণকে আশ্বাস দিলেন যে, যে-গোরুটিকে ঘিরে হঠাৎ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল, তাকে হত্যা করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু গ্রামবাসীরা তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে ঘোষণা করল যে, যদি কোনও গোরুকে হত্যা করা হয় তবে সারা গ্রাম তারা জ্বালিয়ে দেবে। তারা আরও দাবি করলো যে, গোরুটিকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। আরক্ষা-অধীক্ষক এই দাবি মানতে অস্বীকার করলে জনতা ক্রুদ্ধ হয়ে পুলিশের দিকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাদের হঠিয়ে দিলেন। অধীক্ষক জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে তাদের চলে যেতে বললেন, কিন্তু ফল হল না কিছুতেই। সুতরাং তিনি বলিষ্ঠ ভাবে তাঁর রিভলবার থেকে একটি গুলি ছুঁড়লেন ভবিষ্যতের সতর্ক বাণী হিসাবে। জনগণকে অনেক কাছে এগিয়ে আসতে দেখে অধীক্ষক পুলিশকে গুলি করার আদেশ দিলেন। প্রথমে মাত্র একবারই গুলি করা হল, কিন্তু তাতে জনতা পিছু হটল না, তারপর আরও দুবার গুলি করা হলে একটু একটু লোক সরে যায়। সঙ্গে কিছু গবাদি পশুও তারা নিয়ে যায়।

পুলিশ যখন এই সব কাজে ব্যস্ত, তখন কিছু হিন্দু চাষী সকটার অন্য জায়গায় গিয়ে গ্রামে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। তিন চার জন লোক আঘাত পাবার পর পুলিশ এসে ওদের হটিয়ে দিল। এই ঘটনায় ১৪ জন নিহত ও ৩৩ জন আহত হয়। পঞ্জাব সরকার ঘটনার তদন্ত করার জন্য একজন বিচার বিভাগীয় অফিসারকে নিয়োগ করে। ৬ জুলাই প্রকাশিত তাঁর এই তদন্তের প্রতিবেদনে জনতার ওপরে পুলিশের গুলি চালনাকে সমর্থন করা হয় এবং এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, গুলি চালনা মোটেই বাড়াবাড়ি হয়নি এবং জনতা সরে গেলেও গুলি চালনা অব্যাহত ছিল না। তদন্তের বিবরণে আরও বলা হয়, পুলিশ যদি গুলি না চালাত, তাহলে তাদের জীবন-ই বিপন্ন হত, বিপন্ন হত সকটার মানুষ। পরিশেষে তদন্তকারী আধিকারিকের বিবরণ অনুযায়ী সকটার গ্রামে অভিযান না চালালে ২৪ ঘন্টার মধ্যে চারপাশের গ্রামে সাম্প্রদায়িক বিস্ফোরণ ঘটে যেত।

কলকাতার অদূরে গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন খড়্গপুরেও প্রচুর জীবনহানি হয়েছে। সেখানে দুটি দাঙ্গা বাধে—একটি জুন মাসের শেষে মহরম উপলক্ষে এবং দ্বিতীয়টি ১ সেপ্টেম্বর, ১৯২৮ সালে যখন একটি গো-হত্যা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দাঙ্গায় ১৫ জন নিহত ও ২১ জন আহত হয়। দ্বিতীয় দাঙ্গায় এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯ এবং ৩৫। বোম্বাইতে ফেব্রুয়ারি মাসের শুরু থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে যে মারাত্মক দাঙ্গায় ১৪৯ জন নিহত ও ৭০০ জনেরও বেশি আহত হয়, তার তুলনায় এগুলি অবশ্য কিছুই না।

১৯২৯-৩০ সালে জনজীবনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অশুভ দাঙ্গার সংখ্যা কমে যায়। ভারত সরকারের গোচরে আনার মত দাঙ্গায় ঘটনা ঘটে মাত্র ১২টি। এর মধ্যে বোম্বাইয়ের হাঙ্গামা ছিল ভয়াবহ। ২৩ এপ্রিল শুরু হয়ে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এখানে ওখানে গণ্ডগোল চলতে লাগল বিক্ষিপ্তভাবে, যার ফলে ৩৫ জনের মৃত্যু হল এবং ২০০ জন আহত হল। এপ্রিলেই লাহোরে রাজপাল হত্যা নতুন মাত্রা যোগ করল। এই রাজপাল 'রঙ্গিলা রসুল' প্রকাশ করে মুসলমানদের খুব বেকায়দায় ফেলে দেয়। এতে ইসলামের প্রবক্তার বিরুদ্ধে অমার্জিত রুচিপূর্ণ আক্রমণ করা হয়, যার ফলে অতীতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়েছে। হয়েছে অনেক রকমের আইনি ও রাজনৈতিক জটিলতা। সৌভাগ্যক্রমে এই হত্যাকাণ্ডের সময় দুই সম্প্রদায়ের লোকেরাই প্রশংসনীয় সংযমের পরিচয় দিয়েছিল। আবার হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তির ফাঁসি ও অন্ত্যেষ্টির সময় যদিও উত্তেজনা ছিল, কিন্তু কোনও গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়নি।

১৯৩০-৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলন বিস্ফোরিত হল। যেন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা। অধিকাংশই তার অবশ্য রাজনৈতিক চরিত্রের। পুলিশ ও কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকরাই প্রধানত এতে জড়িয়ে পড়ত। কিন্তু এই সব রাজনৈতিক গণ্ডগোলে মিশে গেল সাম্প্রদায়িক রং, ভারতে যেমনটি প্রায়ই হয়ে থাকে। এর কারণ আইন অমান্য আন্দোলনে কংগ্রেসি স্বেচ্ছাসেবকরা মুসলমানদের অংশগ্রহণে যেভাবে বলপ্রয়োগ করত, তার কাছে নতিস্বীকার করতে মুসলমানরা রাজি হয়নি। ফলে যদিও বছরটি শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক গোলমাল দিয়ে, শেষ হল বহু সংখ্যায় গুরুতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দিয়ে। ৪ থেকে ১১ আগস্টের মধ্যে সিন্ধুর সুক্কুর অঞ্চলে ভয়ঙ্করতম দাঙ্গাটি বাধল যাতে একশোর বেশি গ্রামবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হল। ১২ থেকে ১৫ জুলাই বাংলার ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায় দেখা দিল এ রকম-ই গুরুতর দাঙ্গা। তা ছাড়া যুক্তপ্রদেশে বালিয়াতে ৩ আগস্ট ও নাগপুরে ৬ সেপ্টেম্বর ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হল। বোম্বাইতে হল ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর। মাদ্রাজে তিরুচন্দরের কাছে ৩১ অক্টোবর হিন্দু ও খ্রিস্টানদের মধ্যে সংঘর্ষ হল। ১২ ফেব্রুয়ারি অমৃতসরে সত্যাগ্রহীদের উপেক্ষা করার জন্য একজন হিন্দু কাপড় ব্যবসায়ীকে হত্যার চেষ্টা হয়। আগের দিন বারাণসিতেও গুরুতর গণ্ডগোল হয়েছিল। এর শিকার হয়েছিল এক মুসলমান ব্যবসায়ী, আক্রমণের ফলে যিনি প্রাণ হারান। ফলে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই সময় হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ভয়ঙ্কর দাঙ্গা শুরু হয়, এবং স্থায়ী হয় ৫ দিন, যার ফলে প্রচুর সম্পত্তি ও জীবনহানি হয়। এই সময়ে অন্যান্য সাম্প্রদায়িক

অশান্তির ঘটনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ২৫ জানুয়ারি বাংলায় নীলফামারি ও ৩১ জানুয়ারি রাওয়ালপিন্ডির দাঙ্গা। সারা উত্তর ভারতে ১৯৩১ সালের প্রথম দু'মাসের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটল। ইতিমধ্যে ফেব্রুয়ারি মাসে বারাণসিতে গুরুতর দাঙ্গা হয়ে গেল। কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত সামগ্রিক অশান্ত পরিবেশ ও ব্যবসা বাণিজ্য অচলাবস্থার ফলে মুসলমানদের মধ্যে যে অসন্তোষ আরও বেড়ে যায়, তার-ই জন্য প্রধানত এই সব দাঙ্গা-হাঙ্গামা। সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় কংগ্রেস যেভাবে গুরুত্ব পেয়ে যায়, তার ফলে মুসলমানদের মনে আতঙ্ক বাড়ে এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনাকর অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। মার্চ মাসে এই উত্তেজনা অন্তত যুক্তপ্রদেশে ভীষণ বেড়ে যায়। ১৪ ও ১৬ তারিখের মধ্যে মির্জাপুর জেলায় প্রচণ্ড দাঙ্গা বেধে গেল। আগ্রায় হল ১৭ তারিখে এবং চলল ২০ তারিখ পর্যন্ত। বাংলার ধানবাদে ২৮ তারিখে, অমৃতসর জেলায় ৩০ তারিখে এবং দেশের অন্যান্য অনেক জায়গায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক ভীষণভাবে খারাপ হয়ে গেল।

অসমের ডিগবয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লখিমপুর জেলায় একজন হিন্দু ও তিনজন মুসলমান প্রাণ হারাল। বাংলায় আসানসোল বিভাগে মহরম উৎসবের সময় দাঙ্গা দেখা দিল। বিহারে ও ওড়িশায়, বিশেষত সরানে সারা বছর ধরেই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছিল। সব মিলিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বে-আইনি সমাবেশের ঘটনা ঘটে ১৬টি। সাহাবাদের ভাবুয়াতে বকর-ই-ঈদের সময় একটি সংঘর্ষ হল। প্রায় ৩০০ হিন্দু একটি গো-হত্যার ভুল খবর পেয়ে সমবেত হয়। স্থানীয় অফিসাররা তাদের শান্ত করতে সমর্থ হলেন। কিন্তু প্রায় ২০০ মুসলমানের এক জনতা লাঠি, বর্শা ও তরবারি নিয়ে হিন্দুদের উপর আক্রমণ করে। ফলে একজন মারা যায়। দ্রুত পুলিশি ব্যবস্থা ও একটি সালিশি কমিটি গঠন করার ফলে হাঙ্গামা ছড়াতে পারেনি, মহরমের উৎসবে মুঙ্গেরে দুটি ছোটখাটো দাঙ্গা হল, একটিতে হিন্দুরা অন্যটিতে মুসলমানরা আক্রমণকারীর ভূমিকা নিয়েছিল। ঐ বছরেই মাদ্রাজে বেশ কয়েকটি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধে। কোনও কোনও অঞ্চলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে যায়। ৮ জুন ভেলোরে সব চেয়ে বড় গণ্ডগোল হল যখন তাজিয়া নিয়ে একটি মুসলমান মিছিল যাচ্ছিল একটি হিন্দু মন্দিরের পাশ দিয়ে। সংঘর্ষ এমন চরমে উঠেছিল, যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়। শহর জুড়ে সংঘর্ষ চলেছিল আরও ২/৩ দিন। সালেম শহরে ১৩ জুলাই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে উত্তেজনার কারণে শেবাপেটে হিন্দু-মুসলমানের কুস্তি লড়াইয়ে কে জিতবে, এই তর্ক নিয়ে সংঘর্ষ বেধে গেল। সালেম শহরের কাছে বিচিপালাইয়াম

শহরে অক্টোবর মাসে দাঙ্গা হল। রাস্তায় কিছু হিন্দু তরুণদের খেলায় কিছু মুসলমান বাধা দিলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। একটি হিন্দু মিছিল কোন্ দিকে যাবে, এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ১৫ মার্চ করনাম জেলার পলিকল গ্রামে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমুল গণ্ডগোল। তবে পুলিশবাহিনীর একটি ছোট দল দাঙ্গাবাজদের হঠিয়ে দিল খুব সহজেই। ১৯২৯ সালে পঞ্জাবে যেখানে ৮১৩ ছিল দাঙ্গায় সংখ্যা, সেখানে ঐ বছর এই সংখ্যা দাঁড়াল ৯০৭। এগুলির মধ্যে অনেকগুলিই সাম্প্রদায়িক চরিত্রের এবং রাজ্যের অনেক জায়গায় দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা ছিল। যুক্তপ্রদেশে ১৯৩০ সালে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা যদিও ১৯৩১ সালের প্রথম তিন মাসের মতো তীব্র ছিল না, এবং আইন অমান্য আন্দোলনের উত্তেজনায় এই অস্থিরতা কিছু সময়ের জন্য ঢাকা পড়ে যায়, তবু এর লক্ষণগুলির প্রকটতা কিছু কম ছিল না। আগের মত মতানৈক্যের কারণগুলিও ছিল যথারীতি শক্তিশালী। দেরাদুন ও বুলন্দশারে স্বাভাবিক আকারের দাঙ্গা বাধে। হিন্দু মিছিলের যাত্রা পথ নিয়ে আবার ভয়ঙ্কর দাঙ্গা বাধে বালিয়া শহরে। পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়। মুতরা, আজমগড়, মৈনপুরি, ইত্যাদি অনেক জায়গায় দাঙ্গা হয়।

১৯৩১-৩২ সালের ঘটনাগুলি পেরিয়ে আর. টি. সি-তে সংবিধান তৈরির আলোচনার সময় দেখা যাবে, এই সময় সংখ্যাগরিষ্ঠের নীতি অনুসারে রচিত সংবিধানে মুসলমান ও অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থা কী হবে, এ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে চিন্তার ছাপ পড়ে। প্রথম 'গোল টেবিল বৈঠক' সংবিধানের ভবিষ্যৎকে চাপা দিয়ে দেয়। তারপর থেকে স্বায়ত্ত শাসনের মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা অস্বচ্ছ ও নিতান্ত সাধারণ চিন্তাধারার জন্য বেশি দূর এগোতে পারে নি। কিন্তু বৈঠকের শুরুতে রাজ্যগুলির রাজকুমারদের ঘোষণা একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠনে কেন্দ্রের সরকারকে আরও বেশি দায়িত্বশীল করে তোলে। মুসলমানরা তাই উপলব্ধি করে যে, তাদের অবস্থা সুদৃঢ় করার পক্ষে এটাই উপযুক্ত সময়। গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে এই অস্বস্তি আরও ঘনীভূত হল। এই চুক্তির ফলে কংগ্রেসের অবস্থা একটা সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছলেও তাদের বিকাশ বা সরকারের বিরুদ্ধে তাদের জয় মুসলমানদের অস্বস্তিকর ধারণার নিবৃত্তি করতে পারল না। ঐ চুক্তির তিন সপ্তাহের মধ্যে কানপুরে দেখা দিল দারুণ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। ভগৎ সিং-এর ২৩ মার্চ ফাঁসির স্মরণে হরতাল পালনের জন্য কংগ্রেসিরা মুসলমান দোকানদের দোকান বন্ধ করার চেষ্টা করলে এই দাঙ্গা বাধে। ২৪ মার্চ এর পাল্টা হিসাবে হিন্দুদের দোকান লুঠ হয়। ২৫ মার্চ শুরু হল অগ্নিকাণ্ড। দোকান ও মন্দিরে আগুন লাগানো হয়। পুড়ে ছাই হয়ে যায় সে সব। বিশৃঙ্খলা, লুঠতরাজ, হত্যার

আগুন ছড়িয়ে পড়ল আগুনের-ই মতো। পাঁচশো পরিবার বাড়ি ছেড়ে গ্রামে আশ্রয় নিল। ড. রামচন্দ্র ছিলেন সব চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। তাঁর স্ত্রী ও বৃদ্ধ পিতামাতাসহ পরিবারের সব সদস্যকে হত্যা করে নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলা হয়। একই হত্যালীলায় গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীও প্রাণ হারাল। কানপুর দাঙ্গায় তদন্তকারী কমিটি এই মামলার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, দাঙ্গাটি ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত হিংসা ও বিচিত্র স্বেচ্ছাচারিতার ফল, সারা শহরে এবং শহরের বাইরেও তীব্র গতিতে ছুটে যায় এ সংবাদ। দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে সময় লাগলো তিন দিন, সে সময়ের মধ্যে হত্যা ও লুঠপাট চলল নির্বিচারে। পরে আস্তে আস্তে অবস্থা স্বাভাবিক হল। জীবন ও সম্পত্তিহানি হল প্রচুর। মৃত্যুর সংখ্যা হিসাবের মধ্যে ছিল ৩০০, কিন্তু এই সংখ্যা অনেকের মতে আরও বেশি এবং সম্ভবত ৪০০ থেকে ৫০০-এর মধ্যে। মন্দির ও মসজিদ ধ্বংস হয়েছে কিংবা পোড়ানো হয়েছে প্রচুর। প্রচুর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠন হল।

এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কিন্তু কোনও প্রয়োজন-ই ছিল না। কংগ্রেসের কিছু অনুগামীর প্ররোচনামূলক ব্যবহার এ সবের জন্য দায়ী। অনেক বছর ধরে এরকম দাঙ্গা ভারতে দেখা যায়নি। শহর থেকে প্রতিবেশী গ্রামাঞ্চলে হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ত যেখানে, সেখানে কয়েক দিন ধরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলত।

তুলনামূলকভাবে ১৯৩২-৩৩ সালে সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভ ও হাঙ্গামা ছিল কম। নতুন সংবিধানে মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে অনিশ্চতা দূর হবার জন্য এবং সাধারণভাবে আইন শৃঙ্খলার অবনতির কথা গোপন রাখার ফলে এরকম প্রশংসনীয় উন্নতি হয়েছিল, সন্দেহ নেই।

কিন্তু ১৯৩৩-৩৪ সালে সারা দেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল শুধুমাত্র হোলি, ঈদ ও মহরমের মতো উৎসবের সূত্রেই নয়, দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো সাধারণ ঘটনা থেকেও। এ থেকে প্রমাণিত হল, বছরের শুরু থেকেই সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের আবার অবনতি ঘটেছে। যুক্তপ্রদেশের বারাণসি ও কানপুরে, পঞ্জাবের লাহোরে এবং পেশোয়ারে হোলির সময় দাঙ্গা বাধল। বকর-ই-ঈদের সময় গো-হত্যা নিয়ে যুক্তপ্রদেশের অযোধ্যা, বিহার-ওড়িশার ভাগলপুর ও মাদ্রাজের কান্নানোরে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলল। যুক্তপ্রদেশের গাজিপুর জেলার দাঙ্গায় বেশ কিছু লোকের মৃত্যু হল। এপ্রিল ও মে মাসে বিহার, ওড়িশা, বাংলা, সিন্ধু ও দিল্লিতে বেশ কিছু দাঙ্গা হয়ে গেল, যার মধ্যে কয়েকটি তুচ্ছ ঘটনার প্ররোচনার ফল। উদাহরণ স্বরূপ, এক হিন্দু পথিকের গায়ে এক মুসলমান দোকানদারের

অনিচ্ছাকৃত থুতু ফেলার ঘটনায় দাঙ্গা বেধে গেল। ব্রিটিশ ভারতে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বৃদ্ধি প্রতিফলিত হয়েছিল আরও কিছু রাজ্যে যেখানে এক-ই রকমের ঘটনা ঘটেছিল।

জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত যে সব সাম্প্রদায়িক অশান্তি হয়েছিল তা থেকে এটাই বুঝা গিয়েছিল যে, দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব ছিল স্বাভাবিক ও সুগভীর। হিন্দু বা মুসলমানদের তেমন গুরুত্বপূর্ণ উৎসব না থাকায় জুন ও জুলাই মাস দাঙ্গার ঘটনা থেকে তুলনামূলকভাবে মুক্ত ছিল, যদিও বিহারের কিছু অঞ্চলের অবস্থার অবনতির জন্য বাড়তি পুলিশ নিয়োগ করতে হয়। ইতিমধ্যে আগ্রায় একটি দীর্ঘ মেয়াদি বিরোধ ছিল। এখানকার মুসলমানরা অভিযোগ করে যে, কিছু হিন্দু পরিবারের ধর্মীয় আচার পালনের সময় এত গোলমাল ও শব্দ হয় যে পাশের একটি মসজিদে প্রার্থনা করার সময় অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বিরোধের মীমাংসার আগেই ২০ জুলাই এবং ২ সেপ্টেম্বর দাঙ্গা বাধল, যাতে ৪ জন মারা গেল ও ৮০ জনেরও বেশি আহত হল। পয়গম্বরের সম্পর্কে কুৎসা সম্বলিত হিন্দুদের প্রকাশিত একটি বইকে কেন্দ্র করে মাদ্রাজে দাঙ্গা হল, যাতে এক জন নিহত ও ৭৩ জন আহত হয়। একই মাসে পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের অনেক অঞ্চলে ছোটখাটো দাঙ্গা ঘটল।

১৯৩৪-৩৫ সালে ২৯ জুন লাহোরে শোচনীয় দাঙ্গার কারণ ছিল শহিদগঞ্জ গুরুদ্বার নামে পরিচিত একটি শিখ মন্দিরের সামনে একটি মসজিদ সম্পর্কে একজন মুসলমান ও এক শিখের সঙ্গে সংঘর্ষ। বেশ কিছু সময় ধরে চলল অশান্ত পরিবেশ। মুসলমানদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও যখন শিখরা মসজিদটি ভাঙতে শুরু করল, তখন-ই বিদ্বেষের মনোভাব গাঢ়তর হল। বহুদিন ধরে অশান্ত অবস্থা চলল মসজিদটিকে নিয়ে, যেখানে আইনত অধিকার ছিল শিখদের-ই।

২৯ জুনের রাত্রে তিন-চার হাজার মুসলমানের এক জনতা ঐ গুরুদ্বারের সামনে সমবেত হল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দ্রুত হস্তক্ষেপে মুসলমান জনতা ও গুরুদ্বারের ভিতরের শিখদের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী লড়াই বন্ধ করা গেল। মুসলমান জনতা অবশ্য শিখদের কাছ থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল যে মসজিদটিকে ধ্বংস করার কাজে তারা বিরত থাকবে। কিন্তু পরের সপ্তাহে যখন নেতাদের কঠোর পরিশ্রমে একটি সম্মানীয় চুক্তিতে আসা গেল, তখন উগ্রপন্থীদের চাপে পড়ে শিখেরা আবার মসজিদ ভাঙার কাজে নেমে পড়ল। কর্তৃপক্ষ খুব অসুবিধার মধ্যে পড়ে গেলেন। শিখরা তাদের আইনসম্মত অধিকারের ভিত্তিতেই কাজ করছিল। তা ছাড়া

মসজিদ ভাঙা বন্ধ করার একমাত্র উপায় ছিল গুলি চালনা। কিন্তু যেহেতু বাড়িটিতে প্রচুর শিখের বাস এবং শিখেদের উপাসনার স্থান, সেহেতু গুলি চালনার ফলে শুধু যে প্রচুর রক্তপাত ঘটল তাই নয়, সারা প্রদেশ জুড়ে সমস্ত শিখদের মধ্যে এক প্রচণ্ড ধর্মীয় বিরূপতার সৃষ্টি হল। অন্য দিকে সরকারি ঔদাসীন্য মুসলমানদের ঘৃণার উদ্রেক করল স্বাভাবিক কারণেই। আশঙ্কা করা হল, শিখদের ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ হবে এবং সরকারি বাহিনীও রেহাই পাবে না।

দুই সম্প্রদায়ের নেতাদের পারস্পরিক আলোচনার ফলে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হবে, এমনটি আশা করা হয়েছিল। কিন্তু দুষ্কৃতীরা বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে মনের আগুন জ্বালিয়েই রাখল। প্রধান প্রধান দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করা হলেও উত্তেজনা বেড়েই চলল। মুসলমানরা যে মসজিদটি কয়েক বছর আগে কিনেছিল, সেটিকে পুনরুদ্ধার করে দেবার সরকারি প্রতিশ্রুতি সফল হয়নি। ১৯ জুলাই অবস্থার আরও অবনতি হল এবং পরবর্তী দু' দিনের মধ্যে পরিস্থিতি খুব-ই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল। বিশাল জনতা ক্রোধোন্মত্ত হয়ে কেন্দ্রীয় পুলিশ থাকা দখল করে। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার না করে তাদের সরিয়ে দেবার চেষ্টা বারবার ব্যর্থ হয়। ২০ জুলাই দু'বার এবং ২১ জুলাই আট বার গুলি চালাতে হয়। সব সমেত ২৩ রাউন্ড গুলি চলে এবং ১২ জন নিহত হয়। সামরিক ও পুলিশবাহিনীতেও অসংখ্য লোক আহত হয়।

গুলি চালনার ফলে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং আর একত্রিত হয় নি। অন্য প্রদেশ থেকে অতিরিক্ত পুলিশ আনা হয় এবং সামরিকবাহিনীর দুর্গগুলিকে শক্তিশালী করা হয়। প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয় অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে। কিন্তু ধর্মীয় নেতারা বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে মদত জোগাতে লাগলেন। শহরে গোলমাল আবার শুরু হল এবং কিছু মুসলমান সংগঠন কিছু অসম্ভব দাবি উত্থাপন করল।

বছরের শেষ পর্যন্ত লাহোরে অবস্থা ছিল যথেষ্ট উদ্বেগজনক। ৬ নভেম্বর এক মুসলমান একজন শিখকে শোচনীয়ভাবে আহত করে। তিন দিন পর হিন্দু ও শিখের মিলিত এক বিশাল মিছিল বার করা হয়। সংগঠকরা আপাতদৃষ্টিতে সংঘর্ষ এড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তবুও একটি বড় রকমের সংঘর্ষ ঘটে গেল। পরের দিন চলল ব্যাপক দাঙ্গা। অবশ্য পুলিশ ও সামরিকবাহিনীর চেষ্টায় দাঙ্গা থামল তাড়াতাড়ি, কিন্তু অসংখ্য মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হল।

১৯৩৫ সালের ১৯ মার্চ পয়গম্বরের বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ পুস্তিকা লেখক নাথুরামল

নামে এক হিন্দুকে হত্যার অভিযোগে আব্দুল কায়ুমের ফাঁসির দিন করাচিতে ব্যাপক হাঙ্গামা বাধে। শহরের বাইরে সমাধি দেবার জন্য কায়ুমের মৃতদেহ পুলিশ প্রহরায় তার আত্মীয়দের হাতে তুলে দেন জেলাশাসক। সমাধিস্থলে উপস্থিত হল প্রায় ২৫ হাজার লোক। কায়ুমের আত্মীয়েরা মৃতদেহ সমাহিত করতে চাইলেন, কিন্তু উত্তেজিত জনতা দেহ নিয়ে মিছিল করতে চাইল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জনতাকে আটকাতে চাইল। কারণ এর ফলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ লাগতে পারে। কিন্তু মিছিল আটকানোর সব পুলিশি প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল। তাই এক প্লেটুন রয়াল সাসেক্স রেজিমেন্টকে শান্তি রক্ষার জন্য আনা হল। উন্মত্ত জনতার গতি রোধ করতে এই বাহিনী খুব কাছ থেকে জনতার ওপর গুলি চালাতে বাধ্য হল। ৪৭ রাউন্ড গুলিতে ৪৭ জন নিহত ও ১৩৪ জন আহত হল। আবার এক বাহিনী আসার ফলে জনগণ আর এগোতে পারল না। আহতদের বে-সামরিক হাসপাতালে পাঠানো হল এবং আর কোনও প্রতিরোধের সম্মুখীন না হয়ে আব্দুল কায়ুমের দেহের সদ্‌গতি করা হল।

১৯৩৫ সালের ২৫ আগস্ট সেকেন্দ্রাবাদে এক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দেখা দিল।

১৯৩৬ সালে ঘটল চারটি দাঙ্গা। ১৪ এপ্রিল আগ্রা জেলার ফিরোজাবাদে ভয়াবহ দাঙ্গা হল। প্রধান বাজার দিয়ে যখন একটি মুসলমান মিছিল যাচ্ছিল, তখন হিন্দুদের বাড়ির ছাদ থেকে ইঁট ছোঁড়ার অভিযোগ করা হয়। এতে মুসলমানরা ক্রুদ্ধ হয়ে ডঃ জীবরাম নামে এক হিন্দুর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ডঃ জীবরামের বাড়ির সবাই এবং এ ছাড়া ৩টি শিশুসমেত ১১জন হিন্দু অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। ২৪ এপ্রিল ১৯৩৬ বোম্বাই বিভাগের পুণেতে দ্বিতীয়বার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধল। মুঙ্গের জেলার জামালপুরে দাঙ্গা লাগল ২৭ এপ্রিল। ঐ বছর-ই ১৫ অক্টোবর চতুর্থবার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হল বোম্বাই শহরে।

১৯৩৭ সালটিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ছড়াছড়ি। ২৭ মার্চ হোলির মিছিল নিয়ে পানিপথে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ১৪ জন নিহত। ১ মে মাদ্রাজে দাঙ্গা, ৫০ জন আহত। মে মাসটি ছিল দাঙ্গার ঘটনায় ঠাসা এক মাস। অধিকাংশ দাঙ্গাই ঘটেছিল মধ্যপ্রদেশ ও পঞ্জাবে। শিকারপুরের একটি সংঘর্ষ যথেষ্ট ত্রাসের সৃষ্টি করে। অমৃতসরে ১৮ জুন শিখ-মুসলমান দাঙ্গা বাধে। অবস্থা এমন পর্যায়ে যায় যে শান্তিরক্ষায় ব্রিটিশ বাহিনীকে নামাতে হয়।

১৯৩৮ সালে দুটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে—একটি ২৬ মার্চ এলাহাবাদে, অন্যটি এপ্রিল মাসে বোম্বাইতে।

১৯৩৯ সালে ৬টি হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। আসানসোলে ২১ জানুয়ারি এক দাঙ্গায় এক জন নিহত ও ১৮ জন আহত হয়। ১১ ফেব্রুয়ারি কানপুরে দাঙ্গা, ৪২ জন হত, ২০০ আহত ও ৮০০ জন গ্রেপ্তার হয়। ৪ মার্চ বারাণসিতে ও ৫ মার্চ কলকাতার কাশীপুরে দাঙ্গা হল। ১৯ জুন রথযাত্রার মিছিল নিয়ে কানপুরে আবার দাঙ্গা।

সিন্ধুপ্রদেশের সুক্কুরে ১৯৩৯ সালের ২৩ নভেম্বর আবার ভয়ঙ্কর দাঙ্গা। ঘটনার মূলসূত্র মঞ্জিলগড় নামে একটি বাড়ি মুসলমানদের জোর করে অধিগ্রহণের চেষ্টা। বাড়িটি এতদিন সরকারি তত্ত্বাবধানে ছিল এবং হিন্দুরা এই সরকারি সম্পত্তির হস্তান্তরে তীব্র আপত্তি জানাল। বোম্বাই হাইকোর্টের বর্তমান বিচারক মি. ই. ওয়েস্টন, যিনি এই সব দাঙ্গার তদন্ত করেছিলেন, তিনি নিম্নলিখিত নিহত ও আহতদের তালিকা দেন :

তালুক	নিহত		আহত		আহত পরে মৃত	
	হিন্দু	মুসলমান	হিন্দু	মুসলমান	হিন্দু	মুসলমান
সুক্কুর শহর	২০	১২	১১	১১	১	—
সুক্কুর তালুক	২	২	২৩	—	৫	—
শিকারপুর তালুক	৫	—	১১	—	২	—
গাড়হি ইয়াসিন তালুক	২৪	—	৪	—	—	—
রোহড়ি তালুক	১০	—	৩	—	—	—
পানো অকল তালুক	৬	—	১	—	—	—
ঘোড়কি তালুক	১	—	১	—	—	—
মিরপুর মাথেলো তালুক	—	—	১	—	—	—
উবাউরো তালুক	৪	—	৩	১	১	—
	১৪২	১৪	৫৮	১২	৯	—

তাঁর সংগৃহীত অনেক ভয়ঙ্কর তথ্যের মধ্যে নিচে কয়েকটি উল্লেখ করা হল :

'সুক্কুর থেকে আট মাইল ও শিকারপুর থেকে ষোল মাইল দূরে গোসারজি গ্রামে ২০ তারিখের রাত্রে এক ভয়ঙ্কর হাঙ্গামা ঘটেছিল। জেলা শাসকের পাঠানো একটি সরকারি বিবরণ অনুযায়ী সেই রাত্রে সেখানে ২৭ জন হিন্দুকে হত্যা করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুসারে অবশ্য সংখ্যাটি ৩৭'।

'গোসারজি গ্রামের ঠিকাদার পমনমল জানালেন, সত্যাগ্রহের সময় সেখানকার নেতৃস্থানীয় হিন্দুরা এলাকার গণ্যমান্য জমিদার খান সাহেব আমিরবক্সের কাছে তাঁর সুক্কুরে অবস্থানকালে তাঁদের অভিযোগ জানাতে আসতেন। জমিদার তাঁদের আশ্বাস দিতেন যে, তাঁদের নিরাপত্তার জন্য তিনি দায়ী থাকবেন। ২০ তারিখে খান সাহেব আমিরবক্স গোসারজিতে ছিলেন এবং সেদিন সকালে মুখি মেরুমল সেখানে নিহত হন। হিন্দুরা যখন খান সাহেব আমিরবক্সের কাছে নিরাপত্তার জন্য গেলেন, তখন তাঁদের আবার আশ্বাস দেওয়া হল, কিন্তু সেদিন রাতেই ঘটে গেল গণহত্যা ও ব্যাপক লুঠতরাজ। নিহত ৩৭ জনের মধ্যে ৭ জন ছিল নারী। পমনমল আরও জানালেন, পরের দিন সকালে তিনি বাগেরজি গ্রামের উপ-আরক্ষা পরিদর্শকের কাছে গিয়েছিলেন গোসারজি থেকে এক মাইল দূরে, কিন্তু তাঁকে গালাগালি দিয়ে থানা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর তিনি শিকারপুর গেলেন এবং পঞ্চায়েতকে নালিশ জানালেন। কোনও আধিকারিকের বিরুদ্ধে তিনি অবশ্য নালিশ জানান নি। এখানে উল্লেখ করা যায়, বাগেরজির উপ-আরক্ষা পরিদর্শনের গোসারজির হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হওয়ায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ২১১ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হয়েছিলেন'।

'জমিদার খান সাহেব আমিরবক্স, যিনি বাগেরজির হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য বারবার আশ্বাস দিয়েছিলেন, তাঁকে আদালতের শমন পেয়ে যেতে হয়েছিল সাক্ষ্য দিতে। তিনি বলেছিলেন, তিনি গোসারজি গ্রামের থেকে আধ মাইল দূরে থাকেন। ২০ তারিখে মেরুমলের হত্যার পর বাগেরজির উপ-আরক্ষা পরিদর্শকের এসেছিলেন এবং তিনি একজন হিতাকাঙ্ক্ষীর অভিনয় করেছিলেন। তিনি বলেন যে, হিন্দুরা কোনও সাহায্যই চায় নি। তাই কোনও সমস্যার আশঙ্কাও করা হয়নি। ২০ তারিখের রাত্রে তিনি সুস্থ ছিলেন না। তিনি হত্যাকাণ্ডের কিছুই জানতেন না। তিনি স্বীকার করেন যে তিনি মঞ্জিলগড় অধিগ্রহণের ইতিহাস শুনেছিলেন। পরে সাক্ষ্যদানের সময় তিনি স্বীকার করেন যে, সুক্কুরে যেহেতু গণ্ডগোল হয়েছে, তাই গোসারজি

গ্রামের অধিবাসীদের সতর্ক থাকতে বলা হয়। তিনি আরও বলেন, ১৯ মে সন্ধ্যায় তিনি পঞ্চায়েতের বৈঠক ডাকেন। হত্যাকাণ্ডের পর ২১ মে তিনি সূর্যোদয়ের সময় গোসারজি যান। তিনি মেনে নেন যে তাঁকে গোসারজির রক্ষাকর্তা বলে মনে করা হয়।'

মি. ওয়েস্টন আরও বলেছেন :

'এই সাক্ষ্যের সত্যতা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার কোনও সন্দেহ নেই যে ২০ তারিখের রাত্রে গোসারজিতে গণ্ডগোলের ব্যাপারে তিনি সব কিছু জানতেন এবং জেনে শুনেই তিনি বাড়িতে থাকাই পছন্দ করেছেন।'

কে অস্বীকার করবে যে, দাঙ্গার এই ইতিহাস এমন এক ছবি উপহার দিয়েছে যা যেমন বিষন্ন, তেমনি নিরানন্দময়? কিন্তু কালানুক্রমিক হিসাবে এই সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট প্রদেশে কী মারাত্মক ফল সৃষ্টি করে তার সঠিক ধারণা করা যায় না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও এ সব নিয়ে আসে পঙ্গুতা। একটি প্রদেশে দাঙ্গার পুনরাবৃত্তি হলে তার ধারণা সৃষ্টি করতে আমি বোম্বাই প্রদেশের দাঙ্গার কথাই বলি। সাধারণ ছবিটি দাঁড়ায় এইরকম:

'বোম্বাই বিভাগের অন্য সব জায়গা বাদ দিয়ে শুধু বোম্বাই শহরে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখলে কোনও সন্দেহ থাকবে না যে শহরের অবস্থা ছিল সব চেয়ে খারাপ। ১৮৯৩ সালে প্রথম হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধে। এর পর দীর্ঘ ১৯২৯ সাল পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক শান্তি বজায় ছিল। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলিতে শুধুই বেদনার ইতিহাস। ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাস— এই নয় মাসে কম করে ১০টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। ১৯২৯ সালে দুটি দাঙ্গা হয়েছে। প্রথমটিতে ১৪৯ জন নিহত ও ৭৩৯ জন আহত হয় এবং ৩৬ দিন স্থায়ী হয়। দ্বিতীয় ঘটনায় ৩৫ জন নিহত, ১০৯ জন আহত ও ২২ দিন স্থায়ী হয়। ১৯৩০ সালে দাঙ্গার সংখ্যা ২। এতে জীবনহানি ও এর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায়নি। ১৯৩২ সালে আবার দু'টি দাঙ্গা। প্রথমটি ছোট। দ্বিতীয়টিতে ২১৭ জন নিহত, ২,৭১৩ জন আহত হয় এবং এটি ৪৯ দিন স্থায়ী হয়। ১৯৩৩ সালে একটি দাঙ্গা হয়। সে সম্পর্কে বিশদ তথ্য কিছুই পাওয়া যায় না। আবার ১৯৩৬ সালে, যাতে ৯৪ জন নিহত, ৬৩২ জন আহত হয় এবং এই দাঙ্গা চলে ৬৫ দিন। ১৯৩৭ সালের দাঙ্গায় মারা যায় ১১ জন, আহত হয় ৮৫ জন, দাঙ্গা স্থায়ী হয় ২১ দিন। ১৯৩৮ সালের দাঙ্গা মাত্র আড়াই ঘণ্টা চলেছিল এবং সেই সময়েই ১২ জন নিহত ও ১০০ জনের কিছু বেশি লোক আহত হয়। ১৯২৯ সালের

ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৩৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত এই ৯ বছর ২ মাস হিন্দু ও মুসলমানরা বোম্বাই শহরকে রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্যে রেখেছিল ২১০ দিনের জন্য যখন ৫৫০ জন মারা যায় এবং ৪৫০০ জন আহত হন। এর ফলে আবার দাঙ্গা শুরু হয়। মানুষের সম্পত্তি নষ্ট হবার ব্যাপারে হিসাব এর মধ্যে রাখা হয়নি।

৫

১৯২০ থেকে ১৯৪০ এই হল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্পর্কের খতিয়ান। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য আনতে গান্ধীজির তীব্র প্রচেষ্টাকে এর পাশাপাশি রাখলে খতিয়ানটি হবে আরও বেশি কষ্টদায়ক ও হৃদয়বিদারী। সশস্ত্র শান্তির সংক্ষিপ্ত বিরতিটুকু বাদ দিলে একে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কুড়ি বছরের গৃহযুদ্ধ বললে একটুও অতিরঞ্জন হবে না।

এই গৃহযুদ্ধের প্রধান বলি পুরুষ হলেও মহিলারাও নির্যাতন থেকে রেহাই পান নি। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় কত স্ত্রীলোক নির্যাতিত হয়েছে তার সঠিক ও পর্যাপ্ত বিবরণ সম্ভবত পাওয়া যায় নি। তবে সমগ্র ভারতের তথ্য না পেলেও বাংলার তথ্য কিছু পাওয়া গেছে।

১৯৩২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পুরনো বাংলা বিধান পরিষদে বাংলা প্রদেশে নারী-হরণের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে সরকারি ভাবে জানানো হয় যে ১৯২২ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত অপহৃত নারীর সংখ্যা ছিল ৫৬৮। এদের মধ্যে ১০১ জন অবিবাহিতা এবং ৪৬৭ জন বিবাহিতা। অপহৃতা মহিলারা কোন্ শ্রেণীভূক্ত জানতে চাওয়া হলে বলা হয় যে ১০১ জন অবিবাহিতা মেয়ের মধ্যে ৬৪ জন হিন্দু, ২৯ জন মুসলমান, ৪ জন খ্রিস্টান ও ৪ জন মিশ্র শ্রেণীভূক্ত। ৪৬৭ জন বিবাহিতা নারীর মধ্যে ৩৩১ জন হিন্দু, ১২২ জন মুসলমান, ২ জন খ্রিস্টান এবং ১২ জন মিশ্র অবস্থার শিকার। যে ঘটনাগুলি জানা গেছে কিংবা ঘটনাগুলি শনাক্ত হয় নি তাদের নিয়েই এই সংখ্যা। সাধারণত শতকরা ১০টি ঘটনা জানানো হয়েছে কিংবা ধরা পড়েছে। বাকি শতকরা ৯০ ভাগই ধরা পড়েনি। বাংলার সরকারের প্রকাশিত এই সব তথ্য অবলম্বন করে বলা যায়, প্রায় ৩৫,০০০ নারী ১৯২২-২৭ সালের মধ্যে বাংলায় অপহৃত হন।

নারী-সমাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ নাকি শত্রুসুলভ তা নির্ণয় করে। সেই হিসাবে বাংলার গোবিন্দপুরে ১৯৩৬ সালের ২৭ জুন যে ঘটনা ঘটে গেছে তা যথেষ্ট শিক্ষামূলক। ১৯৩৬ সালের ১০ আগস্ট ৪০ জন মুসলমানের বিচার পর্বের শুরুতে সরকারি পরামর্শ দাতার উদ্বোধনী ভাষণ

থেকে নিচের তথ্য পাওয়া যায়। বিচারের পর্যায় অনুসারে :

'গোবিন্দপুরে রাধাবল্লভ নামে এক হিন্দু বাস করতেন। তাঁর একজন ছেলের নাম হরেন্দ্র। সেখানে একটি মুসলমান মহিলা ছিলেন। যাঁর পেশা ছিল দুধ বিক্রি করা। গ্রামের স্থানীয় মুসলমানরা সন্দেহ করত যে ঐ মুসলমান মহিলার সঙ্গে হরেন্দ্রের অবৈধ সম্পর্ক আছে। একজন মুসলমান মহিলা হিন্দুর কর্তৃত্বাধীনে থাকবে, এটা তাঁরা মেনে নিতে পারল না। তারা তখন রাধাবল্লভের পরিবারের ওপর এর দায়িত্ব চাপাতে চাইল। গোবিন্দপুরে মুসলমানদের এক সভা আহ্বান করে তাতে হরেন্দ্রকেও ডাকা হল। হরেন্দ্র সভাতে যাবার কিছু পরেই তার আর্ত চিৎকার শোনা গেল। দেখা গেল সভাস্থলে হরেন্দ্রের ওপর আক্রমণ হয়েছে, মাঠে হরেন্দ্র জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে। মুসলমানরা তাতেও সন্তুষ্ট হল না। তারা রাধাবল্লভকে জানিয়ে দিল যে, সপরিবারে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলে তার ছেলের অপরাধ তারা ক্ষমা করবে না। রাধাবল্লভ তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলেন। মুসলমানরা এটা জেনে ফেলল। পরের দিন রাধাবল্লভের স্ত্রী কুসুম যখন উঠোনে ঝাঁট দিচ্ছিল, তখন কিছু মুসলমান এসে রাধাবল্লভকে আটকে রেখে কুসুমকে অপহরণ করে। কিছু দূরে নিয়ে গিয়ে লাকের ও মাহাজার নামে দু'জন মুসলমান তাকে ধর্ষণ করে এবং তার অলঙ্কারপত্র খুলে নেয়। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এলে কুসুম ছুটে আসে তার ঘরে। দুষ্কৃতীরা তাকে তখনও আবার আক্রমণের চেষ্টা করে। কুসুম অবশ্য কোনও মতে বাড়িতে পৌঁছে দরজা বন্ধ করে দেয়। মুসলমান দুষ্কৃতীরা দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকে এবং আবার কুসুমকে রাস্তায় টেনে নিয়ে যায়। রাস্তায় তাকে আবার ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু রজনী নামে অন্য এক মহিলার সহায়তায় কুসুম কৌশলে পালিয়ে যায় ও রজনীর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। রজনীর বাড়িতে তার থাকার সময় গোবিন্দপুরের মুসলমানরা তার স্বামী রাধাবল্লভকে চরম অপমান করতে করতে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। পরের দিন মুসলমানরা গোবিন্দপুরের যাওয়া-আসার রাস্তায় তীক্ষ্ণ নজর রাখে যাতে রাধাবল্লভ বা কুসুম পুলিশকে কোনও খবর না পাঠাতে পারে'।

নারী-নির্যাতনের এমন ঘটনা, এমন বেপরোয়া ও নির্লজ্জভাবে ঘটতে পারা এটাই প্রমাণ করে যে, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষভাব কতটা তীব্র ছিল। দু'পক্ষের মনোভাব ছিল যুদ্ধবাজ দু'পক্ষের মত। মুসলমানের উপরে হিন্দুদের এবং হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের অত্যাচার, উৎপীড়নের নানা উদাহরণ দেখা গেছে, তবে হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের অত্যাচারই বেশি হয়েছে। লুণ্ঠনের ঘটনায় মুসলমানরা হিন্দুদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছে, যাতে শিশু-নারী-পুরুষ সমেত সমগ্র হিন্দু পরিবার

জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে। মুসলমান দর্শকরা তৃপ্তি সহকারে দেখেছে সে দৃশ্য। সব চেয়ে বিস্ময়কর হল, এরকম ঠাণ্ডা মাথায় গণহত্যার নিন্দায় কেউ সোচ্চার হয়নি, বরং এ সব রণকৌশলের অংশ বলে মনে করা হয়েছে, যার জন্য কোনও ক্ষমা ভিক্ষারও প্রয়োজন ছিল না। এই নৃশংসতা দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে একটি কংগ্রেসি সংবাদপত্র 'হিন্দুস্থান'-এর সম্পাদক ১৯২৬ সালে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য আনতে গান্ধীজির চূড়ান্ত ব্যর্থতার বেদনাদায়ক সত্যটি ব্যাখ্যা করেছেন। চরম হতাশায় সম্পাদক মন্তব্য করেছেন :

'বর্তমান ভারত এবং জাতি হিসাবে ভারতীয়দের মধ্যে এক বিশাল দূরত্ব আছে। কঠোর বাস্তব যা হত্যা ও লুণ্ঠনের মধ্যে প্রকাশিত এবং আত্মপ্রবঞ্চনাকারী স্বদেশ-প্রেমিকের কল্পনায় ছবির মধ্যে বিশাল দূরত্ব। হাজার মঞ্চ থেকে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা বলা যায় বা তাঁকে শিরোনামে আনা যায়, কিন্তু মোহজানের ধোঁয়াশা ছিন্ন হয়ে যায় পরস্পর সংঘর্ষ ও মন্দির-মসজিদ ভাঙার ঘটনায়। কিছু পবিত্র স্তোত্র উচ্চারণ কিংবা 'আ লা নাইডু' ..... গাইলেই দেশের মঙ্গল হবে না। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য নিয়ে কংগ্রেস সভাপতির মধুর বক্তৃতা হয় তো তাঁর প্রতিভার সাক্ষ্য দেবে, কিন্তু সমস্যা থেকেই যাবে। লক্ষ লক্ষ ভারতীয় শুধু তখন-ই সাড়া দেবে যখন শুধু নেতাদের মুখেই নয়, লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর হৃদয়ে এই ঐক্যগীতি অনুসরণ তুলবে।'

এতক্ষণ যা বলা হল তা থেকে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কোনও আশাই করা যায় না। এতদিন এই ঐক্যকে মরীচিকার মতো হলেও দেখা যেত। আজ এটি যেমন দৃষ্টির বাইরে, তেমনই মনেরও বাইরে। এমনকি গান্ধীজিও এটিকে অসম্ভব কাজ বিবেচনা করে পরিত্যাগ করেছেন।

কেউ কেউ আছেন যাঁরা অবশ্য গত কুড়ি বছরের ইতিহাস সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে এখনও বিশ্বাসী। দুটি যুক্তিতে তাঁদের এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে একটি জাতিতে পরিণত করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় এরা বিশ্বাসী। দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের দাবি দাওয়াগুলি মিটে গেলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য অবশ্যই আসবে।

এটা অবশ্য সত্য, সরকার একটি ঐক্য সৃষ্টির ক্ষমতা সম্পন্ন সংগঠন। একটি মাত্র সরকারের অধীনে থাকার কারণে ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের একটি মাত্র জাতিতে পরিণত হবার ঘটনা অনেক আছে। কিন্তু যে হিন্দুরা ঐক্যের জন্য সরকারের ওপর নির্ভরশীল তারা বোধ হয় ভুলে গেছে যে ঐক্য সৃষ্টি করার ব্যাপারে সরকারের

ক্ষমতারও সীমা আছে। এই সীমা তৈরি হয় মানুষের বিভ্রমের সম্ভাবনার দ্বারা। যে দেশে জাতি, ভাষা বা ধর্ম কোনও বাধার সৃষ্টি করতে পারে না, সেখানে সরকার অবশ্যই একটি ঐক্য সৃষ্টিকারী শক্তি। অন্যদিকে, যেখানে এগুলি বাধা তৈরি করে, সেখানে সরকারের এরকম কোনও শক্তিই থাকে না। এক সরকারের অধীনে থাকার সুবাদে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ইতালি এবং জার্মানি যদি একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করতে পারে তাহলে তার কারণ অবশ্যই এটা যে, সেখানে সরকারের ঐক্যপ্রয়াসে জাতি, ভাষা বা ধর্ম কোনও বাধার সৃষ্টি করে নি। অন্য দিকে, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া বা তুর্কি যদি ঐক্যবদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়, এমনকি একটি মাত্র সরকারের অধীনে থাকা সত্ত্বেও, তবে তার কারণ হল, সেখানে ভাষা, জাতি ও ধর্ম এতটাই শক্তিশালী ছিল যে তারা সরকারের ঐক্য সৃষ্টির ক্ষমতাকে প্রতিহত করে দিয়েছে। একথা কেউ অস্বীকার করবেন না যে ভারতে জাতি, ভাষা ও ধর্মের শক্তি এত বেশি যে এক-ই সরকারের অধীনে একটি একতাবদ্ধ জাতি গঠনের সম্ভাবনা এখানে সুদূর পরাহত। এ কথা বলা নিতান্তই অবাস্তব হবে যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয়দের একটি মাত্র জাতিতে পরিণত করতে পেয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার যা করেছেন তা হল একটি সাধারণ আইন দিয়ে তাদের একটি বন্ধন সূত্রে আবদ্ধ করা, যেমন করে অবাধ্য পশুদের একটি দড়ি দিয়ে বেঁধে একটি মাত্র আস্তাবলে রাখা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার যা করেছে তা হল ভারতীয়দের মধ্যে এক ধরনের শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। তাদের এক জাতিতে পরিণত করা যায়নি তাতে।

এটা কিন্তু বলা যাবে না যে একতা সৃষ্টির কাজে কম সময় পাওয়া গেছে। একটি কেন্দ্রীয় সরকারের একশো পঞ্চাশ বছর যদি যথেষ্ট সময় না হয়, তবে অনন্তকালও যথেষ্ট হবে না। এই ব্যর্থতার জন্য ভারতীয়দের প্রতিভাই দায়ী। ভারতীয়দের মধ্যে একতার জন্য কোনও আগ্রহ নেই, মিলনের জন্য নেই কোনও আকাঙ্ক্ষা। এক রকম পোশাক, এক রকম ভাষার জন্য কোনও ইচ্ছা নেই। সংকীর্ণ সব কিছু ত্যাগ করে যা কিছু সাধারণ ও জাতীয় তাকে গ্রহণ করার কোনও তাগিদ নেই। একজন গুজরাটি গুজরাটি হতে, মহারাষ্ট্রবাসী মহারাষ্ট্রবাসী হতে, পঞ্জাবি পঞ্জাবি হতে, মাদ্রাজি মাদ্রাজি হতে এবং একজন বাঙালি বাঙালি হতেই গর্ব বোধ করে। এই হল হিন্দুদের মানসিকতা, যে-হিন্দুরা মুসলমানদের জাতীয়তাবোধের অভাবের কথা বলে, কারণ মুসলমানরা বলে 'আমি আগে মুসলমান, পরে ভারতীয়'। ভারতের কোথাও এমনকি হিন্দুদের মধ্যেও কি এমন কোনও প্রবৃত্তি বা আবেগ আছে, যাতে নৈতিক ও সামাজিক একতা সম্পর্কে তাদের সামান্যতম সচেতনতা প্রমাণিত হয়? সাধারণ ও ঐক্য সৃষ্টিতে সাহায্যকারী কোনও কিছুর জন্য স্থানীয় ও সংকীর্ণ কিছু

ত্যাগ করার আকাঙ্ক্ষা আছে কি? এমন কোনও সচেতনতা, এমন কোনও আকাঙ্ক্ষা সত্যিই নেই। আর তা না থাকলে ঐক্যস্থাপনে সরকারের ওপর নির্ভরশীল হবার অর্থ আত্ম-প্রবঞ্চনা।

দ্বিতীয়টির ব্যাপারে সাইমন কমিশনের মতটি প্রনিধানযোগ্য :

'ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বেগ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাগুলির কারণ। যতদিন ব্রিটিশের হাতে কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং স্বায়ত্ত শাসনের চিন্তা করা হয়নি, ততদিন হিন্দু-মুসলমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটি সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। এরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে উৎসাহ দেবার নীতি সমদর্শী আমলাতন্ত্র গ্রহণ করে নি বলেই নয়, এর অন্য কারণটি হল এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের আধিপত্য সম্পর্কে খুব বেশি আশঙ্কিত ছিল না। আজ ভারতীয় রাজ্যগুলিতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের তুলনামূলক অভাবের কারণও এক-ই। এক প্রজন্ম আগে যাঁরা ব্রিটিশ ভারতের অবস্থা সম্পর্কে পরিচিত ছিলেন, তাঁরা জানেন যে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সুকুমার বৃত্তিগুলি তখন এত বেশি ছিল যে, নাগরিক শান্তি বিপন্ন করতে পারে এমন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছিল না বললেই চলে। কিন্তু নানা সংস্কার ও তাদের অনুসারী নানা ধারণা হিন্দু-মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নতুন মাত্রা এনে দেয়। এক সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয় অধিকতর শিক্ষা ও সম্পদের যুক্তিতে। অন্য সম্প্রদায় তাদের লোকজনের উপযুক্ত নিরাপত্তার দাবি করে। তারা এটাও ভোলে না যে, দেশের ভূতপূর্ব বিজয়ীদের প্রতিনিধিত্ব করছে তারাই। দেশের সরকারি পদগুলিতে যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব ও পূর্ণ অধিকার দাবি করে তারা'।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে সমস্যার প্রকৃতি নির্ণয় সঠিক হয়েছে, মুসলমানদের দাবিগুলি যুক্তিপূর্ণ এবং হিন্দুরা সেগুলি মঞ্জুর করতে প্রস্তুত— যদিও এই সব সম্ভাবনা নিছকই অনুমানভিত্তিক— তবু প্রশ্ন থেকে যায় মুসলমানদের রাজনৈতিক দাবিগুলি মিটে গেলেও রাজনৈতিক ঐক্যের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত ঐক্য সত্যই আসবে কি? কেউ কেউ মনে করেন যে, হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক ঐক্যই যথেষ্ট। আমার মতে এটি এক বিরাট ভুল। যাঁরা এই ধারণায় বিশ্বাসী তাঁরা সম্ভবত স্বায়ত্ত শাসন অথবা স্বাধীনতা, যার তাৎক্ষণিক আবেদন আছে, তা অর্জনের দাবিতে ব্রিটিশের ওপর চাপ সৃষ্টির কাজে হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের কাজে লাগাতে চান। কম করে বললেও এটিকে একটি অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত বলতে হয়। ব্রিটিশের ওপর হিন্দুদের দাবিতে মুসলমানদের কীভাবে সামিল করা যাবে সেটাও একটি

প্রশ্ন। সংবিধানকে তারা কীভাবে নেবে? তারা এটিকে অবাঞ্ছিত বন্ধন বলে ভাববে, অথবা প্রকৃত আত্মীয়তার সূত্র মনে করবে, এটাই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কারণ প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক ভাবলে শুধু রাজনৈতিক একতাই নয়, মনের ও আত্মার, এক কথায় সামাজিক একতাও দরকার। প্রকৃত ঐক্য না হলে রাজনৈতিক ঐক্যের কোনও অর্থ হয় না। ব্যক্তিগত ঐক্যের মতোই তা নিরাপত্তাহীন, যেমন বন্ধুত্বের পরিবর্তে একে অপরের শুধুই সহযোগী হয় কখনও। এটা যে কতটা নিরাপত্তাহীন, জার্মানি ও রাশিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীই তার প্রমাণ। ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি না যে, শুধুমাত্র পার্থিব স্বার্থ চরিতার্থ করতে একটি স্থায়ী ঐক্য গড়ে তোলা যায়। চুক্তিতে ঐক্য আসতে পারে। কিন্তু এরকম ঐক্য কখনও মিলনে পরিণত হয় না। মিলনের ভিত্তি হিসাবে চুক্তি খুব-ই দুর্বল ব্যবস্থা। স্বভাবতই চুক্তি হল চরিত্রগত ভাবে বিচ্ছেদযোগ্য। একটি চুক্তি কাউকে সাহায্য করতে বা আত্মত্যাগের মনোভাব জাগাতে পারে না। মূল লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে এক বন্ধনে আবদ্ধও করতে পারে না। একের সঙ্গে অপরকে যোগ করার বদলে চুক্তির মাধ্যমে সকলে চায় যতটা সম্ভব বেশি কিছু পেতে। সাধারণ কোনও কারণের জন্য আত্মত্যাগের পরিবর্তে চুক্তির বিভিন্ন পক্ষগুলি দেখে একজনের ত্যাগ অপরের স্বার্থে যেন ব্যবহার না করা হয়। প্রধান লক্ষ্যের জন্য সংগ্রাম না করে চুক্তির পক্ষগুলি দেখে নিজেদের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য যেন নষ্ট না হয়। এ সম্পর্কে রেনান (Renan) সব চেয়ে যথার্থ বলেছেন :

'স্বার্থের বন্ধনই মানুষের সব চেয়ে শক্তিশালী বন্ধন। তবু শুধু স্বার্থ দিয়ে কি জাতি গড়া যায়? আমি তা বিশ্বাস করি না। স্বার্থের বন্ধন বাণিজ্যিক চুক্তি তৈরি করে। জাতীয়তাবাদের একটি আবেগপ্রবণ দিক আছে। এর সঙ্গে দেহ মন যুক্ত। একটি রাষ্ট্র জোট কখনও পিতৃভূমি হতে পারে না'।

ইতিহাসের সুপরিচিত ছাত্র জেমস ব্রাইসের (James Bryce) মতও একইরকম ভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রাইসের মতে:

'একটি প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব শুধু পার্থিব স্বার্থের উপরেই নির্ভর করে না, যাদের জন্য এই প্রতিষ্ঠান সে সব মানুষের সুগভীর আবেগের ওপরেও নির্ভর করে। যখন এটি সেই আবেগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন সেই আবেগ শুধুমাত্র সোচ্চারই হয় না, বেশি শক্তিশালীও হয়, এবং সেই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, পূর্ণ জীবনী শক্তি আরোপ করে'।

বিসমার্কের (Bismark) জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে ব্রাইস এই মন্তব্য

করেছিলেন। ব্রাইসের মতে বিসমার্ক স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছিলেন, কারণ এটি ছিল আবেগ নির্ভর এবং এই আবেগ লালিত হয়েছে যার দ্বারা তা হল :

'...এমন এক বস্তু যাকে বলা যায় জাতীয়তার জন্য প্রবৃত্তি বা আকাঙ্ক্ষা, নৈতিক ও সামাজিক একতার জন্য সচেতন মানুষের আকাঙ্ক্ষা, একটি মাত্র সরকারের অধীনে এই একতাকে প্রকাশিত ও বোধগম্য করা, যে সরকার সভ্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এর জন্য স্থান করে দেবে'।

এই নৈতিক ও সামাজিক একতা তৈরি হয় কীভাবে যা স্থায়িত্ব আনতে পারে? একটি মাত্র সরকারের অধীনে এই একতা কিভাবে প্রকাশিত ও বোধগম্য করা যায়। যে-সরকার সভ্য রাষ্ট্রের মধ্যে এর জন্য স্থান করে দেবে?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে জেমস্ ব্রাইসের মতো আর কেউ যথেষ্ট উপযুক্ত নন। রোম সাম্রাজ্যের তুলনায় পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের উচ্ছলতা আলোচনা করতে তাঁকে যে সব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এগুলি ছিল সেই রকম প্রশ্ন। ভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য আনতে সক্ষম হয়েছে এমন সাম্রাজ্য অবশ্যই রোমান সাম্রাজ্য। ব্রাইসের ভাষাকে সংক্ষিপ্ত করে বলা যায়— প্রথমে ইতালি ও পরে রাজ্যগুলিতে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য রোমের নাগরিকতার ক্রমশ প্রসারণ, সমান ও সমতা সৃষ্টিকারী রোমের আইন, সমস্ত বিষয়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণ, জনসংখ্যার গতিবিধি, ইত্যাদিকে একত্রিত করে একটি জনসমষ্টি তৈরি করা। বিভিন্ন প্রদেশের গ্রাম্যতা বিশিষ্ট সম্রাটরা ইতালির মতো কিংবা অ্যান্টনির সময় রোমের মতো ঐক্য সাধনের স্বপ্ন দেখেন নি। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল যে-কোনও কর্মধারা প্রত্যেক নাগরিকের জন্য খোলা রাখতে হবে, যাতে স্বাধীনভাবে তারা মহান নাগরিকে পরিণত হয়। বাণিজ্য, সাহিত্য ও সব রকমের বিশ্বাসকে সহ্য করার মাধ্যমে রোমের নাগরিকতার ক্রমশ প্রসারণ ঘটল। জাতি-ধর্মের কোনও বিসংবাদ এই শান্তিকে ভঙ্গ করতে পারল না, কারণ সব জাতীয় বৈষম্য সাধারণ সাম্রাজ্যের তত্ত্বের পুষ্টি জোগায়।

রোম সাম্রাজ্যের এই ঐক্য ছিল রাজনৈতিক ঐক্য। এই ঐক্য কত দিন টিকে ছিল? ব্রাইসের কথায় :

'এরকম শ্লথগতির প্রভাব এই একতা আনতে কদাচিৎ কাজ করেছে যখন অন্য সব প্রভাব একে ভয় দেখাতে শুরু করেছে। নতুন শত্রুরা সীমান্তে ভিড় করছে। অথচ অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তাদের ছিল ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন। ভ্যালেরিয়ান-এর পতনের

পর নৈরাজ্যের সময়ে সাম্রাজ্যের সব অংশে সৈন্যবাহিনী তাদের প্রধান সেনাপতিদের তুলে নিত এবং রাজাদের বাদ দিয়েই বড় বড় প্রদেশ শাসন করত রাজধানীর দখলদারদের প্রতি বিন্দুমাত্র আনুগত্য না দেখিয়ে। দু'শো বছর আগেই সাম্রাজ্যের পশ্চিমার্ধ স্বতন্ত্র রাজ্যে টুকরো টুকরো হয়ে যেত যদি না ডায়োকলেটিয়ানে একটি রাজপুত্রের আবির্ভাব ঘটত, যে ছিল কর্মক্ষম ও দক্ষ। সমস্ত সুগন্ধকে স্পষ্ট হবার আগে সংরক্ষণ করা ও নতুন প্রতিবিধানের সাহায্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হাজির হওয়া তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বিভাজন করার নীতি থেকে তাঁর পরিকল্পনা যে কত ব্যাপক ছিল তা বুঝা গেল। আরও বুঝা গেল যে, দুর্বল হৃদয় তার হৃৎস্পন্দন শরীরের প্রত্যন্ত অংশে শোনাতে পারে না। চারটি রাজধানীতে রাজত্ব করা চার রাজার মধ্যে তিনি চূড়ান্ত ক্ষমতা ভাগ করে দিলেন। তারপর তাঁর পূর্বপুরুষের মতো জাঁক-জমক দিয়ে ঘটনাটি মুড়ে রাখতে চাইলেন। ...রোমের বিশেষ সুবিধা বিপদগ্রস্ত হল নিকোমেডিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মিলনের আপেক্ষিক বিরাটত্বর ফলে'।

সুতরাং এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রাজনৈতিক ঐক্য রোমান সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও ঐক্যের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু ঘটনা হল এটাই যে, রোম সাম্রাজ্য কাঁপছিল আর খণ্ডে খণ্ডে ভাঙছিল এবং রাজনৈতিক ঐক্য তার স্থায়িত্ব আনতে পারেনি— এ সব সত্ত্বেও রোম সাম্রাজ্য কয়েক শো বছর স্থায়ী হয়েছিল। পরে তা হল পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য। অধ্যাপক মারভিনের (Prof. Marvin) কথায় :*

'রোমান সাম্রাজ্যের একতা ছিল রাজনৈতিক ও সামরিক। চার থেকে পাঁচশো বছরের মধ্যে ছিল এর স্থায়িত্বকাল। ক্যাথলিক চার্চে যে ঐক্য থাকত, তা ধর্মীয় ও নৈতিক এবং হাজার বছর ধরে তা স্থায়ী হত'।

প্রশ্ন হল, পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের এমন স্থায়িত্ব হল কীভাবে যা রোম সাম্রাজ্যে আশাই করা যায় নি? ব্রাইসের মতে খ্রিস্ট ধর্মের আকারে এটি ছিল সাধারণ এক ধর্ম এবং খ্রিস্টান গির্জার আকারে এক সাধারণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যা পবিত্র রোম সাম্রাজ্যকে দৃঢ় করেছিল, যা রোম সাম্রাজ্যে অনুপস্থিত ছিল। এই হল সেই দৃঢ়তা যা মানুষকে দিয়েছে নৈতিক ও সামরিক ঐক্য এবং এই ঐক্য প্রকাশিত ও অনুভূত হয়েছে একটি সরকারের আড়ালে।

একটি সাধারণ ধর্ম হিসাবে খ্রিস্টধর্মের ঐক্য সৃষ্টিকারী প্রভাব সম্পর্কে ব্রাইস বলেছেন :

* 'দি ইউনিটি অব্ ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেসন', (চতুর্থ সংস্করণ), পৃ : ২৭

'ধর্মের অন্তরতম ও গভীরতম ক্ষেত্রেই একটি জাতির বসতি। যেহেতু স্বর্গীয়তাকে ভাগ করা হয়েছে, সেইমতো মানবিকতাকে ভাগ করা হয়েছে। ঈশ্বরের একত্বের নীতি এখন মানুষের ঐক্যনীতিতে আরোপিত হওয়া উচিত। ঈশ্বর তাঁর প্রতিকৃতিতেই সৃষ্ট হয়েছেন। খ্রিস্টধর্মের প্রথম শিক্ষাই হল ভালবাসা, যা একজনের সঙ্গে অন্য জনকে এক সূত্রে গ্রথিত করে। যাকে সন্দেহ, কুসংস্কার এবং জাত্যভিমান এতদিন দূরে রেখেছিল। এইভাবে জন্ম নেয় এক নতুন ধর্ম— বিশ্বাসী পবিত্র সাম্রাজ্যের ধর্ম, যেখানে সব মানুষকে বুকে টেনে নেওয়া হয় পুরনো পৃথিবীর বহু ঈশ্বরবাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, যেন একদিকে সিজার, অন্যদিকে অসংখ্য রাজ্য ও প্রজাতন্ত্রের লুপ্ত ধারণা'।*

যদি ব্রাইস রোম সাম্রাজ্যের অস্থায়িত্ব ও তার পরবর্তীকালের তুলনামূলক স্থায়িত্বের কথা বলে থাকেন, তাহলে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ভারতকে কিছু শিক্ষা দিতে পারে। যদি ব্রাইসের যুক্তি এই হয় যে, নির্ভর করার মতো কোনও রাজনৈতিক ঐক্য না থাকার জন্যই রোমান সাম্রাজ্য অস্থায়ী ছিল এবং সাধারণ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তৈরি নৈতিক ও সামাজিক ঐক্যের অনুসারী পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ছিল আরও বেশি স্থায়ী, তাহলে এটাই প্রতীয়মান হবে যে, হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের কোনও সম্ভাবনাই নেই। দুই ধর্মের মিলনে সাহায্যকারী একটি শক্তির একান্ত অভাব আছে। প্রটেস্টান্ট ও ক্যাথলিক কিংবা শৈব ও বৈষ্ণবদের মতো আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হিন্দু-মুসলমান শুধু দুটি শ্রেণী বা সম্প্রদায় নয়। তারা পরিষ্কার দুটি প্রজাতি। মানবিকতা যে উভয়ের মধ্যেই একটি বর্তমান প্রয়োজনীয় গুণ, একথা হিন্দু বা মুসলমান কেউ-ই স্বীকার করে না। তারা যে বহু নয় এক, তাদের মধ্যে পার্থক্যটা শুধুই যে একটা আকস্মিক ঘটনা— এটাও তারা স্বীকার করে না। তাদের কাছে স্বর্গীয়তা বিভক্ত, তাই মনুষ্যত্বও বিভক্ত, সুতরাং তারাও অবশ্যই বিভক্ত থাকবে। এক আত্মায় তাদের মিলিত করার কোনও শক্তিই নেই।

সামাজিক মিলন ছাড়া রাজনৈতিক ঐক্য অর্জন করা সম্ভব নয়। যদিও সম্ভব

---

* খ্রিস্টান চার্চ পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের একীকরণ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে নি। খুব-ই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। একটার পর একটা প্রতিষ্ঠান তার চারদিকে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, কিভাবে রাজ্য ও শহরসমূহ পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে আশ্চর্য গোষ্ঠীগত অভ্যুত্থানে এবং খ্রিস্টান চার্চের সংযোগ ক্ষেত্রে ক্রমাগত অসুবিধা সৃষ্টিতে, তা দেখে, ব্রাইস বলেন, 'ধর্মীয় ঐক্য রক্ষার জন্য প্রচার-সংগঠনকে শক্তিশালী করা বইয়ের সংঘসমূহকে নিকটবর্তী করে। বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা তবু অনেক বেশি শক্তিশালী। সত্য বলা হয়, অভিন্ন এবং বিশ্বাসী সকলকে এক-ই সঙ্গে আনে এবং রক্ষা করে। একটি মেষপাল ও একজন মেষপালকই থাকে।

হয় তবে গ্রীষ্মকালের চারা গাছের মতো তা অনিশ্চিত— যে কোনও কালবৈশাখীতেই উপড়ে যেতে পারে। শুধু রাজনৈতিক ঐক্য থাকলেও ভারত অবশ্যই একটি রাষ্ট্র হতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র হওয়া মানেই একটি জাতি গঠন নয়। জাতি গঠিত না হলে অস্তিত্বের সংগ্রামে রাষ্ট্রের টিকে থাকা খুব-ই কঠিন। সমস্ত মিশ্র রাষ্ট্রের ধ্বংস ও উচ্ছেদের মাধ্যমে একটি মাত্র জাতীয়তাবাদ-ই এখন সময়ের সচল গতিশক্তি। মিশ্র রাষ্ট্রের বিপদ সুতরাং কোনও বহিরাক্রমণ নয়, বরং বলা যায় অভ্যন্তরের খণ্ডিত, অবদমিত ছোট ছোট জাতীয়তাবোধ-ই হল এই বিপদের কারণ। যাঁরা পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করেন, তাঁদের এই বিপদের দিকটি মনে রাখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এটিও বুঝতে হবে যে, একটি মিশ্র রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করে নিজেদের জন্য একটি পৃথক বাসস্থান নির্মাণের কোনও চেষ্টা যদি অবদমিত কোনও জাতি করে থাকে, তবে তা নিন্দিত না হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিরও নৈতিক সমর্থন পেয়ে যায়।

□ □ □

অধ্যায় ৮

পাকিস্তানের বিকল্প বিষয়ে মুসলমানদের মত

১

হিন্দুরা বলছে যে তাদের কাছে পাকিস্তানের একটি বিকল্প আছে। পাকিস্তানের কোনও বিকল্পের কথা মুসলমানরা কি ভেবেছে? হিন্দুরা বলছে হ্যাঁ, মুসলমানরা বলছে না। হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে মুসলমানদের পাকিস্তান প্রস্তাব হল দরকষাকষির নিমিত্ত মাত্র— সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার মাধ্যমে তারা ইতিমধ্যে যা কিছু লাভ করেছে সাম্প্রদায়িক ভাবে, তাতে আরও কিছু সাফল্য যোগ করার উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তাব রাখা হয়েছে। মুসলমানরা এই ইঙ্গিতকে অস্বীকার করছে। তারা বলছে যে, পাকিস্তানের সমান বলে কোনও কিছু নেই। তাই তাদের পাকিস্তান চাই, এবং পাকিস্তান ছাড়া অন্য কিছু নয়। সুতরাং এইসব দেখে মনে হচ্ছে যে মুসলমানরা পাকিস্তানের উদ্দেশে নিজেদের সমর্পিত করেছে এবং অন্য কিছু গ্রহণ না করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়েছে। আর হিন্দুরা বিকল্পের আশা করে অনর্থক চিন্তা করছে। যদি ধরে নিই যে, হিন্দুরা খুব-ই চালাক এবং মুসলমানদের চালটি ধরে ফেলতে সমর্থ হয়েছে, তাহলে হিন্দুরা কি পাকিস্তানের মুসলমান বিকল্প মেনে নিতে প্রস্তুত থাকবে? প্রশ্নের উত্তরটি অবশ্য নির্ভর করছে পাকিস্তানের বিকল্প হিসাবে মুসলমানরা কী চায় তার ওপর।

মুসলমানদের মতে পাকিস্তানের বিকল্প কী? কেউ জানে না। মুসলমানরাও কেউ তা বলেনি এবং হয়ত বলবেও না যতদিন না বিরোধী দলগুলি একত্র হয়ে হিন্দু ও মুসলমানের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নিয়ে বুঝাপড়ায় বসছে। আগে থেকে কিছু জানার অর্থ হল আগাম প্রস্তুতির সুযোগ। সুতরাং হিন্দুদের কাছে এটা প্রয়োজন যে তারা সম্ভাব্য বিকল্প সম্পর্কে ধারণা করে, কেননা কোনও বিকল্পই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার চেয়ে ভালো হতে পারে না এবং নিশ্চিত কিয়ৎ পরিমাণে খারাপ-ই হবে।

কোনও নির্দিষ্ট বিকল্প প্রস্তাবের অভাবে এ সম্পর্কে শুধু অনুমান করা যেতে পারে মাত্র। কোনও একজনের অনুমানের সঙ্গে অন্যের অনুমানের তফাত থাকে, ফলে সংশ্লিষ্ট দলকে স্থির করতে হবে কোন্ অনুমানের ওপর সে নির্ভর করবে। সম্ভাব্য অনুমানের মধ্যে, আমার অনুমান হল এই যে, মুসলমানরা তাদের বিকল্প প্রস্তাব হিসাবে এইগুলি পেশ করতে পারে :

ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানে থাকবে—

(১) কেন্দ্র এবং প্রদেশের বিধানসভায় মুসলমানদের ৫০ শতাংশ প্রতিনিধি হতে হবে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে,

(২) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নির্বাহিদের (Executive) ৫০ শতাংশ মুসলমানদের জন্য রাখতে হবে,

(৩) জন-কৃত্যকে (Civil Service) ৫০ শতাংশ পদ মুসলমানদের জন্যে নির্ধারিত করতে হবে,

(৪) সৈন্যবাহিনীতে সংখ্যা অর্ধেক হবে উচ্চ ও নিম্ন পদগুলিতে,

(৫) জনগণের কাজের উদ্দেশে গঠিত সংগঠনে, যেমন পরিষদ ও আয়োগে মুসলমানদের ৫০ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব থাকবে,

(৬) ভারত অংশগ্রহণ করবে এমন সমস্ত আন্তর্জাতিক সংগঠনে মুসলমানদের ৫০ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব থাকবে,

(৭) প্রধানমন্ত্রী যদি হিন্দু হন, তাহলে উপ-প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন মুসলমান,

(৮) প্রধান সেনাপতি যদি হিন্দু হন, তবে উপ-সেনাপ্রধান হবেন মুসলমান,

(৯) আইনসভার শতকরা ৬৬ শতাংশ মুসলমান সদস্যের মত ছাড়া প্রাদেশিক সীমারেখার কোনও পরিবর্তন করা যাবে না,

(১০) আইনসভার ৬৬ শতাংশ মুসলমান সদস্যের মত ছাড়া কোনও মুসলমান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ বা চুক্তি গ্রহণ করা যাবে না,

(১১) আইনসভার ৬৬ শতংাশ মুসলমান সদস্যের মত ছাড়া মুসলমানদের সংস্কৃতি ধর্ম বা ধর্মীয় আচরণে প্রভাব পড়তে পারে এমন কোনও আইন প্রণয়ন করা যাবে না,

(১২) ভারতের জাতীয় ভাষা (National Language) হবে উর্দু,

(১৩) আইনসভার ৬৬ শতাংশ মুসলমান সদস্যের মত ছাড়া গো-হত্যা বা ইসলাম ধর্মের প্রচার ও ধর্মান্তরিতকরণ নিষিদ্ধ করে বা নিয়ন্ত্রণ করে কোনও আইন বৈধ হবে না,

(১৪) আইনসভার প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ৬৬ শতাংশ মুসলমান সদস্য অন্তর্ভুক্ত না করে সংবিধানের কোনও পরিবর্তন করা যাবে না'।

আমার এই অনুমান শুধু কল্পনা নির্ভর নয়। এমন ইচ্ছেও নয় যে, হিন্দুদের ভয় দেখাই, যাতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা পাকিস্তান মেনে নেয়। বলা দরকার, আমার এই অনুমান, মুসলমানদের বিভিন্ন অংশের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যসূত্রের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি।

মহামান্য হায়দ্রাবাদের নিজামের অধিরাজ্যের (Dominion) জন্য প্রস্তাবিত 'সংবিধান

সংশোধন'-এর প্রকৃতি লক্ষ্য করলেই পাকিস্তানের মুসলমান বিকল্প কী হতে পারে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

'সংস্কারের হায়দ্রাবাদ প্রকল্প' হল একটি নতুন ধরনের প্রকল্প। ব্রিটিশ ভারতের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রকল্প এখানে বাতিল করা হয়েছে। তার বদলে বলা হয়েছে 'ক্রিয়ামূলক প্রতিনিধিত্ব' (Functional Representation)-এর কথা— শ্রেণী ও বৃত্তির প্রতিনিধিত্ব। ৭০ জন সদস্য যুক্ত আইন সভার গঠন হবে এইরকম :

নির্বাচিত			মনোনীত		
কৃষি	...	১২	এলাকা	...	৮
পতিদার	৮]		সর্ফ-ই খাস	২]	
ভাড়াটে	৪]		পইগাহ্	৩]	
মহিলা	...	১	পেশকারি	১]	
স্নাতক	...	১	সালার জং	১]	
বিশ্ববিদ্যালয়	...	১	সমস্থান	১]	
জায়গিরদার	...	২	আধিকারিক	...	১৮
মাসদার	...	১	গ্রামীণ শিল্পকলা	...	১
আইনি	...	২	অনুন্নত শ্রেণী	...	১
চিকিৎসা	...	২	অপ্রধান		
প্রতীচ্য	১]		প্রতিনিধিত্বহীন শ্রেণী	...	৩
প্রাচ্য	১]		অন্যান্য	...	৬
শিক্ষক	...	১			
বাণিজ্য	...	১			
শিল্প	...	২			
ব্যাঙ্কিং	...	২			
দেশীয়	১]				
সমবায় ও যৌথ	১]				
সংগঠিত শ্রমিক	...	১			
হরিজন	...	১			
জেলা মিউনিসিপ্যালিটি	...	১			
শহর মিউনিসিপ্যালিটি	...	১			
গ্রামীণ বোর্ড	...	১			
	মোট	৩৩		মোট	৩৭

সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের চেয়ে 'ক্রিয়ামূলক' প্রতিনিধিত্ব বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বেশি মৈত্রী তৈরি করবে কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তখনকার সামাজিক ও ধর্মীয় বিভেদগুলি জিইয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকল্প শ্রেণীচেতনা বাড়িয়ে শ্রেণী দ্বন্দ্বকে খুব সহজেই তীব্র করে তুলবে। আপাতভাবে এটিকে খুব নিরীহ মনে হলেও খুব শীঘ্রই এর আসল চরিত্র দেখা দেবে যখন প্রতিটি শ্রেণীই তাদের জনসংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব দাবি করবে। কিন্তু কর্মানুযায়ী প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি 'সংস্কারের হায়দ্রাবাদ প্রকল্প'-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। এর আসল বৈশিষ্ট্য হল নতুন হায়দ্রাবাদ আইনসভায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রস্তাবিত পদ বিভাগ। মহামান্য নিজামের অনুমোদিত এই প্রকল্প অনুযায়ী, সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব একেবারে বাতিল হয়নি। কর্মনুযায়ী প্রতিনিধিত্বের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বও রেখে দেওয়া হয়েছে। এটি কাজ করবে যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে। কিন্তু আইনসভা সহ প্রতিটি নির্বাচিত বডিতে[১] 'দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের' জন্য সমান প্রতিনিধিত্ব রাখতে হবে এবং কোনও প্রার্থী জয় লাভ করতে পারবে না যদি সে তার সম্প্রদায়ের সদস্যদের দেওয়া ভোটের শতকরা ৪০ ভাগ না পায়। সংখ্যার বিষয়টি গণ্য না করেই[২] হিন্দু ও মুসলমানের সমান প্রতিনিধিত্ব শুধু নির্বাচিত বডিতে কায়েম হবে না, নির্বাচিত সদস্যদের পাশাপাশি মনোনীত সদস্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

সম প্রতিনিধিত্বের তত্ত্বটির যৌক্তিকতা দেখাতে বলা হয়েছে যে—

'তাদের ঐতিহাসিক অবস্থান ও রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোয় স্থান বিবেচনায় রাজ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের গুরুত্ব এত স্পষ্ট যে, আইনসভায় তাদের স্থানকে সংখ্যালঘুর পর্যায়ে নামানো যায় না'।

সম্প্রতি সংবাদপত্রে[৩] জনৈক মি. মীর আমির আলি খাঁ, যিনি নিজেকে জাতীয়তাবাদী দলের নেতা বলে দাবি করেছেন, ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার

---

১. কেন্দ্রীয় আইনসভা বাদে প্রকল্প অনুযায়ী এগুলি হল পঞ্চায়েত, গ্রামীণ বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটিজ, শহর কমিটি।

২. ১৯৩১ সালের জনগণনা অনুসারে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের জনসংখ্যার ভাগ এই রকম ছিল :

হিন্দু	অস্পৃশ্য জাতি	মুসলমান	অন্যান্য	মোট
৯৬,৯৯,৬১৫	২৪,৭৩,২৩০	১৫,৩৪,৬৬৬	৫,৭৭,২৫৫	১,৪৪,৩৬,১৪৮

৩. বোম্বে সেন্টিনাল, ২২ জুন, ১৯৪০। মি. আকবর আলি খাঁ বলেছেন যে তিনি কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি মি: শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের সঙ্গে প্রস্তাবগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তিনি যে প্রস্তাবগুলি প্রকাশ করেছেন সেগুলি মি. আয়েঙ্গার অনুমোদিত প্রস্তাব।

সমাধান কল্পে স্ব-প্রণীত কিছু প্রস্তাব প্রকাশ করেছেন। এই প্রস্তাবগুলি হল—

(১) ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান, দেশের যথোচিত মিলিটারি প্রতিরক্ষার এবং দেশের লোককে যথেষ্ট মিলিটারিমনস্ক করে তোলার ওপর নির্ভর করবে। হিন্দুদেরও মুসলমানদের মত একই রকম মিলিটারিমনস্ক করে তুলতে হবে।

(২) ভারতের প্রতিরক্ষা নিজেদের ওপর তুলে নেওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ দুই সম্প্রদায়ের সামনে এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা সমান রাখতে হবে এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে, যা আঞ্চলিক ভিত্তি থেকে স্বতন্ত্র, কোনও রেজিমেন্ট তৈরি হবে না।

(৩) যুক্তি সঙ্গত ভাবে সামরিকমনস্ক এমন লোকেদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে জাতীয় সরকার তৈরি করা উচিত প্রদেশে ও কেন্দ্রে। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় হিন্দু ও মুসলমান মন্ত্রীর সংখ্যা সমান হবে। আর যখন প্রয়োজন, অন্যান্য সংখ্যালঘুদের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে। যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমেই এই প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হবে, কিন্তু দেশের বর্তমান মানসিকতায় পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী প্রথা চলাই উচিত। হিন্দু মন্ত্রীরা আইনসভার হিন্দু সদস্যদের দ্বারাই নির্বাচিত হবে, এবং মুসলমান মন্ত্রীরা নির্বাচিত হবে মুসলমান সদস্যদের দ্বারা।

(৪) মন্ত্রিসভার পতন ঘটবে স্পষ্ট অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে, যখন হাউসের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তা পাস হবে এবং এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হিন্দু ও মুসলমানের আলাদা ভাবে পরীক্ষা করা হবে।

(৫) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্ম, ভাষা, লিপি ও ব্যক্তিগত আইন সাংবিধানিক রক্ষাকবচের মাধ্যমে রক্ষা করতে হবে যাতে আইনসভায় কোনও সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধি সদস্যরা এই রক্ষাকবচের বিরুদ্ধাচারী কোনও আইন বা ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর ভেটো প্রয়োগ করতে পারে। একই ধরনের ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা রাখতে হবে যাতে সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থার পরিপন্থী কোনও সিদ্ধান্ত না নিতে পারা যায়।

(৬) শাসন ব্যবস্থায় ন্যায় বিচারের বাস্তব ব্যবস্থা হিসাবে চাকুরি ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভাবে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থায় সমমত থাকা চাই।

হায়দ্রাবাদে জাতীয়তাবাদী দলের একজন মুসলমান নেতার পেশ করা এই প্রস্তাবগুলি যদি কোনও ইঙ্গিত বহন করে তবে বোঝা যায় ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের চিন্তা কোন্ দিকে এগোচ্ছে এবং পাকিস্তানের মুসলমান বিকল্প বিষয়ে আমি যে ধারণা করেছি, তা এ থেকেই শক্তিলাভ করছে।

২

এটি সত্য যে, ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে 'আজাদ মুসলমান কনফারেন্স' এই গালভরা নাম দিয়ে দিল্লিতে এক সভা হয়। আজাদ কনফারেন্সে যেসব মুসলমানরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা এক সঙ্গে মুসলমান লীগ ও 'ন্যাশানালিস্ট মুসলমানস' এর বিরোধী ছিলেন। তারা মুসলমান লীগের বিরুদ্ধে ছিলেন এই কারণে যে— প্রথমত, পাকিস্তানের প্রতি তাঁরা সদয় ছিলেন না এবং দ্বিতীয়ত, নিজেদের অধিকার রক্ষায় ইংরাজদের ওপর তারা নির্ভরশীল হতে চাননি[১]। তারা জাতীয়তাবাদী মুসলমানদেরও (কংগ্রেসিই বলা যায়) বিপক্ষে, কেন না এরা মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলির প্রতি উদাসীন হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত[২]।

এসব সত্ত্বেও আজাদ মুসলিম কনফারেন্সকে বন্ধুদের সভা বলে হিন্দু স্বাগত জানিয়েছে। কিন্তু কনফারেন্স যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তাতে লীগ ও এর মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। আজাদ মুসলমান কনফারেন্সের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমটি হল এই রকম :

'ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমানার সমগ্রতা ভারতের থাকবে এবং সেই কারণে এই দেশের সম্পদের মালিকানা আছে এমন জাতি-ধর্ম-নির্বিবেশে সব নাগরিকের সবার বাসভূমি হবে এই দেশ। এই দেশের প্রতিটি জায়গায় বাস হবে মুসলমানদের, যারা তাদের জীবনের চেয়ে প্রিয় তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিক গৌরবকে মনে রাখবে। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিতে, প্রতিটি মুসলমান একজন ভারতীয়। এই দেশের বসবাসকারী সব নাগরিকের সাধারণ অধিকার এবং দায়িত্ব ও জীবনের প্রতিটি

---

১. সভায় একজন মুখ্য বক্তা, মুফতি কিফায়াত উল্লাহ্, বক্তৃতা কালে বলেন যে 'তাদের ঘোষণা দরকার যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে তারা অন্য কোনও সম্প্রদায়ের পেছনে দাঁড়াবেন না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান যে তাদের অধিকার রক্ষার জন্য তাঁরা ব্রিটিশদের দ্বারস্থ হবেন না। নিজেদের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করতে তারা নিজেরাই রক্ষাকবচগুলি নির্ধারণ করবেন এবং এই রক্ষাকবচগুলিকে মেনে নিতে অসম্মত হবে যে দল, তা সে যত শক্তিশালীই হোক, তার বিরুদ্ধে তারা লড়াই চালাবে, যেভাবে স্বাধীনতার জন্য তারা লড়ছে সরকারের বিরুদ্ধে'। 'হিন্দুস্তান টাইম্‌স' এপ্রিল ৩০, ১৯৪০।

২. হিন্দুস্তান টাইম্‌স-এর একই দিনে খবরে মৌলানা হাফিজুল রহমান ও ডঃ কে. এম. আশরাফের ভাষণ দ্রষ্টব্য।

ক্ষেত্রে এবং মানবিক কর্মকাণ্ডের প্রতিটি স্তরে এক। এই অধিকার ও দায়িত্বের নিরিখে ভারতীয় মুসলমান প্রশ্নাতীত ভাবে ভারতীয় এবং ভারতের প্রতিটি জায়গায় প্রশাসনিক, আর্থিক ও জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যান্য ভারতীয়ের মত সমান সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। এইসব কারণের জন্য অন্যান্য ভারতীয়ের সঙ্গে মুসলমানদেরও সমান দায়িত্ব আছে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য চেষ্টা করার ও আত্মত্যাগ করার। এটি স্ব-প্রণোদিত ঘোষণা এবং এর সত্যতায় কোনও সৎচিন্তার মুসলমানের সন্দেহ থাকা উচিত নয়। এই কনফারেন্স দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এবং জোরের সঙ্গেই ঘোষণা করছে যে, মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হল ভারতীয় মুসলমানের লক্ষ্য, এবং আরও ঘোষণা করছে যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা উদ্বিগ্ন। এই লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অতীতকালে তারা অনেক মহান আত্মত্যাগ করেছে এবং আরো আত্মত্যাগের জন্য এখনও প্রস্তুত'।

'ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল এবং ভারতের স্বাধীনতার পথে তারা অন্তরায় এমন সমস্ত ভিত্তিহীন অভিযোগের তীব্র নিন্দা করছে এই কনফারেন্স এবং স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করছে যে মুসলমানরা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে খুবই সচেতন এবং স্বাধীনতার যুদ্ধে অন্যদের থেকে পিছনে থাকাকে তারা তাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে বিসদৃশ এবং সম্মানের পক্ষে ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করে'।

এই সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে তারা পাকিস্তান পরিকল্পনার নিন্দা করেছে। তাদের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি এই রকমের :

'কনফারেন্সের বহুবিবেচিত ধারণা হল, ভারতের জনগণের কাছে ভবিষ্যৎ ভারত সরকারের সেই সংবিধানই গৃহীত হবে যা প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটের মাধ্যমে ভারতীয়দের দ্বারাই তৈরি হবে। কন্সটিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বির মুসলমান সদস্যদের সুপারিশ অনুযায়ী মুসলমানদের বৈধ স্বার্থসমূহ সুরক্ষা করবে সংবিধান। অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি বা কোনও বহিঃশক্তির প্রতিনিধিদের কোনও অধিকার থাকবে না এইসব রক্ষাকবচ বিষয়ে কথা বলার'।

এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কনফারেন্স ঘোষণা করছে যে মুসলমানদের জন্য রক্ষাকবচগুলি মুসলমানরাই শুধু নির্ধারণ করবে।

তাদের তৃতীয় সিদ্ধান্তটি হল এই :

'যেহেতু ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানে সরকারের স্থায়িত্ব ও দেশের নিরাপত্তার

জন্য প্রয়োজন হল প্রতিটি নাগরিকের সন্তুষ্টি, সেই হেতু এই কনফারেন্স প্রয়োজন মনে করছে যে নিম্নলিখিত জরুরি বিষয়ে মুসলমানদের সন্তুষ্টির জন্য একটি রক্ষাকবচ প্রকল্প তৈরি করা উচিত'।

'কনফারেন্স ২৭ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড গঠন করছে। সমস্ত দিক পরীক্ষা করে বিবেচনা ও পরামর্শ করে এই বোর্ড তাদের সুপারিশ কনফারেন্সের পরবর্তী অধিবেশনে পেশ করবে, যাতে কনফারেন্স এই সুপারিশগুলিকে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের স্থায়ী জাতীয় সমাধান অর্জনের উপায় হিসাবে কাজে লাগাতে পারে। দু' মাসের মধ্যে এই সুপারিশগুলি পেশ করা হবে। বোর্ডের বিবেচনার বিষয়গুলি হল—

'(১) মুসলমান সংস্কৃতি, ব্যক্তিগত আইন ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষা।

(২) মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার এবং সেগুলির রক্ষা।

(৩) ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচে রচনা—যেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য ক্ষমতা প্রদান'।

'জন কাজে অংশ গ্রহণের জন্য মুসলমানদের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সুরক্ষার ব্যবস্থা'।

'কোনও শূন্য পদ পূর্ণ করার ক্ষমতা বোর্ডের হাতে থাকবে। প্রয়োজনে অন্য সদস্য কো-অপ্ট করার ক্ষমতাও বোর্ডের থাকবে। প্রয়োজনে বোর্ড দেশের অন্য কোনও মুসলমান বডির সঙ্গে পরামর্শ করতে পারবে। বোর্ডের ২৭ জন সদস্যকে মনোনীত করবেন সভাপতি'।

'বোর্ডের সভায় কোরামের সংখ্যা হবে নয়'।

'যেহেতু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার বিষয়টি কন্সটিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বির দ্বারা নির্ধারিত হবে, এই কনফারেন্স প্রয়োজন মনে করছে যে এর মুসলমান সদস্যদের নির্বাচন মুসলমানদের হাতেই থাকবে'।

এই বোর্ডের প্রতিবেদনের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি, তাহলে জানতে পারব মুসলমানদের রক্ষাকল্পে আজাদ মুসলমান কনফারেন্স কী পদ্ধতি গ্রহণ করছে। তবে আশা করার মত এমন কোনও কারণ দেখা যাচ্ছে না যে, তা পাকিস্তানের মুসলমান বিকল্প হিসাবে আমার যে ভাবনা তার বিরুদ্ধে যাবে। লক্ষ্য না করে উপায় নেই যে, আজাদ মুসলমান কনফারেন্স মুসলমানদের একটি বডি, যারা মুসলমান লীগের

বিরুদ্ধে শুধু নয়, জাতীয়তাবাদী মুসলমানদেরও বিরুদ্ধে। সুতরাং এমন বিশ্বাস করার কারণ নেই যে হিন্দুদের প্রতি তারা লীগের চেয়ে বেশি সদয় হবে। ধরে নেওয়া যাক যে, আমার ধারণা ঠিক হল, তাহলে জানতে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক যে হিন্দুরা কী বলবে। তারা কি পাকিস্তানের এই বিকল্প মেনে নেবে? নাকি এর বদলে পাকিস্তান হওয়াই সমীচীন মনে করবে? এসব প্রশ্নের উত্তরের জন্য হিন্দুদের ওপর ও তাদের নেতৃবৃন্দের ওপর নির্ভর করতে হবে। এ প্রসঙ্গে শুধু এটুকু বলা দরকার যে, এই প্রশ্নে মতামত নির্ধারণের জন্য তাদের কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে। বিশেষ করে, তাদের মনে রাখা দরকার Macht Politic ও Gravamin Politic-এর পার্থক্য (ক্ষমতার রাজনীতির সঙ্গে দাবি তৈরি করে ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনার পার্থক্য), মনে রাখতে হবে Communitas Communitatum ও Nation of Nations-এর বিভেদ। জানা দরকার যে দুর্বলের ভীতি প্রশমনে রক্ষাকবচগুলির সঙ্গে সবলের ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে পরিকল্পনার ফারাক আছে। ফারাক আছে রক্ষাকবচ প্রদানের সঙ্গে দেশকে হাতে তুলে দেওয়ার মধ্যে। তা ছাড়া, তাদের এও মনে রাখতে হবে যে Gravamin Politic-কে নিশ্চিন্তে মেনে নেওয়ার অর্থ Macht Politic মেনে নেওয়া নয়। নিরাপদে একটি সম্প্রদায়ের জন্য যা মেনে নেওয়া যায়, একটি রাষ্ট্রের জন্য তা নিরাপদে মেনে নেওয়া যায় না, আর দুর্বলের আত্মরক্ষার ব্যবহারের জন্য যা মেনে নেওয়া যায়, তা সবলের জন্য মেনে নেওয়া যায় না, কেননা তা আক্রমণের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

এইগুলিই হল জরুরি বিষয়। এখন হিন্দুরা যদি বিষয়গুলিকে গ্রাহ্য না করে, তবে নিজেদের ক্ষতি মেনে নিয়েই তারা তা করবে। কেননা পাকিস্তানের মুসলমান বিকল্প আসলে হল একটি ভয়ঙ্কর ও সাংঘাতিক বিকল্প।

□ □ □

অধ্যায় ৯

বিদেশ থেকে শিক্ষা

ভারতকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে ভাগ করার জন্য মুসলমানদের দাবির কাছে হিন্দুরা নতি স্বীকার করবে না এবং যে কোনও মূল্যে ভারতের ভৌগোলিক ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করবে; তারা দেখবে ভারতের মতো যেসব দেশে অনেক জাতির বাস, যেখানে কীভাবে ঐক্যের চেষ্টা হয়েছে এবং তার ফল কী হয়েছে।

এই ধরনের সমস্ত দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করার প্রয়োজন নেই। দু'টি দেশের কথা আলোচনা করাই এখানে যথেষ্ট হবে— তুরস্ক ও চেকোশ্লোভাকিয়া।

১

তুরস্কের কথা দিয়েই শুরু করা যাক। ইতিহাসে তুর্কিদের আবির্ভাব ঘটেছিল এই কারণে যে, ১২৩০ থেকে ১২৪০ খ্রিস্টাব্দের কোনও এক সময় তারা তাদের বাসস্থান সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে মোঙ্গলদের দ্বারা উৎখাত হয়েছিল এবং উত্তর-পশ্চিম অ্যানাটোলিয়াতে বসবাস শুরু করতে বাধ্য হয়েছিল। ১৩২৬ সালে ব্রুসা দখলের সঙ্গে তুরস্ক সাম্রাজ্যের নির্মাতা হিসাবে জীবন শুরু হয়। ১৩৬০-৬১ সালে তারা এজিয়ান থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত থ্রেস দখল করে; ১৩৬১-৬২-তে কন্‌স্টান্টিনোপলের বাইজান্টাইন সরকার তাদের অধীনতা স্বীকার করে। ১৩৬৯-তে বুলগেরিয়াও তাকে অনুসরণ করে। ১৩৭১-৭২-তে ম্যাসিডোনিয়া অধীকৃত হয়। ১৩৭৩ তে কনস্টান্টিনোপল নিশ্চিত ভাবে আটোমন সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়। ১৩৮৯-তে সার্বিয়া, ১৪৩০-এ সালোনিকা, ১৪৫৩-তে কনস্টান্টিনোপল, ১৪৬১-তে ট্রেবিজোন্দ, ১৪৬৫-তে কুরামন এবং ১৪৭৫-তে কাফা ও তানা দখল করা হয়। কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর তারা ১৫১৪-তে দখল করে মোসাল, ১৫১৬-১৭-তে সিরিয়া, মিশর, হিয়াজ ও ইয়েমেন এবং ১৫২১-এ বেলগ্রেড। এরপর ১৫২৬-এ মোহাজে হাঙ্গারিয়ানদের পরাজিত করা হয়। ১৫৫৪ সালে ঘটে প্রথম বাগদাদ জয় এবং ১৬৩৯-তে দ্বিতীয়বার বাগদাদ জয়। দুবার তারা ভিয়েনা অবরুদ্ধ করে রেখেছে— প্রথমবার ১৫২৯ সালে এবং পুনরায় ১৬৮৩-তে, যাতে ভিয়েনা ছাড়িয়ে বিজয় অব্যাহত রাখা যায়। কিন্তু দু'বারই তাদের অভিযান ব্যর্থ হয়, ফলে ইউরোপে তাদের বিস্তার চিরদিনের মত রুদ্ধ হয়। কিন্তু তাহলেও ১৩২৬ থেকে ১৬৮৩

সালের মধ্যে তারা যেসব দেশ দখল করেছিল তাতেই এক বিশাল সাম্রাজ্য তৈরি হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তুকিরা কিছু অঞ্চল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেও ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে তুরস্ক সাম্রজ্যের যে বিশাল পরিধি ছিল, তার মধ্যে ছিল ১) দানিয়ুবের দক্ষিণে বলকান অঞ্চল, ২) এশিয়া মাইনর, লেভান্ট ও প্রতিবেশী অঞ্চল (যেমন সাইপ্রাস) ৩) সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন, ৪) মিশর এবং ৫) মিশর থেকে মারাক্কো পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকা। তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনের কাহিনী খুব সহজেই বলা যায়। অধীনতা ভেঙে প্রথম বেরিয়ে গেছে মিশর, ১৭৬৯ সালে। তারপর গেছে বলকানের খ্রিস্টানরা। ১৮১২-তে তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ করে রাশিয়া কেড়ে নিয়েছে বেসারাবিয়া। রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে সার্বিয়া ১৮১২-তেই বিদ্রোহ করে এবং সার্বিয়াকে পৃথক সরকারের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয় তুরস্ক। এক-ই সুবিধা দিতে হয়েছে ১৮২৯-এ দানিয়ুব তীরবর্তী আরও দুই অঞ্চল—মোলডাভিয়া ও ওয়ালোসিয়াকে। ১৮২২ থেকে ১৮২৯ পর্যন্ত যে গ্রিসে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলেছিল তার ফলে গ্রিস সম্পূর্ণ ভাবে তুরস্ক শাসন থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে এবং ১৮৩২ সালে গ্রিসের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হয়। ১৮৭৫-৭৭ সালে বলকান অঞ্চলগুলিতে বিক্ষোভ শুরু হয়। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাতে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং বুলগেরিয়ানরা তুর্কিদের ওপর অত্যাচার শুরু করে; তুর্কিরাও সমান অত্যাচার চালাতে থাকে বুলগেরিয়ানদের ওপর। ফলে সার্বিয়া ও মন্টেনেগ্রো তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধ ঘোষণা করে রাশিয়াও। বার্লিন চুক্তি অনুসারে বুলগেরিয়াকে তুরস্কের অধীনে স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হয় এবং পূর্ব রুমানিয়া তুরস্কের তত্ত্বাবধানে শাসন করবে এক ক্রিশ্চিয়ান গভর্নর। রাশিয়া কার্স ও বাটাউম অঞ্চল ফিরে পায়। রুমানিয়াকে দেওয়া হয় দব্রুজা। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা যায় অস্টিয়ার শাসনে এবং সাইপ্রাস দখল করে ইংল্যান্ড। ১৮৮১ সালে গ্রিস থেসালি লাভ করে এবং ফ্রান্স দখল করে টিউনিস। ১৮৮৫ তে বুলগেরিয়া ও পূর্ব রুমানিয়া একত্র হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করে।

১৯০৬ সাল পর্যন্ত তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিস্তার ও পতনের হুবহু ছবি এঁকেছেন মি. লেন পুলে নিম্নলিখিত ভাষায় :

'পুরানো হিসাবে, পোর্লে যখন শাসন করেছেন তখন তুরস্ক সাম্রাজ্য বলতে এখনকার তুরস্ক নামে ছোট দেশটি নয়, গ্রিস, বুলগেরিয়া ও পূর্ব রুমানিয়া, রুমানিয়া, সার্বিয়া, বসনিয়া ও হের্জেগোভিনা, ক্রিমিয়া ও দক্ষিণ রাশিয়ার একটা অংশ, মিশর, সিরিয়া, ত্রিপোলি, টিউনিস, আলজিয়ার্স এবং ভূমধ্যসাগরের অনেক দ্বীপ, আরবের মরুভূমি অঞ্চল, ইত্যাদিও জয় করেছে, যার সমগ্র জনসংখ্যা বর্তমানে ৫০ মিলিয়নের

কিছু বেশি অথবা রাশিয়া বাদে ইউরোপের দ্বিগুণ। কিন্তু এক এক করে তার প্রদেশগুলি চলে গেছে। আলজিয়ার্স ও টিউনিস ফ্রান্সের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে এবং এই ১৭৫,০০০ স্কোয়ার মাইল এবং ৫ মিলিয়ান অধিবাসী তাদের অধীনতা পরিবর্তন করেছে। মিশর কার্যত স্বাধীন এবং এর অর্থ হল ৫০০,০০০ মাইল এবং ছয় মিলিয়নের বেশি লোকের বিযুক্তি। তুলনামূলক ভাবে এশিয়াটিক তুরস্ক কম অঞ্চল হারিয়েছে। বর্তমানে এর মধ্যে আছে প্রায় ৬৮০,০০০ স্কোয়ার মাইল এবং ১৬ মিলিয়নের বেশি লোকসংখ্যা। ইউরোপ তুরস্কের ক্ষতি আফ্রিকা মতওই যেখানে একমাত্র ত্রিপোলি তার দখলে। সার্বিয়া ও বসনিয়া শাসন করছে অস্ট্রিয়া এবং সেখানে ৪০,০০০ মাইল এবং সাড়ে তিন মিলিয়ন অধিবাসী অস্ট্রিয়ার লোক হয়ে গেছে। ওয়ালেশিয়া ও মোলডাভিয়া এক হয়ে মিশেছে স্বাধীন রুমানিয়া রাষ্ট্রে— ফলে তুরস্কের ভৌগোলিক সীমানা কমে গেছে ৪৬,০০০ মাইল এবং জনসংখ্যা কমেছে ৫ মিলিয়ন। বুলগেরিয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্র যার ওপর পোর্টসের কোনও কর্তৃত্ব নেই এবং পূর্ব রুমানিয়া সম্প্রতি কার্যত বুলগেরিয়ারই অংশ হয়েছে এবং দুটি দেশের প্রায় এলাকা ৪০,০০০ স্কোয়ার মাইল এবং জনসংখ্যা প্রায় ৩ মিলিয়ন। গ্রিস দেশ তার ২৫,০০০ মাইল ও দু' মিলিয়ন জনসংখ্যা নিয়ে অনেক আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ইউরোপে যেখানে তুরস্ক সাম্রাজ্য একসময় ২৩০,০০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং জনসংখ্যা ছিল ২০ মিলিয়ন, এখন কমে দাঁড়িয়েছে মোট ৬৬ হাজার মাইলে এবং সাড়ে চার হাজার জনসংখ্যায়। তুরস্ক সাম্রাজ্য প্রায় তার তিন-চতুর্থাংশ জমি হারিয়েছে এবং সেই অনুপাতে জনসংখ্যা'।

তুরস্কের এই অবস্থা ছিল ১৯০৭ সালের। তারপর থেকে যা ঘটেছে, তাতে বিধৃত হয়েছে তার আরো করুণ অবস্থা। ১৯০৮ সালে তরুণ তুর্কিদের বিপ্লবের সুযোগ নিয়ে অস্ট্রিয়া বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা দখল করেছে এবং বুলগেরিয়া তার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। ১৯১১ সালে ইটালি ত্রিপোলিকে নিজের হাতে নিয়েছে এবং মরোক্কো দখল করেছে ফ্রান্স ১৯১২-তে। ১৯১২ সালে ইটালির সফল আক্রমণে অনুপ্রাণিত হয়ে বুলগেরিয়া, গ্রিস, সার্বিয়া ও মন্টেনেগ্রো মিলিত ভাবে বলকান লীগ তৈরি করেছে এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই যুদ্ধে, প্রথম বলকান যুদ্ধে, তুরস্ক সম্পূর্ণ ভাবে পরাস্ত হয়েছে। লন্ডন চুক্তির (১৯১৩) সাহায্যে ইউরোপে তুরস্ক আধিপত্য কনস্টান্টিনোপলকে ঘিরে ছোট একফালি অংশে নেমে যায়। কিন্তু এই চুক্তি কার্যকর হতে পারে নি কারণ বিজেতা দেশগুলি বিজিত এলাকার ভাগ নিয়ে একমত হতে পারে নি। ১৯১৩ সালে বলকান লীগের অন্যান্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধে নামে এবং রুমানিয়া বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে

সীমানা বাড়াবার আশায়। তুরস্কও তাই করেছে। 'বুখারেস্ট চুক্তি'র (১৯১৩) সালে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের অবসান ঘটে, তুরস্ক আদ্রিয়ানোপ্‌ল পুনর্দখল করে এবং বুলগেরিয়ার কাছ থেকে থ্রেস ফিরে পায়। ১৯১৪ সালে যখন বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় বলকানরা তুরস্কের অধীনতা থেকে মুক্ত হয় এবং ইউরোপের খুব কম এলাকাই তুরস্কের অধীনে থাকে। আফ্রিকা মহাদেশের ব্যাপারে দেখা যায় যে মিশর ও উত্তর আফ্রিকার বাকি অংশে সুলতানের আধিপত্য ছিল নামমাত্র, কারণ সেখানে তখন ইউরোপীয় শক্তি তাদের প্রকৃত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছে। ১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধেই তুরস্কের পতন সম্পূর্ণ হয়। ভূমধ্যসাগর থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত সব রাজ্য ও বাগদাদ, জেরুজালেম, দামাস্কাস ও অ্যালেপ্পো দখল হয়ে যায়। ইউরোপ মৈত্রী শক্তি কনস্টান্টিনোপ্‌ল দখল করে। 'সেভরেস চুক্তি' ফলে তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ সমাপ্ত হয় এবং তার অধীনস্থ রাজ্যগুলি, এমনকি এশিয়া মাইনরের সমভূমি অঞ্চল পর্যন্ত তুরস্কের হাতছাড়া করার চেষ্টা হয়। ম্যাসিডেনিয়া, থ্রেস ও এশিয়া মাইনরে গ্রিসের দাবি তুরস্কের প্রতিকূলেই বিবেচিত হয় এবং ইতালিকে দেওয়া হয় আদালিয়া ও দক্ষিণের বিরাট অঞ্চল। ইরাক, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, হেদজাজ ও নেজ, এশিয়ার তার সব আরব রাজ্যগুলি থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়। শুধু রাজধানী থেকে বিচ্ছিন্ন অ্যানাটেলিয়ার অনুর্বর মালভূমি অঞ্চলের অংশ। এই চুক্তি সুলতান মেনে নিলেও কামাল পাশার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী দল তীব্র ভাবে আক্রমণ করল। গ্রিকরা যখন তাদের নতুন এলাকার দখল নিতে গেল, তখন তাদের আক্রমণ করে পরাজিত করা হয়। গ্রিসের সঙ্গে যুদ্ধের শেষে (১৯২০-১৯২২), দেখা গেল তুরস্ক স্মিরনা পুনর্দখল করেছে। মৈত্রী শক্তি গ্রিসের অনুকূলে সৈন্য পাঠাবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। ফলে তাদের জাতীয়তাবাদী তুর্কিদের সঙ্গে সমঝোতা করতে হয়। মুদিয়ানিয়ার সভায় গ্রিকরা সের্ভসর চুক্তির বিষয় পুনর্মাজিত করতে রাজি হয় এবং ১৯২৩ এর 'লসানের চুক্তি' অনুযায়ী পশ্চিম থ্রেস বাদে অন্যত্র তুরস্কের দাবি মেনে নেওয়া হয়। সেভসর চুক্তির অন্যান্য বিষয় তুরস্ককে মেনে নিতে হয় এবং এর ফলে এশিয়ায় তার সমস্ত আরব রাজ্যগুলি হাত ছাড়া হয়ে যায়। ১৯১৪ সালের যুদ্ধের আগে, তুরস্ক ইউরোপের সব রাজ্যগুলিই হারায়। যুদ্ধ শেষে সে হারাল এশিয়ার রাজ্যগুলি। পুরনো তুরস্ক সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার ফলে এখন যা দাঁড়াল তা হচ্ছে, পুরনো সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র নিয়ে গঠিত তুরস্ক রিপাবলিক নামে ছোট্ট একটি দেশ।*

* তুরস্কের পরিধি ২,৯৪,৪৯২ বর্গ মাইল হ্রদ ও জলাশয় বাদে। ইউরোপে তুরস্কের অংশ ৯,২৫৭ বর্গ মাইল মাত্র।

২

চেকোশ্লোভাকিয়ার উদাহরণ দেখা যাক। ১৯১৪ এর ইউরোপীয় যুদ্ধের শেষে 'ট্রিয়াননর চুক্তি'র ফলে এর জন্ম। ট্রিয়াননের চুক্তির শর্তের চেয়ে কঠোর আর কোনও চুক্তির শর্ত ছিল না। অধ্যাপক ম্যাকার্টনি বলেছেনে, 'এই চুক্তির দ্বারা হাঙ্গেরির শুধু অঙ্গহানি ঘটেনি, টুকরো টুকরো হয়েছে। আমরা যদি ক্রোয়েশিয়া ও স্লোভানিয়াকে বাদ দিই, যে দেশ দুটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল অন্যান্য দেশের সঙ্গে, তাহলে হাঙ্গেরি নিজেই তার পূর্ব অবস্থার চেয়ে এক-তৃতীয়াংশে পরিণত হয়েছিল (শতকরা ৩২.৬ ভাগ) এবং জনসংখ্যা দাঁড়িয়ে ছিল দুই-পঞ্চমাংশের কিছু বেশি (শতকরা ৪১.৬ ভাগ)। হাঙ্গেরীয় এলাকা ও অধিবাসীদের অন্তত সাতটি দেশের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল'। এই দেশগুলির মধ্যে অন্তত একটি দেশের অস্তিত্ব আগে ছিলই না। রাষ্ট্রটি নতুন সৃষ্টি করা হয়। এই রাষ্ট্রটির নাম চেকোস্লোভাকিয়া।

চেকোস্লোভাকিয়া রিপাবলিকের এলাকা ছিল ৫৪,২৪৪ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৩,৬১৩,১৭২। এর অংশ হয়েছিল সেই এলাকাগুলি, যা আগে বোহেমিয়া, মোরাভিয়া, শ্লোভাকিয়া ও রুমেনিয়া নামে পরিচিত ছিল। এই মিশ্র রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল তিনটি প্রধান জাতীয়তা—১) বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার চেকরা, ২) শ্লোভাকিয়ার শ্লোভাকরা, ও ৩) রুমেনিয়ার রুমেনিয়ানরা।

চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্র দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মাত্র দু'দশকের জন্যে ছিল তার অস্তিত্ব। ১৯৩৯ সালের ১৫ মার্চ এই রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটে, বা বলা যায় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে এটির ধ্বংস প্রাপ্তি ঘটে। সে আসে জার্মানির আধিপত্যে। যে সব কারণে তা ঘটে, সেগুলির বৈশিষ্ট্য খুবই বিস্ময়কর। যে শক্তি তাকে জন্ম দিয়েছে, মৃত্যু হয়েছে তারই হাতে। ১৯৩৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর 'মিউনিখ চুক্তি' করে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালি বিশ্বযুদ্ধে তাদের পুরানো শত্রু জার্মানিকে সাহায্য করে পুরনো মিত্র চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করতে। গত শতাব্দীতে চেকদের স্বাধীনতা অর্জনের সমস্ত প্রচেষ্টা মুছে গেল। তারা আবার তাদের পুরানো জার্মান প্রভুদের দাসে পরিণত হল।

৩

তুরস্কের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ কী?

লর্ড এভারস্লে তাঁর 'টার্কিশ এমপায়ার'* গ্রন্থে তুরস্কের পতনের যেসব কারণ দেখিয়েছেন সেগুলির কিছু অভ্যন্তরীণ এবং কিছু কারণ বহিরাগত। অভ্যন্তরীণ কারণগুলি দ্বিবিধ। প্রথম হল অটোমন বংশের অবনয়ন। প্রধান ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়েছিল সুলতানদের উজিরদের হাতে, না হলে প্রায়শই সুলতানের হারেম সুন্দরীদের হাতে থাকত না। সুলতানের আদেশে রাষ্ট্রের শাসনকার্য চলত পোর্লে থেকে, আর পোর্লে সরকারি শাসনকার্যের বিরুদ্ধে সব সময়-ই থাকত হারেম। প্রতিটি স্তরের রাজকর্মচারীরাই তাদের সরকারি পদগুলিকে যেন বিক্রয়ের জন্যেই রেখে দিয়েছিলেন, যারা বেশি দর হাঁকবে তাদের কাছে তারা বিক্রিত হবে। তাদের এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তারা হারেমের নারীদের উৎকোচ দিয়ে বশ করত এবং কালক্রমে সুলতানের মতামতকে প্রভাবিত করা হত। ফলে হারেম হয়ে উঠেছিল দুর্নীতির কেন্দ্র, যেখান থেকে এই দুর্নীতি সারা তুরস্ক সাম্রাজ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল। আর এটিই হয়েছিল পতনের একটি প্রধান কারণ। তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনের দ্বিতীয় প্রধান কারণ হল সৈন্যবাহিনীর অবনয়ন— এর কারণ দুটি। গত ৩০০ বছরে সৈন্যবাহিনী হারিয়েছে তাদের জলুস ও দক্ষতা, যেসবের সাহায্যে অটোমনরা জিতেছে অনেক যুদ্ধ। এই দক্ষতা ও সাহস হারানোর কারণ ছিল সৈন্যবাহিনীর গঠন, যেখানে নিয়োগ করা হত শুধু তুর্কি ও আরবদের, আর যুদ্ধকালে বকশিস হিসাবে পাওয়া লুণ্ঠন সামগ্রী পাওয়ার আশা ত্যাগ, কেননা শেষ দিকে সাম্রাজ্য তখন নিজেকে রক্ষা করতেই ব্যস্ত, কোনও নতুন বিজয়ের সুযোগ নেই অথচ যা আছে তা রক্ষা করাই যথেষ্ট তখন।

তুরস্কের বিচ্ছিন্ন হবার বহিরাগত কারণগুলির মধ্যে বলা হয় প্রধান হল ইউরোপীয় জাতিগুলির প্রবল লালসা। এই ধারণার ফলে কিন্তু আসল কারণটাই হারিয়ে যায়। বাস্তবিক ও প্রধান কারণ ছিল অধীনস্থ জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবাদের স্পৃহা বৃদ্ধি। তুর্কি কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে গ্রিক বিদ্রোহ, সার্ব, বুলগেরিয়ান ও অন্য বলকানদের বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামের দ্বন্দ্বের প্রকাশ হিসাবে দেখা দিয়েছিল। এটি একধরণের মত, অন্যটি অবশ্য ভাসাভাসা। এই বিদ্রোহগুলির মধ্যে দিয়ে জাতীয়তাবাদের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। তুর্কি অপশাসন, ইসলামের প্রতি খ্রিস্টীয়

* শেখ আব্দুর রশিদ কর্তৃক সংক্ষেপিত সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

বীতরাগ এবং ইউরোপীয় জাতিগুলির চেষ্টা নিশ্চয় এই বিদ্রোহগুলির তাৎক্ষণিক কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এর সাহায্যে, কী সেই শক্তি যা তাদের সঞ্চালন করেছিল তার ব্যাখ্যা মেলে না। এই আসল সঞ্চালিকা শক্তি ছিল জাতীয়তাবাদের স্পৃহা এবং তাদের বিদ্রোহগুলি অন্তরের এই ঈপ্সার প্রকাশ মাত্র। এটি যে জাতীয়তাবাদের স্পৃহা ছাড়া অন্য কিছু নয়, যাতে তুরস্ক টুকরো টুকরো হয়েছিল, তা প্রমাণিত হয়েছে শেষ যুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহে ও তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায়। এখানে ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের দ্বন্দ্ব ছিল না, এখানে শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক। তথাপি আরবরা তুরস্ক সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীন হতে চাইল। কেন? কারণ তারা আরবীয় জাতীয়তাবাদে আন্দোলিত হয়েছিল এবং তুরস্কের অধীনে থাকার চেয়ে আরব জাতীয়তাবাদী হওয়াই বেছে নিয়েছে।

চেকোশ্লোভাকিয়া ধ্বংসের কারণ কী?

সাধারণ ধারণা হল, এই ধ্বংসের কারণ জার্মান আক্রমণ। কিয়দংশে তা সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। জার্মানি যদি চেকোস্লোভাকিয়ার একমাত্র শত্রু হত, তাহলে সীমান্তে কিছু এলাকা যেখানে সুদেতেন জার্মানদের বাস তা-ই শুধু হারাতে হত। জার্মানি আক্রমণের ফলে আর কিছু হারাবার ভয় থাকত না। বস্তুত, সীমান্তের অন্তর্গত শত্রুদের দ্বারাই চেকোস্লোভাকিয়ার ধ্বংস সংঘটিত হয়েছে। শত্রু ছিল শ্লোভাকদের আপস বিরোধী জাতীয়তাবাদ, কেন না স্লোভাকরা রাষ্ট্রের ঐক্য ভঙ্গ করে স্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা অর্জনে তৎপর হয়েছিল।

এক রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে স্লোভাক ও চেকদের মিলন সম্ভব হয়েছিল কিছু অনুমিত ধারণার ভিত্তিতে। প্রথমত, ধরে নেওয়া হয়েছিল যে একজাতি হওয়ার উপযোগী আত্মীয়তা তাদের আছে এবং চেকোস্লোভাকদের একটি শাখা হল স্লোভাকরা। দ্বিতীয়ত, উভয়েই চেকোস্লোভাক ভাষায় কথা বলত। তৃতীয়ত, স্লোভাকদের পৃথক জাতীয়তার চেতনা ছিল না। সেই সময় কেউ এই অনুমিত ধারণাগুলিকে পরীক্ষা করে দেখে নি, কারণ স্লোভাকরাই এই ঐক্যের পক্ষে ছিল— শান্তি অধিবেশনে তাদের প্রতিনিধিদের ঘোষণার মাধ্যমেই এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছি। এটি ছিল খুব-ই কৃত্রিম ও তাৎক্ষণিক ধারণা। অধ্যাপক ম্যাকার্টনি* এইরকম বলেছেন :

'... এই ইতিহাস (স্লোভাক ও চেকদের সম্পর্ক বিষয়ক) বর্তমান যুগে বিবেচনা করে যে মূল রাজনৈতিক সত্য বেরিয়ে আসে তা হল স্লোভাকদের জাতীয়তাবাদী

* 'হাঙ্গেরি অ্যান্ড হার সাকসেসর', (অক্সফোর্ড), সি.এ. মাকার্টনি; পৃঃ ১৩৬

চেতনার চরম উন্মেষ। যেমন মনে হয়েছিল তেমন বেশি সংখ্যায় ছিল না সেইসব লোকজন, যারা একক এবং অবিভাজ্য চেকোস্লোভাকিয়ার ভাষা ও জাতীয়তায় বিশ্বাস করত। বর্তমানে তাদের সংখ্যা, অন্তত স্লোভাকিয়াতে, খুব-ই কমে এসেছে, কেন না চেক ও স্লোভাকদের পার্থক্যের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তারা প্রভাবিত হয়েছে। বর্তমানে চেকদের দ্বারাই বাস্তবে স্লোভাকিয়ার সরকারি ভাষা হিসাবে স্লোভাককে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক ও জাতীয় প্রতিরোধ কম নয়, আর এখন 'চেকোস্লোভাকিয়া' নামটি বস্তুত সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে সরকারি নথিপত্র ও সাহিত্যে যা বিদেশিদের সুবিধার জন্যেই রচিত। এই দেশে অনেক সপ্তাহ কাটানোর সময়, মনে পড়ছে একবার একজনকে এই শব্দটি ব্যবহার করতে শুনেছি, যে ছিল আধা জার্মান ও আধা হাঙ্গারিয়ান এক নারী, যে এটি ব্যবহার করেছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অর্থে। কোনও স্লোভাক বা চেক নিজেকে চেকোস্লোভাকিয়ান বলে ভাবে না বা ডাকে না, স্লোভাক বা চেক এই শব্দে ছাড়া'।

স্লোভাকদের এই স্বাভাবিক জাতীয় বোধ, যা সব সময়ই জাগ্রত ছিল, প্রকাশিত হয়ে পড়ে যখন স্বায়ত্ত শাসনের জন্য সুদেতেন জার্মানরা চেকোস্লোভাকিয়ার কাছে কিছু দাবি জানায়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দলবদ্ধতার নীতি প্রয়োগ করে জার্মানরা তাদের লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করেছে এই বলে যে, 'আমরা যা চাইছি তা দাও, না হলে তোমার দোকান আমরা ভেঙে ফেলব'। স্লোভাকরাও সঙ্গে সঙ্গে স্বায়ত্ত শাসনের দাবি তুলেছে, তবে একটু ভিন্ন সুরে। তারা গায়ের জোর দেখায়নি, কিন্তু শুধু স্বায়ত্ত শাসনের প্রশ্নে তাদের দাবিকে অনমনীয় করেছে। স্বাধীনতার চিন্তাকে তারা আগেই পরিহার করেছিল এবং ৮ অক্টোবরের ঘোষণায়, যা স্বায়ত্ত শাসনের আন্দোলনের মুখ্য নায়ক ড. টিসো করেছিলেন, বলা হয়েছে : 'ঈশ্বর ও জাতির লক্ষ্যে আমরা এগুবো খ্রিস্টধর্ম ও জাতীয়তার শক্তি নিয়ে'। তাদের ইচ্ছার আন্তরিকতায় বিশ্বাস করে এবং চেক ও স্লোভাকদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের অবনতি এড়াতে প্রাগের ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি ১৯৩৮ সালের নভেম্বরে 'মিউনিখ চুক্তি'র ঠিক পরপরই 'কনস্টিটিউশনাল অ্যাক্ট অন দি অটোনমি অফ স্লোভাকিয়া' নামে এক আইন প্রণয়ন করে। এই আইনে যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল তার চরিত্র ছিল সুদূর প্রসারী। স্লোভাকিয়ার জন্য পৃথক পার্লামেন্টের ব্যবস্থা করা হয় এবং এই পার্লামেন্টের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয় চেকেস্লোভাক রিপাবলিকের আইনি কাঠামোর মধ্যে স্লোভাকিয়ার শাসনতন্ত্র নির্ধারণ করার। এই পার্লামেন্টের দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার সম্মতি সাপেক্ষে স্লোভাকিয়ার এক্তিয়ার পুনর্নির্ধারিত হবে। স্লোভাকিয়া সম্পর্কিত কোনও আন্তর্জাতিক চুক্তি স্লোভাক পার্লমেন্টের সম্মতি ব্যতীত হবে না। স্লোভাকিয়ার রাজশাসন

ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কেন্দ্রীয় কর্মচারীরা মূলত স্লোভাক-ই হবে। সমস্ত কেন্দ্রীয় সংস্থা, কাউন্সিল, কমিশন ও অন্যান্য সংগঠনে স্লোভাকিয়ার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব স্বীকৃত হয়। একই ভাবে, সমস্ত আন্তর্জাতিক সংগঠন, যেখানেই চেকোস্লোভাক রিপাবলিক আমন্ত্রিত হবে, স্লোভাকিয়াও আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে। শান্তির সময় স্লোভাক সৈন্যদের যতদূর সম্ভব স্লোভাকিয়াতেই রাখা হবে। আইন সভাগত কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় সম্পূর্ণ ভাবে উভয়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, সেগুলি চেকোস্লোভাকিয়ার পার্লামেন্টের ওপর অর্পিত হয়। স্লোভাকদের এই সমস্ত অধিকার সুনিশ্চিত করে কনস্টিটিউশন অ্যাক্টে বলা হয় যে সাংবিধানিক পরিবর্তন করার জন্য ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লির সিদ্ধান্ত তখন-ই বৈধ হবে যখন এই পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্যে স্লোভাকিয়া থেকে নির্বাচিত ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লির সদস্যবৃন্দেরও আনুপাতিক গরিষ্ঠতা থাকবে। একই ভাবে, রিপাবলিকের প্রেসিডেন্টের নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্মতি শুধু সংবিধান বিধি অনুসারে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বলেই হবে না, স্লোভাক সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশেরও সম্মতি দরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর স্লোভাকদের আস্থা থাকার বিষয়টিকে জোর দেওয়ার জন্য এ ব্যবস্থাও সংবিধানে রাখা হয়েছে যাতে পার্লামেন্টের এক-তৃতীয়াংশ স্লোভাক সদস্যও অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারবে। চেকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তৈরি এইসব সাংবিধানিক পরিবর্তনের ফলে চেক ও স্লোভাকদের মধ্যে একটি হাইফেন চিহ্ন তৈরি হয়, যা আগে কখনও ছিল না। কিন্তু এই পরিবর্তনগুলি করা হয়েছিল এই আশায় যে চেকদের সঙ্গে স্লোভাকদের ছোটখাটো ঝগড়াঝাটি একবার দূর হয়ে গেলে স্লোভাকদের জাতীয়তাবাদই তাদেরকে চেকদের আরো ঘনিষ্ঠ করে তুলবে। স্লোভাকিয়ার স্বাধীন অবস্থানকে সুনিশ্চিত করে এবং এতখানি সুনিশ্চিত করে যে তার অবস্থানকে স্লোভাকদের সম্মতি ছাড়া পরিবর্তন করা যাবে না, এই সাংবিধানিক পরিবর্তনগুলি সংঘটিত হয়েছে। ফলে জাতীয় পরিচয় হারানোর কোনও সম্ভাবনাই স্লোভাকদের আর ছিল না চেকদের হাতে। স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার পাওয়ার ফলে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল পৃথক হয়ে পড়ে এবং স্লোভাকরা তাদের নিজস্ব পরিচয় রক্ষা করার সুযোগ পায়।

নতুন সংবিধান বলে নির্বাচিত স্লোভাক পার্লামেন্টের শুরু ১৯৩৯ সালের ১৮ জানুয়ারি, এবং পার্লামেন্টের সভাপতি ডঃ মার্টিন সোকোল ঘোষণা করেন : 'স্লোভাকদের স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগ শেষ হয়েছে, এখন জাতীয় পুনর্জন্মের যুগ শুরু হল'। এই উপলক্ষে অন্যান্য যেসব বক্তৃতা করা হয়েছিল, তা থেকে এই ইঙ্গিত মেলে যে স্লোভাকিয়া স্বায়ত্ত শাসন পাওয়ার ফলে এখন থেকে চেকদের

প্রতি কোনও বিদ্বেষ স্লোভাকরা অনুভব করবে না এবং উভয়েই অনুগত হয়ে চেকো-স্লোভাক রাষ্ট্রে পাশাপাশি বসবাস করবে।

স্লোভাক পার্লামেন্ট উদ্বোধনের পর একমাস যেতে না যেতেই স্লোভাক রাজনীতিকরা ওই হাইফেনটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সম্পূর্ণ বিযুক্তি চায়। উত্তেজক বক্তৃতার মাধ্যমে তারা চেকদের আক্রমণ করে, চেক শোষণের কথা তোলে এবং স্বাধীন স্লোভাকিয়ার দাবি করে। মার্চ মাস শুরু হওয়ার সময়েই, নানা ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাথা চাড়া দিতে থাকে এবং চেকো-স্লোভাক রাষ্ট্রের সংহতি সাংঘাতিক ভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে। ৯ মার্চ জানা গেল যে স্লোভাক প্রধান টিসো, স্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ১৩ তারিখে এই ঘোষণা প্রত্যাশা করে স্লোভাকিয়ার সৈন্য পাঠানো শুরু হয় এবং রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট ড. হাচা স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী টিসো সহ সমস্ত মন্ত্রিবর্গকে বরখাস্ত করলেন। পরদিন টিসো পুলিশের নজরবন্দী থাকাকালীন-ই বার্লিনে টেলিফোন করে সাহায্য প্রার্থনা করেন। সোমবার টিসো ও হিটলারের সাক্ষাৎ হল এবং তাঁরা দেড় ঘণ্টা ধরে বার্লিনে আলোচনা করলেন। হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের পরপরই টিসো প্রাগে টেলিফোনে কথা বলেন এবং জার্মান আদেশ জানিয়ে দেন।

এই আদেশগুলি হল—

(১) স্লোভাকিয়া থেকে সমস্ত চেক সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে।

(২) জার্মানির রক্ষাধীন হয়ে স্লোভাকিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র হবে।

(৩) প্রেসিডেন্ট হাচা স্বাধীনতার ঘোষণা শোনার জন্য স্লোভাক পার্লামেন্ট ডাকবেন।

প্রেসিডেন্ট হাচা ও প্রাগ সরকারের 'হ্যাঁ' বলা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না, কারণ তাঁরা জানতেন ভালো করে যে, কয়েক ডজন জার্মান সৈন্য দলের ডিভিসন ইতিমধ্যেই চেকোস্লোভাকিয়ার অরক্ষিত সীমান্তের ধারে জড় হয়েছে এবং যে কোনও সময় ভিতরে চলে আসবে, যদি স্লোভাকিয়া সম্পর্কে জার্মানির আদেশ অমান্য করা হয়। এই ভাবেই নতুন রাষ্ট্র চেকোস্লোভাকিয়ার সমাপ্তি ঘটে।

৪

এই দু'টি দেশের বাহিনী থেকে কী শিক্ষা আমরা পাই?

বিষয়গুলিকে কীভাবে পেশ করা হবে সে সম্পর্কে কিছু মতপার্থক্য আছে। মি.

সিডনি ব্রুক বলবেন যে বিচ্ছিন্নতার জন্য এইসব যুদ্ধবিগ্রহের কারণ হল জাতীয়তাবাদ, যা, তাঁর মতে, বিশ্বশান্তির শত্রু। অন্যদিকে মি. নরম্যান অ্যাঞ্জেল বলবেন যে জাতীয়তাবাদ নয়, জাতীয়তাবাদের ভীতিই হল এসবের কারণ। মি. রবার্টসনের মতে, জাতীয়তাবাদ একটি সদর্থক মায়া না হলেও একটি অযৌক্তিক প্রবৃত্তি এবং যত তাড়াতাড়ি মানব জাতি এর থেকে মুক্তি পাবে ততই মঙ্গল।

যে ভাবেই বিষয়টিকে দেখা হোক, এবং যত ব্যগ্র ভাবেই কেউ জাতীয়তাবাদের নিধন চাক, একটি স্পষ্ট শিক্ষা এ থেকে পেতে পারি : জাতীয়তাবাদ এমন একটি সত্য যাকে এড়ানো যাবে না, অস্বীকার করাও যাবে না। কেউ একে অযৌক্তিক প্রবৃত্তি বলুক বা সদর্থক মতিভ্রমই বলুক, সত্য হল এই যে, এটি একটি সক্রিয় শক্তি এবং সাম্রাজ্যকে ভেঙে ফেলার সর্বব্যাপী ক্ষমতা তার আছে। জাতীয়তাবাদ কারণ, না জাতীয়তাবাদের বিপদ-ই কারণ— এই প্রশ্ন শুধু ঝোঁকের পার্থক্যগত। আসল জিনিস হল স্বীকার করে নেওয়া যে, মি. টয়েনবির ভাষায়, 'আমরা না চাইলেও যুদ্ধ বাধানোর ক্ষমতা জাতীয়তাবাদের আছে। মারাত্মকভাবে একথা প্রমাণিত যে, এটি কোনও পরিত্যক্ত বিশ্বাস নয়। এটি এমন এক মৌল শক্তি যাকে না মেনে উপায় নেই'। টয়েনবি আরও বলেছেন যে 'জাতীয়তাবাদকে সঠিক ভাবে চিনতে পারাটা জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে'। একথা শুধু ইউরোপের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। একথা তুরস্কের ক্ষেত্রেও সত্য হয়েছে। সত্য হয়েছে চেকোস্লোভাকিয়াতে। এইসব দেশের কাছে যা জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্ন হয়েছে, ভারতের ক্ষেত্রেও তা না হয়ে পারে না। অধ্যাপক টয়েনবি যুক্তি দেখিয়েছেন, যেভাবে তাঁর আগে গুইজোট দেখিয়েছেন, যে ইউরোপীয় শান্তির প্রয়োজনীয় ভিত্তি হিসাবে জাতীয়তাবাদকে মেনে নিতে হবে। এই যুক্তি অগ্রাহ্য করতে ভারত পারবে কি? যদি সত্যিই অগ্রাহ্য করা হয়, তবে তা ভারতের ক্ষেত্রে ঝুঁকির কারণ হবে। জাতীয়তাবাদ যে বিচ্ছিন্নতার শক্তি এই শিক্ষাই শুধু আমরা দুটি দেশের ইতিহাস থেকে পাইনি। তাদের অভিজ্ঞতা থেকে আরও অনেক উল্লেখযোগ্য শিক্ষাও পাওয়া যায়। কী সেই শিক্ষা, তা স্পষ্ট হবে যদি আমরা কিছু তথ্য স্মরণে আনি।

তুর্কিদের যতটা অনুদার বলে বর্ণনা করা হয়েছে, ততটা অনুদার তারা ছিল না। তারা তাদের সংখ্যালঘুদের যথেষ্ট পরিমাণ স্বায়ত্ত শাসনের সুযোগ দিয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের সামাজিক ঐতিহ্যের বিভিন্নতা সত্ত্বেও কিভাবে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করবে সেই সমস্যা সমাধানের পথে তারা অনেক দূর এগিয়েছিল। অটোমন সাম্রাজ্যে অ-মুসলমান ও অ-তুর্কি সম্প্রদায়গুলিকে নিজস্ব গন্ডীর ভিতর-ই এলাকাগত ও সংস্কৃতিগত এক ধরনের স্বাধিকার প্রদান করা হয়েছিল,

যা এমনকি পশ্চিমের রাজনৈতিক চিন্তাধারাতেও কল্পনা করা যেত না। খ্রিস্টধর্মাবলম্বী প্রজাদের কি তাতে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত ছিল না? যে যাই বলুক, খ্রিস্টধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জাতীয়তাবাদ এই স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনে তৃপ্ত হয় নি। তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে এবং এই যুদ্ধে তুরস্ক বিভক্ত হয়েছে।

তুর্কিরা আরবদের সঙ্গে ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। মানব সমাজের মধ্যে ইসলামের ধর্মীয় বন্ধন খুব-ই দৃঢ়। ঐক্যের ক্ষেত্রে অন্য কোনও সামাজিক সম্মেলন ইসলামিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ধারে কাছে যেতে পারে না। এই সঙ্গে একথাও স্মরণযোগ্য যে, তুর্কিরা খ্রিস্টানদের অধীনস্থ মনে করলেও আরবদের সমকক্ষ মনে করেছে। সমস্ত অ-মুসলমানদের অটোমন সৈন্যবাহিনী থেকে দূরে রাখা হয়েছে। কিন্তু আরব সৈন্য ও অফিসারেরা তুর্কি ও কুর্দদের পাশে পাশে থেকে যুদ্ধ করেছে। তুরস্কের স্কুলে শিক্ষিত হয়ে আরব আধিকারিক শ্রেণী সৈন্যবাহিনীতে ও জন-কৃত্যকে তুর্কিদের সমান মর্যাদায় কাজ করেছে। তুর্কি ও আরবদের মধ্যে তেমন অবমাননাকর কোনও পার্থক্য রাখা হয়নি এবং অটোমন কৃত্যকে কোনও অপরের উচ্চ পদে ওঠার বাধা ছিল না। শুধু রাজনৈতিক ভাবে নয়, এমনকি সামাজিক ব্যাপারেও তুর্কিরা আরবদের সমান মর্যাদা দিয়েছে, আরবরা তুর্কি রমণীর পানিগ্রহণ করেছে এবং তুর্কিরাও আরব স্ত্রী গ্রহণ করেছে। ভ্রাতৃত্ব, স্বাধীনতা ও সমতার ভিত্তিতে গঠিত আরব-তুর্কি ইসলামিক ভ্রাতৃত্বে সন্তুষ্ট থাকা কি আরবদের উচিত ছিল না? যে যাই বলুক, আরবরা সন্তুষ্ট থাকে নি। আরবদের জাতীয়তাবোধ ইসলামের বন্ধনকে ভেঙেছে এবং স্বাধীনতার জন্য সহ-মুসলমান তুর্কিদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। আরব জাতীয়তা বোধের জয় হয়েছে, কিন্তু তুরস্ক পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে।

চোকোস্লোভাকিয়ার যাত্রা শুরু হয়েছিল এই ধারণার স্বীকৃতি থেকে যে চেক ও স্লোভাকরা একজাতি। কয়েক বছরের মধ্যে স্লোভাকরা নিজেদের একটি পৃথক জাতি হিসাবে দাবি করল। এমনকি তারা একথাও স্বীকার করতে চাইল না যে, তারা চেকদের মতো একই গোত্রের শাখা। তাদের জাতীয়তাবাদ চেকদের স্বীকৃতি আদায় করেছে যে তারা সম্পূর্ণ পৃথক। চেকরা স্লোভাকদের জাতীয়তাবাদকে শান্ত করতে চেয়েছিল তাদের দুইয়ের মধ্যে একটি হাইফেন যুক্ত করে, যাতে পার্থক্য স্পষ্ট করা যায়। চেকোশ্লোভাকিয়ার জায়গায় তারা চেকো-স্লোভাকিয়া পেতেও রাজি ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্লোভাকদের জাতীয়তাবাদ সন্তুষ্ট হয়নি। স্বায়ত্ত শাসনের ব্যবস্থায় তাদেরকে চেকদের থেকে আলাদাও করা হয়েছিল, আবার হাইফেনের ব্যবহারে যুক্তও রাখা হয়েছিল। হাইফেন দিয়ে তাদেরকে আলাদা করে দেখানোয় খুশি হয়েছে, কিন্তু চেকদের সঙ্গে যুক্ত করে রাখায় তাদের ঘোর আপত্তি। স্লোভাকরা হাইফেন যুক্ত

স্বায়ত্ত শাসনে স্বস্তি পেয়েছিল এবং রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকার প্রতিজ্ঞা করেছিল। কিন্তু বাহ্যত তা ছিল কৌশলগত, এই অবস্থাকে শেষ বলে মানতে পারে নি তারা। তারা গ্রহণ করেছে স্বায়ত্ত শাসন যাতে তারা একটি সুবিধাযুক্ত অবস্থান পায় এবং সুযোগ পেলেই হাইফেনটিকে তুলে দেওয়াই মূল লক্ষ্য ছিল যাতে স্বায়ত্ত শাসন থেকে স্বাধীনতায় পৌঁছনো যায়। স্লোভাক জাতীয়তাবাদ হাইফেনে সন্তুষ্ট থাকেনি। হাইফেনের বদলে ব্যবধান চেয়েছে তারা। তাই হাইফেন যুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা লড়াই শুরু করেছে যাতে হাইফেন উঠে গিয়ে ব্যবধান তৈরি হয় চেক ও স্লোভাকের মধ্যে। এই লক্ষ্যে তারা কী পদ্ধতি গ্রহণ করছে তা তারা গ্রাহ্যে আনেননি। তাদের জাতীয়তাবাদ এত দৃঢ়বদ্ধ ছিল যে যখন তারা জয় লাভে ব্যর্থ হল, তখন জার্মানদের সাহায্য নিতে দ্বিধা করেনি।

সুতরাং তুরস্ক ও চেকোস্লোভাকিয়ার খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার বিষয়টি গভীর ভাবে অধ্যায়ন করলে প্রমাণিত হয় যে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বা ধর্মের বন্ধন কোনওটাই জাতীয়তাবাদকে রুদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

এই শিক্ষাটি হিন্দুদের ভালোভাবে অনুধাবন করা উচিত। তাদের প্রশ্ন করা উচিত নিজেদের কাছে : গ্রিক, বলকান ও আরব জাতীয়তাবাদ যদি তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করতে পারে, এবং স্লোভাক জাতীয়তাবাদের ফলে যদি চেকোস্লোভাকিয়া ভেঙে যায়, তাহলে মুসলমান জাতীয়তাবাদের কারণে ভারত রাষ্ট্রের বিভাজন ঘটলে আটকাবে কে? অন্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে যদি আমরা এই শিক্ষা পাই যে জাতীয়তাবাদের এই ফলাফলই এইরকম, তাহলে এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারতকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে ভাগ করে এক চরম বিপর্যয় থেকে আমরা নিজেদের বাঁচাবো না কেন? হিন্দুদের এই সতর্কবাণী গ্রহণ করা উচিত যে তারা যদি ভারতকে ভাগ করতে রাজি না হয়, তাহলে তারা সেই একই অবস্থার মুখোমুখি হবে যা হয়েছে তুরস্কে, চেকোশ্লোভাকিয়ায়। মাঝ-সমুদ্রে যদি তারা জাহাজডুবি ঘটাতে না চায়, তাহলে তারা পরিহার্য জিনিসপত্র সব জাহাজ থেকে ফেলে দিয়ে জাহাজকে হাল্কা করবে।

৫

ভারতকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে বিভক্ত করা মেনে নিলে হিন্দুরা কি সত্যিই কিছু হারাবে?

চেকোস্লোভাকিয়ার ক্ষেত্রে এটি শিক্ষণীয় হবে যদি 'মিউনিখ চুক্তি' অনুসারে এলাকা

হারানোর পর সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি আমরা লক্ষ্য করি। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে চেকোস্লোভাকিয়ার জনগণের উদ্দেশ্যে সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর বাণী :*

'নাগরিকবৃন্দ ও সৈন্যেরা ... আমি আমার জীবনের কঠিনতম মুহূর্তের মধ্যে বাস করছি। আমি এমন একটি দুঃখজনক কর্ম পালন করছি যার তুলনায় মৃত্যুও সহজতর। কিন্তু যেহেতু আমি লড়াই করেছি এবং জানি কোন্ পরিস্থিতিতে যুদ্ধে জেতা সম্ভব, নির্দ্বিধায় আপনাদের কাছে তাই জানাচ্ছি যে আমাদের বিরুদ্ধ শক্তি এই মুহূর্তে তার অধিকতর শক্তিকে মেনে নিতে এবং সেইমত ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করেছে'।...

'মিউনিখে চার ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তি মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাতে আমরা নতুন সীমানা মেনে নিই, এবং সেই অনুসারে আমাদের রাষ্ট্রের জার্মান এলাকাগুলি নিয়ে নেওয়া হবে। মরিয়া ও আশাহীন প্রতিরক্ষা ও তাদের শর্ত গ্রহণ— এই দুয়ের মধ্যেই আমাদের একটিকে গ্রহণ করতে হত। প্রথমটির অর্থ হল শুধু বয়স্ক প্রজন্মের নয়, শিশু ও নারীদেরও আত্মদান। আর দ্বিতীয়টির অর্থ, যুদ্ধ ব্যতিরেকে তাদের নির্দয় শর্তাবলীর প্রয়োগ, এর সমান কোনও ঘটনার নজির ইতিহাসে নেই। আমরা শান্তির জন্য আমাদের অবদান রাখতে চেয়েছি, এবং আনন্দের সঙ্গে সে কাজ করেছি। কিন্তু এই কাজে কোনও জোর আমাদের ওপর খাটানো হয় নি'।

'কিন্তু আমরা পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিলাম, ছিলাম একাকী ... বিহ্বল অবস্থায় আপনাদের নেতৃবৃন্দ সৈন্যবাহিনী ও রিপাবলিকের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একত্রে সমস্ত সম্ভাবনাগুলিকে বিবেচনা করেছে। তারা মেনে নিয়েছে যে সীমানার সংক্ষেপ এবং জাতির মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের পবিত্র কর্তব্য হল জনগণের জীবন রক্ষা করা, যাতে এই বিপর্যস্ত সময়ের মধ্যে থেকে আমরা দুর্বল অবস্থায় বেরিয়ে না আসি, এবং যাতে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, জাতি পুনরায় তার শক্তি সংগ্রহ করবে যেমন অতীতে বহুবার আমরা করেছি। আসুন, আমরা সবাই মিলে দেখি যে আমাদের দেশ তার নতুন সীমানার ভিতরেই দৃঢ় ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে এবং দেশের জনগণ সুনিশ্চিত হতে পারছে শান্তি ও ফলদায়ী পরিশ্রমের এক নতুন জীবনের। আপনাদের সহায়তায় আমরা নিশ্চয় সফল হব। আপনাদের ওপর আমাদের ভরসা আছে এবং আপনাদেরও আস্থা আছে আমাদের ওপরে'।

স্পষ্ট যে, চেকরা ইতিহাসের আবেগ বশবর্তী হয়ে চলতে চায়নি। দেশের ছোট

---

* 'আই উইটনেস ইন চেকোস্লোভাকিয়া', আলেকজান্ডার হেন্ডারসন (হেরাপ, ১৯৩৯); পৃ: ২২৯-৩০

পরিসীমা ও ক্ষুদ্রতর চেকোস্লোভাকিয়াও জনগণের বিনষ্টির চেয়ে বেশি কাম্য হওয়ায় তাকেই মেনে নিয়েছে।

তুরস্কের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে ১৮৫৩ সালে জার নিকোলাস একের কথায়। সেন্ট পিটার্সবার্গে ব্রিটিশ রাষ্ট্র প্রতিনিধির সঙ্গে কথোপকথনকালে তিনি বলেছিলেন— 'আমরা হাত দিয়ে ধরে আছি একজন অসুস্থ মানুষকে, খুবই অসুস্থ একজন মানুষকে ... যে কোনও মুহূর্তে আমাদের হাতের মধ্যেই তার মৃত্যু হতে পারে'। সেই দিন থেকে ইউরোপের অসুস্থ মানুষ, তুরস্কের সমাগত ক্ষয়ের অপেক্ষায় থেকে তার সব প্রতিবেশীরা। রাষ্ট্রের এক একটি এলাকা হস্তচ্যুত হওয়াকে মনে করা হয়েছে মৃত্যু পথগামী এক ব্যক্তির কম্পন, আর যার মৃত্যু হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয় সেভের্স চুক্তিতে স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে।

তুরস্ক বিনষ্ট হওয়া সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ কি সঙ্গত? এ সম্পর্কে আরনল্ড টোয়েনবির মন্তব্য লক্ষ্য করার মত। জারের তুরস্ক বর্ণনা— তুরস্ক এক অসুস্থ লোক যে যেকোনও মুহূর্তেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

'তাঁর রোগ পরীক্ষার এই দ্বিতীয় ও চাঞ্চল্যকর অংশে নিকোলাস স্বাভাবিক ছিলেন না, কেন না তিনি উপসর্গগুলিকে বুঝতেই পারেননি। প্রাকৃতিক ইতিহাস বিষয়ে অজ্ঞ কোনও ব্যক্তি যদি সাপের খোলস ত্যাগের সময় হাজির থাকে, তাহলে খুব জোরের সঙ্গেই বলবে যে, প্রাণীটির আর বাঁচার আশা নেই। সে নিশ্চয় বলবে যে, মানুষের খোলস হারানো দুর্ভাগ্যের আর সে মানুষের কোনও আশা ভরসা থাকে না। তথাপি এও সত্য যে চিতা তার গায়ের দাগ বদলাতে পারে না, কোনও ইথিয়োপীয়ান ব্যক্তিও তা পারেন না, একটু খতিয়ে দেখলে আমাদের শৌখিন প্রকৃতিবিদকে জানানো যায় যে, সাপ দুটি কাজই পারে এবং এ কাজ সে করে অভ্যাসবশত। সন্দেহ নেই যে, সাপের কাছেও অবশ্য কাজটি বিসদৃশ ও অস্বস্তিকর। সাময়িকভাবে সে শক্তিহীন হয়ে পড়ে এবং বিপজ্জনকভাবে শত্রুদের দয়ার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু যদি যে চিল ও কাকের হাত থেকে এই পরিবর্তনের সময় রক্ষা পায়, তখন সে তার স্বাস্থ্যই পুনরুদ্ধার করে না, নতুন যৌবনও লাভ করে। তুর্কিদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা এই রকমের এবং 'খোলস পরিহাররত সাপ' হল তার বর্ণহীন অবস্থার বর্ণনায় অধিকতর উপযোগী তুলনা'।

এই দিক থেকে দেখলে, তুরস্কের সম্পদহানি তার অস্বাভাবিক মাংসপিণ্ডের পরিহার ও নতুন খোলস লাভ মাত্র। তুরস্ক নিশ্চিত ভাবে সমজাতীয় এক দেশ এবং তার অভ্যন্তর থেকে বিচ্ছিন্নতার কোনও ভীতি নেই।

হিন্দুস্থানে মুসলমান এলাকাগুলি বাড়তি আঁচিলের মত এবং তাদের কাছে হিন্দুস্তানও তাই। সবাইকে একত্রে বাঁধলে ভারত এশিয়ার রুগ্ণ মানুষ হয়ে উঠবে। উভয়ে সুসংহত হলে ভারত হয়ে উঠবে একটি মিশ্র জাতি। ভারতের অংশ বিশেষ বিচ্ছিন্ন করার বদ্‌গুণ যদি পাকিস্তান প্রস্তাবের থাকে, তবে এর মধ্যে বিবাদের স্থলে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার সদ্‌গুণও আছে।

দুই ভাগে বিভক্ত হলে প্রত্যেকেই সমজাতীয় হয়ে উঠবে। দুটি অংশের সমরূপভাব খুবই স্পষ্ট। প্রত্যেকের-ই এক সাংস্কৃতিক ঐক্য বর্তমান। প্রত্যেকেরই আছে ধর্মীয় একতা। পাকিস্তানের ভাষাগত ঐক্য বিদ্যমান। ভারতের যদি এমন ঐক্য নাও থাকে, তবু কোনও বিতর্ক ছাড়াই সে ঐক্যস্থাপন সম্ভব— সাধারণ ভাষা হিন্দুস্তানি, হিন্দি বা উর্দু যা-ই হোক। বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রত্যেকেই শক্তিশালী ও সুসংবদ্ধ হতে পারবে। ভারতের প্রয়োজন এক সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় সরকারের। কেন্দ্রশাসিত সরকারের কাঠামো যা 'ভারত শাসন আইন ১৯৩৫'এ বিধৃত আছে, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এই আইনের বলে গঠিত কেন্দ্রীয় সরকার হল এমন এক জীর্ণ নড়বড়ে জিনিস যার প্রাণ আছে বলে মনে হয় না। আমরা আগেই বলেছি যে, কেন্দ্রীয় সরকার চরিত্র ও গঠনগত দিক থেকে প্রধানত হিন্দু হতে বাধ্য— এই যুক্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীন থাকতে চায় এমন মুসলমান প্রদেশগুলিকে শান্ত করার ইচ্ছা হলেই কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হয়ে পড়বে। পাকিস্তানের জন্ম হলে এইসব বিবেচনাগুলি গুরুত্ব হারাবে। হিন্দুস্তানে তখন এটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার এবং সমজাতীয় জনসংখ্যা হবে, যা কোনও রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের প্রয়োজনীয় উপাদান; আর এগুলির কোনওটিই অর্জিত হবে না যদি হিন্দুস্থান থেকে পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন না হয়।

অংশ-IV

পাকিস্তান ও অসুস্থ পরিবেশ

হিন্দু-মুসলমান সমস্যার দুটি দিক আছে। প্রথম দিকটিতে যে সমস্যা নিজেকে হাজির করে, তা হচ্ছে পরস্পর মুখোমুখি পৃথক দুটি সম্প্রদায় নিজেদের অধিকার ও সুবিধা নিয়ে বুঝাপড়া করতে চায়। অন্য দিকটিতে, বিচ্ছেদ ও সংঘর্ষ পরস্পরের ওপর প্রতিক্রিয়াজনিত যে প্রভাব ফেলে সেই সমস্যাটি রয়েছে। পরবর্তী আলোচনায়, হিন্দু মুসলমান সমস্যার প্রথম দিকটি সম্পর্কে পাকিস্তান বিষয়ক কর্মসূচীটি পরীক্ষা করেছি। সমস্যার দ্বিতীয় দিকটি সম্পর্কে, পাকিস্তান কর্মসূচীটি আমরা পরীক্ষা করি নি। তবুও, এ ধরণের পরীক্ষা প্রয়োজন, কারণ হিন্দু-মুসলমান সমস্যার ঐ দিকটিও গুরুত্বহীন নয়। তাদের দাবিগুলি নিয়ে বুঝাপড়ার আলোচনাকেই মেনে যাওয়াটা অসম্পূর্ণ না হলেও অত্যন্ত ভাসা ভাসা একটা দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। তাদের ভাগ্য যে এক সূতাতে বাঁধা এটা উপেক্ষা করা যায় না। এ কারণে তারা পছন্দ করুক বা না করুক, তাদের এক অভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নিতে হবে। আর এই অভিন্ন কার্যক্রমে তারা যদি দুটি যুযুধান পক্ষ হিসাবে পরস্পরের মুখোমুখি হয়, তবে তাদের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমীক্ষাযোগ্য, কারণ সেগুলি (ঐ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া) পরস্পরকে প্রভাবিত করে এবং একটা অবস্থার সৃষ্টি করে যেখানে অসুস্থতা এড়ানোর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। পরিস্থিতি সমীক্ষা করলে দেখা যায়, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াগুলি এক অসুস্থতার জন্ম দিয়েছে, যা তিনভাবে নিজেকে প্রকট করেছে : (১) সামাজিক নিশ্চল অবস্থা, (২) সাম্প্রদায়িক আগ্রাসন, ও (৩) রাজনৈতিক ভাগ্য সম্পর্কে জাতীয় হতাশা। এই অসুস্থতা গুরুতর। পাকিস্তান কি এই অসুস্থতার প্রতিকার ? না, তা অসুস্থতাকে আরও তীব্র করবে? পরবর্তী অধ্যায় সমূহে এই প্রশ্নগুলি বিবেচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় ১০

সামাজিক অচলায়তন

১

যে সব সামাজিক কু-প্রথা হিন্দু সমাজের বৈশিষ্ট্য, সেগুলি সুবিদিত। মিস্ মেয়ো-র 'মাদার ইন্ডিয়া' প্রকাশিত হওয়ার পর এই কু-প্রথাগুলি সম্পর্কে ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে অবহিত করেছে। 'মাদার ইন্ডিয়া' এই কু-প্রথাগুলিকে প্রকাশ্যে আনা এবং সেগুলির প্রণেতাদের তাঁদের পাপের জবাবদিহি করার জন্য বিশ্ব আদালতে দাঁড় করানোর উদ্দেশ্য অর্জন করেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব জুড়ে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে একটা ভুল ধারণাও তৈরি করেছে। সেই ধারণা হচ্ছে, হিন্দুরা রক্ষণশীল ও সামাজিক কু-প্রথার কর্দমে নিজেদের হীন প্রতিপন্ন করছে। অন্যদিকে, ভারতে মুসলমানরা এইসব কু-প্রথা থেকে যুক্ত এবং হিন্দুদের তুলনায় প্রগতিশীল। কিন্তু ভারতে মুসলমান সমাজকে যারা খুব কাছ থেকে জানেন, তাঁদের কাছে এই ধারণা প্রচলিত থাকবে, এটা বিস্ময়কর।

কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন, কোন সামাজিক কু-প্রথা আছে, যা হিন্দুদের মধ্যে দেখা যায়, মুসলমানদের মধ্যে যায় না?

বাল্য বিবাহের কথা ধরা যাক। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন গঠিত 'বাল্য বিবাহ বিরোধী সমিতি'র সচিব একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বাল্য বিবাহের কু-প্রথা কতটা ব্যাপক তা এতে দেওয়া আছে। ১৯৩১ এর আদমশুমার প্রতিবেদন থেকে পাওয়া পরিসংখ্যান সারণি নিম্নরূপ —

১৫ বছরের অনুর্দ্ধ মহিলাদের প্রতি হাজারে বিবাহিতার সংখ্যা

	হিন্দু	মুসলমান	জৈন	শিখ	খ্রিস্টান
১৮৮১	২০৮	১৫৩	১৮৯	১৭০	৩৩
১৮৯১	১৯৩	১৪১	১৭২	১৪৩	৩৭
১৯০১	১৮৬	১৩১	১৬৪	১০১	৩৮
১৯১১	১৮৪	১২৩	১৩০	৮৮	৩৯
১৯২১	১৭০	১১১	১১৭	৭২	৩২
১৯৩১	১৯৯	১৮৬	১২৫	৮০	৪৩

বাল্য বিবাহের নিরিখে মুসলমানদের মধ্যে অবস্থাকে কি হিন্দুদের তুলনায় ভালো বলে বিবেচনা করা যায়?

মহিলাদের অবস্থার কথা ধরা যাক। মুসলমানরা জোর দিয়ে বলেন, মুসলমান মহিলাদের যে আইনগত অধিকার দেওয়া হয়, তা তাঁদের জন্য প্রাচ্য মহিলা, যেমন হিন্দু মহিলাদের তুলনায় অধিকতর স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করে এবং এই আইনগত অধিকারগুলি কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশের মহিলাদের যে অধিকার দেওয়া হয় তার চেয়েও বেশি। মুসলমান আইনে কয়েকটি সংস্থানের ওপর নির্ভরও করা হয়।

প্রথমত, বলা হয় যে মুসলমান আইন, মহিলাদের বিয়ের জন্য কোনও বয়স নির্দিষ্ট করে না এবং যে কোনও একটি বালিকার বিয়ের অধিকারকে স্বীকার করে। পিতা বা পিতামহ বিবাহ সম্পন্ন না করলে বাল্যাবস্থায় বিবাহিত কোনও মুসলমান বালিকা বয়ঃসন্ধি অর্জনের পর সেই বিয়ে অস্বীকার করার ক্ষমতা বা অধিকার রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের মধ্যে বিয়ে একটি চুক্তি হিসাবে প্রচলিত। বিয়ে একটি চুক্তি হলে স্বামীর তাঁর স্ত্রী এর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার আছে। মুসলমান আইনে স্ত্রীর জন্য পর্যাপ্ত রক্ষাকবচের সংস্থান রয়েছে। সেগুলির সুযোগ নেওয়া হলে বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে একজন মুসলমান মহিলা তাঁর স্বামীর মতই সমান অবস্থায় থাকেন। কারণ, এটা দাবি করা হয়, মুসলমান আইনে একজন স্ত্রী বিয়ের সময় অথবা কয়েকটি ক্ষেত্রে, এমন কি তারও পরে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন, যার দ্বারা কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি বিবাহ বিচ্ছেদ পেতে পারেন।

তৃতীয়ত, মুসলমান আইন অনুযায়ী, এক মহিলা নিজেকে সমর্পণের বিনিময়ে তার স্বামীর কাছ থেকে কিছু পরিমাণ অর্থ বা অন্যান্য সম্পত্তি দাবি করতে পারে। একে বলা হয় স্ত্রী ধন। এমন কী বিয়ের পরেও স্ত্রী-ধনের পরিমাণ স্থির হতে পারে এবং যদি কোনও পরিমাণ স্থির করা নাও হয়, স্ত্রী উপযুক্ত স্ত্রী-ধন পাওয়ার অধিকারী। স্ত্রী-ধনকে সাধারণত দু ভাগে ভাগ করা হয়, একাংশকে বলা হয়, "তাৎক্ষণিক", যা দাবি করা মাত্র দেয় এবং অন্য অংশকে বলা হয় "বিলম্বিত", যা মৃত্যু বা বিবাহ বিচ্ছেদের দরুন, বিবাহ ভঙ্গের ক্ষেত্রে প্রদেয়। স্ত্রী-ধনের জন্য মহিলার দাবিকে তার স্বামীর ভূসম্পত্তি বিনিময়ে দেওয়া ঋণ হিসাবে গণ্য করা হয়। স্ত্রী-ধনের ওপর তার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে, এর উদ্দেশ্য তাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়া। সে তার খুশিমতো এই স্ত্রী-ধন ছেড়ে দিতে পারে অথবা তার থেকে আয় পেতে পারে।

আইনের এই সমস্ত সংস্থান তার অনুকূলে এটা ধরে নিলেও মুসলমান রমণী পৃথিবীতে সবচেয়ে অসহায় ব্যক্তি। এক মিশরীয় মুসলমান নেতার কথায় —

'তার (মুসলিম রমণী) ওপর ইসলাম নিকৃষ্টতার শীলমোহর লাগিয়ে দিয়েছে। যে সামাজিক প্রথা তাকে নিজেকে প্রকাশ বা ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে, তার প্রতি ধর্মীয় অনুমোদন রয়েছে'।

কোনও মুসলমান বালিকার-ই তার বিয়েকে অস্বীকার করার সাহস নেই, যদিও সে শিশু ছিল এবং তার মাতা-পিতা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি এই বিয়ে সংঘটিত করেছে, এই যুক্তিতে ঐ বিবাহ অস্বীকার করার অবকাশ তার থাকতে পারে। কোনও মুসলমান পত্নীই তার বিবাহ সংক্রান্ত চুক্তিতে তার জন্য বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার সংরক্ষিত রেখে একটি ধারার সন্নিবেশকে সঙ্গত বলে মনে করবে না। সেক্ষেত্রে, তার ভাগ্যে যা আছে তা হলো, "একদা বিবাহিতা, সর্বদা বিবাহিতা"। বিবাহের বন্ধন যতই পীড়াদায়ক হোক না কেন, তা সে এড়িয়ে যেতে পারে না। যেখানে সে বিয়েকে অস্বীকার করতে পারে না, তার স্বামী কোনও কারণ না দেখিয়েই তা সর্বদা করতে পারে। "তালাক" শব্দটি উচ্চারণ কর ও তিন সপ্তাহের জন্য আত্মসংযম পালন কর, তা হলেই মহিলাটি স্বামী পরিত্যক্তা। তার স্বামীর মর্জির ওপর একমাত্র লাগাম হচ্ছে, স্ত্রী-ধন প্রদানে দায়বদ্ধতা। সেই স্ত্রী-ধনের ওপর অধিকার যদি মহিলা ইতিমধ্যেই ছেড়ে দিয়ে থাকে তাহলে তার স্বামীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার তার খেয়ালের ব্যাপার।

বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে, কার্য, চিন্তা বা মতের এই স্বাধীনতা এক মহিলার পূর্ণ, স্বাধীন ও সুখী জীবনের পক্ষে যে নিরাপত্তার ভাব, এত মৌল-তাকেই ধ্বংস করে। একজন মুসলমান মহিলা জীবনের যে নিরাপত্তাহীনতার অধীন তা অনেকটাই বেড়ে যায় মুসলমান আইন স্বামীকে একাধিক বিবাহ ও বিবাহ ছাড়াই মহিলার সঙ্গে বৈবাহিক আচরণ (concubinage) রাখার যে অধিকার দেয় তার দরুন। মুসলমান আইন এক-ই সময়ে একজন মুসলমানকে চারজন মহিলাকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়। প্রায়ই এটা বলা হয়ে থাকে, কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে একজন হিন্দুর কতজন স্ত্রী থাকবে, তার ওপর হিন্দু আইন কোন নিয়ন্ত্রণ রাখে না। সেই কারণে তার তুলনায় মুসলমান আইন উন্নততর। কিন্তু এটা ভুলে যাওয়া হয় যে চারজন বৈধ পত্নী ছাড়াও মুসলমান আইন একজন মুসলমানকে তার ক্রীতদাসীদের সঙ্গে সহবাসের অনুমতি দেয়। ক্রীতদাসীদের ক্ষেত্রে, তাদের সংখ্যা কত হবে, সে বিষয়ে

কিছু বলা নেই। কোন রকম বিধি নিষেধ ছাড়াই একজন মুসলমান ক্রীতদাসীদের পেতে পারে এবং তাদের বিয়ে করার কোনও দায়বদ্ধতাও নেই। যত কথাই বলা হোক না কেন, বহু বিবাহ ও উপপত্নী রাখার গুরুতর ও বহুক্ষতিকর দিকগুলি এবং বিশেষ করে একজন মুসলমান মহিলার পক্ষে সেটা যে তার দুঃখ কষ্টের কতটা কারণ তা বর্ণনা করা যায় না। এটা সত্যি যে বহু বিবাহ ও উপপত্নী রাখা অনুমোদিত বলেই এটা ধরে নেওয়া ঠিক নয় যে মুসলমানরা সাধারণভাবে এসব কু-প্রথাকে প্রশয় দেন। তবুও একটা কথা থেকেই যায়, একজন মুসলমানের পক্ষে তার পত্নীকে দুঃখ কষ্টের মধ্যে ফেলে ও সুখ থেকে বঞ্চিত করে এই সব অধিকার অপপ্রয়োগ করা সহজ।

মি. জন জে পুল যিনি ইসলামের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন নন, তিনিও লক্ষ্য করেছেন[১] —

'বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে এই স্বাধীনতার সুযোগ খুব ভালোভাবে অনেক মুসলমানের-ই নেই। স্টোবার্ট তাঁর বই, 'ইসলাম ও তার প্রবক্তা' গ্রন্থে এই বিষয়ে মন্তব্য করে বলেছেন, ''কয়েকজন মুসলমান ক্রমাগত তাদের স্ত্রীদের পরিবর্তন করাকে একটা অভ্যাসে পরিণত করেন। ২০-৩০ জন পত্নী রয়েছেন, প্রতি তিনমাসে একটি করে নতুন স্ত্রী হচ্ছে, এমন যুবকদের কথা আমরা পড়ে থাকি। আর এইভাবে চলে আসছে মহিলাদের অনির্দিষ্ট কালের জন্য এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে হস্তান্তরিত হওয়া, যেখানে, সেখানে একজন স্বামী ও একটি বাসস্থান গ্রহণ করতে তারা দায়বদ্ধ থাকে অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ তাদের দীন অবস্থার মধ্যে যদি ফেলে, তবে জীবন ধারণের জন্য আরও হীন উপায় তাদের অবলম্বন করতে হয়। এই ভাবে আইনকে অক্ষরে অক্ষরে কঠোর ভাবে বজায় রেখে শুধু একজন, অথবা নিশ্চিত ভাবে অনধিক চারজন পত্নীকে অধিকার করে অসচ্চরিত্র ব্যক্তি বিবাহ বিচ্ছেদের মাধ্যমে তাদের জীবদ্দশায় যত খুশি সংখ্যক পত্নী পেতে পারে'।'

'আরও একভাবেও একজন মুসলমান বাস্তবে চার এর বেশি পত্নী রাখতে পারে এবং তার পরেও আইনের মধ্যে থাকতে পারে। এটা করা যায় উপপত্নীদের সঙ্গে বাস করে, কুরআন স্পষ্টভাবে তা অনুমোদন করেছে। চার পত্নী রাখা অনুমোদন করে এ সংক্রান্ত সুরায় (Sura) এই শব্দগুলি যুক্ত হয়েছে, 'ক্রীতদাসীদের মধ্যে

১. Studies in Mahomedamism; পৃষ্ঠা : ৩৪-৩৫।

যাদের তুমি অধিকার করবে''। তারপর ৭০ সুরায় এটা বলা হয়েছে যে, ক্রীতদাসীদের সঙ্গে বাস করা কোনও পাপ নয়। তাদের দক্ষিণ হস্ত যে 'ক্রীতদাসীদের অধিকার করে তাদের ব্যাপারে তারা নির্দোষ থাকবে।' অতীত দিনের মতো বর্তমান সময়েও বহু সংখ্যক মুসলমান গৃহে ক্রীতদাসীদের দেখা যায়। ম্যুর তাঁর "Life of Mahomed"—এ বলেছেন, 'মহিলা ক্রীতদাসদের সঙ্গে বাস করার অসীম অনুমতি যতদিন অব্যাহত থাকবে, মুসলমান দেশগুলিতে ক্রীতদাস প্রথা বন্ধ করতে কোনও আন্তরিক প্রয়াস চালানোর আশা ততদিন করা যায় না। এই ভাবে ক্রীতদাস প্রথা রদ করার ব্যাপারে কুরআন মানবতার শত্রু। আর মহিলারা স্বাভাবিক ভাবেই অধিকতর দুঃখভোগী।

জাতি বা বর্ণ ব্যবস্থার কথা ধরা যাক। ইসলাম সৌভ্রাতৃত্বের কথা বলে। প্রত্যেকেই অনুমান করে, ইসলাম অবশ্যই ক্রীতদাস ও জাত প্রথা থেকে মুক্ত হবে। ক্রীতদাস প্রথা সর্ম্পকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। এটা এখন আইনের সাহায্যে বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু যখন এটা ছিল তাঁরপক্ষে বেশির ভাগ সমর্থনই এসেছিল ইসলাম ও ঐস্লামিক দেশ থেকে।[১] ক্রীতদাসদের প্রতি ন্যায়োচিত ও মানবিক ব্যবহার সর্ম্পকে কুরআন বিধৃত পয়গম্বরের নির্দেশাবলী প্রশংসণীয়। কিন্তু এই অভিশাপের বিলোপ কে সমর্থন করবে এমন কিছুই ইসলামে নেই। স্যার ডব্লু ম্যুর যথার্থই বলেছেন : '.....বরং হাল্কা করার বদলে তিনি শৃঙ্খলকে শক্ত করেছেন। ....নিজের ক্রীতদাসদের মুক্ত করার ব্যাপারে কোনও মুসলমানের দায়বদ্ধতা নেই। ' কিন্তু ক্রীতদাস প্রথা যদি চলে গিয়ে থাকে মুসলমানদের মধ্যে জাত ব্যবস্থা রয়েই গেছে। উদাহরণ স্বরূপ বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যে অবস্থা বর্তমান তার কথা ধরা যেতে পারে। বাংলা প্রদেশের ১৯০১ সালের আদমশুমার অধীক্ষক বাংলার মুসলমানদের সম্পর্কে যে কৌতূহলজনক তথ্য নথিভূক্ত করেছেন তা নিম্নরূপ :—

'মুসলমানদের শেখ, সৈয়দ, মুঘল ও পাঠান-চিরাচরিত ভাবে এই চারটি গোষ্ঠীতে বিভাজন, বাংলা প্রদেশের ক্ষেত্রে খুব সামান্যই প্রযোজ্য। মুসলমানরা নিজেরা দুটি প্রধান সামাজিক বিভাগকে স্বীকার করে। (১) আশ্‌রাফ অথবা শরাফ এবং (২) আজলাফ্। আশরাফ্ বা শরাফ বলতে বুঝায় মহৎ এবং এর মধ্যে রয়েছে বিদেশি ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সন্দেহাতীত ভাবে বংশোদ্ভূত ব্যক্তি। বিশেষ বৃত্তিজীবি গোষ্ঠী ও নিম্নপর্যায় থেকে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিসহ

১. Studies in Mahomedamism, অধ্যায় XXXIX.

অন্য সব মুসলমান-ই এক অবজ্ঞাসূচক শব্দ আজলাফ্ বলে পরিচিত। আজলাফ্ মানে, অর্ধম বা হীন ব্যক্তি। তাদের কামিনা বা ইত্র, নীচ বা রসিল এবং রিজাল বা অপদার্থ, বলেও ডাকা হয়। কোনও কোনও জায়গায় আবদাল বা অধমতম বলে তৃতীয় একটি শ্রেণী সংযোজিত হয়। অন্য কোনও মুসলমান এদের সঙ্গে মিশে না। তাদের মসজিদে প্রবেশ, অথবা সাধারণের কবরস্থান ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

'এই সব গোষ্ঠীর মধ্যেও, হিন্দুদের মধ্যে যেমন দেখা যায়, একেবারে সেই ধরণেরই সামাজিক অগ্রাধিকার ভিত্তিক জাত রয়েছে।

(i) আশরাফ অথবা উন্নত শ্রেণীর মুসলমান

(১) সৈয়দ

(২) শেখ

(৩) পাঠান

(৪) মোগল

(৫) মালিক

(৬) মির্জা

(ii) আজলাফ অথবা নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান

(১) কৃষিজীবি শেখ, এবং অন্যরা যারা গোড়ার হিন্দু ছিল কিন্তু কোনও পেশা জীবী গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে না এবং যারা আশরাফ সম্প্রদায়ে প্রবেশাধিকার পায় নি যেমন 'পিরালি' ও 'ঠাকরাই।

(২) দর্জি, গোলা, ফকির ও রংগ্রেজ

(৩) বারহি, ভাতিয়ারা, চিক, চুরিহার, দাই, ধাওয়া, ধুনিয়া, গড্ডি, গালাল, কমাই, কুলা-কুঞ্জারা, লাহেরি, মাহিফেয়ুশ, মাল্লা, নুলিয়া, নিকারি,

(৪) আফদল, বাখো, বেদিয়া, ভাট, চাম্বা, দাকালি, ধোবি, হাজ্জাম, মুচি, নগচি, নাট, পানওয়রিয়া, মাদারিয়া, তুন্তিয়া।

(iii) আরজল বা অধস্তন শ্রেণীর মুসলমান

ভঞ্জার, হালালখোর, হিজরা, কস্‌বি, লালবেগি, মাংটা, মেহতর।

আদমশুমার অধীক্ষক মুসলমান সামাজিক ব্যবস্থার আরও একটি বৈশিষ্ট্যের কথাও উল্লেখ করেছেন। সেটি হচ্ছে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলন। তিনি জানিয়েছেন,

'পঞ্চায়েত কতৃত্ব বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারের মতো সামাজিক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও প্রসারিত। অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহকে শাসক বা নিয়ন্ত্রক সংস্থা একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য করে, ফলে এইসব গোষ্ঠী প্রায়শই হিন্দু বর্ণগুলির মতোই কঠোর ভাবে স্ববর্ণ বিবাহ প্রচলিত। অসবর্ণ বিবাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা উচ্চতর ও নিম্নতর উভয় জাতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন, একজন ধুমা, ধুমা ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারে না। এই নিয়ম যদি লঙ্ঘিত হয়, তবে নিয়ম লঙ্ঘনকারীকে তৎক্ষণাৎ পঞ্চায়েতের কোপে পড়তে হয় এবং এক অবমাননাকর পরিস্থিতির মধ্যে নিজের সম্প্রদায় থেকে উচ্ছেদ হতে হয়। এরকম গোষ্ঠীর কোনও সদস্য সাধারণত অন্য কোনও গোষ্ঠীতে প্রবেশ করতে পারে না। এবং নিজের বিশেষ পেশা ছেড়ে দিলেও এবং অন্য জীবিকা গ্রহণ কালেও যে সম্প্রদায়ে তাঁর জন্ম, সেই সম্প্রদায়ের নামেই তার পরিচিতি থেকে যায়। হাজার হাজার জোলা, কসাই এর কাজ করে তবুও তারা জোলা হিসাবেই পরিচিত।'

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আদমশুমার প্রতিবেদন থেকেও অনুরূপ তথ্যাদি সংগ্রহ করা যেতে পারে। যারা আগ্রহী তারা সেগুলি দেখতে পারেন। তবে বাংলার তথ্য এটা দেখানোর পক্ষে যথেষ্ট যে, মুসলমানরা শুধু জাতপাত প্রথা নয়, অস্পৃশ্যতাকেও মেনে চলে।

অতএব, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ভারতে মুসলমান সমাজ হিন্দু সমাজের মতোই সামাজিক কু-প্রথায় দীর্ণ। বস্তুতঃ হিন্দুদের সব সামাজিক কু-প্রথাই মুসলমানদের রয়েছে এবং তার সঙ্গে আরও বেশি কিছু রয়েছে এই আরও বেশি কিছুর মধ্যে রয়েছে মুসলমান মহিলাদের জন্য বাধ্যতামূলক পর্দা প্রথা।

পর্দা ব্যবস্থার ফলে মুসলমান মহিলাদের পৃথক রাখার একটি ব্যবস্থা এসেছে। মহিলাদের বাইরের ঘরে, বারান্দায় বা বাগানে আসাটা কাম্য নয়। তাদের থাকার ঘরগুলিও বাড়ির পিছন দিকে। মুসলমান মহিলাদের যুবতী, বৃদ্ধা, সকলে এক-ই কক্ষে আটক থাকেন। তাদের উপস্থিতিতে কোনও পুরুষ ভৃত্য কাজ করতে পারে না। একজন মহিলাকে শুধু তার পুত্র, ভ্রাতা, পিতা, পিতৃব্য ও মাতুলস্থানীয় আত্মীয় এবং স্বামী অথবা বিশ্বাসযোগ্য বলে গণ্য এমন কোনও নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়। এমনকি প্রার্থনার জন্য তিনি মসজিদেও যেতে পারে না। এবং বাইরে বেরোতে হলে তাকে অবশ্যই বোরখা পরতে হবে। ভারতে সবচেয়ে বিকট যে দৃশ্যগুলি দেখা যায়, তার একটি হচ্ছে বোরখা পরিহিতা মহিলার রাস্তা দিয়ে যাওয়া। এ ধরণের পৃথকীকরণ মুসলমান মহিলাদের শারীরিক গঠনের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব না ফেলে পারে না। এরা সাধারণত রক্তাল্পতা, যক্ষা, পায়োরিয়ার

শিকার। তাঁদের শরীরে বিকৃতি দেখা দেয় এবং পিঠ কুঁজো হয়ে যায়। হাড় বেড়ে বেঁকে যায় এবং হাত পাও বাঁকতে থাকে। পাঁজর, সন্ধি এবং প্রায় সব হাড়েই ব্যথা করতে থাকে। তাদের মধ্যে বুক ধড়ফড়ানি প্রায়-ই দেখা দেয়। বস্তিতে বা শরীরের নিম্নাংশে বিকৃতির ফলে প্রসবের সময় তাদের অকাল মৃত্যু ঘটে। পর্দা মুসলমান মহিলাদের মানসিক ও নৈতিক পুষ্টি থেকে বঞ্চিত করে। স্বাস্থ্যকর সামাজিক জীবন থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তাদের মধ্যে নৈতিক অধঃপতনের প্রক্রিয়া শুরু হতে বাধ্য এবং তা শুরু হয়ও। বহিঃজগৎ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা পরিবারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলহে নিজেদের মনকে নিয়োজিত করে। ফলে তারা সঙ্কীর্ণ ও অত্যন্ত সীমিত দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ হয়ে ওঠে।

অন্যান্য সম্প্রদায়ে তাদের বোনেদের তুলনায় তারা পিছিয়ে পড়ে। ঘরের বাইরে কোনও কাজে অংশ নিতে পারে না এবং ক্রীতদাস মনেবৃত্তি ও হীনমন্যতা জনিত জটিলতায় তারা নিজেদের ভারেই নিজেরা নুয়ে পড়ে। বাড়ির চার দেওয়ালের বাইরে কৌতূহলি না হবার শিক্ষা তাদের দেওয়া হয়েছে। তাই জ্ঞানার্জনে তাদের কোনও আগ্রহ নেই। পর্দানসীন মহিলারা বিশেষ ভাবে অসহায়, ভীরু এবং যে কোনও জীবন সংগ্রামের অনুপযুক্ত। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে পর্দানসীন মহিলাদের বিপুল সংখ্যা বিবেচনা করলে পর্দা প্রথাজনিত সমস্যার ব্যাপকতা গভীরতা একজন সহজেই বুঝতে পারবেন।[১]

নৈতিকতার ওপর পর্দা প্রথার যে প্রভাব পড়ে, এই প্রসার শারীরিক ও বৌদ্ধিক প্রভাবের সঙ্গে তার কোনও তুলনাই চলে না। নারী ও পুরুষের নৈতিকতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। পর্দা প্রথার কারণে নিজের বাড়ির মহিলা ছাড়া বাইরের কোনও মহিলার সঙ্গে একজন মুসলমানের সম্পর্ক থাকে না। বাড়ির মহিলাদের সঙ্গেও তার সম্পর্ক মাঝে মধ্যে কথাবার্তার মধ্যেই সীমিত। তাই শিশু বা বয়স্ক ছাড়া অন্য কোনও মহিলার সঙ্গ পাওয়া বা তার সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ একজন পুরুষের নেই। মহিলাদের থেকে পুরুষদের এই ভাবে আলাদা করে দেওয়াটা পুরুষদের নৈতিকতার ওপর নিশ্চিত ভাবেই কু-প্রভাব ফেলে। যে সামাজিক ব্যবস্থা নারী পুরুষের মধ্যে সব সংস্পর্শ ছিন্ন করে দেয় তা যে যৌন বাড়াবাড়ি এবং অস্বাভাবিক ও অন্য অসুস্থ অভ্যাস ও উপায় গ্রহণে এক অস্বাস্থ্যকর প্রবণতার জন্ম পুরুষের মধ্যে দেবে, তা বলে দেওয়ার জন্য মনোবিশ্লেষকের প্রয়োজন নেই। পর্দা প্রথার কুপরিণতি শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মুসলমানদের থেকে হিন্দুদের

---

১. মুসলমান মহিলাদের অবস্থার জন্য শ্যাম কুমার নেহরু সম্পাদিত 'আমাদের জাত' দ্রষ্টব্য।

বিচ্ছিন্নতা যা ভারতে জনজীবনে এক অভিশাপ, তার জন্য এই পর্দা প্রথাও দায়ী। এই যুক্তিকে কষ্ট কল্পিত কারুর মনে হতেই পারে। মুসলমানদের মধ্যে পর্দা প্রথার তুলনায় হিন্দুদের অসামাজিকতাই এই বিচ্ছিন্নতার কারণ। কিন্তু হিন্দুরা যখন বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব নয় কারণ এ ধরণের সম্পর্কের অর্থ এক পক্ষের মহিলাদের সঙ্গে অন্য পক্ষের পুরুষদের সম্পর্ক, তখন তারা ঠিকই বলেন।[১]

এখন নয়, যে দেশের কয়েকটি স্থানে হিন্দুদের কোনও কোনও অংশের মধ্যে পর্দা-প্রথা ও তার কু-পরিণতি দেখা যায় না। তবে যা বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে পর্দা-প্রথার একটা ধর্মীয় অলঙ্ঘণীয়তা রয়েছে, যা হিন্দুদের মধ্যে নেই। হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের মধ্যে পর্দা-প্রথায় মূল আরও গভীরে। ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা ও সামাজিক প্রয়োজনের মধ্যে অনিবার্য সংঘাতের মুখোমুখি হয়েই তার পর্দা-প্রথা অপসারণ সম্ভব। পর্দা-প্রথার সমস্যা তার মূল ছাড়াও মুসলমানদের পক্ষে একটি বাস্তব সমস্যা। হিন্দুদের ক্ষেত্রে এরকমটা নয়। মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই প্রথার বিলোপের চেষ্টার কোন দৃষ্টান্ত নেই।

এই ভাবে ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবন-ই শুধু নয়, রাজনৈতিক জীবনেও এক অচলায়তন বিদ্যমান। রাজনীতির জন্যই রাজনীতিতে আগ্রহ মুসলমানদের নেই। তাদের প্রধান স্বার্থ হচ্ছে ধর্ম। কোনও একটি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে সমর্থনের ব্যাপারে যে শর্তাবলী একটি মুসলমান নির্বাচনী ক্ষেত্র রাখে তার থেকেই এটা সহজে দেখা যাবে। একটি মুসলমান নির্বাচনী ক্ষেত্র প্রার্থীর কর্মসূচী পরীক্ষা করে দেখা কে গুরুত্ব দেয় না। ঐ নির্বাচনী ক্ষেত্রে একজন প্রার্থীর কাছে যা চায়, তা হচ্ছে এই, যে প্রার্থী তাঁর নিজের খরচে মসজিদের পুরোনো বাতিগুলি পাল্টে, নতুন বাতি লাগিয়ে দেবেন। মসজিদে একটি নতুন কার্পেট দেবেন, কারণ পুরোনোটি ছিন্ন। অথবা মসজিদটি সারিয়ে দেবেন, কারণ তা ভগ্নদশা। কোনও কোনও জায়গায় প্রার্থী যদি জোরদার ভোজ দিতে রাজি থাকেন এবং অন্য কয়েকটি

---

১. ইওরোপীয়দের ক্লাবে, ভারতীয়দের প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য, ভারতীয়রা তাদের দোষারোপ করেন। কিন্তু ইওরোপীয়রা নিজের সমর্থনে যে যুক্তি দেখান তা বেশ লক্ষ্যণীয়। ইওরোপীয়রা বলেন, "ক্লাবে আমরা, আমাদের মেয়েদের আনি। তোমরা যদি তোমাদের মেয়েদের ক্লাবে আনতে রাজি থাকো, তোমাদের নেওয়া যেতে পারে। তোমরা যদি তোমাদের মেয়েদের সঙ্গ পাওয়া থেকে আমাদের বঞ্চিত কর, তোমাদের সঙ্গ লাভের জন্য আমাদের মেয়েদের আমরা এগিয়ে দিতে পারি না। সমান সমান ব্যবহারের জন্য তৈরি হও, তারপর আমাদের ক্লাবে প্রবেশাধিকার চাইতে পার।

স্থানে প্রার্থী যদি ভোট কিনতে রাজি থাকেন তা হলে মুসলমান নির্বাচনী ক্ষেত্রের লোকেরা সন্তুষ্টই থাকেন। মুসলমানদের কাছে নির্বাচন হচ্ছে শুধু টাকার ব্যাপার এবং কদাচিৎ সাধারণ উন্নয়ণ বিষয়ক সামাজিক কর্মসূচির ব্যাপার।

মুসলমান রাজনীতি জীবনের বিশুদ্ধ ধর্ম নিরপেক্ষ ধরণগুলির, যেমন, ধনী ও দরিদ্র, পুঁজি ও শ্রম, জমিদার ও প্রজা, পুরোহিত ও অজ্ঞব্যক্তি, যুক্তি ও কুসংস্কারের মধ্যে পার্থক্যের তোয়াক্কা করে না। মুসলমান রাজনীতি মূলত যাজকতন্ত্রী এবং তা শুধু একটা পার্থক্যই স্বীকার করে, তা হচ্ছে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত পার্থক্য। মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনীতিতে জীবনের ধর্ম নিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্যগুলির কোনও স্থান নেই এবং আর যেগুলির স্থান যদি থাকেও তার কারণ সেগুলি অপ্রতিরোধ্য। মুসলমান রাজনীতি জগতের একমাত্র নিয়ন্ত্রক নীতির তারা অধীন, সেই নীতি হচ্ছে ধর্ম।

২

মুসলমানদের মধ্যে এইসব কু-প্রথার অস্তিত্ব যথেষ্টই দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু এইসব কু-প্রথা দূর করতে পারে সেই রকম যথেষ্ট ব্যাপক সংগঠিত সমাজ সংস্কার আন্দোলন ভারতের মুসলমানদের মধ্যে নেই, এই ব্যাপারটি আরও বেশি দুঃখজনক। হিন্দুদেরও সামাজিক কু-প্রথা রয়েছে কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য তাদের ক্ষেত্রে বেশ স্বস্তিদায়ক, তা হচ্ছে, হিন্দুদের মধ্যে কয়েকজন কু-প্রথাগুলি অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই সব প্রথা বিলোপের জন্য সক্রিয়ভবে আন্দোলন করছেন। অন্যদিকে মুসলমানরা এগুলি যে কু-প্রথা তা উপলব্ধি করে না এবং তার ফলে সেগুলি বিলোপের জন্য আন্দোলনও করে না। বস্তুত তারা তাদের প্রচলিত রীতিতে যে কোনও পরিবর্তনের বিরোধিতা করে। উল্লেখযোগ্য, মুসলমান ১৯৩০-এ কেন্দ্রীয় ব্যাবস্থাপক সভায় আনা বাল্য বিবাহ বিলের বিরোধিতা করেছিল। তারা যে প্রতিটি পর্যায়ে বিধেয়কের বিরোধিতা করেছিল, তাই নয়, এটি যখন আইনে পরিণত হ'ল, তারা সেই আইনের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করল। ভাগ্যক্রমে ঐ আইনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আইন অমান্য আন্দোলন বাড়ে নি এর সঙ্গে যুগপৎ কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনে তা ডুবে যায়। কিন্তু এ আন্দোলন সামাজিক সংস্কারের কত জোরালো বিরোধিতা মুসলমানরা করে, তা প্রমাণ করে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, মুসলমানরা কেন সামাজিক সংস্কারের বিরোধী? সাধারণত এর যা উত্তর দেওয়া হয়, তা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে মুসলমানরা একটা প্রগতি

বিরোধী শ্রেণী। এই দৃষ্টিকোন নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রাথমিকভাবে, মুসলমানদের কার্যধারার যে গতি ছিল তার মাত্রা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। সেই গতি ছিল মুসলমানদের বিরাট বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পেছনে। এর পর মুসলমানরা হঠাৎ এক বিস্ময়কর জাড্যাবস্থার বা জড়তার মধ্যে পতিত হল, যে অবস্থা থেকে তারা আর কখনও উঠেছে বলে মনে হয় না। তাদের অবস্থা নিয়ে যারা সমীক্ষা করেছেন, তাঁরা এই জড়তার কারণ নির্দেশ করেছেন। বলা হয়েছে, ইসলাম এক বিশ্ব ধর্ম। সর্ব সময়, এবং সর্বাবস্থায়, সব মানুষের পক্ষে উপযোগী। মুসলমানদের এই মৌল ধারণাই এর কারণ।

একটি মত হচ্ছে : 'মুসলমান, তার ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ততা থেকে এগোয়নি; দ্রুত গতিশীল আধুনিক শক্তি সম্পন্ন এক বিশ্বে সে স্থানু হয়ে থেকেছে। বস্তুত ইসলামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, সব অসভ্য বা অল্প সভ্য জাতি ইসলামের অধীন হয়েছে তাদের তা গতিহীন করে দিয়েছে। এটা স্ফটিকের মতো স্থির, জড়, ও দুর্ভেদ্য। এটা অপরিবর্তনীয়; রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কোনও প্রভাব এর ওপর নেই।

ইসলামের বাইরে কোনও নিরাপত্তা নেই, এর আইনের বাইরে কোন সত্য নেই, এর আধ্যাত্মিক বাণীর বাইরে কোন সুখ নেই, এ-সব শেখানো হওয়ায় একজন মুসলমান নিজের অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থা, ঐস্লামিক চিন্তা ছাড়া অন্য কোনও ধরণের চিন্তা সম্পর্কে ভাবতে অক্ষম। সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, সে পূর্ণতার এক অতুলণীয় উচ্চ মাত্রায় পৌচেছে, প্রকৃত বিশ্বাস, প্রকৃত মতবাদ ও প্রকৃত প্রজ্ঞার সে একমাত্র অধিকারী। সে একাই সত্যের অধিকারী—সংশোধন সাপেক্ষ কোনও আপেক্ষিক সত্য নয়; চরম সত্য।

'বিভিন্ন ধরণের মানুষকে নিয়ে যে বিশ্ব গঠিত, মুসলমানদের ধর্মীয় আইন কার্যত সেই মানুষদের চিন্তা অনুভূতি, ধারণা ও বিচারের ঐক্য শিক্ষা দেয়।'

এটা জোর দিয়ে বলা যায়, এই ঐক্য বা অভিন্নতাকে মারাত্মক। এটা শুধু মুসলমানদের শেখানো হয় না, এক ধরণের অসহিষ্ণু মনোভাব তাদের ওপর এই অভিন্নতাকে চাপিয়ে দেয়। এর অসহিষ্ণুতার তীব্রতা ও হিংস্রতা মুসলমান দুনিয়ার বাইরে অজ্ঞাত। ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে বিরোধ রয়েছে, এরকম সব যৌক্তিক চিন্তাকে অবদমিত করাই এই অসহিষ্ণুতার লক্ষ্য।

রেনান লক্ষ্য করেছেন[১] 'ইসলাম আধ্যাত্মিকতাও পার্থিবতার ঘনিষ্ঠ সম্মেলন;

১. Nationality and other Essays.

এটা একটা নির্দিষ্ট মতের শাসন। মানবসমাজ এ পর্যন্ত যত শৃঙ্খল বহন করেছে সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভারি .... ধর্ম হিসাবে ইসলামের সৌন্দর্য রয়েছে; কিন্তু মানুষের যুক্তির ওপর ঐস্লামিকতা আঘাত হেনেছে। যে সব মনে আলোর দরজা এটা বন্ধ করে দিয়েছে, নিঃসন্দেহে সেইসব মনগুলি তাদের অভ্যন্তরীন সীমাতেই বদ্ধ; কিন্তু এটা স্বাধীন চিন্তাকে নিপীড়িত করেছে, আমি বলব না, অন্যান্য ধর্মের তুলনায় অধিকতর হিংস্রভাবে, কিন্তু অধিকতর কার্যকর ভাবে, সেই নিপীড়ণ চলেছে। যে সব দেশকে ইসলাম জয় করেছে, সেগুলিকে তা মনের যৌক্তিক সংস্কৃতির পক্ষে এক বদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। বস্তুতঃ মুসলমানের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিজ্ঞানের প্রতি ঘৃণা। গবেষণা নিরর্থক, প্রকৃতি বিজ্ঞান চপল, প্রায় অপবিত্র। কারণ ঐসব বিজ্ঞান ভগবানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়াস; ঐতিহাসিক বিজ্ঞান, যা ইসলাম পূর্ব সময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, প্রাচীন অপধর্ম বা প্রচলিত ধর্মবিরোধী মতকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে, এই হচ্ছে মুসলমানের প্রর্বতনা, রেনান উপসংহার টেনেছেন এই বলে, ‘বিজ্ঞান কে সত্য বলে গণ্য করায় ইসলাম সঙ্গতিপূর্ণ কিন্তু এই সঙ্গতিপূর্ণ হওয়াটা একটা বিপদজনক বস্তু। নিজের দুর্ভাগ্যে ইসলাম সফল হয়েছে। বিজ্ঞানকে হত্যা করে তা নিজেকে হত্যা করেছে এবং পৃথিবীতে তা সম্পূর্ণ নিকৃষ্ঠতায় নিন্দিত।’

এই উত্তর স্পষ্ট হলেও সত্য উত্তর হতে পারে না। এটা যদি সত্য উত্তর হয় তা হলে ভারতের বাইরে যে সব মুসলমান দেশে যে আন্দোলন ও আলোড়ন চলছে তা আমরা ব্যাখ্যা করব কি ভাবে? সেখানে অনুসন্ধানের স্পৃহা, পরিবর্তনের মানসিকতা ও সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা সমাজের প্রতিটি অংশ লক্ষ্যণীয়। প্রকৃতপক্ষে তুরস্কে যে সব সামাজিক সংস্কার হয়েছে তার প্রকৃতি সবচেয়ে বৈপ্লবিক। এই দেশগুলির মুসলমানদের চলার পথে ইসলাম যদি বাধা না হয়, ভারতের মুসলমানদের ক্ষেত্রে তা প্রতিবন্ধক হবে কেন? ভারতে মুসলমান সম্প্রদায় সামাজিক ও রাজনৈতিক নিশ্চলতার পেছনে অবশ্যই কোন বিশেষ কারণ রয়েছে।

সেই বিশেষ কারণ কি হতে পারে? আমার মনে হয়, ভারতে মুসলমানরা যে বিশেষ অবস্থায় রয়েছে তার মধ্যেই ভারতীয় মুসলমানদের পরিবর্তনের মানবিকতার অভাবের কারণ খুঁজতে হবে। প্রধানত যে হিন্দু সামাজিক পরিমণ্ডলে ভারতীয় মুসলমানের অবস্থিতি সেই হিন্দু পরিমণ্ডল সর্বদাই নীরবে অথচ নিশ্চিতভাবে তার ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করছে। সে অনুভব করে, এই পরিমণ্ডল তার মুসলমানত্ব হরণ করছে। এই ক্রমিক ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে সে যা কিছু ইসলামিক তার সংরক্ষণের ওপরেই জোর দিতে চায়। এগুলি তার সমাজের পক্ষে সহায়ক

অথবা ক্ষতিকর, সেই বিবেচনার জন্য পরোয়া না করেই। দ্বিতীয়ত ভারতের মুসলমানরা এক হিন্দু প্রধান রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে অবস্থান করছেন।

সে অনুভব করে তাকে অবদমিত করা হবে এবং রাজনৈতিক অবদমন মুসলমানদের একটি দলিত শ্রেণীতে পরিণত করবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে হিন্দুদের দ্বারা পরিপ্লাবিত হওয়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে এই সচেতনতা তার রয়েছে। আমার মনে হয়, সামাজিক সংস্কারের ব্যাপারে ভারতীয় মুসলমানরা যে বাইরের মুসলমানদের তুলনায় পশ্চাদপর এই সচেতনতাই তার প্রধান কারণ। আসন ও পদের জন্য নিরন্তর সংগ্রাম চালানোর জন্যই তাদের শক্তি নিয়োজিত। সামাজিক সংস্কারের ব্যাপারে কোনও সময়, কোনও ভাবনা বা কোনও প্রশ্ন করার অবকাশ তাদের নেই। যদি সেরকম কিছু থাকেও, তা এক আকাঙ্ক্ষার দ্বারা ভারাক্রান্ত। সেই আকাঙ্ক্ষা নিজেদের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটাতে এবং যে কোনও মূল্যে নিজেদের সামাজিক ও ধর্মীয় ঐক্য বজায় রেখে হিন্দু ও হিন্দুত্বের সমস্যার বিরুদ্ধে একটি যৌথ মোর্চা গড়ে তুলতে, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার চাপ থেকে উদ্ভূত।

ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক নিশ্চলতার ব্যাখ্যা এক-ই। মুসলমান রাজনীতিকরা তাদের রাজনীতির ভিত্তি হিসাবে জীবনের ধর্ম নিরপেক্ষ ধরণগুলিকে স্বীকার করেন না, কারণ তাদের কাছে এর অর্থ হিন্দুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেদের সম্প্রদায়কে দুর্বল করা। ধনীদের কাছ থেকে ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য দরিদ্র মুসলমান দরিদ্র হিন্দুদের সঙ্গে যোগ দেবে না। জমিদারের অত্যাচার প্রতিরোধে মুসলমান প্রজারা যোগ দেবে না, হিন্দু প্রজাদের সঙ্গে। পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমের লড়াইতে মুসলমান শ্রমিকেরা হিন্দু শ্রমিকদের সঙ্গে জোট বাঁধবে না। কেন? উত্তরটি সহজ। দরিদ্র মুসলমান দেখে, সে যদি ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের সংগ্রামে যোগ দেয় তাহলে তার লড়াই একজন ধনী মুসলমানের বিরুদ্ধে যেতে পারে। মুসলমান প্রজা অনুভব করে, জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সে যদি যোগ দেয়, একজন মুসলমান জমিদারের বিরুদ্ধে তাকে লড়াই করতে হতে পারে। একজন মুসলমান শ্রমিক অনুভব করে, পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমের আন্দোলনে সে যদি যোগ দেয়, একজন মুসলমান কারখানা মালিকের স্বার্থের ওপর সে আঘাত হানতে পারে। একজন ধনী মুসলমান, একজন মুসলমান জমিদার অথবা একজন মুসলমান কারখান মালিকের স্বার্থের ওপর যে কোনও আঘাত করলে সে মুসলমান সম্প্রদায়ের অনিষ্টই করবে, এ বিষয়ে সে সচেতন। কারণ হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তখন তার সংগ্রাম দুর্বল হয়ে পড়বে।

মুসলমান রাজনীতি কি ভাবে বিকৃত হয়েছে তা ভারতীয় রাজ্যগুলিতে রাজনৈতিক সংস্কারের প্রতি মুসলমান নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা যায়। হিন্দু রাজ্য কাশ্মীরে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রর্বতনের জন্য মুসলমানরা ও তাঁদের নেতারা ব্যাপক আন্দোলন চালিয়েছেন। এক-ই মুসলমান ও তাদের নেতারা অন্যান্য মুসলমান রাজ্যে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রর্বতনের তীব্র বিরোধী। এই অদ্ভুত মনোভাবের কারণ খুব-ই সহজ। সব ব্যাপারেই মুসলমানদের কাছে নির্ণায়ক প্রশ্ন হচ্ছে, কি ভাবে এটা হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের প্রভাবিত করবে। প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার যদি মুসলমানদের সাহায্য করে তার জন্য তারা দাবি জানাবে, সংগ্রাম করবে। কাশ্মীর রাজ্যে শাসক একজন হিন্দু কিন্তু প্রজাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমান। কাশ্মীরে প্রতিনিধিত্ব মূলক সরকারের জন্য মুসলমানরা সংগ্রাম করেছিল, কারণ কাশ্মীরে প্রতিনিধিত্ব মূলক সরকারে অর্থ ছিল একজন হিন্দু রাজার থেকে মুসলিম জনতার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর। অন্যান্য মুসলমান রাজ্যে শাসক একজন মুসলমান, কিন্তু প্রজাদের অধিকাংশ হিন্দু। এরকম রাজ্যগুলিতে প্রতিনিধিত্ব মূলক সরকারের অর্থ একজন মুসলমান শাসকের থেকে হিন্দু জনতার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর। আর এই কারণেই মুসলমানরা একটা ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব মূলক সরকার প্রবর্তনকে সমর্থন করে এবং অন্য ক্ষেত্রে তার বিরোধিতা করে। মুসলমানদের কাছে গণতন্ত্র প্রধান বিবেচ্য নয়। প্রধান বিবেচ্য হচ্ছে, সংখ্যা গরিষ্ঠের শাসনে যে গণতন্ত্র তা হিন্দুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মুসলমানদের ওপর কি প্রভাব ফেলবে, এটা কি তাঁদের শক্তিশালী করবে না দূর্বল করবে? গণতন্ত্র যদি তাদের দুর্বল করে তবে তারা গণতন্ত্রকে গ্রহণ করবে না। তারা বরং চাইবে মুসলমান রাজ্যগুলতিতে একটি জীর্ণাবস্থা চলতে থাকুক কিন্তু হিন্দু প্রজাদের ওপর মুসলমান শাসকের অধিকার যে ক্ষুণ্য না হয়।

মুসলমান সম্প্রদায় রাজনৈতিক ও সামাজিক নিশ্চলতার একটা শুধু একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে। মুসলমানরা ভাবে হিন্দু ও মুসলমানরা বরাবর-ই লড়াই করে যাবে; হিন্দুরা মুসলমানদের ওপর আধিপত্য স্থাপন করতে আর মুসলমানরা শাসক সম্প্রদায় হিসাবে তাদের ঐতিহাসিক অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত করতে। এই সংগ্রামে যে শক্তিশালী, সেই জিতবে আর শক্তি সুনিশ্চিত করতে তারা (মুসলমানরা) অবশ্যই নিজেদের বিভেদ সৃষ্টি করে এমন যে কোন কিছুকে চাপা দেবে অথবা ঠাণ্ডা ঘরে পাঠাবে। অন্যান্য দেশে মুসলমানরা যদি তাদের সমাজ সংস্কারের কাজ হাতে নিয়ে থাকে আর ভারতের মুসলমানরা যদি তা করতে অস্বীকৃত হয়, তবে তার কারণ অন্যান্য দেশের মুসলমানরা যদি তাদের সমাজ সংস্কারের কাজ হাতে নিয়ে থাকে আর ভারতের মুসলমানরা যদি তা করতে অস্বীকৃত হয় তবে তার কারণ অন্যান্য

দেশের মুসলমানরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক সংঘর্ষ থেকে মুক্ত, ভারতের মুসলমানরা তা নয়।

৩

এমন নয় যে সংরক্ষণশীলতার অন্ধ মানসিকতা, যা সামাজিক কাঠামোর সংস্কারের প্রয়োজনকে স্বীকার করে না, শুধু মুসলমানদেরই গ্রাস করেছে। হিন্দুদেরও তা গ্রাস করেছে। একটা সময়ে হিন্দুরা স্বীকার করল যে, সামাজিক দক্ষতা ছাড়া অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে কোনও স্থায়ী প্রগতি অসম্ভব। কু-রীতি প্রথা যে অনিষ্ট করেছে, তার দরুণ হিন্দু সমাজ একটা দক্ষ অবস্থায় নেই এবং এই সব কু-প্রথা বিলোপে নিরন্তর প্রয়াস চালাতে হবে। এই বিষয়টির উপলব্ধির কারণেই জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সামাজিক সম্মেলনের। কংগ্রেস যুক্ত ছিল দেশের রাজনৈতিক সংগঠনে দুর্বল ক্ষেত্রগুলি নিরুপণের কাজে, আর সামাজিক সম্মেলন নিয়োজিত ছিল হিন্দু সামাজের সামাজিক সংগঠনে দুর্বল লক্ষণগুলিকে অপসারণের কাজে। কিছু সময়ের জন্য, কংগ্রেস ও সম্মেলন এক অভিন্ন সংস্থার দুই শাখা হিসাবে কাজ করেছিল এবং এক-ই মণ্ডপে তাদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু শীঘ্রই দুটি শাখা দুটি দলে পরিণত হল একটি 'রাজনৈতিক সংস্কার দল' (Political Reform Party) অন্যটি 'সামাজিক সংস্কার দল' (Social Reform Party) এদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক শুরু হল। রাজনৈতিক সংস্কার দল, জাতীয় কংগ্রেসকে সমর্থন করল, সামাজিক সংস্কার দল সমর্থন করল সামাজিক সম্মেলনকে। দুটি সংস্থা পরিণত হল প্রতিদ্বন্দ্বী দুই শিবিরে। বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, সামাজিক সংস্কার কি রাজনৈতিক সংস্কারের আগে হওয়া উচিত। এক দশক সংশ্লিষ্ট শক্তিগুলি সম্পূর্ণ ভারসাম্যাবস্থায় ছিল এবং কোনও পক্ষের জয় ছাড়াই যুদ্ধ চলেছিল। যাই হোক, এটা স্পষ্ট হল যে, সামাজিক সম্মেলনের সৌভাগ্যে দ্রুত ভাটার টান দেখা যাচ্ছে। সামাজিক সম্মেলনের অধিবেশনগুলিতে সভাপতি মহোদয়গণ আক্ষেপ করেছিলেন যে, শিক্ষিত হিন্দুরা রাজনৈতিক অগ্রগতির সপক্ষে কিন্তু সামাজিক সংস্কার বিষয়ে উদাসীন। কংগ্রেসের অধিবেশনে যাঁরা উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল বেশ বড়, আর যারা উপস্থিত হননি, কিন্তু এর (কংগ্রেসের) প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল আরও বেশি। অন্যদিকে সামাজিক সম্মেলনের অধিবেশনে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যা ছিল অনেক অনেক কম। এই ঔদাসীন্য, সদস্যদের সংখ্যা হ্রাস হওয়ার পর শীঘ্রই দেখা দিল প্রয়াত শ্রী তিলকের মতো রাজনীতিকদের সক্রিয় বিরোধিতা। কালক্রমে, রাজনৈতিক সংস্কারের পক্ষপাতীরা

জয়লাভ করলেন। সামাজিক সম্মেলন বিলীন বিলুপ্ত হল।* এর সঙ্গে অন্তর্হিত হল হিন্দু সমাজ থেকে সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা। শ্রী গান্ধীর নেতৃত্বে হিন্দু সমাজ রাজনৈতিক উন্মাদাগারে পরিণত না হলেও নিঃসন্দেহে রাজনীতির জন্য পাগল হয়ে উঠল। হিন্দুদের মনে সমাজ সংস্কারের জন্য যে স্থান ছিল, তা গ্রহণ করল অসহযোগ, সত্যাগ্রহ আর স্বরাজের দাবি। রাজনৈতিক আন্দোলনের হট্টগোল, হিন্দুরা এমনকি জানেও না কোনও কু-প্রথা দূর করতে হবে কিনা। যাঁরা এ সম্পর্কে সচেতন, তাঁরা বিশ্বাস করেন না সামাজিক সংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কারের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এর গুরুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হলে তাঁরা যুক্তি দেখান যে, প্রথমে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জিত না হলে, কোনও সামাজিক সংস্কার হতে পারে না। রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারে তাঁরা এতটাই আগ্রহী যে, এমকি সামাজিক সংস্কারের সপক্ষে প্রচারের ব্যাপারেও তাঁরা অধৈর্য। কারণ এই প্রচারের অর্থ এতটা সময় শক্তি রাজনৈতিক প্রচার থেকে বাদ পড়বে। এক পথপ্রেরক শ্রী গান্ধীকে জাতীয়তাবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি খুব উপযুক্ত ভাবে যদিও স্থূল ভাষায় জাগিয়েছিলেন।

তিনি শ্রী গান্ধীকে লিখেছিলেন,

'আপনি কি মনে করেন না রাজনৈতিক শক্তিকে জয় করা ছাড়া কোনও মহান সংস্কার অর্জন অসম্ভব? বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হতে হবে? রাজনৈতিক পুনগঠন ছাড়া কোনও পুনগঠন সম্ভব নয় এবং আমার আকাঙ্ক্ষা সরু চাল, মোটা চাল, সুষম খাদ্য এরকম কথাবার্তা শুধু কল্পনা কুসুম'।**

রানাডের নেতৃত্বাধীন সামাজিকসংস্কার দলের মৃত্যু হল, ক্ষেত্র পড়ে রইল কংগ্রেসের জন্য। হিন্দুদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রতিবন্দ্বী আর একটি দল বেড়ে উঠল। এই দলটি হিন্দু মহাসভা। এর নাম থেকে একজন আশা করবেন যে হিন্দু সমাজে সংস্কার সংগঠন করবে এটি এমন এক সংস্থা কিন্তু তা নয়। কংগ্রেসের সঙ্গে রেষারেষিতে এর সামাজিক সংস্কার বনাম রাজনৈতিক সংস্কার, এই প্রশ্নের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। কংগ্রেসের সঙ্গে এর ঝগড়ার মূলে ছিল কংগ্রেসের মুসলমানের প্রতি অনুকূল নীতি। মুসলমান দখলদারির বিরুদ্ধে হিন্দুদের অধিকার সুরক্ষিত করতেই এটি সংগঠিত হয়েছিল। এর পরিকল্পনা হচ্ছে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি যৌথ মোর্চা গড়ে তোলার জন্য হিন্দুদের সংগঠিত করা। হিন্দু অধিকারগুলিকে সুরক্ষার

---

* বিস্তৃত বিবরণের জন্য আমার 'জাতের বিলোপ' দ্রষ্টব্য।

** হরিজন; ১১ই জানুয়ারী, ১৯৩৬

জন্য সংগঠিত সংস্থা হিসাবে এটির সব সময়ই দৃষ্টি ছিল রাজনৈতিক আন্দোলন, আসন পদের ওপর সামাজিক সংস্কারের জন্য চিন্তাভাবনার কোনও অবকাশ এর থাকতে পারে না। সব হিন্দুর এক যৌথ মোর্চা গড়ে তুলতে আগ্রহী এক সংগঠন হিসাবে এটি এর উপাদানগুলির মধ্যে কোনও বিভেদ সৃষ্টি সহ্য করতে পারে না। সামাজিক সংস্কার সাধনে হাত দিলে এমনটাই ঘটত। আপনার হিন্দুদের সংহত করার স্বার্থ, হিন্দু মহাসভা সব সামাজিক কুপ্রথা যেমনন আছে সেইরকমই মেনে নিতে প্রস্তুত। হিন্দুদের সংহতির স্বার্থে, ১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী উদ্ভাবিত মহাসংখ্যক তার বহু বৈষম্য ত্রুটি সত্বেও স্বাগত জানাতে তৈরি। এক-ই উদ্দেশ্যে হিন্দু মহাসভা ভারতীয় রাজ্যগুলিকে তাদের প্রশাসন যেমন আছে সেই ভাবেই বজায় রাখার পক্ষপাতী। এর সভাপতির রণহুঙ্কার হচ্ছে 'হিন্দু রাজ্যগুলি থেকে হাত ওঠাও'। মুসলমানদের মনোভাবের তুলনায় এই মনোভাব আরও বিস্ময়কর। হিন্দু রাজ্য গুলিতে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার হিন্দুদের কোনও ক্ষতি করতে পারে না। তাহলে হিন্দু মহাসভার সভাপতি এর বিরোধী কেন? সম্ভবত তা সাহায্য করে মুসলমানদের, যাদের তিনি সহ্য করতে পারেন না।

৪

তাদের শক্তিগুলিকে সংক্ষিপ্ত করার ভাবনা হিন্দু-মুসলমানদের কতদূর নিয়ে যেতে পারে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুসলিম বিবাহ ভঙ্গ সম্পর্কিত ১৯০৯ সালের VIII আইনের ওপর বিতর্কের চেয়ে আর অন্য কিছুর সাহায্যে তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় না। ১৯৩৯ সালের আগে আইন ছিল, মুসলমান আইনে বিবাহিত একজন পুরুষ বা মহিলার স্বধর্ম ত্যাগ আপনা থেকেই বিবাহ ভঙ্গ করত। ফলে, একজন বিবাহিত মুসলমান মহিলা তার ধর্ম পরিবর্তন করলে, তার নতুন ধর্মাবলম্বী একজনকে বিয়ে করতে পারত। যে কোনো হিসাবে গত ৬০ বছর ধরে সারা ভারতে আদালতের বলবৎ করা আইনের বিধান ছিল এটাই।[১]

১৯৩৯ সালের আইন VIII বলে এই আইন বিলুপ্ত হল। ১৯৩৯-এর আইনের ৪ নম্বর ধারা বলছে :—

'একজন বিবাহিত মুসলমান মহিলার ইসলাম ত্যাগ অথবা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও ধর্ম বিশ্বাসে ধর্মান্তর আপনা থেকে তাঁর বিবাহ ভঙ্গ করবে না।

১. প্রাচীন যে সব সিদ্ধান্তের খবর পাওয়া গেছে, তা হচ্ছে ১৮৭০-এ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উচ্চ ন্যায়ালয়ের জাবারেস্ত বনাম তাঁর স্ত্রীর মামলায় দেওয়া সিদ্ধান্ত।

যদি এরকম ধর্মত্যাগ বা ধর্মান্তরের ৭০ মহিলা ২ নম্বর ধারায় বর্ণিত কোনও একটি কারণে তাঁর বিবাহ ভঙ্গের জন্য হুকুম নামা পাওয়ার অধিকারী হন।

যদি, অধিকন্তু, এই ধারার সংস্থান, অন্য কোনও ধর্ম বিশ্বাস থেকে ইসলামে ধর্মান্তরিত মহিলা যিনি পুনরায় তার আগেকার ধর্ম গ্রহণ করবে, তার ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য হবে না।

এই আইন অনুসারে, একজন বিবাহিত মুসলমান মহিলার বিবাহ, তার অন্য ধর্মে ধর্মান্তরের কারণে ভঙ্গ হয় না। যা তিনি পান তা বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার। এটা খুব গোলমেলে দেখায় যে, ২ নম্বর ধারা, বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হিসাবে ধর্মান্তর বা স্বধর্মত্যাগের উল্লেখ করে না। এই আইনের ফল হচ্ছে, একজন বিবাহিত মুসলমান মহিলার বিবেকের কোনও স্বাধীনতা নেই এবং বরাবরের মতো তিনি তার স্বামীর কাছে বাঁধা, যার ধর্মীয় বিশ্বাস ঐ মহিলার পক্ষে সম্পূর্ণ বিরক্তিকর বা অবজ্ঞেয় হতে পারে।

এই পরিবর্তনের সপক্ষে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে, তা বেশ মনোযোগ দাবী করে। বিধেয়কের উত্থাপক কাজি কাজমি, বিধায়ক, এই পরিবর্তনের সমর্থনে খুব চাতুর্যের সঙ্গে উদ্ভাবিত এক যুক্তির আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। বিধেয়কটি উল্লেখ করতে প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন।[১]

'অন্য যে কোনও ধর্মের মত ইসলামের বিবেচনায় স্বধর্মত্যাগ এক বিরাট অপরাধ, অনেকটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধের মতো। ওই সংস্থান রাখা ইসলাম ধর্মের পক্ষে অভিমত কিছু নয়। যে কোনও জাতির পুরানো আইন যদি আমরা খুঁজে দেখি, আমরা দেখব যে অন্যান্য বিধিতেও একইরকম সংস্থান রয়েছে। পুরুষের ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান রয়েছে, যেমন মৃত্যুদণ্ড। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে শুধু কারাদণ্ডের বিধান-ই রয়েছে। এই প্রধান সংস্থান হচ্ছে যেহেতু এটা ছিল, পাপ, এটা ছিল অপরাধ, এটা ছিল শাস্তিযোগ্য। আর মহিলাকে স্ত্রী হিসাবে তার মর্যাদা লাভে বঞ্চিত হতে হত। সর্বদাই শুধু সে হারাত না, হারাত সমাজের তার সব মর্যাদা; সে তার সম্পত্তি ও নাগরিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত হত। কিন্তু আমরা দেখি যে সর্বপ্রথম ১৮৫০-এ একটি আইন এখানে গৃহীত হল। জাত-ব্যবধান অপসারণ আইন নামে অভিহিত এই আইনটি ছিল ১৮৫০-এর ২১তম আইন।

'এই আইন বলে, স্বধর্মত্যাগের পর এক মহিলার নাগরিক অধিকার হরণের যে

১. বিধান সভার বিতর্ক, ১৯৩৮, খন্ড -V ; ১০৯৮-১১০১

শাস্তি তার ওপর আরোপ করা যেত, তা দূর হয়েছে। আর তাকে কোনও সম্পত্তি বা উত্তরাধিকার বা এরকম কিছু থেকে বঞ্চিত করা যায় না। একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে, আইনসভা তার সাহায্যে এসেছে। তা তাকে কিছু পরিমাণ চিন্তার স্বাধীনতা দিয়েছে, তার পছন্দমত ধর্মাবলম্বনের জন্য একধরণের ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছে এবং যে ধারার জন্য তাকে কষ্ট ভোগ করতে হত সেই বাজেয়াপ্ত সম্পর্কিত ধারা বিলোপ হয়েছে। এটা ছিল তার ধর্ম বিশ্বাস পরিবর্তনের ওপর নিয়ন্ত্রণ। প্রশ্ন হচ্ছে, এর পর স্ত্রী হিসাবে তার মর্যাদার ওপর নিষেধ-বিধি আরোপ অব্যাহত রাখার কতটুকু অধিকার আমাদের আছে! স্ত্রী হিসাবে তার মর্যাদা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ। সে কোনও পরিবারের, তার শিশুসন্তানরা রয়েছে, তার অন্যান্য সম্পর্কও রয়েছে। তার মানসিকতা যদি উদার হয়, সে একই পুরানো ধর্ম আঁকড়ে থাকত না চাইতে পারে। সে যদি তার ধর্ম পরিবর্তন করে, তাহলে কেন আমরা তার ওপর আধুনিক ধারনা মতো আর একটি শাস্তি চাপিয়ে দেব। ঐ শাস্তি হচ্ছে সে আর তার স্বামীর স্ত্রী থাকবে না। আমার নিবেদন, বর্তমান সময়ে যখন আমরা চিন্তার স্বাধীনতা ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে ওকালতি করছি, ওকালতি করছি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে বিয়ের পক্ষে, তখন শুধু বিশ্বাস বা ধর্মের পরিবর্তন একজন মহিলার তার স্বামীর স্ত্রী হিসাবে অধিকার কেড়ে নেবে—এই আইন সমর্থন করা আমাদের পক্ষে অসংগত। তাই, আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা বলতে আমার কোনও দ্বিধা নেই, এক মহিলার স্বধর্মত্যাগ তার স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্কের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারবে, এই প্রস্তাব আমরা কোনও ভাবেই সমর্থন করতে পারি না। কিন্তু এটা যুক্তির একটা অংশ মাত্র।

'১৯৩৬-এর পার্সি বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের ৩২ নম্বর ধারার ফলে একজন বিবাহিত মহিলা প্রতিবাদী আর পার্সি নেই'' এই যুক্তিতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা আনতে পারে।

'এর থেকে দুটি জিনিস স্পষ্ট। প্রথমটা এই যে কোনও ধর্মীয় ধারণা বা ধর্মীয় ভাবাবেগ থেকে বিবাহ ভঙ্গের যুক্তি এটা নয়। কারণ ধর্মান্তরের পর দু'বছর যদি অতিক্রান্ত হয়, এবং আবেদনকারী যদি আপত্তি না করে, তার পুরুষ বা মহিলার বিবাহ ভঙ্গের জন্য মামলা করার কোনও অধিকার নেই। দ্বিতীয় জিনিসটি হচ্ছে, অপরপক্ষ ধর্ম পরিবর্তন করেছে, এই অভিযোগ আবেদনকারীর-ই যার বিবাহ ভঙ্গ ঘটানোর অধিকার আছে।

.... এই আইন ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ব্যাপারে, বিবাহ সম্পর্কের ওপর

ধর্মান্তর কী প্রভাব ফেলে সে সম্পর্কে আমরা ধারণা পেতে পারি। ১৮৮৬-র XXI আইন, দেশীয় অধিবাসী ধর্মান্তরিতদের বিবাহ ভঙ্গ আইন থেকে।

......ভারতের সব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। আর এই আইন স্বীকার করে যে, শুধু একজন ভারতীয়ের খ্রীস্টধর্মে, ধর্মান্তরিত হলে বিবাহ ভঙ্গ করবে না। তবে তার আইন-আদালতে যাওয়া এবং অন্য পক্ষ, যে ধর্মান্তরিত হননি, অবশ্যই তার বৈবাহিক কর্তব্য পালন করবে এটা বলার অধিকার তার থাকবে .... তখন তাদের এক বছরের সময় দেওয়া হয় এবং বিচারক নির্দেশ দেন যে, দাম্পত্য সম্পর্ক পুনঃ স্থাপনে তাদের প্রণোদিত করতে অপর কয়েক ব্যক্তির উপস্থিতিতে তারা পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। আর যদি তারা একমত না হন, পরিত্যাগের কারণে বিবাহ ভঙ্গ হয়, নিঃসন্দেহে বিবাহ ভঙ্গ হয়, তবে ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনের কারণে নয়। ..... তাই ভারতে প্রতিটি সম্প্রদায়ের-ই স্বীকৃত নীতি হচ্ছে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া বিবাহ ভঙ্গে পরিণত হয় না।'

বিধান সভার আর এক মুসলমান সদস্য বিধেয়কের সমর্থক সৈয়দ গুলাম বিখ ছিলেন নির্দয় ভাবে অকপট। বিধেয়কের সমর্থনে, তিনি বললেন[১] ঃ

'দীর্ঘ সময় ধরে ব্রিটিশ ভারতে আদালতগুলি দ্বিধাহীন ভাবে সীমাবদ্ধতা ছাড়াই এই মত দিয়েছেন যে, সর্বাবস্থায় স্বধর্মত্যাগ আপনা থেকে ও অবিলম্বে বিবাহিত অবস্থায় সমাপ্তি ঘটায়, কোনও আইনগত প্রক্রিয়া, আদালতে হুকুমনামা বা অন্য কোনও অনুষ্ঠান ছাড়াই আদালতগুলি এই অবস্থান নিয়েছে। এখন, এই বিষয়ে হানাফি আইনবিদ্‌দের তিনটি পৃথক মত রয়েছে। একটি মত, বোখারা ন্যায়বিদদের নির্দেশে করা হয়। এটি সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয় নি। আমি বলব তা গৃহীত হয়েছে একটা খণ্ডিত ছিন্ন-ভিন্ন অবস্থায়। বোখারার মত কী তা শ্রী কাজমি এবং অন্য কয়েকজন বক্তা বর্ণনা করেছেন। বোখারা ন্যায়বিদ্‌রা বলেন, স্বধর্মত্যাগের দ্বারা বিবাহভঙ্গ হয়। বস্তুত, আমার আরও নির্দিষ্টভাবে বলা উচিত—সেজন্য আমি অধিকার প্রাপ্ত—এটা (বিবাহ) বোখারা মত অনুসারে ভঙ্গ হয় না, সাময়িক ভাবে স্থগিত হয়। বিবাহ স্থগিত হয়, কিন্তু পত্নীকে হেফাজতে বা আটক অবস্থায় রাখা হয়, যতক্ষণ না সে অনুতপ্ত হয় ও পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আর এরপর তার স্বামীকে বিবাহ করার জন্য তাকে প্রণোদিত করা হয়। স্বামীর বিবাহ শুধু সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখা হয়, সমাপ্ত বা বাতিল করা হয় না। দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে, স্বধর্মত্যাগের পর এক বিবাহিত মুসলমান মহিলা আর তার স্বামীর স্ত্রী থাকে না,

১. বিধানসভার বিতর্ক ১৯৩৮, খণ্ড -V ১৯৫৩-৫৫

তার ক্রীতদাসী হয়ে যান। এই মতের স্বাভাবিক পরিণতির মতো আর একটি মত হচ্ছে, এই মহিলা আবশ্যিক ভাবে তার প্রাক্তন স্বামীর ক্রীতদাসী এমন নয়, বরং তিনি সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্রীতদাসী এবং যে কেউ তাকে ক্রীতদাসী হিসাবে নিয়োগ করতে পারে। তৃতীয় মত, যেটি সমরখন্দ্ ও বাল্খের উলেমাদের, হচ্ছে এরকম স্বধর্মত্যাগের দ্বারা বিবাহবন্ধন প্রভাবিত হয় না, এবং মহিলা স্বামীর স্ত্রী থেকে যায়। এই হচ্ছে তিনটি মত। প্রথম মতের একাংশ আদালতগুলি গ্রহণ করেছে এবং এই অংশের ওপর ভিত্তি করেই রায়ের পর রায় দেওয়া হয়েছে।

'...... এই সভা ভালোভাবে অবগত যে, এটা একমাত্র দৃষ্টান্ত নয় যেখানে বিচার সংক্রান্ত ভুলকে আইন প্রণয়ণের দ্বারা সংশোধন করতে চাওয়া হয়েছে, অন্য অনেক ক্ষেত্রেও বিচারালয় সম্বন্ধীয় ভুল অথবা বিচারালয়ের মতের মধ্যে সংঘাত বা আইনের অনিশ্চয়তা বা অস্পষ্টতা থেকেছে। আইনপ্রণয়ণের দ্বারা বিচারালয়ের মতের ভুলগুলির নিরন্তর সংশোধন করা হচ্ছে। এই বিশেষ ব্যাপারে ভুলের পর ভুল হয়েছে, ঘটেছে দুঃখজনক ভুল। আমাকে আদালতের রায়গুলি দেখানো হচ্ছে প্রামাণ্য বিষয়কে প্রমাণিত ধরে নেওয়া। নিশ্চিতভাবেই এটা বুঝতে হবে যে, যেহেতু উচ্চ ন্যায়ালয়গুলি আমার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত করেছেন, তাই এই সভায় আসা এবং সভাকে এইভাবে বা ঐভাবে আইন প্রণয়ণ করতে বলা আমার কাজ নয়, এটা আমার উত্থাপিত বিধেয়কের উত্তর নয়।'

পরিবর্তনের গভীরতার নিরিখে, এর সমর্থনে যে সব যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে, সেগুলি বস্তুত খুব-ই অসার। শ্রী কাজমি এটা উপলব্ধি করতে পারেন নি যে পার্সি, খ্রীস্টান, মুসলমানদের বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত আইনে পার্থক্য রয়েছে। ধর্মান্তরে প্রকৃতই এটা একবার প্রতিষ্ঠিত হলে, মুসলমান আইন পার্সি, খ্রীস্টানদের আইনের তুলনায় এগিয়ে থাকবে। মুসলমান আইনকে পশ্চাৎগামী করার বদলে উপযুক্ত কাজ হত পার্সি ও খ্রীস্টানদের আইনকে অগ্রগামী করা। শ্রীনইরঙ্গ এটা অনুসন্ধানের জন্য থামেন নি যে, মুসলমান ন্যায়বিদদের মধ্যে যদি ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা থাকে, তবে মুসলমান মহিলার অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানকারী অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত মতটিকে গ্রহণ করা এবং মহিলাদের ক্রীতদাসে পরিণতকারী বর্বর মতকে তার স্থান না নিতে দেওয়া আইনের সঙ্গে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ কিনা।

সে যাই হোক, পরিবর্তনের যে প্রকৃত উদ্দেশ্য তার সঙ্গে আইনি যুক্তির কোনও সম্পর্ক নেই। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, অন্য বিশ্বাসে বিশ্বাসী মহিলাদের অবৈধ ধর্মান্তর, তারপর সে যে ধর্মসম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছে, সেই ধর্মাবলম্বী কোনও একজনের

সঙ্গে অবিলম্বে তড়িঘড়ি বিয়ে বন্ধ করা। এই বিয়ের লক্ষ্য নতুন সম্প্রদায়ে তাকে (মহিলাকে) আটক রাখা এবং আগে সে যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাতে প্রত্যাবর্তন থেকে তাকে নিবৃত্ত করা। মুসলমান মহিলার হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া এবং হিন্দু মহিলার ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, তার গুরুতর পরিণতি হতে পারে। এর অর্থ দুই সম্প্রদায়ের সংখ্যাগত ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। মহিলাদের অপহরণের দরুণ এই বিঘ্ন ঘটছে বলেই তাকে উপেক্ষা করা যায় না। কারণ মহিলা এক-ই সঙ্গে মাত্রায় জাতীয়তাবাদের বীজভূমি ও বেশ্যালয়, পুরুষ কখনও তা হতে পারে না[১]।

মহিলাদের এই ধর্মান্তর ও তার পর তাদের বিবাহকে তাই সঠিকভাবেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের চালানো পর্যায়ক্রমিক বিপর্যস্ত করার কাজ বলেই গণ্য করা হয়। এই সব কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের আপেক্ষিক সংখ্যা শক্তিতে পরিবর্তন আনা। মহিলাদের অপহরণের এই ঘৃণ্য অভ্যাস গবাদিপশুর চুরির মতোই সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। সম্প্রদায়িক ভারসাম্যের পক্ষে এটা স্পষ্টতই বিপজ্জনক। এটা বন্ধ করতে প্রয়াস চালাতে হত। এই বিধেয়কের পেছনে প্রকৃত কারণ ছিল এটাই। আইনের ৪ নং ধারার দুটি সংস্থান থেকে তা দেখা যাবে। সংস্থান ১-ক অনুসারে হিন্দুরা মুসলমানদের এই বক্তব্য মেনে নিয়েছে যে, আদিতে যদি কোনও হিন্দুমুসলমান মহিলাকে ধর্মান্তরিত করত, তবে তার ধর্মান্তর সত্ত্বেও সে তার প্রাক্তন মুসলমান স্বামীর প্রতি অনুগত থাকতে বাধ্য থাকবে। সংস্থান ২-এ মুসলমানরা হিন্দুদের এই বক্তব্য মেনে নিয়েছে যে, তারা যদি কোনও হিন্দু বিবাহিত মহিলাকে ধর্মান্তরিত করে ও তার যদি একজন মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে হয়, ঐ মহিলা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে তার বিবাহ ভঙ্গ হয়েছে বলে পরিগণিত হবে এবং হিন্দু সমাজে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে তার স্বাধীনতা থাকবে। এই ভাবে, আইনের পরিবর্তনের পেছনে আছে সংখ্যাগত ভারসাম্য রক্ষার আকাঙ্ক্ষা এবং এই উদ্দেশ্যেই মহিলাদের অধিকারের ব্যাপারে ত্যাগ স্বীকার করতে হল।

এই অসুস্থ পরিবেশের পরেও দুটি বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি পর্যাপ্তভাবে লক্ষিত হয় নি।

এরকম একটি বৈশিষ্ট্য, অন্যের সামাজিক ব্যবস্থায় কোনও সংস্কারকে এক পক্ষ ঈর্ষামিশ্রিত দৃষ্টিতে দেখে। এরকম সংস্কারের ফলে তার যদি প্রতিরোধের শক্তি বাড়ে, তৎক্ষণাৎ তা পারস্পরিক-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

১.জাতীয়তাবাদের পরিপোষণে মহিলাদের ভূমিকাকে যথেষ্টভাবে লক্ষ্য করা হয়নি। এ ব্যাপারে রেনান-এর 'এসেজ অন্ ন্যাশানালিটি'-তে তাঁর মন্তব্যগুলি দেখুন।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ একটি খুব কৌতূকপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। এই মনোভাবকে তা পরিস্ফুট করে। তাঁর স্মৃতিচারণমূলক 'লিবারেটর'-এ[১] লিখতে গিয়ে তিনি এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন :—

'শ্রীরানাডে সেখানে ছিলেন ...... সামাজিক সম্মেলনকে পথনির্দেশ করতে। সম্মেলনকে সেই প্রথম ও শেষবারের মতো জাতীয় অভিধা দেওয়া হয়েছিল। গোড়া থেকে এটা ছিল সব ধরনের হিন্দুদের সম্মেলন। জাতীয় সামাজিক সম্মেলনে যোগদানকারী একমাত্র মুসলমান প্রতিনিধি ছিলেন, বেরিলির মুফ্‌তি সাহেব। ব্যস্‌! সম্মেলন শুরু হল। বাল-বিধবাদের পুনর্বিবাহের সমর্থনে একজন হিন্দু প্রতিনিধি ও আমি প্রস্তাব উত্থাপন করলাম। সনাতনপন্থী পণ্ডিতরা এর বিরোধিতা করলেন। তখন মুফতি বলার জন্য অনুমতি চাইলেন। প্রয়াত বৈজনাথ মুফতি সাহেবকে বললেন, প্রস্তাবটি শুধু হিন্দুদের বিষয়ে। তাই তাঁর বলার দরকার নেই। তাতে মুফতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন।

'সভাপতির জন্য কোনও বিশেষ সুযোগ ছিল না। এবং মুফতি সাহেবকে তাঁর বক্তব্য বলতে দেওয়া হল। মুফতি সাহেবের যুক্তি ছিল, হিন্দু শাস্ত্রগুলি পুনর্বিবাহ অনুমোদন করে না। এর জন্য চাপাচাপি করা পাপ। আবার যাঁরা খ্রীস্টান বা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের পুনরায় ধর্মান্তরিত করা বিষয়ক প্রস্তাব উঠল, মুফতি সাহেব পীড়াপীড়ি করলেন যে একজন যখন হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেছেন, তাঁকে আর ঐ ধর্মে ফিরে আসতে দেওয়া উচিত নয়।'

আর একটি দৃষ্টান্তে অস্পৃশ্যদের সমস্যার ব্যাপারে মুসলমানদের মনোভাব লক্ষ্য করা যাবে। মুসলমানরা বরাবর দলিতদের এক অভিলাষপূর্ণ মনোভাব নিয়ে দেখেছে। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বেষের অনেকটাই মুসলমানদের এই আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত যে দলিতদের অঙ্গীভূত করে হিন্দুরা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। ১৯০৯-এ মুসলমানরা এক সাহসী পদক্ষেপ নিল। তারা প্রস্তাব করল যে, দলিতদের জনগণনায় যেন হিন্দু বলে নথিভুক্ত করা না হয়। ১৯২৩-এ মহম্মদ আলি, কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তাঁর ভাষণে ১৯০৯-এ মুসলমানদের গৃহীত অবস্থান থেকেও অনেক এগিয়ে গেলেন।

তিনি বললেন :—

'পপলার ও পিপুল গাছের ব্যাপারে ও গীত বাদ্যাদি সহ শোভাযাত্রা নিয়ে

---

১. ২৬শে এপ্রিল, ১৯২৬

ঝগড়া সত্যিই বালখিল্যতাসুলভ কিন্তু, সাম্প্রদায়িক কাজকর্মের নিষ্পত্তি যদি আপোষে করা না যায়, তাহলে একটি প্রশ্ন থাকে যা অমিত্রজনোচিত কাজের অভিযোগ করার ভিত্তি সহজেই জুগিয়ে দেয়। প্রশ্নটি অবদমিত বর্ণগুলির ধর্মান্তর বিষয়ে, যদি হিন্দু সমাজ দ্রুত তাদের অঙ্গীভূত না করে। খ্রিস্টীয় যাজক সম্প্রদায় ইতিমধ্যেই ঐকাজে ব্যাপৃত এবং কেউ তাদের সঙ্গে কলহ করছে না। কিন্তু যেই মাত্র এক-ই উদ্দেশ্যে কয়েকটি মুসলমান ধর্মপ্রচারক সমাজ গঠিত হবে, হিন্দু পত্রপত্রিকায় তা নিয়ে সোরগোলের সম্ভাবনা একপ্রকার নিশ্চিত। অবদমিত বর্ণগুলির ধর্মান্তরের উদ্দেশ্যে একটি ধর্মপ্রচারক সমিতি গড়ে তুলতে পেরেছেন এমন এক প্রভাবশালী ও ধনী ভদ্রলোক আমাকে একটি প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রস্তাবটি হচ্ছে, অগ্রণী হিন্দু ভদ্রমহোদয়দের সঙ্গে নিয়ে এক বসতিতে পৌছানো এবং দেশকে কয়েকটি পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত করা সম্ভব যেখানে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মপ্রচারকেরা ক্রমান্বয়ে কাজ করবেন। প্রতিটি সম্প্রদায় প্রতি বছর অথবা সময়ের দীর্ঘতর সময় ধরে তাঁরা কতজনকে নিজ সম্প্রদায়ে অঙ্গীভূত করতে ও কতজনকে ধর্মান্তরিত করতে প্রস্তুত তার আনুমানিক হিসাব তৈরি করবেন। এই সব আনুমানিক হিসাবের অবশ্যই কর্মী সংখ্যা ও কতো অর্থ তাঁরা ব্যয় করতে পারবেন তার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হবে। পূর্ববর্তী সময়কালের প্রকৃত সংখ্যার দ্বারা এই হিসাব যাচাই করা হবে। এই ভাবে প্রতিটি সম্প্রদায়-ই অবদমিত বর্ণগুলিকে অঙ্গীভূত ও ধর্মান্তরিত করা বা বরং পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা ছাড়াই সংস্কারের কাজ করতে পারবে। আমি বলতে পারি না, আমার হিন্দু ভাইরা কীভাবে এটাকে নেবেন এবং সবরকম সারল্য ও আন্তরিকতার সঙ্গে আমি তাদের কাছে পরীক্ষামূলকভাবে এই প্রস্তাব রাখছি। আমার দিক থেকে আমি এটুকু বলতে পারি আমি বরোদা রাজ্যে 'কালি প্রজাদের এবং প্রদেশের প্রদেশে, গণ্ডদের অবস্থা দেখেছি, আমি অকপটে স্বীকার করছি এটা. আমাদের সকলের কাছেই লজ্জার বিষয়। হিন্দুরা যদি তাদেরকে নিজেদের সমাজের অঙ্গীভূত না করে, তবে অন্যরা অবশ্যই তা করবে এবং তখন গোঁড়া হিন্দুরাও তাদের অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা বন্ধ করবে। ধর্মান্তর, মনে হয় নিকৃষ্ট ধাতুকে প্রবল ভাবে স্বর্ণে পরিণত করার মতো তাদের রূপান্তরিত করে। কিন্তু এটা কি ধর্মান্তরকে অতিরিক্ত লাভজনক করে তোলে না?'

অন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মুসলমান ও হিন্দুরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যে বিরোধিতা করছে তা একটুও হ্রাস পাচ্ছে না। এটা দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতার মতো। হিন্দুদের যদি বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় থাকে, মুসলমানদের অবশ্যই আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। হিন্দুরা যদি শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করে, মুসলমানরা

অবশ্যই তবলিগ্ (Tablig) আন্দোলনের সূচনা করবে। হিন্দুরা যদি সংগঠন আরম্ভ করে তবে মুসলমানরা অবশ্যই তাঞ্জিম দিয়ে তার মোকাবিলা করবে। হিন্দুদের যদি [১] R.S.S.S থাকে তবে মুসলমানরা অবশ্যই তার জবাব দেবে [২] খাক্সার সংগঠিত করে। সামাজিক অস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের ক্ষেত্রে এই প্রতিযোগিতা যুদ্ধের মুখোমুখি দুটি দেশের তুলণীয় দৃঢ় সংকল্প ও অশঙ্কা নিয়ে চালানো হয়ে থাকে মুসলমানদের ভয় হিন্দুরা তাদের বশীভূত করছে। হিন্দুরা মনে করে মুসলমানরা আবার তাদের জয় করার কাজে নিয়োজিত। মনে হয় উভয়েই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং একে অন্যের প্রস্তুতির ওপর নজর রাখছে।

এরকম অবস্থা অশুভ না হয়ে পারে না। এটা একটা দুষ্ট চক্র। হিন্দুরা যদি নিজেদের আরও শক্তিশালী করে, মুসলমানরা ভাবে তারা বিপদে পড়ল। এই বিপদের মোকাবিলায় মুসলমানরা তাদের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করবে এবং হিন্দুরা সমকক্ষ হবার জন্য এক-ই জিনিস করে। প্রস্তুতি যত এগিয়ে যাবে, সন্দেহ, গোপণীয়তা ও ষড়যন্ত্রও এগিয়ে যেতে থাকবে। শান্তিপূর্ণ সমঝোতা সম্ভাবনা মূলেই বিষাক্ত হয়ে উঠবে। আর সঠিকভাবে বললে যেহেতু প্রত্যেকেই আশঙ্কা করছে ও বিরোধিতার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাই দুয়ের মধ্যে সংঘর্ষ ক্রমশঃ অনিবার্য হয়ে উঠবে। কিন্তু যে অবস্থায় হিন্দু ও মুসলমানরা নিজেদের দেখে, তাতে পরস্পরের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেদের প্রস্তুত করা ছাড়া অন্য কোনও কিছুতে মনোযোগ না দেওয়াটা তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এটা অস্তিত্বের লড়াই আর যে প্রশ্নটি বিবেচ্য, তা হচ্ছে টিকে থাকার উৎকর্ষ বা তার ক্ষেত্র নয়।

এই আলোচনা থেকে দুটি জিনিস ফুটে ওঠে—এটা বলা যেতে পারে। এক, হিন্দু ও মুসলমানরা পরস্পরকে বিপদ মনে করে। দুই, এই বিপদের মোকাবিলায় যে সব সামাজিক কু-প্রথায় তারা জীর্ণ সেগুলি অপসারণের কাজ উভয়েই স্থগিত রেখেছে। এটা কি একটা কাম্য অবস্থা? যদি না হয়, তা হলে কিভাবে এর সমাপ্তি ঘটানো যেতে পারে?

সামাজিক সংস্কারের সমস্যবলী পাশে সরিয়ে রাখাকে কেউই একটা কাম্য অবস্থা বলতে পারেন না। যেখানেই সামাজিক কু-প্রথা থাকে, সেখানে ব্যবস্থাবদ্ধ সমাজ বা রাষ্ট্রের স্বাস্থ্যের জন্য কষ্টভোগ ও অন্যায়ের প্রতীক হয়ে ওঠার আগেই সেগুলিকে

---

১. হিন্দু স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙেঘর' সংক্ষিপ্ত আকার।

২. 'খাক্সার' একটি মুসলমান স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী।

অপসারিত করা প্রয়োজন। কারণ, প্রত্যেক জায়গাতেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক কু-ব্যবস্থাই বিপ্লব বা ক্ষয়ের জনক। রাজনৈতিক সংস্কারের আগে সামাজিক সংস্কার না সামাজিক সংস্কারের আগে রাজনৈতিক সংস্কার তা বিতর্কের বিষয় হতে পারে। কিন্তু, যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করা যায়, তাই যে এর (রাজনৈতিক ক্ষমতার) একমাত্র উদ্দেশ্য, সে বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। রাজনৈতিক ক্ষমতার অভাবে জরুরি ও জ্বলন্ত সামাজিক সমস্যা ও কু-প্রথাগুলি সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে ও ধ্বংস করছে, এরকম যদি মনে হয়, তবেই রাজনৈতিক শাসনের জন্য সমস্ত সংগ্রাম যুক্তিযুক্ত, অযথা ঐ সংগ্রাম নিষ্ফল ও নিরর্থক। কিন্তু ধরা যাক, হিন্দু ও মুসলমানরা কোনওভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করল। তারা সামাজিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করবে এমন আশা কি করা যায়? যে ব্যাপারে প্রায় কোনও আশা নেই? হিন্দু ও মুসলমানরা যতক্ষণ পরস্পরকে বিপদ হিসাবে দেখে ততক্ষণ তাদের মনোযোগ নির্দিষ্ট থাকবে ঐ বিপদের মোকাবিলার প্রস্তুতিতে। হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের এক অভিন্ন মোর্চা গড়ে তোলার জরুরি প্রয়োজন সামাজিক সংস্কার সম্পর্কে নীরব থাকার এক ষড়যন্ত্র রচনা করতে বাধ্য। সামাজিক কু-প্রথা গুলি দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি করলেও এবং সেগুলির প্রতি অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন হলেও মুসলমান বা হিন্দু কেউ-ই সেগুলির প্রতি মনোযোগী হবে না। এর সহজ কারণ তারা মনে করে সামাজিক সংস্কারের প্রতিটি ব্যবস্থাই নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ও বিভাজন ঘটাতে এবং তাকে দুর্বল করতে বাধ্য। সেখানে অন্য সম্প্রদায়ের বিপদের মোকাবিলা করতে তাদের ঐক্য রক্ষা করা উচিত। এটা স্পষ্ট, যতক্ষণ এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে বিপদ হিসাবে দেখবে, ততক্ষণ কোনও সামাজিক প্রগতি হবে না এবং সংরক্ষণশীলদের মনোভাব উভয়ের চিন্তা ও কাজকে অধিকার করে রাখবে।

এই বিপদ কতদিন স্থায়ী হবে? এক-ই সংবিধানের আবরণের অধীনে এক দেশের সদস্য হিসাবে হিন্দু ও মুসলমানদের যতদিন থাকতে হবে, ততদিন এই বিপদ যে থাকবে তা নিশ্চিত। কারণ, ভারসাম্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা অভিন্ন সংবিধানে থাকার ফলে যে ভয়, তাই মুসলমানদের কাছে হিন্দুদের এবং হিন্দুদের কাছে মুসলমানদের বিপদে পরিণত করবে। কারণ, কোনও কিছুই সংবিধান নির্দিষ্ট স্থূল বিন্দুতে ভারসাম্যকে ধরে রাখতে পারে না। এরকমটাই যদি হয়, তবে স্পষ্টত পাকিস্তানই সমাধান। যে অবস্থাটি বিপদের কারণ, তা এর দ্বারা নিশ্চিত ভাবেই অপসারিত হবে। পাকিস্তান, হিন্দু ও মুসলমান, উভয়কেই, ক্রীতদাসে পরিণত হওয়া

ও পরস্পরের ওপর আধিপত্যের আশঙ্কা থেকে মুক্ত করবে। পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান, প্রতিটির জন্য পৃথক সংবিধানের ব্যবস্থা করে দৈনন্দিন জীবনে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে চিরন্তন সংঘর্ষের ভিত্তিটিকেই অপসারিত করবে। সামাজিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেসব বিষয়কে তারা এখন ঠাণ্ডা ঘরে সরিয়ে রাখতে বাধ্য হয়, সেগুলিতে হাত লাগানোর স্বাধীনতা দেবে, তাদের সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবনকে উন্নত করে। সর্বোপরি এটাই হল স্বরাজের জন্য সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য।

এরকম কোনও ব্যবস্থা ছাড়া হিন্দু ও মুসলমানরা একপক্ষ অন্যপক্ষকে জয় করে নেবে তখন ভয় থেকে তারা যেন দুটি জাতি এমন ভাবে ক্রিয়া করবে ও প্রতিক্রিয়া জাগাবে। আগ্রাসনের প্রস্তুতি সব সময়ই সামাজিক সংস্কারের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে যাতে যে সামাজিক অচলাবস্থা শুরু হয়েছে তা অব্যাহত থাকবে। এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং তাতে কারুর-ই বিস্মিত হওয়ার কথা নয়।

কারণ বার্নার্ড শ দেখিয়েছেন :—

'এক বিজিত জাতি হচ্ছে কর্কট রোগাক্রান্ত এক মানুষের মতো; যে এছাড়া আর কোনও কিছু ভাবতে পারে না ..... একজন স্বাস্থ্যবান মানুষ যেমন তাঁর হাড় সম্পর্কে সচেতন নন, এক স্বাস্থ্যবান জাতি তার জাতীয়তা সম্পর্কে সচেতন নয়। কিন্তু কোনও জাতির জাতীয়ত্ব যদি ভঙ্গ করা হয়, তবে সেটা আবার জোড়া লাগানো ছাড়া অন্য কোনও কিছু সে ভাবতে পারে না। সে কোনও সংস্কারক, কোনও দার্শনিক, কোনও প্রচারকের কথা সে শুনবে না, যতক্ষণ না জাতীয়তাবাদীর দাবি মঞ্জুর হয়। একীকরণও মুক্তির কাজ ছাড়া অন্য কোনও কাজ, তা সে যত গুরুত্বপূর্ণই হোক, তেমন দেবে না।'

হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাওয়া মুসলমানদের একীকরণ না হলে এবং পরস্পরের অধীন হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্তি না ঘটলে এ-ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে সামাজিক নিশ্চল অবস্থাজনিত অসুস্থ পরিবেশ অপসারিত হবে না। সারবে না।

□ □ □

অধ্যায়-১১

সাম্প্রদায়িক আগ্রাসন

ওপর ওপর থেকে দেখলেও এটা একজনের দৃষ্টি এড়াবে না যে, মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের একটা সাম্প্রদায়িক আক্রমণাত্মক মনোভাব রয়েছে। হিন্দুর আক্রমণাত্মক মনোভাব একটা নতুন পর্যায়, এই মনোভাব সে সবে পোষণ করতে শুরু করেছে। মুসলমানদের আক্রমণাত্মক মনোভাব তাদের সহজাত এবং হিন্দুদের তুলনায় প্রাচীন। এমন নয় যে, সময় পেলে হিন্দুরা তাদের এই মনোভাবকে তীব্রতর করবে না এবং মুসলমানদের ছাড়িয়ে যাবে না। কিন্তু এখন যা অবস্থা, আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রদর্শনে মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় অনেক এগিয়ে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কিত অধ্যায়ে মুসলমানদের সামাজিক আগ্রাসনের বিষয়ে যথেষ্ট বলা হয়েছে। মুসলমানদের রাজনৈতিক আগ্রাসন নিয়ে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন কারণ—এই রাজনৈতিক আগ্রাসন যে অস্বস্তি সৃষ্টি করেছে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। মুসলমানদের রাজনৈতিক আগ্রাসনের বিষয়ে তিনটি জিনিস লক্ষ্যণীয়।

প্রথম হচ্ছে, মুসলমানদের রাজনৈতিক দাবিগুলির ক্রমবর্ধমান তালিকা। এর সূত্রপাত ১৮৯২ সাল থেকে। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বশাসনের পরিবর্তে সুশাসনের দাবি নিয়ে এর শুরু। এই দাবির জবাবে ব্রিটিশ সরকার ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের আইন অনুযায়ী স্থাপিত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের প্রকৃতি বা ধরন পাল্টানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। কংগ্রেস আন্দোলনের সেই উন্মেষের পর্যায় এই সব ব্যবস্থাপক পরিষদকে সম্পূর্ণভাবে জনপ্রিয় করার তাগিদ ব্রিটিশ সরকার অনুভব করেন নি। এগুলিকে জনপ্রিয়তার একটা মোড়ক দেওয়াই যথেষ্ট বলে সরকার ভেবেছিলেন। সেইমতো ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার 'ভারতীয় পরিষদ আইন' নামে একটি আইন অনুমোদন করেন। দুটি কারণে আইনটি স্মরণীয়। ১৮৯২ সালের এই আইনে ব্রিটিশ সরকার সর্বপ্রথম ভারতে আইনসভার গঠনের ভিত্তি হিসেবে জনপ্রতিনিধিত্বের নীতির অনুরূপ একটি ধারণাকে গ্রহণ করলেন। এটা নির্বাচনের নীতি নয়। এটা ছিল মনোনয়নের নীতি। শুধু শর্ত ছিল মনোনয়নের আগে একজনকে পুরসভা, জেলাপরিষদ, বিশ্ববিদ্যালয়

ও বণিক সমিতি প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ জনসংস্থার দ্বারা মনোনীতি হতে হবে। দ্বিতীয়ত এই আইন অনুযায়ী গঠিত আইনসভাগুলিতে মুসলমানদের জন্য পৃথক প্রতিনিধিত্বের নীতি ভারতের রাজনৈতিক সংবিধানে প্রথম বার প্রবর্তন করা হল।

এই নীতির প্রবর্তন রহস্যাবৃত। কারণ চুপিসাড়ে ও চোরা গোপ্তাভাবে এটা প্রবর্তন করা হয়েছিল। আইনে পৃথক প্রতিনিধিত্বের নীতি খুঁজে পাওয়া যাবে না। আইনে এ সম্পর্কে কোনও কথা নেই। আইনে না থাকলেও কোন কোন বর্ণ ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হবে সে সংক্রান্ত বিধি-নিয়ম প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্তদের যে নির্দেশ জারি করা হয় তাতেই মুসলমানদের একটি শ্রেণী হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

মুসলমানদের পৃথক প্রতিনিধিত্বের নীতি প্রবর্তনের জন্য কে দায়ি, তাও একটা রহস্য। পৃথক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা কোনও সংগঠিত মুসলমান সমিতির তোলা দাবির পরিণতি নয়। তাহলে কে এর সূত্রপাত করলেন? মনে করা হয়ে থাকে,* ভাইসরয়, লর্ড ডাফরিন-ই এর সূচনা করেন। ১৮৮৮ সালে ব্যবস্থাপক পরিষদগুলিতে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার সময় ইংল্যাণ্ডে যে ভাবে প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা হয়, সে ভাবে না করে ভারতে বিভিন্ন স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তায় ওপর তিনি জোর দেন। এ বিষয়ে কৌতূহল আরও একটি প্রশ্নের জন্ম দেয়। তা হচ্ছে, লর্ড ডাফরিনকে এ ধরনের পরিকল্পনার প্রস্তাব করতে কোন বিষয়টি উদ্বুদ্ধ করেছিল? মনে করা হয়ে থাকে,† তিনবছর আগে যে কংগ্রেসের পত্তন হয়েছিল তার থেকে মুসলমানদের সরিয়ে আনতে হবে এই ধারণাই এক্ষেত্রে কাজ করেছিল। সে যাই হোক এটা নিশ্চিত যে এই আইন অনুসারেই মুসলমানদের জন্য পৃথক প্রতিনিধিত্ব প্রথম বার ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ঠ্য হয়ে উঠেছিল। তবে এটাও লক্ষ্য করার মতো যে আইন বা নিয়মবিধি কোনওটাই মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর নির্বাচনের অধিকার ন্যস্ত করে নি। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন দাবি করার অধিকারও মুসলমান সম্প্রদায়কে ওই আইনে দেওয়া হয় নি। এই আইন মুসলমানদের যা দিয়েছিল, তা হচ্ছে পৃথক প্রতিনিধিত্বের অধিকার।

* প্রথম আর. টি. সি-র সংখ্যালঘু উপসমিতিতে স্যার মহম্মদ শফির ভাষণ দ্রষ্টব্য, ভারতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৫৭।

† রাজা নরেন্দ্রনাথের ভাষণ দ্রষ্টব্য। তদেব, পৃষ্ঠা-৬৫।

শুরুতে যদিও পৃথক প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব ব্রিটিশদের কাছ থেকেই এসেছিল, মুসলমানরাও পৃথক রাজনৈতিক অধিকারের সামাজিক মূল্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয়নি, ফলে ১৯০৯ এ মুসলমানরা যখন জানতে পারলেন যে, ব্যবস্থাপক পরিষদের সংস্কার বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে চিন্তা ভাবনা চলছে, নিজে থেকেই তারা ভাইসয়র লর্ড মিন্টোর কাছে প্রতিনিধিমণ্ডলী* নিয়ে হাজির হলেন। ভাইসরয়ের কাছে তারা নিম্নলিখিত দাবিগুলি পেশ করলেন ঃ-

(i) তাদের সংখ্যাগত শক্তি সামাজিক অবস্থা ও স্থানীয় প্রভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জেলা ও পৌর পর্ষদগুলিতে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ;

(ii) বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালন পর্ষদে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের আশ্বাস।

(iii) প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব। মুসলমান জমিদার আইনজীবী, ব্যবসায়ী, ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থবাহী গোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিগণ নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং জেলা ও পৌরপর্ষদগুলির সদস্যদের নিয়ে গঠিত এক বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী এই প্রতিনিধিদের নির্বাচন করবেন।

অধিরাজিক (Imperial) ব্যবস্থাপক পরিষদে মুসলমান প্রতিনিধিদের সংখ্যা তাঁদের জনসংখ্যাগত শক্তির ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। এবং মুসলমানরা যেন কখনই প্রভাবহীন বা অকার্যকর সংখ্যালঘুতে পরিণত না হয়। মনোনীত হবার পরিবর্তে যতটা সম্ভব তাদের নির্বাচিত হওয়া উচিত জমিদার, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, প্রাদেশিক পরিষদগুলির সদস্যগণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ফেলোদের নিয়ে গঠিত এক বিশেষ মুসলমান নির্বাচকমণ্ডলী এই প্রতিনিধিদের নির্বাচন করবেন।

এই দাবিগুলি মঞ্জুর করা হয় এবং ১৯০৯ এর আইনে কার্যকর করা হয়। এই আইনে মুসলমানদের দেওয়া হল

---

* কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে মহম্মদ আলি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন যে, এই প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রেরণ ছিল এক, "নির্দেশিত কার্য।"

(1) তাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচনের অধিকার, (2) পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা তাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচনের অধিকার (3) সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীতেও ভোটদানের অধিকার এবং (4) প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে আনুপাতিক গুরুত্বের অধিকার। পরের পৃষ্ঠার সারণিতে ১৯০৯ সালের আইন ও তদনুযায়ী প্রণিত বিধি অনুসারে আইনসভা গুলিতে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নির্দেশ করে।

পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশ (C.P.) ব্যতিরেকে সব প্রদেশে এই সংস্থানগুলি প্রযুক্ত হল। পঞ্জাবের মুসলমানদের জন্য এ ধরনের বিশেষ সুরক্ষা অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হওয়ায় তা পঞ্জাবের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হল না। সেই সময় কোনও ব্যবস্থাপক পরিষদ না থাকায় সি.পি.-র ক্ষেত্রেও তা প্রযুক্ত হল না। সি.পির ব্যবস্থাপক পরিষদ স্থাপিত হয় ১৯১৪ সালে।

১৯১৬-র অক্টোবরে রাজকীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে ১৯ জনের সদস্য সংবিধানের সংস্থান দাবি করে একটি স্মারকলিপি ভাইসরয় লর্ড জেমসফোর্ডের কাছে দেন। পরে পরেই মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে একাধিক দাবি নিয়ে মুসলমানরা এগিয়ে আসেন, এগুলি হল : (i) পঞ্জাব ও সি.পি.-র ক্ষেত্রে পৃথক প্রতিনিধিত্বের নীতি সম্প্রসারিত করা (ii) প্রাদেশিক ও রাজকীয় ব্যবস্থাপক পরিষদগুলিতে মুসলমান প্রতিনিধিদের সংখ্যা নির্ধারণ করা (iii) মুসলমান তাদের ধর্ম ও ধর্মীয় আচারবিধিকে ক্ষুন্নকারী আইনের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ।

এই দাবিগুলির জেরে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে চুক্তি হয় তা 'লখনউ চুক্তি' সমঝোতা নামে পরিচিত। বলা যেতে পারে এতে দুটি খণ্ড ছিল। একটি আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত। এই অনুসারে যে মতৈক্য হল তা হচ্ছে ;

'একজন অনাধিকারিক উত্থাপিত কোনও বিধেয়ক অথবা তার কোনও খণ্ড অথবা কোনও প্রস্তাব যদি একটি বা অন্য সম্প্রদায়ে স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করে (সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপক পরিষদে ওই সম্প্রদায়ের সদস্যরা এই প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেবেন) তবে তা নিয়ে অগ্রসর হওয়া যাবে না, যদি ওই বিশেষ পরিষদে, রাজকীয় এবং প্রাদেশিক ওই সম্প্রদায়ের সদস্যদের তিন চতুর্থাংশ বিধেয়কটি অথবা তার কোনও খণ্ড অথবা প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।'

অন্য ধারাটি মুসলমানদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বিষয়ক। রাজকীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের বিষয়ে 'লখনউ চুক্তি'র সমঝোতার সংস্থান রাখা হল ঃ-

১৯০৯ সালের আইন ও তদনুযায়ী প্রণিত বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থাপক পরিষদগুলিতে হিন্দু ও মুসলমানদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব

প্রদেশ	১৯০৯ সালের আইনে সর্বাধিক অতিরিক্ত সদস্য	স্তম্ভ ৫ এবং ১২তে অনুমোদিত সর্বাধিত অতিরিক্ত সদস্য	পদাধিকারে	নির্বারিত সদস্য			মনোনীত সদস্য					8.৫.১২ স্তম্ভের মোট সংখ্যক
				মোট	অ-মুসলমান	মুসলমান	আধিকারিক		সরকারি	বেসরকারি	মোট	
							আইন আধিকারিক	অন্যান্য				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
ভারত	৬০	৬০	৮	২৭	২২	৫	—	২৮	৫	—	৩৩	৬৩
মাদ্রাজ	৫০	৪৫	৪	২১	১৯	২	১	১৬	৫	২	২৪	৪৯
বোম্বাই	৫০	৪৫	৪	২১	১৭	৪	১	১৪	৭	২	২৪	৪৯
বাংলা	৫০	৫০	৪	২৮	২৩	৫	—	১৬	৪	২	২২	৫৪
বিহার	৫০	৪১	৪	২১	১৭	৪	১	১৫	৪	১	২০	৪৫
যুক্তপ্রদেশ	৫০	৪৯	১	২১	১৭	৪	—	২০	৬	২	২৮	৫০
পঞ্জাব	৩০	২৬	১	৮	৮	—	—	১০	৬	২	১৮	২৭
ব্রহ্মদেশ	৩০	১৭	১	১	১	—	—	৬	৮	২	১৬	১৮
অসম	৩০	২৫	১	১১	৯	২	—	৯	৪	১	১৪	২৫

* স্তম্ভ ৯-এ আধিকারিকের সর্বাধিক সংখ্যা আছে

'ভারতীয় নির্বাচিত সদস্যদের এক তৃতীয়াংশের মুসলমান হওয়া উচিত। তারা বিভিন্ন প্রদেশে পৃথক পৃথক নির্বাচনমণ্ডলীয় দ্বারা নির্বাচিত হবেন, যতটা সম্ভব সেই অনুপাতে, যে অনুপাতে পৃথক মুসলমান নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদগুলিতে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।'

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদগুলিতে মুসলমান প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে এই ঐকমত্য হল যে, মুসলমান প্রতিনিধিত্বের নিম্নলিখিত অনুপাতে দেওয়া উচিত* ঃ—

	প্রাদেশিক আইনসভায় নির্বাচিত ভারতীয় সদস্যদের শতাংশ
পঞ্জাব	৫০
যুক্তপ্রদেশ	৩০
বাংলা	৪০
বিহার ও ওড়িশা	২৫
মধ্যপ্রদেশ	১৫
মাদ্রাজ	১৫
বোম্বাই	৩৩

মুসলমানদের এই অনুপাতে আসন দেওয়ার পাশাপাশি, ১৯০৯ সালের ব্যবস্থা অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীতে তাদের যে দ্বিতীয় ভোটের অধিকার ছিল তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হল।

মন্টেগু-চেমসফোর্ড প্রতিবেদনে 'লখনউ চুক্তি'র বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে কিন্তু এটি সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মধ্যে একটি সমঝোতা হওয়ায় সরকার তাকে বাতিল করতে এবং সে জায়গায় পরিবর্ত হিসাবে নিজের সিদ্ধান্তকে বিকল্প হিসাবে চাননি। সমঝোতার উভয় ধারাই সরকার মেনে নিয়েছিলেন এবং ১৯১৯ এর 'ভারত শাসন আইনে' (Government of India Act) সন্নিনিবেশিত করেছিলেন। আইন

* কোনও কারণে চুক্তিতে অসমে মুসলমান প্রতিনিধিত্বের অনুপাত স্থির করা হয় নি।

প্রণয়ন সংক্রান্ত খণ্ডটিকে কার্যকর করা হয়েছিল তবে পৃথক আকারে। বিধান মণ্ডলের সদস্যদের বিরোধিতার জন্য ছেড়ে না রেখে সংস্থান রাখা হল† যে ভারতে ব্রিটিশ প্রজাদের কোনও শ্রেণীর ধর্ম বা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও প্রথাকে ক্ষুণ্ণ করে এমন কোনও আইন ভারতীয় আইনসভায় কোনও কক্ষের বৈঠকে বড়লাটের প্রাক অনুমোদন ব্যতিরেকে উত্থাপন করা হবে না।

প্রতিনিধিত্ব বিধায়ক খণ্ডটি সরকার মেনে নিলেন, যদিও, সরকারের মতে এতে পঞ্জাব ও বাংলার মুসলমানরা ন্যায় বিচার পান নি।

মুসলমানদের দেওয়া এই সুবিধাগুলির পরিণতি ১৯১৯-এর ভারত সরকার আইন অনুযায়ী গঠিত, বিধানমণ্ডলগুলির গঠনগত দিকটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এটা এই রকম :

আইনসভাগুলির গঠনবিন্যাস

		নির্বাচিত সদস্য			মনোনীত সদস্য		
	সংবিধিবদ্ধ ন্যূনতম	মোট	মুসলমান	অ-মুসলমান	সরকারি	বেসরকারি	প্রকৃত মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
ব্যবস্থাপক সভা	১৪৫	১০৪	৫২	৫২	২৬	১৫	১৪৫
রাজ্য পরিষদ	৬০	৩৩	১১	২২	১৭	১০	৬০
মাদ্রাজ প্রাদেশিক পরিষদ	১১৮	৯৮	১৩	৮৫	১১	২৩	১৩২
বোম্বাই প্রাদেশিক পরিষদ	১১১	৮৬	২৭	৫৯	১৯	৯	১১৪
বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদ	১২৫	১১৪	৩৯	৭৫	১৬	১০	১৪০
যুক্তপ্রদেশ প্রাদেশিক পরিষদ	১১৮	১১০	২৯	৭১	১৭	৬	১২৩
পঞ্জাব প্রাদেশিক পরিষদ	৮৩	৭১	৩২	৩৯	১৫	৮	৯৪
বিহার প্রাদেশিক পরিষদ	৯৮	৭৬	১৮	৫৮	১৫	১২	১০৩
মধ্যপ্রদেশ প্রাদেশিক পরিষদ	৭০	৫৫	৭	৪৮	১০	৮	৭৩
অসম প্রাদেশিক পরিষদ	৫৩	৩৯	১২	২৭	৭	৭	৫৩

† 'ভারত শাসন আইন ১৯১৯', অনুচ্ছেদ ৬৭-র (২) (খ)

নিচের সারণি থেকে, 'লখনউ চুক্তি'তে মুসলমানদের অর্জিত প্রতিনিধিদের পরিধি দেখা যাবে ঃ

বিধায়ী সংস্থা (আইনসভা)	নির্বাচনী এলাকার মোট জনসংখ্যার শতাংশ হিসাবে মুসলমানদের (১৯২১-এর জনগণনা)	মোট সদস্যসংখ্যার শতাংশ হিসাবে মুসলমান সদস্যদের সংখ্যা	নির্বাচিত ভারতীয় সদস্যদের মোট সংখ্যার শতাংশ হিসাবে নির্বাচিত মুসলমান সদস্যদের সংখ্যা	ভারতীয় সাধারণ (সম্প্রদায়ভিত্তিক) নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলি থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণ আসন সমূহে মোট সদস্যসংখ্যার শতাংশ হিসাবে মুসলমান সদস্যদের সংখ্যা	লখনউ চুক্তি অনুসারে শংতাশ
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
পঞ্জাব	৫৫.২	৪০	৪৮.৫	৫০	৫০
যুক্তপ্রদেশ	১৪.৩	২৫	৩০	৩২.৫	৩০
বাংলা	৫৪.৬	৩০	৪০.৫	৪৬	৪০
বিহার ও ওড়িশা	১০.৯	১৮.৫	২৫	২৭	২৫
মধ্যপ্রদেশ	৪.৪	৯.৫	১৩	১৪.৫	১৫
মাদ্রাজ	৬.৭	১০.৫	১৪	১৬.৫	১৫
বোম্বাই	১৯.৮	২৫.৫	৩৫	৩৭	৩৩.৩
অসম	৩২.২	৩০	৩৫.৫	৩৭.৫	কোনও সংস্থান নেই
ব্যবস্থাপক সভা	২৪	২৬	৩৪	৩৮	৩৩.৩

'লখনউ চুক্তি' অনুসারে মুসলমানরা যে আনুপাতিক গুরুত্ব অর্জন করেছিল, এই সারণি তা পুরোপুরি সুষ্ঠভাবে দেখাচ্ছে না। লর্ড সাউথবরোর নেতৃত্বাধীন নির্বাচনাধিকার সমিতির প্রতিবেদন সম্পর্কে ভারত সরকার তাদের পেরিত বার্তায়* এটা ক্রমশ পরিস্ফুট করেছিলেন। পরবর্তী সারণি ওই প্রেরিত বার্তা থেকে নেওয়া

* বিধিবদ্ধ আয়োগ, ১৯২৯, প্রতিবেদন খণ্ড-I পৃ : ১৮৯

† স্তম্ভ ৩-এ বিশে, নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলি যেমন বাণিজ্য, যার সম্প্রদায়গত অনুপাত বিভিন্ন সময়ে পৃথক হতে পারে, অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অনুরূপভাবে স্তম্ভ ২ যাতে সরকারি ও বেসরকারি মনোনীত সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম ফল দেখাতে পারে।

* ভারতীয় সংবিধানিক সংস্কার (নির্বাচনাধিকার) সম্পর্কে ১৯১৯-এর ২৩শে এপ্রিল তারিখের প্রেরিত বার্তা, অনুচ্ছেদ ২১.

হয়েছে, এতে দেখা যাচ্ছে যে মুসলমানরা ১৯০৯-এ ভারত সরকার তাদের যা দিয়েছিলেন, তা তুলনায় অনেকবেশি আনুপাতিক গুরুত্ব পেয়েছিলেন 'লখনউ চুক্তি' অনুসারে।

	জনসংখ্যায় মুসলমানদের অনুপাত (শতাংশ হিসাবে) (১)	প্রস্তাবিত মুসলমান আসনের অনুপাত (শতাংশ হিসাব) (২)	(১)-এর শতাংশ হিসাবে (২) (৩)
বাংলা	৫২.৬	৪০	৭৬
বিহার ও ওড়িশা	১০.৫	২৫	২৩৮
বোম্বাই	২০.৪	৩৩.৩	১৬৩
মধ্যপ্রদেশ	৪.৩	১৫	৩৪৯
মাদ্রাজ	৬.৫	১৫	২৩১
পঞ্জাব	৫৪.৮	৫০	৯১
যুক্তপ্রদেশ	১৪.০	৩০	২১৪

১৯২৭-এ ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সংবিধানের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখতে এবং আরও সংস্কারের সুপারিশ করতে সাইমন কমিশনের নিযুক্তির ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানরা আরও রাজনৈতিক দাবি দাওয়া নিয়ে এগিয়ে এল। মুসলিম লীগ, নিখিল ভারত মুসলিম সম্মেলন, সর্বদলীয় মুসমিল সম্মেলন, জামায়েত-উল-উলেমা ও খিলাফৎ সম্মেলনের মধ্যে। মুসলমানদের বিভিন্ন মঞ্চ থেকে এই দাবিগুলি তোলা হয়। এই দাবিগুলি মূলত এক-ই ছিল। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, মুসলিম লীগের পক্ষে জিন্নাহ্-র সূত্রকারে প্রণীত দাবিগুলি অনুরূপ ছিল। এগুলি।†

এগুলি নিম্নলিখিত আকারে রাখা হয়েছিল ঃ—

১। ভবিষ্যৎ সংবিধানের আকার যুক্তরাষ্ট্রীয় হওয়া উচিত : প্রদেশগুলির হাতে থাকবে অবশিষ্ট সম্পর্কীয় ক্ষমতা।

† দাবিগুলি জিন্নাহ্-র ১৪ দফা নাম পরিচিত। বস্তুতপক্ষে এগুলির সংখ্যা ১৫ এবং এগুলি ১৯২৭-এর মার্চে দিল্লিতে সবরকম মতাবলম্বী মুসলমান নেতাদের এক বৈঠকে প্রণয়ন করা হয়েছিল। এগুলি 'দিল্লি প্রস্তাব' নামে পরিচিত। জিন্নাহ্-র ১৪ দফায় উৎস সম্পর্কে জিন্নাহ্-র ব্যবস্থার জন্য দেখুন সর্বভারতীয় পঞ্জি ১৯২৯, খণ্ড-১, পৃ : ৩৬৭

২। সবপ্রদেশকে অভিন্নমাত্রায় স্বশাসন মঞ্জুর করা উচিত।

৩। দেশে সব আইনসভা ও অন্যান্য নির্বাচিত সংস্থা, প্রদেশে সংখ্যালঘুদের পর্যাপ্ত ও কার্যকর প্রতিনিধিত্বের সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী, পুনর্গঠিত হওয়া উচিত, তবে কোনও প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠাকে সংখ্যালঘুতে বা এমনকি সমান পর্যায়েও নামিয়ে আনা যাবে না।

৪। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব এক তৃতীয়াংশের কম হবে না।

৫। সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিত্ব এখনকার মতোই পৃথক নির্বাচনমণ্ডলী দ্বারা হতে থাকবে। তবে এই শর্তে যে, যে কোন গোষ্ঠী যে কোনও সময় যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর অনুকূলে পৃর্থক নির্বাচকমণ্ডলী ছাড়ার স্বাধীনতা থাকবে।

৬। কোনও সময় প্রয়োজনে যে আঞ্চলিক পুনর্বণ্টন হতে পারে তা যেন কোনও ভাবেই পঞ্জাব, বাংলা ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠতা কে ক্ষুণ্ণ না করে।

৭। পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্থাৎ বিশ্বাস, পূজার্চ্চনা, উদ্‌যাপন, প্রচার সমিতি গঠন ও শিক্ষার স্বাধীনতা সমস্ত গোষ্ঠীর জন্য সুনিশ্চিত থাকবে।

৮। কোনও আইনসভা বা অন্য কোনও নির্বাচিত সংস্থায় কোনও বিধেয়ক বা প্রস্তাব অথবা তার অংশ বিশেষ অনুমোদিত হবে না যদি ওই বিশেষ সংস্থায় কোনও একটি গোষ্ঠীর তিন চতুর্থাংশ সদস্য এরকম বিধেয়ক বা প্রস্তাব অথবা তার অংশবিশেষের এই যুক্তিতে বিরোধিতা করে যে, এটা ওই গোষ্ঠীর স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হবে ; অথবা বিকল্প হিসাবে এরকম অন্য কোনও উপায় উদ্ভাবন করা যেতে পারে অথবা এরকম ক্ষেত্রে কার্যকর ও ব্যবহারিক কোনও উপায় পাওয়া যেতে পারে।

৯। সিন্ধুকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি থেকে আলাদা করতে হবে।

১০। অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে সমান ভিত্তিতে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তানে সংস্কার প্রবর্তন করতে হবে।

১১। প্রয়োজনীয় দক্ষতার কথা মনে রেখে রাষ্ট্রেরও স্বশাসিত সংস্থাগুলির সব চাকুরিতে অন্যান্য ভারতীয়দের সঙ্গে মুসলমানদের পর্যাপ্ত অংশ দিয়ে সংবিধানের সংস্থান রাখতে হবে।

১২। মুসলমান ধর্ম, সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত আইনের সুরক্ষার্থে এবং মুসলমানদের শিক্ষা, ভাষা, ধর্ম, ব্যক্তিগত আইন ও মুসলমান দাতব্য সংস্থাগুলির বিকাশে এবং সরকার ও স্বশাসিত সংস্থাগুলির দেওয়া সাহায্য অনুদানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের যথোচিত অংশ দিতে সংবিধানে পর্যাপ্ত রক্ষাকবচ যেন থাকে।

১৩। অন্তত এক তৃতীয়াংশ মুসলমান মন্ত্রী ছাড়া যেন কোনও কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করা না হয়।

১৪। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির সম্মতি ব্যতিরেকে কেন্দ্রীয় আইনসভা সংবিধানের কোনও পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না।

১৫। বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন আইনসভা ও অন্যান্য নির্বাচিত সংস্থায় পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব অনিবার্য। তদুপরি এই অধিকার থেকে মুসলমানদের বঞ্চিত না করার জন্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ায় নিজেদের অধিকার ও স্বার্থ ওপরে বা এখানে বর্ণিত উপায়ে সুরক্ষিত হওয়ার বিষয়ে সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত মুসলমানরা কোনও ভাবেই শর্তসাপেক্ষে বা শর্তহীনভাবে যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী কোনও ভাবেই সম্মতি দেবে না।

দ্রষ্টব্য ঃ— যে সব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেখান তাদের সংখ্যার অনুপাতে অতিরিক্ত প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি এর পরে বিবেচ্য।

মুসলমানদের দাবি সমূহে এটি একটি সংহত বিবরণ। এতে কতকগুলি দাবি আছে যেগুলি পুরনো এবং কতকগুলি নতুন। পুরনোগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কারণ লক্ষ্য হচ্ছে সেগুলি থেকে উদ্ভূত সুবিধাগুলি বজায় রাখা। মুসলমানদের অবস্থানে দুর্বলতাগুলি দূর করতে নতুন দাবিগুলি সংযোজিত হয়েছে। নতুন দাবিগুলি হচ্ছে সংখ্যায় পাঁচটি ঃ

(১) পঞ্জাব ও বাংলায় সংখ্যাগুরু মুসলমানদের জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব, (২) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় মন্ত্রিসভাতেই মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব (৩) চাকুরি সমূহে মুসলমানদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব (৪) বোম্বাই প্রেসিডেন্সি থেকে সিন্ধুকে আলাদা করা এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তানকে স্বশাসিত প্রদেশের মর্যাদায় উন্নীত করা এবং (৫) অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তে প্রদেশগুলির হাতে ন্যস্ত করা।

এই দাবিগুলির মধ্যে বোধহয় (১) (৪) (৫) ছাড়া অন্যগুলির ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। (১) ও (৪) নং দাবির উদ্দেশ্য ছিল যে চারটি প্রদেশে মুসলমান সম্প্রদায় শুধু সম্প্রদায় হিসেবেই সংখ্যাগুরু সেখানে মুসলমানদের বিধিবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেওয়া যাতে তারা যে দুটি প্রকল্পে হিন্দু সম্প্রদায়ে সংখ্যা গুরু তাদের প্রতিস্থাপক শক্তি হিসাবে কাজ করতে পারে। উভয় সম্প্রদায়-ই তাদের সংখ্যা লঘুত্বের ক্ষেত্রে সুব্যবহারের আশ্বাসএর ওপর জোর দিয়েছিল। (৫) নং দাবির উদ্দেশ্য ছিল সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, পঞ্জাব ও বাংলায় মুসলমান শাসন সুনিশ্চিত করা। কিন্তু এই সব মুসলমান প্রদেশ যদি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাহলে ওই সব প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনও কার্যকর হবে না বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল কারণ কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দু ছাড়া অন্য কারো হাতে থাকত না। কেন্দ্রে হিন্দু সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুসলমান প্রদেশগুলিকে মুক্ত করাই ছিল লক্ষ্য যার জন্য ৫ নং দাবিটি তোলা হয়েছিল।

হিন্দুরা এই দাবিগুলির বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু সেটা হয়ত খুব বড় ব্যাপার নয়। যেটা তাৎপর্য পূর্ণ তাহচ্ছে, সাইমন কমিশন এই দাবিগুলি খারিজ করে দিয়েছিলেন। সাইমন কমিশন কোনও ভাবেই মুসলমানদের প্রতি অ-মিত্র ভাবাপন্ন ছিলেন না। কমিশন মুসলমানদের দাবিগুলি খারিজ করার পক্ষে কয়েকটি অত্যন্ত অকাট্য যুক্তি দেখিয়েছিলেন। তারা বলেছিলেন * :—'এই দাবি, এতদূর পর্যন্ত চায় যে এই ছটি প্রদেশ মুসলমানদের জন্য বর্তমানে দেওয়া প্রতিনিধিত্বে পূর্ণ নিরাপত্তা রক্ষিত হোক ; এক-ই সঙ্গেই পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর সুবাদে বাংলা ও পঞ্জাবে আসন সংখ্যা বর্তমানে যে অনুপাতে মুসলমান সম্প্রদায় পেয়েছে তাকে জনসংখ্যায় মুসলমানদের সংখ্যার অনুপাতে বাড়িয়ে দেওয়া হোক। এটা উভয় প্রদেশেই, সাধারণ নির্বাচনভিত্তিক আসনগুলির একস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় সংস্থাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমানদের দেবে। আমরা এতদূরে যেতে পারি না। সম্প্রদায়গুলির মধ্যে নতুন একটি সাধারণ সমঝোতা না হলে, দুটি প্রদেশে (সম্প্রদায় ভিত্তিক) গুরুত্বের বর্তমান আপেক্ষিক আয়তন অব্যাহত রাখার বিষয়টি, বাংলা ও পঞ্জাব আসন বরাদ্দে বর্তমান অবস্থা থেকে এত বিপুল তারতম্যের সঙ্গে ন্যায়ত মেলানো যাবে না।

"ছ'টি প্রদেশে মুসলমানরা যে অত্যন্ত অধিক গুরুত্ব পায় তা তাদের বজায় থাকুক এবং এক-ই সঙ্গে হিন্দুও শিখদের বিরোধিতার মুখেও নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি কোনও আবেদন ব্যতিরেকেই পঞ্জাব ও বাংলায় মুসলমানদের নির্দিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা

---

* প্রতিবেদন, খণ্ড ২; পৃষ্ঠা-৭১

অপরিবর্তনীয় থাকুক—এমনটা হবে অন্যায়'। হিন্দু ও শিখদের বিরোধিতা এবং সাইমন কমিশন খারিজ করে দেওয়া সত্ত্বেও সালিশের ভূমিকা পালনে আহূত হয়ে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের পুরোনো ও নতুন সব দাবিই মঞ্জুর করলেন।

১৯৩২ এর ২৫শে জানুয়ারি তারিখে ভারতের 'গেজেট অব্ ইন্ডিয়ায় এক অধিসূচনা † বলে ভারত শাসন আইন ১৯১৬-র ৫২ এ ধারায় (২) উপধারা অনুযায়ী ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ঘোষণা করলেন যে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, ছোটলাটের প্রদেশ হিসাবে গণ্য হবে। ১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইন ২৮৯ ধারার উপধারা ১এ বিধৃত সংস্থান অনুসারে পরিষদে জারি করা এক আদেশবলে, ১৯৩৬-এ ১ এপ্রিল থেকে সিন্ধুকে বোম্বাইয়ের থেকে পৃথক করা হল এবং ছোটলাটের প্রদেশ হিসাবে ঘোষণা করা হল যা সিন্ধু প্রদেশে নামে পরিচিত হবে। ১৯৩৪ এর ৭ জুলাই প্রকাশিত ভারত সচিবের জারি করা এক প্রস্তাব অনুযায়ী রাজকীয় ও প্রাদেশিক সব নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি চাকুরিতে মুসলমানদের অংশ নির্ধারিত হল ২৫ শতাংশ। অবশিষ্ট ক্ষমতার ব্যাপারে, সেগুলি প্রদেশগুলির হাতে ন্যস্ত হওয়া উচিত মুসলমানদের এই দাবি গৃহীত হয়নি—এটা ঠিক। কিন্তু অন্য এক অর্থে এই ক্ষেত্রে মুসলমানদের দাবি মঞ্জুর করা হয়েছিল এমনটা মনে করা যেতে পারে। মুসলমানদের দাবির মূল কথা ছিল, অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রের ওপর ন্যস্ত হওয়া উচিত নয়। অন্যভাবে বললে, এর মানে দাঁড়ায় ওই ক্ষমতাগুলি হিন্দুদের হাতে থাকা উচিত নয়। ১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইনের ১০৪ ধারা সংক্ষেপে এটাই করেছিলে। ওই ধারা স্বেচ্ছাধীনভাবে প্রয়োগ করার জন্য বড়লাটের হাতে অবশিষ্ট ক্ষমতা ন্যস্ত করেছিল। কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্বের দাবি ওই আইনে এক বৈধানিক সংস্থানের সাহায্যে কার্যকর করা

---

† অধিসূচনা নং এফ-১৭১/৩১-আর ভারতের 'গেজেট অব্ ইন্ডিয়া' তাং, ২৫শে জানুয়ারি ১৯৩২, সাইমন কমিশন এই বলে দাবিটি নাকচ করে দিয়েছিলেন ঃ 'আমরা ব্রে কমিটির এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সংবিধানিক অগ্রগমণের উদ্দেশ্যে এখন সাংবিধানিক সংস্থান করা উচিত। .... কিন্তু আমরা এ বিষয়েও একমত যে ওই প্রদেশের পরিস্থিতি এবং ভারতের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সঙ্গে ওই প্রদেশের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক এমনই যে, বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। তাই ভারতের অন্যান্য অংশে প্রাদেশিক অঞ্চলগুলির পক্ষে উপযুক্ত হতে পারে এমন প্রস্তাবগুলি এখানে স্বতই প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।' এই বলে তাঁরা এটার কথাবার্তা দেখালেন ঃ' একজন মানুষের সিগারেট খাওয়ার সহজাত অধিকার যখন সে এক বারুদ খানায় অবশ্যই প্রয়োজনের কারণে খর্ব হবে' প্রতিবেদন, খণ্ড ২, অনুচ্ছেদ ১২০-১২১.

হয়নি। মন্ত্রিসভাগুলিতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের অধিকার অবশ্য ব্রিটিশ সরকার মেনে নিয়েছিলেন এবং একে কার্যকর করার সংস্থান ছোটলাট ও বড়লাটের জারি করা নির্দেশাবলী সংক্রান্ত নথিতে রাখা হয়েছিল, পঞ্জাব ও বাংলায় বিধিবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে বাকি দাবিটি সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার সাহায্যে কার্যকর করা হল। এটা ঠিক, সমগ্র সভায় বিধিবদ্ধ সংখ্যা গরিষ্ঠতা মুসলমানদের দেওয়া হয়নি এবং অন্যান্য স্বার্থের মানুষদের প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার প্রয়োজনে এটা করাও যায়নি। 'লখ্‌নউ চুক্তি'র আওতায় মুসলমানদের যে আনুপাতিক গুরুত্ব পেয়েছিল তাকে স্পর্শ না করেই পঞ্জাব ও বাংলায় হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের বিধিবদ্ধ সংখ্যা গরিষ্ঠতা দেওয়া হয়েছে। মুসলমান সম্প্রদায়কে ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া এইসব রাজনৈতিক অনুদানে নিরপত্তার অভাব ছিল এবং মুসলমানরা এই আশঙ্কা করেছিল তাদের স্বার্থের পক্ষে হানিকর এমন ভাবে শর্তগুলিকে পরিবর্তনের জন্য হিন্দুরা মুসলমানদের ওপর অথবা রাজ্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এই ভয়ের কারণ ছিল দুটি। এক, আমরণ অনশনের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি উপায় দলিত বর্গগুলির বিষয় বাঁটায়োরার অংশটি সংশোধনে শ্রীযুক্ত গান্ধীর সাফল্য।* এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে কিছু লোক প্রকৃত পক্ষে মুসলমানদের বিষয়ে বাঁটোয়ারার অংশটি সংশোধনের জন্য আন্দোলন করল এবং এমনকি কিছু মুসলমানকেও দেখা গেল যে তারা এ ধরনের আলোচনায় প্রবেশ করার পক্ষপাতী† এতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শঙ্কা দেখা দিল। অনুদানের শর্তগুলিতে সংশোধনের আশঙ্কার আর একটি কারণ দেখা দিয়েছিল ভারত সরকার বিধেয়কে কয়েকটি ধারার কিছু সংশোধনীয় ফলে। ব্রিটিশ আইনসভার নিম্নকক্ষ হাউস অফ কমনসে কয়েকটি শর্তাধীনে এধরনের সংশোধন অনুমোদন করে সংশোধনীগুলি আনা হয়েছিল। এইসব ভয় দূর করতে এবং অনুদানের দ্রুত ও তড়িঘড়ি সংশোধনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে সম্রাটের সরকার নিম্নলিখিত ইস্তাহারটি জারি করার অনুমোদন ভারত সরকারকে দেন ঃ

'এটা ভারত সরকারের নজরে এসেছে যে, এখন যেটা ভারত সরকার বিধেয়কে ৩০৪ খণ্ডে (প্রথম উত্থাপনের সময় বিধেয়কে ২৮৫ নং এবং কমন্স দ্বারা সমিতিতে সংশোধিত বিধেয়কে সংখ্যা ২৯৯ নং) কমন্সে অনুমোদনের সময় বিধেয়কটি

* এর পরিণতি 'পুনাচুক্তি'। এটি ১৯৩২ এর ২৪শে সেপ্টেম্বর সাক্ষরিত হয়।

† সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় মুসলমানদের অংশে সংশোধন করার প্রয়াসের বিষয়ে দেখুন, All India Register 1932, খণ্ড-২; পৃ-২৮১, ৩১৫।

এমনভাবে সংশোধিত হয়েছে যে, সাধারণভাবে সরকারের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বলে যা পরিচিত তার ভিত্তিতে উপযুক্ত মনে করলে সাংবিধানিক সংস্থানগুলি যে কোনও সময় পরিবর্তনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রাজ্য সরকারের থাকবে, এটি প্রচলিত ধারণা।

'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার কোনও পরিবর্তনের বিষয়ে এবং এরকম কোনও পরিবর্তনের সম্পর্কে রাজ্য সরকারের নিজস্ব নীতির বিষয় উভয়ক্ষেত্রেই ৩০৪ খণ্ড কার্যকর প্রভাব বলে যাকে সরকার বিবেচনা করেন, সে সম্পর্কে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়াটাকে রাজ্য সরকার কার্যবলে মনে করেন।

'এই খণ্ডের অধীনে ভারত সরকারগুলিকে ও আইনসভাগুলিকে, দশবছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর, আইন সভার গঠন সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থান ও নিয়ন্ত্রক বিভিন্ন ব্যাপার সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার আওতাভুক্ত এমন প্রশ্নগুলিও রয়েছে।

'প্রস্তাবিত সংশোধন এবং বিশেষভাবে কোনও সংখ্যালঘুর স্বার্থের ওপর এর কি প্রভাব পড়বে সে সম্পর্কে ক্ষেত্র বিশেষ বড়লাট বা ছোটলাটের অভিমত সংসদের সামনে পেশ করার এবং তিনি যে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব করছেন, সে সম্পর্কে সংসদকে জানানোর কর্তব্য এই ধারায় ভারত সচিবের ওপর বর্তায়।

'এই পদ্ধতির ফলে উদ্ভূত সাংবিধানিক সংস্থানগুলির যে কোনও পরিবর্তন পরিষদের এক আদেশ বলে কাযকর হবে। কিন্তু এটি এই শর্তসাপেক্ষে যে প্রস্তাবিত আদেশের খসড়াটি সংসদের উভয়পক্ষ এক প্রস্তাব করলে নিঃসংশয়ীয়ভাবে অনুমোদন করবে। বিধেয়কের ৩০৫ খণ্ড সাহায্যে শর্তটি সুনিশ্চিত হয়েছে।

" দশবছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগে, ভারতের সরকারগুলি ও আইনসভাগুলিকে অনুরূপ কোনও সংবিধানিক উদ্‌যাপনের কথা নেই। তবে, খণ্ডটিকে দশবছর শেষ হওয়ার আগেও পরিষদের আদেশবলে (সর্বদা সংসদের উভয়পক্ষের অনুমোদন ক্রমে) এরকম পরিবর্তন গঠনের ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে, কিন্তু, প্রথম দশ বছরের মধ্যে এবং বস্তুত পরবর্তীকালে, ভারতের আইনসভাগুলি যদি উদ্‌যোগী না হয় পরিষদের কোনও পদক্ষেপ অনুমোদনের জন্য সংসদে পেশ করার আগে, ভারত সচিবের অবশ্যকর্তব্য হবে ভারতের সরকারগুলি ও আইনসভাগুলি যারা প্রভাবিত হবে, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা (যদি পরিবর্তনটি গুরুত্বহীন না হয়)।

'পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে উল্লিখিত ক্ষমতাগুলির অবশ্যকরার কারণগুলি নিম্নরূপ ঃ—

'(ক) ভোটাধিকার ও আইনসভাগুলির গঠন বিষয়ে অপ্রধান বিষয়গুলি সংশোধনের প্রয়োজনে কখন দেখা দেবে, সে সম্পর্কে আগাম ধারণা করা অসম্ভব, এবং ধরনের সংশোধনের পক্ষে নতুনভাবে সংশোধনকারী সংসদের আইনের কমে কোনও পদ্ধতি লক্ষ্য না হলে, তা স্পষ্টতই অসুবিধাজনক হবে, এবং এ ধরনের বিস্তারিত বিষয়গুলি বিধিবদ্ধভাবে আলাদা করলে তা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হবে।'

'(খ) ভারতে সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সর্বসম্মত মতৈক্যের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে সংস্থানগুলির সংশোধন করা কাম্যও হতে পারে ; এবং মতৈক্য হয়েছে এমন পরিবর্তনের পক্ষে সংসদের আইন সংশোধন ছাড়া অন্য কোনও পদ্ধতি না থাকাও হবে অসুবিধাজনক।'

'এই ধারায় ন্যস্ত ক্ষমতা বলে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সীমার মধ্যে, রাজ সরকার, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মতৈক্য হয়নি এমন কোনও পরিবর্তনের জন্য সংসদকে সুপারিশ করা প্রস্তাব করবে না।'

'উপসংহারে, সম্রাটের সরকার আবারও এই ব্যাপারটির ওপর জোর দেবে যে ৩০৫ খণ্ডের* সংস্থান সমূহ দৃষ্টে ৩০৪ খণ্ডের কোনও ক্ষমতাই প্রয়োগ করা যাবে না, যদি না সংসদের উভয়সভা সংশয়াতীত প্রস্তাবের সাহায্যে যে বিষয়ে একমত হয়।'

'গোলটেবিল বৈঠকে' মুসলমানেরা দাবি করেছিল এবং তাদের যেসব দাবি মানা হয়েছিল, তা বিবেচনা করলে যে কেউ ভাবতে পারতেন যে, মুসলমানদের দাবিগুলি চরমসীমায় পৌচেছিল এবং ১৯৩২ এর বন্দোবস্ত ছিল চূড়ান্ত নিষ্পত্তি, কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে যে এতেও মুসলমানেরা সন্তুষ্ট নন। মুসলমানদের ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখতে নতুন নতুন দাবি-দাওয়া সম্বলিত আর একটি তালিকা তৈরি মনে হচ্ছে। ১৯০৮-এ শ্রী জিন্নাহ্ ও কংগ্রেসের মধ্যে যে বিতর্ক চলে, তাতে শ্রী জিন্নাহ্‌কে তার দাবিগুলি প্রকাশ করতে বলা হয়। কিন্তু তিনি তা করতে অসম্মত হন। কিন্তু বিতর্ক চলাকালে পণ্ডিত নেহরু ও শ্রী জিন্নাহ্-র মধ্যে শর্ত বিনিময়ের সময় এই

* ভারতীয় বার্ষিক পঞ্জীয়ক ১৯৩৮, খণ্ড-১; পৃ—৩৬৯

দাবিগুলি পরিস্ফুট হয়। শ্রী জিন্নাহ্‌কে লেখা তাঁর চিঠিগুলির একটিতে পণ্ডিত নেহরু এই দাবিগুলিকে তালিকাবদ্ধ করেন। তাঁর তৈরি তালিকা, নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে বিরোধের নিষ্পত্তি প্রয়োজন, এমন ব্যাপার হিসাবে দেখান ঃ—

(১) ১৯২৯-এ মুসলিম লীগ প্রণীত ১৪ দফা।

(২) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সবরকম বিরোধিতা কংগ্রেসকে তুলে নিতে হবে এবং এতে জাতীয়তাবাদ প্রত্যাখ্যাত বা অস্বীকৃত হয়েছে এমন কথা বলা চলবে না।

(৩) বিধিবদ্ধ আইনপ্রণয়নের মাধ্যমে সরকারি চাকুরিতে মুসলমানদের ভাগ সংবিধানে সুনির্দিষ্টভাবে ধার্য করতে হবে।

(৪) বিধির সাহায্যে মুসলমান ব্যক্তিগত আইন ও সংস্কৃতিকে সুরক্ষিত রাখতে হবে।

(৫) শহিদগঞ্জ মসজিদের ব্যাপারে আন্দোলন কংগ্রেসকে হাতে তুলে নিতে হবে এবং মুসলমানরা যাতে ওই মসজিদের অধিকার পায় তার জন্য কংগ্রেসকে তার নৈতিক চাপ কাজে লাগাতে হবে।

(৬) মুসলমানদের আজানের ডাক দেওয়া ও তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি উদ্‌যাপনের অধিকার যেন কোনও ভাবেই ক্ষুন্ন করা না হয়।

(৭) গো-হত্যা অধিকার মুসলমানদের দিতে হবে।

(৮) যে প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, সেখানে আঞ্চলিক পূনর্বণ্টন বা বিন্যাসের দ্বারা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠাকে ক্ষুন্ন করা যাবে না।

(৯) বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতটি পরিত্যাগ করতে হবে।

(১০) মুসলমানরা চায় উর্দু ভারতের জাতীয় ভাষা হোক এবং উর্দুর ব্যবহার হ্রাস বা নষ্ট করে ফেলা হবে না এই বিধিবদ্ধ আশ্বাস পেতে তারা আগ্রহী।

(১১) স্থানীয় (স্বশাসিত) সংস্থগুলিকে মুসলমানদের প্রতিনিধি, যেন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তি যে নীতি, তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে।

(১২) ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার পরিবর্তন করতে হবে অথবা মুসলিম লীগের পতকাকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

(১৩) মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের এক কর্তৃত্বমূলক ও প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

(১৪) মিলিঝুলি বা জোট সরকার গঠন করতে হবে।

এই নতুন তালিকায় পর, মুসলমানদের দাবিদাওয়া কোথায় থামবে তা জানা নেই। এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৩৮ থেকে ১৯৩৯ এর মধ্যে আর একটি দাবি, স্পষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ দাবি এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সেই দাবি হচ্ছে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মুসলমানদের ৫০ শতাংশ বা অর্ধেক ভাগ চাই। নতুন দাবিগুলির এই তালিকায় কতকগুলি দাবি যদি দায়িত্বজ্ঞানহীন নাও হয়, আপাতদৃষ্টে অতিশয় ও অসম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ, আধাআধি ভাগ ও উর্দুকে ভারতের জাতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতির জন্য দাবির প্রসঙ্গটা তুলতে পারেন। ১৯২৯-এ মুসলমানরা জোর দিয়েছিল আইনসভাগুলিতে আসনবরাদ্দের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা সংখ্যালঘু বা সমপর্যায়ে নেমে না আসে।* ১৯২৯তে মুসলমানরা মেনে নিয়েছিল যে অন্যান্য সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে এবং মুসলমানরা যেভাবে তা পাচ্ছে তারাও সেভাবেই তা পাবে। মুসলমান ও অন্য সংখ্যালঘুদের মধ্যে একমাত্র যে পার্থক্য করা হয়েছিল, তা হচ্ছে সংরক্ষণ নিয়ে, মুসলমানরা নিজেদের রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণে অন্য সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে যা মাত্রা হয়েছিল তার চেয়ে বেশি মাত্রায় সংরক্ষণ দাবি করেছিল। মুসলমানরা অন্য সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও পর্যাপ্ততাকে কখনও অস্বীকার করেনি। কিন্তু ৫০ শতাংশের এই নতুন দাবির সঙ্গে সঙ্গে, মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হিন্দুদের শুধু সংখ্যালঘুতেই পরিণত করতে চাইছে না, অন্য সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক অধিকারকেও খর্ব করছে। মুসলমানরা এখন হিটলারের ভাষায় কথা বলছে এবং জার্মানির ক্ষেত্রে হিটলার যেমন করছেন, তারাও তেমন-ই বিশ্বে একটা স্থান দাবি করছে। ৫০ শতাংশের জন্য তাদের দাবি, অন্য সংখ্যালঘুদের যাই হোক, জার্মানদের নিজেদের জন্য Deutchland Uber Alles and Le bensraaum এই দাবির প্রতিরূপ।

উর্দুকে ভারতের জাতীয় ভাষা হিসাবে, স্বীকৃতির জন্য তাদের দাবিও এক-ইরকম বাড়াবাড়ি। উর্দু একে তো সারা ভারতে বলা হয় না, তার ওপর এটা ভারতের

* শ্রী জিন্নাহ্-র ১৪ দফায় দফা-৩ দেখুন।

সব মুসলমানের ভাষাও নয়। ৬ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমানের মধ্যে মাত্র ২ কোটি ৮০ লক্ষ উর্দু বলেন।† উর্দুকে জাতীয় ভাষা করার প্রস্তাবের অর্থ ২ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমানের ভাষাকে বিশেষভাবে চারকোটি মুসলমানের ওপর এবং সাধারণভাবে ৩২ কোটি ২০ লক্ষ ভারতীয়ের ওপর চাপিয়ে দিতে হবে।

এইভাবে এটা দেখা যাবে যে সংবিধান প্রস্তাব যতোবার আসে, ততোবারই কয়েকটি রাজনৈতিক দাবি বা দাবিসমূহ নিয়ে মুসলমানরা তৈরি। মুসলমানদের দাবিগুলির এই অনির্দিষ্ট বিস্তারকে একমাত্র রোধ করতে পারে ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে কোনও বিরোধে ব্রিটিশ সরকারই চূড়ান্ত বিচারক। আস্থা সহকারে কেউ কি ভুলতে পারে যে, এই নতুন দাবিগুলি নিয়ে বিরোধ যদি সালিশির জন্য ব্রিটিশদের কাছে যায়, তাদের সিদ্ধান্ত মুসলমানদের পক্ষে যাবে না? মুসলমানরা যতো বেশি দাবি করে, ব্রিটিশরাও যেন ততোটাই মানিয়ে নিতে প্রস্তুত বলে মনে হয়।

যাই হোক না কেন, অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে ব্রিটিশরা, মুসলমানদের দাবির চেয়ে বেশি তাদের দিতে উৎসুক। এরকম দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

এগুলি একটি 'লখনউ চুক্তি' সম্পর্কিত। প্রশ্ন ছিল, ব্রিটিশরা চুক্তিটি মানবে কিনা। মন্টেগু-চেমসফোর্ড প্রতিবেদনের রচয়িতারা এটি গ্রহণ করতে অনাগ্রহী ছিলেন বেশ সারগর্ভ কয়েকটি কারণে। 'লখনউ চুক্তি'তে মুসলমানদের মঞ্জুর করা গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে যৌথ প্রতিবেদনের রচয়িতারা মন্তব্য করেছিলেন *

'এখন এই ধরনের এক সুবিধাভোগী অবস্থানের ব্যাপারে এই আপত্তি তোলা যেতে পারে যে, পৃথক প্রতিনিধিত্বের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অন্য কোনও সম্প্রদায় যদি ক্ষতিপূরণ চায়, তবে অ-মুসলমানদের আসন কমিয়ে অথবা মুসলমান ও অ-মুসলমান উভয়ের আসন আনুপাতিকভাবে কমিয়ে ওই সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করা যেতে পারে। কোনও প্রক্রিয়া অবলম্বন করা উচিত, তা নিয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের অভিমত অভিন্ন না হবার-ই সম্ভাবনা। তাই, কয়েকটি কারণে যেগুলি আমরা পরে ব্যাখ্যা করব। মুসলমানদের পৃথক প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখার বিষয়টিতে আমরা সম্মতি দিই, আমাদের সামনে উপস্থাপিত বিশেষ প্রস্তাবগুলিতে আমাদের সম্মতি দান স্থগিত রাখতে আমরা বাধ্য যতক্ষণ আমরা অন্য স্বার্থসংশ্লিষ্টদের ওপর এগুলির প্রভাব

† ১৯২১-এর জনগণনা অনুসারে প্রাপ্ত এই পরিসংখ্যান।

* মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড প্রতিবেদন ১৯১৮; অনু-১৬৩

নির্ধারণ করি এবং তাদের জন্য সঙ্গত সংস্থান রাখি।'

'লখনউ চুক্তি'তে গুরুতর ত্রুটি সত্ত্বেও, ভারত সরকার ওপরে বর্ণিত তাদের বিবরণীতে এই সুপারিশ করেন যে বাংলার মুসলমানদের ব্যাপারে চুক্তির শর্তগুলিকে উন্নত করতে হবে। এর কারণ পড়লে খুব অদ্ভুত লাগে, এতে যুক্তি দেখানো হয়েছিল —

'বাংলার ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য তাঁরা (চুক্তির রচয়িতা) প্রস্তাব করেছেন, তা স্পষ্টই অপর্যাপ্ত†। প্রশ্ন তোলা যেতে পারে কংগ্রেস লীগ চুক্তি যখন তৈরি হচ্ছিল, তখন পূর্ববাংলার মুসলমান জনতার দাবিগুলির ওপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছিল কিনা। তাঁরা সুস্পষ্টভাবেই এক অনগ্রসর ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট সম্প্রদায়। ১৯১২ সালে প্রেসিডেন্সির পুনর্বিভাজন তাদের কাছ দারুণ হতাশা নিয়ে এসেছে এবং তাদের স্বার্থ যাতে তখন উদারভাবে সুরক্ষিত থাকে, তা দেখা থেকে আমরা যেন আদৌ বিমুখ না হই। বেশি নয়, বাংলায় মুসলমানদের তাদের সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব দিতে আমাদের উচিত তাদের জন্য ৩৪টির বদলে ৪৪টি চুক্তি অনুসারে ৪৪টি আসন বরাদ্দ করা।

বাংলার মুসলমানদের জন্য ভারত সরকারের এই উৎসাহের অংশীদার ব্রিটিশ সরকার হন নি। ব্রিটিশ সরকার মনে করেছিলেন, বাংলার মুসলমানরা যে সংখ্যক আসন পেয়েছেন, তা একটি চুক্তির ফলে। চুক্তির সাহায্য নিয়ে যেখানে বিরোধ নেই সেখানে দরকষাকষির এই ফলকে আরও ভাল করতে যে কোনও হস্তক্ষেপ এই ধারণারই জন্ম দেবে যে ব্রিটিশ সরকার কোনও বিশেষ অর্থে ও বিশেষ কারণে মুসলমানদের বন্ধু। আসনসংখ্যার ওই বৃদ্ধির সুপারিশ করে, ভারত সরকার চুক্তিতে কেন পঞ্জাব ও বাংলার মুসলমানদের জনসংখ্যার অনুপাতে আসন দেওয়া হয়নি, সেই কারণটি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সম্প্রদায় মাত্রই রাজনৈতিক সংরক্ষণের অধিকারী নয়, এই নীতির ওপর 'লখনউ চুক্তি' প্রতিষ্ঠিত ছিল, যদিও সেই নীতি তখন জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। সংখ্যালঘু হলে, একটি সম্প্রদায় এই সংরক্ষণের অধিকারী 'লখনউ চুক্তি'র ভিত্তি ছিল এই নীতি। পঞ্জাব ও বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যালঘু ছিল না। পরে তাই অন্যান্য প্রদেশ, যেখানে তারা সংখ্যালঘু ছিল, সেখানে তারা যে সংরক্ষণ পেয়েছিল, সেরকম সংরক্ষণ পঞ্জাবে ও

† ভারত সরকার মনে করেছিলেন যে, পঞ্জাবের প্রতিও অন্যায় হয়েছে। বাংলার ক্ষেত্রে বাংলা ভাগ করার মতো বিশেষ কারণ ছিল, কিন্তু পঞ্জাবের এমন বিশেষ কারণ না থাকায় চুক্তি নির্ধারিত প্রতিনিধিত্বকে বাড়ানোর প্রস্তাব ভারত সরকার করে নি।

বাংলাতে তারা পায়নি। সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও পঞ্জাব ও বাংলার মুসলমানেরা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর প্রয়োজন অনুভব করেছিল। চুক্তির আধার স্বরূপ নীতি অনুযায়ী তারা আসনের সংখ্যালঘু অংশে রাজি হয়েই শুধু এই উপযুক্ততা অর্জন করতে পারত। বাংলা ও পঞ্জাবের মুসলমানদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসনের গরিষ্ঠ অংশ প্রাপ্য হলেও, তা না পাওয়ার এটাই ছিল কারণ।*

বাংলার মুসলমানদের তারা যা চেয়েছিল, তার থেকে বেশি দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়নি। কিন্তু তারা যে এরকম করতে চেয়েছিল, সেটা তাদের অভিপ্রায়ের প্রমাণ হিসাবে রয়েছে।

সালিশি হিসাবে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানরা যা চেয়েছিল তার চেয়ে বেশি দিয়েছিল, এমন দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে ১৯৩২-এ সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তে দেওয়া হয়। স্যার মহম্মদ শফি, গোলটেবিল বৈঠকের সংখ্যালঘু বিষয়েও উপসমিতিতে দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব করেছিলেন। ১৯৩১-এ ৬ই জানুয়ারি স্যার মহম্মদ শফি সাম্প্রদায়িক নিষ্পত্তির ভিত্তি হিসাবে নিম্নলিখিত প্রস্তাব দিয়েছিলেন ✝ ঃ—

'আমার দেওয়া শর্ত অনুসারে আমরা যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী গ্রহণে প্রস্তুত আছি। প্রথমত মুসলমানরা সংখ্যালঘু এমন প্রদেশগুলিতে বর্তমানে তারা যে অধিকার ভোগ করেন, তা অব্যাহত রাখতে হবে। পঞ্জাব ও বাংলায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে তাদের প্রতিনিধিত্ব ও দুটি যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী থাকা উচিত মৌলানা মহম্মদ আলির

---

* সংশ্লিষ্ট চুক্তির পক্ষ হিসাবে যে মুসলমানেরা ছিলেন, তারা যে এটা ভালোভাবেই বুঝেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। ১৯১৯-এর ভারত সরকার বিধেয়ক সম্পর্কে সংসদ একটি যৌথ চয়ন সমিতি নিয়োগ করেছিলেন। তার সামনে সাক্ষী হিসাবে হাজির হয়ে প্রশ্ন সংখ্যা ৩৮০৮এর উত্তরে শ্রী জিন্নাহ্ যা বলেছিলেন, তা হচ্ছে : "বাংলার অবস্থাটা এই রকম : বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ আর চুক্তি হয়েছিল যে কোনো জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী দাবি করতে পারবে না : সংখ্যালঘুকে রক্ষার জন্যই হোক নির্বাচকমণ্ডলী। কিন্তু পাল্টা যুক্তিও পুরোপুরি সত্য যে, সংখ্যার বিচারে আমরা সংখ্যাগুরু, কিন্তু ভোটদাতা হিসাবে বাংলায় আমরা সংখ্যালঘু, দারিদ্র্য অনগ্রসরতা এমন সব কারণে। বলা হয়েছিল : ঠিক আছে, তাহলে ৪০ শতাংশ ধার্য কর, কারণ সত্যিই যদি তোমাদের পরীক্ষা দিতে হয়, তোমরা ৪০ শতাংশ পাবে না। কারণ ভোটদাতা হবার যোগ্যতা তোমাদের থাকবে না। তাছাড়া, অন্যান্য প্রদেশে আমাদের সুবিধা ছিল।"

✝ 'প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে'র সংখ্যালঘু বিষয়ক উপসমিতির প্রতিবেদন (ভারতীয় সংস্করণ); পৃ: ৯৬

শর্তের সঙ্গে সংরক্ষণের নীতিকে যুক্ত করা উচিত।'†

১৯৩১-এর ১৪ই জানুয়ারি এক-ই সমিতিতে তিনি তাঁর বক্তব্যে অন্য প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন ‡

'আজ আমি এই প্রস্তাব করতে অধিকার প্রাপ্ত যে, পঞ্জাবে মুসলমানেরা সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে সমগ্র সভার মোট আসন সংখ্যার ৪৯ শতাংশ যেন পায়, ওই প্রদেশে যে বিশেষ নির্বাচনক্ষেত্র সৃষ্টির প্রস্তাব রয়েছে, সেই নির্বাচনক্ষেত্রগুলিতে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার স্বাধীনতা যেন থাকে। বাংলার ক্ষেত্রে, সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে মুসলমানেরা যেন সমগ্র সভায় ৪৬ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব পায় এবং ওই প্রদেশ যে বিশেষ নির্বাচনক্ষেত্র সৃষ্টির প্রস্তাব রয়েছে, তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় স্বাধীনতা যেন তাদের থাকে। মুসলমানেরা সংখ্যালঘু এমন প্রদেশের ক্ষেত্রে, তারা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে বর্তমানে যে গুরুত্ব পেয়ে থাকে, তা যেন বজায় থাকে। সিন্ধুতে আমাদের, হিন্দু ভাইদের এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্তে প্রদেশ আমাদের হিন্দু ও শিখভাইদের অনুরূপ গুরুত্ব দিতে হবে। এরপর কোনও সময় যদি কোনও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা বা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় কোনও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের দুই তৃতীয়াংশ সম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী পরিত্যাগ করতে এবং যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী গ্রহণ করতে চায়, তখন যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা চালু হওয়া উচিত।"

দুটি প্রস্তাবের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। বিধিবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠাতা যেন যৌথ নির্বাচক মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত থাকে। যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর বিধিবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠতা যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে চাই সংখ্যালঘু আসনের সঙ্গে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী।' ব্রিটিশ সরকার বিধিবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি মেনে নিলেন, ও দ্বিতীয় দাবি থেকে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী এবং মুসলমানরা দুটি না চাইলেও তাঁদের দুটিই দিলেন।

দ্বিতীয় যে জিনিসটি দেখার মতো তা হচ্ছে হিন্দুদের দুর্বলতাগুলিকে মুসলমানদের কাজে লাগানার মানসিকতা মনে হয়, হিন্দুরা যদি কোনও কিছুতে আপত্তি করে, মুসলমানদের নীতি তার ওপর জোর দেওয়া এবং তখন-ই তা ছেড়ে দেওয়া যখন

---

† শ্রীমহম্মদ আলির সূত্র ছিল, যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর ও সংরক্ষিত আসনের পক্ষে এই শর্তে যে নিজের সম্প্রদায়ের ভোটের অন্তত ৪০ শতাংশ এবং অন্য সম্প্রদায়ের ভোটের ৫০ শতাংশ না পেলে কোনও প্রার্থীকেই নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে না।

‡ 'গোল টেবিল বৈঠকের সংখ্যালঘু বিষয়ক উপসমিতির প্রতিবেদন (ভারতীয় সংস্করণ); পৃঃ-১২৩

হিন্দুরা দেখাবে যে মুসলমানদের অন্য কিছু সুবিধাদানের মাধ্যমে তারা একটা দিতে প্রস্তুত। এর একটা উদাহরণ হিসাবে পৃথক ও যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর প্রশ্নটির উল্লেখ কেউ করতে পারে। আমি মনে করি, যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী নিয়ে হিন্দুদের লড়াই করাটা বোকামি। বিশেষ করে মুসলমানরা সংখ্যালঘু এমন প্রদেশগুলিতে। যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী, কখনওই জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসাবে যথেষ্ট হতে পারে না। জাতীয়তবাদ রাজনৈতিক সম্পর্কে বা নগদ সম্পর্কের ব্যাপার নয়। এর সহজ কারণ এই যে যুক্তরাষ্ট্র, শুধু বহির্ভাগগুলির হিসাবনিকাশের পরিণতি হতে পারে না। দুটি সম্প্রদায় যেখানে পাঁচ বছরের জন্য একান্ত ও আত্ম-অন্তরীণ জীবন যাপন করে, সেখানে তারা এক হবে না, কারণ, নির্বাচনে ভোট দেবার উদ্দেশ্য পাঁচ বছরে একদিন তারা একসঙ্গে আসতে বাধ্য হয়। যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ক্রীতদাসে পরিণত করতে পারে : কিন্তু জাতীয়তাবাদের জন্ম দিতে পারে না। সেটাই হোক, যেহেতু হিন্দুরা যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর ওপর জোর দিচ্ছে, মুসলমানেরা জোর দিচ্ছে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ওপর। এই জোরাজুরি যে শুধু দর কষাকষির ব্যাপার, তা দেখা যায় শ্রী জিন্নাহ্‌র ১৪ দফা * এবং ১৯২৭-এর ৩০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কলকাতা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব† থেকে। সেখানে এটা সন্নিবেশিত হল যে হিন্দুরা যখন সিন্ধুর বিভাজন এবং উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে স্বশাসিত প্রদেশের মর্যাদায় উন্নীত করতে রাজি হবে, তখন-ই শুধু মুসলমানেরা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী দাবি পরিত্যাগ করতে সম্মত হবে। স্পষ্টতই মুসলমানরা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীকে ** গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে নি। তারা এটাকে দেখেছিল তাদের অন্যান্য দাবি আদায়ের ভালো উপায় হিসাবে।

এই শোষণ মানসিকতার আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় গো-হত্যা ও মসজিদের সামনে বাজনা বন্ধ করার জন্য তাদের জোরাজুরিতে। কোরবানির উদ্দেশ্য গো-হত্যার ওপর ঐস্লামিক আইনে জোর দেওয়া হয় না, আর কোনও মুসলমান-ই হজে গেলে মক্কা বা মদিনায় গরু কোরবানি করে না। কিন্তু ভারতে অন্য কোনও পশু কোরবানি করে তারা সন্তুষ্ট হবে না। সব মুসলমান দেশে কোনও আপত্তি ছাড়াই মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো যেতে পারে। এমনকি আফগানিস্তান, যা ধর্মনিরপেক্ষীকৃত (Secularised) দেখা নয়, সেখানেও মসজিদের সামনে বাজনায়

* শ্রী জিন্নাহ্-র পেশ করা দরকার দফা সংখ্যা ১৫ দেখুন।

† প্রস্তাব ও তার ওপর শ্রী বরকত আলির ভাষণের জন্য দেখুন ভারতীয় ত্রৈমাসিক পঞ্জিয়ক, ১৯২৭, খন্ড-২, পৃ : ৪৪৭-৪৮

** হিন্দুদের দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, তারা যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী পায়নি, যদিও মুসলমানরা তা পেয়েছিল।

আপত্তি জানানো হয় না। কিন্তু ভারতে মুসলমানেরা অন্য কোনও কারণে নয়, শুধু হিন্দুরা বাজনা বাজানোর অধিকার দাবি করে বলেই তা বন্ধ করার জন্য জোরাজুরি করবে।

তৃতীয় যে জিনিসটি দেখায় তা হচ্ছে রাজনীতিতে, মুসলমানদের দুবৃত্ততামূলক পদ্ধতি অবলম্বন। দুবৃত্ততা যে তাদের রাজনৈতিক কৌশলের নিশ্চিত অংশ হয়ে উঠেছে, দাঙ্গাগুলি তার পর্যাপ্ত ইঙ্গিত বহন করে। চেকদের* বিরুদ্ধে সুদেতান জর্মনরা যে উপায় প্রয়োগ করেছিল, মনে হয় মুসলমানরা সচেতনভাবে ও উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে ওই জার্মানদের অনুকরণ করছে।† মুসলমানরা যতক্ষণ ছিল আক্রমণকারী, হিন্দুরা নিষ্ক্রিয় এবং সংঘর্ষে মুসলমানদের চেয়ে তার বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু এখন আর এটা সত্য নয়। হিন্দুরা প্রতিশোধ নিতে শিখেছে এবং একজন মুসলমানকে ছুরিকাঘাত করতে সে আর এখন কোনও আত্মগ্লানি অনুভব করে না। এই প্রতিশোধের মনোবৃত্তি দুবৃত্ততার বিরুদ্ধে দুবৃত্ততার কুৎসিত দৃশ্যে অবতারণাকে সম্ভব করে তোলে।

এই সমস্যার মোকাবিলা কিভাবে করা যায় তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। সরলমনস্ক হিন্দু মহাসভার দেশপ্রেমিকরা বিশ্বাস করেন, মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে হিন্দুদের মনস্থির করতে হবে আর তা হলেই মুসলমানদের টনক নড়বে। অন্যদিকে আছে, কংগ্রেসের হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা যাদের নীতি হচ্ছে সহিষ্ণুতা এবং রাজনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা দিয়ে মুসলমানদের শান্ত করা। কারণ তাঁদের বিশ্বাস, তাঁদের দাবি মুসলমানরা সমর্থন না করলে স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে তাঁরা পৌঁছতে পারবেন না। হিন্দু মহাসভার পরিকল্পনা কোনওভাবে ঐক্যের নয়। বরং এটা প্রগতির পক্ষে এক নিশ্চিত প্রতিবন্ধক। হিন্দুমহাসভা সভাপতির স্লোগান "হিন্দুস্তান হিন্দুদের জন্য" শুধু ঔদ্ধত্যপূর্ণ তাই নয়, এটা ডাহা নির্বুধিতা ; তবে প্রশ্ন হচ্ছে, কংগ্রেসের পথ কি সঠিক পথ? আমার মনে হয় কংগ্রেস দুটি জিনিস উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রথম যে জিনিসটি কংগ্রেস উপলব্ধি করতে পারেনি তা হচ্ছে, তোষণ করা ও নিষ্পত্তি করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তার এই পার্থক্যটা খুব মৌলিক। তোষণের অর্থ, এই সময়ে আক্রমণকারীর

---

† নিখিলভারত মুসলিম লীগের করাচি অধিবেশনে শ্রী জিন্না ও স্যার আব্দুল হারুন উভয়েই ভারতের মুসলমানদের মুসলিম বিশ্বের Sueten এর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এবং বলেছিলেন চেকোস্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে Sudeten জার্মানরা যা করেছিল ভারতের মুসলমানরা সেরকম করতে সক্ষম।

অসন্তোষের শিকার যেসব মানুষ তাদের বিরুদ্ধে তার হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুঠের মতো কাজকে উপেক্ষা করে কোনও কিছুর বিনিময়ে তাকে বশীভূত করা। অন্যদিকে নিষ্পত্তির অর্থ, কোনও পক্ষই উলঙ্ঘন করতে পারবে না এমন সীমা বেঁধে দেওয়া। তোষণ আক্রমণকারীর দাবি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে কোনও সীমা নির্দেশ করে না। নিষ্পত্তি তা করে। দ্বিতীয় যে জিনিসটি কংগ্রেস উপলব্ধি করতে পারেনি, তা হচ্ছে সুবিধাদানের নীতি মুসলমানদের আক্রমণাত্মক ভাবকে বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তার চেয়ে ও যেটা করা বা, এই সব সুবিধাকে মুসলমানরা হিন্দুদের পরাজয়ী মনোভাব ও প্রতিরোধের অভাবের চিহ্ন হিসাবে দেখে। হিটলারের প্রতি তোষণনীতির ফলে, মিত্রশক্তি নিজেকে যে অবস্থায় ফেলেছে, হিন্দুদের ও সেইরকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে ফেলবে। এটি আর একটি অস্বস্তি এবং সামাজিক অচলায়তনের যে অস্বস্তি তার চেয়ে এটি কম নয়। তোষণ অবশ্যই এই অস্বস্তিকে আরও বাড়াবে। এর একমাত্র নিরাময় হচ্ছে নিষ্পত্তি, পাকিস্তান যদি নিষ্পত্তি হয়, তবে সেটি একটি বিবেচনাযোগ্য প্রস্তাব। নিষ্পত্তি হিসাবে, এটা অবিরাম তোষণের প্রয়োজনীয়তাকে শেষ করবে এবং হিন্দুদের সঙ্গে ব্যবহারে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার দরুন উদ্ভূত নিরাপত্তাহীনতার জায়গায় যাঁরা নিষ্পত্তির শান্তি ও স্থিরতা চান, তাঁদের এটাকে স্বাগত জানানো উচিত।

□ □ □

অধ্যায়-১২

জাতীয় নৈরাশ্য

ধরা যাক, একজন ভারতীয়কে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমার দেশের সর্বোচ্চ কোন্ ভবিষ্যৎ তোমার কাম্য? তার উত্তর কী হবে, প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ এবং উত্তরটি নির্দেশমূলক না হয়ে পারে না।

কোনও সন্দেহ নেই আর সব কিছু ঠিক থাকলে দেশের জন্য গর্বিত শতকরা একশো ভাগ ভারতীয় এমন কথাই বলবে, 'আমার কাছে ভারতের আদর্শ ভাগ্যলিপি হচ্ছে এক অখণ্ড ও স্বাধীন ভারত।' সমানভাবে এটাও সত্যি যে এই ভবিতব্যটা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের দ্বারাই গৃহীত না হলে, এই আদর্শ শুধু একটি শুভ ইচ্ছাকেই ব্যক্ত করবে, কখনও সুনির্দিষ্ট আকার নেবে না। এটা শুধু কী একজনের শুভ ইচ্ছা, অথবা সকলের পক্ষে অনুসরণযোগ্য একটি লক্ষ্য?

রাজনৈতিক লক্ষ্য সমূহের স্বীকৃতিকে ধরলে, সব দল-ই এর সঙ্গে একমত, কারণ তাদের সকলেই ঘোষণা করেছে যে, ভারতের রাজনৈতিক বিবর্তনের লক্ষ্য স্বাধীনতা। কংগ্রেস হচ্ছে প্রথম দল যারা ঘোষণা করেছিল যে, তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা। ১৯২৭- এ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত দলের মাদ্রাজ অধিবেনে এক বিশেষ প্রস্তাবে, ভারতীয় জনগণের লক্ষ্য পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা, এই মর্মে কংগ্রেসের বিশ্বাস ঘোষিত হল। ১৯৩২ পর্যন্ত হিন্দুমহাসভা, ভারতের রাজনৈতিক বিবর্তনের লক্ষ্য হিসাবে একটি দায়িত্বশীল সরকার পেলেই সন্তুষ্ট ছিল। ১৯৩৭ পর্যন্ত তারা তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসে কোনও পরিবর্তন ঘটায় নি। ওই বছর (১৯৩৭) তাদের আমেদাবাদ অধিবেশনে ঘোষণা করল যে, হিন্দুমহাসভা ভারতের জন্য পূর্ণ স্বরাজ বা নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। মুসলিম লীগ, ১৯১২তে ঘোষণা করেছিল যে, তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস হচ্ছে, ভারতে একটি দায়িত্বশীল সরকার

---

* মাদ্রাজে কংগ্রেসে মত পরিবর্তিত হল না। ১৯২৯-এর ৩১শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে এই মত পরিবর্তিত হয়েছিল। মাদ্রাজ অধিবেশনে স্বাধীনতার সপক্ষে শুধু একটি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছিল। ১৯২৮-এর ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত কলকাতা অধিবেশনে শ্রী গান্ধী ও কংগ্রেস সভাপতি উভয়েই নিজের থেকে ঘোষণা করলেন যে ১৯২৯-এর ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রির মধ্যে ব্রিটিশ সরকার দিতে চাইলে Dominion State বা অধিরাজ্যের মর্যাদা গ্রহণ করতে তাঁরা প্রস্তুত।

স্থাপন। ১৯৩৭-এ তারাও তাদের বিশ্বাসকে দায়িত্বশীল সরকার থেকে স্বাধীনতায় পরিবর্তন করে সমানভাবে এগিয়ে আসে। এইভাবে তারাও নিজেদের কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে এক-ই অবস্থানে নিয়ে আসে।

তিনটি রাজনৈতিক সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী স্বাধীনতার অর্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তি। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজবাদের চোয়াল থেকে মুক্তি নিয়ে মতৈক্য যথেষ্ট নয়। স্বাধীন ভারতকে কিভাবে বজায় রাখা হবে তা নিয়েও মতৈক্য হতে হবে। এর জন্য এনিয়ে মতৈক্য থাকতে হবে যে, ভারত শুধু ব্রিটিশদের থেকেই মুক্ত ও স্বাধীন হবে না, অন্য কোনও বিদেশি শক্তির হাতে যেতে ও এর স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। বস্তুত, ব্রিটিশের কাছ থেকে শুধু মুক্তি অর্জনের চেয়েও তার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার দায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দায় সম্পর্কে, এক-ই রকম অভিন্ন মত আছে বলে মনে হয় না। যাই হোক না কেন, এই বিষয়ে মুসলমানদের মনোভাব খুব স্বস্তিদায়ক নয়। মুসলমানদের বহু উক্তি থেকে এটা স্পষ্ট যে, ভারতের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার দায় তারা গ্রহণ করবে না। আমি নিচে এরকম দুটি উক্তির উল্লেখ করছি।

১৯২৫-এ লাহোরে অনুষ্ঠিত এক সভায় ডকটর কিচলু বলেছিলেন* :—

"খিলাফৎ কমিটি প্রাণিত না করা পর্যন্ত কংগ্রেস ছিল নিষ্প্রাণ। খিলাফৎ কমিটি যখন এতে যোগ দিল, ৪০ বছরে হিন্দু কংগ্রেস যা করেনি, তা তারা একবছরেই করল। সাত কোটি অস্পৃশ্যকে উন্নীত করার কাজও তারা করল। এই কাজটা ছিল পুরোপুরিভাবে হিন্দুদের, তবুও কংগ্রেসের অর্থ এতে ব্যয় করা হল। আমার ও আমার মুসলমান ভাইদের টাকা এতে জলের খরচ করা হল। কিন্তু সাহসী মুসলমানেরা তাতে কিছু মনে করেন নি, তাহলে মুসলমানরা যখন তাঞ্জিমের কাজ হাতে নেয়, এবং যে টাকা হিন্দু বা কংগ্রেস কারোর-ই নয়, সে টাকা তাতে ব্যয় করে। তাহলে হিন্দুরা কেন আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করবে?

'আমরা যদি এই দেশ থেকে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাই এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করি এবং যদি আফগান বা অন্য মুসলমানরা ভারত আক্রমণ করে, তখন আমরা মুসলমানরা তাদের বিরোধিতা করব এবং আক্রমণ থেকে দেশকে বাঁচাতে আমাদের সব সন্তানদের উৎসর্গ করব। কিন্তু একটা কথা আমি খুব চাঁছাছোলা ভাবে ঘোষণা করব। শুনুন, আমার হিন্দু ভাইয়েরা, খুব মনোযোগসহকারে শুনুন। আমাদের তাঞ্জিম

* Through Indian Eyes, Times of India, dated 14-3-25

আন্দোলনের পথে যদি আপনারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন, এবং আমাদের অধিকার আমাদের না দেন, তবে আমরা আফগানিস্তান বা অন্য কোনও মুসলমান শক্তির সঙ্গে আমরা হাত মেলাব এবং এদেশে আমাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করব।'

মৌলানা আজাদ শোভানি, ১৯৩৯-এর ২৭শে জানুয়ারি সিলেটে (শ্রীহট্টে) তাঁর বক্তৃতায়† যে মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন, তা অনুধাবনের অপেক্ষা রাখে। এক মৌলানার প্রশ্নের উত্তরে মৌলানা আজাদ শোভানি বলেছিলেন—

'এদেশ থেকে ইংরেজকে বিতাড়িত করার পক্ষে ভারতে যদি কোনও বিশিষ্ট নেতা থাকেন, তবে আমিই সেই নেতা। এসত্ত্বেও আমি চাই মুসলিম লীগের পক্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোনও লড়াই যেন না হয়। আমাদের বড় লড়াই যারা সংখ্যাগুরু, সেই ২২ কোটি হিন্দু শত্রুর বিরুদ্ধে। মাত্র সাড়ে চার কোটি ইংরেজ, শক্তিমান হয়ে কার্যত সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করছে। আর এই ২২ কোটি হিন্দু যারা বিদ্যা, বুদ্ধিমত্তা ও ধনসম্পদের দিক থেকেও এগিয়ে, তারা যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে হিন্দুরা ইয়াজুজ-মজুজ-এর মতো মুসলমান ভারতকে গ্রাস করবে, এমনকি ক্রমে ক্রমে মিশর, তুরস্ক, কাবুল, মক্কা, মদিনা এবং অন্যান্য মুসলমান প্রধান অঞ্চলতেও (কুরআন এরকম উল্লেখ রয়েছে যে পৃথিবী ধ্বংসের আগে তাঁরা পৃথিবীতে অবির্ভূত হবে এবং যা দেখবে তাই গ্রাস করবে)।

'ইংরেজরা ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে.......অদূর ভবিষ্যতে তারা ভারত থেকে চলে যাবে। তাই আমরা যদি ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু হিন্দুদের বিরুদ্ধে এখন থেকে লড়াই এবং তাদের দুর্বল না করি, তাহলে তারা ভারতে শুধু রামরাজ্যই স্থাপন করবে না, ক্রমশ সারাবিশ্বে ছড়িয়েও যাবে। হিন্দুদের শক্তিশালী বা দুর্বল করা নির্ভর করছে ৯ কোটি ভারতীয় মুসলমানের ওপর। তাই প্রতিটি ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানের আবশ্যিক কর্তব্য হচ্ছে, মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে লড়াই চালানো যাতে হিন্দুরা এখানে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে এবং ইংরেজদের যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

'যদিও ইংরেজরা মুসলমানদের শত্রু, তাহলেও আপাতত আমাদের যুদ্ধ ইংরেজদের সঙ্গে নয়। প্রথমে মুসলিম লীগের মাধ্যমে হিন্দুদের সঙ্গে কিছু বুঝাপড়ায়

† বক্তৃতার বাংলা বয়ান আনন্দবাজার পত্রিকায় বেরিয়েছিল এখান দেওয়া এর ইংরাজী অনুবাদ Hidustan Standrad-এর সম্পাদক আমার জন্য করেছেন।

আমাদের আসতে হবে। পরে আমরা সহজেই ইংরেজদের বিতাড়িত করতে এবং ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব।

'সাবধান! কংগ্রেস মৌলবিদের ফাঁদে পা দিও না ; কারণ মুসলমান ভাগ্য ২২ কোটি হিন্দু শত্রুর হাতে কখন ওই নিরাপদ নয়।'

আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিকের বিবরণ অনুযায়ী মৌলানা আজাদ শোভানি তখন কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের ওপর নিপীড়নের বিভিন্ন কাল্পনিক ঘটনা বর্ণনা করেন।

'তিনি বলেন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের পর কংগ্রেস যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করল, তার মনে হল মুসলমান স্বার্থ হিন্দুপ্রধান কংগ্রেসের হাতে নিরাপদ নয় ; কিন্তু হিন্দু নেতারা এব্যাপারে উদাসীন ভাব দেখালেন এবং সেই কারণে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে লীগে যোগ দিলেন। তিনি যে ভয় করেছিলেন, কংগ্রেসমন্ত্রীরা বাস্তবে তাই ঘটালেন। ভবিষ্যতের পূর্বাভাষ দেওয়াকেই রাজনীতি বলে তাই তিনি একজন বড় রাজনীতিক। আবার তারা ভাবছিলেন যে, ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে, বলপ্রয়োগ অথবা বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে হিন্দুদের সঙ্গে কোনও একরকম বোঝাপড়ায় পৌছাতে হবে। অন্যথায় হিন্দু যারা ৭০০ বছর ধরে মুসলমানদের ক্রীতদাস ছিল, মুসলমানদের দাসে পরিণত করবে।'

মুসলমানদের মনের ভাবনা কী, সে সম্পর্কে হিন্দুরা অবহিত এবং স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে মুসলমানরা তাদের দাসে পরিণত করবে। এই সম্ভাবনায় ভীত। ফলে স্বাধীনতাকে ভারতের রাজনৈতিক বিবর্তনের লক্ষ্য করার ব্যাপারে হিন্দুরা অনাসক্ত। বিচার করার যোগ্য নয় এমন লোকেদের ভয় এগুলো নয়, এবং স্বাধীনতার লক্ষ্যে যাত্রার বিষয়ে আশঙ্কা যে হিন্দুরা প্রকাশ করেছিলেন, তারা মুসলমান নেতাদের সঙ্গে সংস্পর্শের সুবাদে স্পষ্টতই এ বিষয় উপযুক্ত দিলেন।

শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ট বলেন *—

'ভারতের মুসলমানদের সম্পর্কে আর একটি গুরুতর প্রশ্ন ওঠে। মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে সম্পর্ক যদি 'লখনউ চুক্তি'র সময়কার মতো হয়, তবে প্রশ্নটি ততটা জরুরি হবে না, যদিও তাহলেও এটা আজ হোক কাল হোক স্বাধীন ভারতে নিশ্চিত ভাবেই উঠবে। কিন্তু খিলাফৎ আন্দোলনের সময় অবস্থা বদলাছে এবং

* Th e Future Indian Politics; পৃঃ ৩০১-৩০৫

বিগত বছরগুলিতে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অন্তর্নিহিত ঘৃণার মনোভাব নগ্ন ও নির্লজ্জভাবে মাথা চাড়া দিয়েছে। এটা, খিলাফৎ ধর্ম যুদ্ধকে উৎসাহদানের ফলে ভারতের ওপর যে বহু আঘাত নেমে এসেছে, তারই একটি। আমরা দেখেছি ব্যবহারি রাজনীতির নির্দেশক হিসাবে মুসলমানদের তরবারির পুরানো ধর্মের পুনরুজ্জীবন, আমরা দেখেছি শতাব্দীর বিস্ফোরণকে জোর করে বাইরে টেনে আনা, সেই পুরানো একাধিকার, আরবের দ্বীপ জাজিরুৎ-আবরকে পুণ্যজমি হিসাবে দাবি করা যেখানে একজন অমুসলমানের পা পড়তে পারে না, আমরা শুনেছি মুসলমান নেতাদের ঘোষণা যে আফগানরা যদি ভারত আক্রমণ করে, তারা তাদের সমবিশ্বাসীদের সঙ্গে যোগ দেবে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে মাতৃভূমির রক্ষাকারী হিন্দুদের হত্যা করবে; আমরা দেখাতে বাধ্য হয়েছি যে মুসলমানদের প্রধান অনুগত্য ঐস্লামিক দেশগুলির প্রতি, আমাদের মাতৃভূমির প্রতি নয়; আমরা জেনেছি তাদের প্রিয় সে আশা "ভগবানের রাজত্ব" প্রতিষ্ঠা করা, সেই ভগবান তাদের সমস্ত সৃষ্টিকে ভালবাসাদায়কারী বিশ্ব পিতা নন; তাঁকে দেখা হয় মুসলমানদের দৃষ্টির আলোকে যিনি ইলহামের সাহায্যে অবিশ্বাসীদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর আদেশ দিচ্ছেন। যেমন, আদি হিব্রুদের মোসি জিহোভা, যখন তারা যুদ্ধ করছিল, পয়গম্বরে দেওয়া ধর্ম অনুসরণে স্বাধীনতার জন্য আদি মুসলমানদের মতো। ভগবানের আদেশ মানুষের মাধ্যমে দেওয়া হয়, বিশ্ব এ ধরনের তথাকথিত ঈশ্বরতন্ত্রের যুগ পেরিয়ে এসেছে। মুসলমান নেতারা তখন দাবি জানাচ্ছেন যে, তাঁরা তাঁদের বিশেষ প্রচারকের আইনকে বেশি মান্য করবে, তারা যে রাষ্ট্রে বাস করত যেখানকার আইনের চেয়ে। এই দাবি সভ্য ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতাকে ভিতর থেকে আঘাত করতে এটা তাদের খারাপ নাগরিকে পরিণত করেছে। কারণ তাদের আনুগত্যের কেন্দ্র রাষ্ট্রের বাইরে এবং তারা যখন এই মুসলমান নেতাদের তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মৌলানা মহম্মদ আলি ও শওকৎ আলি, তাঁদের প্রচারিত দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে, তখন আর তাদের রাষ্ট্রের জন্য নাগরিকদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। ভারত যদি স্বাধীন হত, তবে জনগণের মধ্যে সুসম্পন্ন অংশটি ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে আশুবিপদ হয়ে দাঁড়াত। কারণ অজ্ঞ জনগণ, তাদের ভগবদ্বাণী প্রচারকের নামে যারা আবেদন জানিয়েছেন, তাদের অনুসরণ করতেন, আফগানিস্তান, বালুচিস্তান, পারস্য, ইরাক, আরব, তুরস্ক ও মিশর এবং মধ্য এশিয়ার যেসব আদিবাসী মুসলমান তাদের সঙ্গে জোটবেঁধে এদেশের অজ্ঞ মুসলমান জনতা ভারতকে ইসলামের শাসনে আনার জন্য অস্ত্র ধারণ করবে, এবং ব্রিটিশ ভারতে ভারতীয়

রাজ্যগুলির মুসলমানদের সাহায্য নিয়ে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা করবে। আমরা ভেবেছিলাম, ভারতীয় মুসলমানরা তাদের মাতৃভূমির প্রতি অনুগত এবং আমরা এখনও আশা করেছিলাম যে শিক্ষিত শ্রেণীর কয়েকজন এই ধরনের মুসলমান বিদ্রোহ নিবারণে সচেষ্ট হতে পারেন। কিন্ত কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলার পক্ষে তারা সংখ্যায় খুব-ই কম এবং স্বধর্মত্যাগী বলে তাদের হত্যা করা হবে। ঐস্লামিক শাসনের অর্থ কী তা মালাবার আমাদের শিখিয়েছে এবং ভারতে খিলাফৎ রাজে আরেকটি নমুনা আমরা দেখতে চাই না। মোপলাদের প্রতি মালাবারের বাইরের মুসলমানরা, কতোটা সহানুভূতি অনুভব করে, তা তাদের সমর্থনে সমধর্মবিশ্বাসীদের গড়ে তোলা সমর্থন এবং শ্রী গান্ধীর নিজের বক্তব্যে প্রমাণিত হয়েছে। শ্রী গান্ধী বলেছেন, তাদের ধর্ম যেভাবে তাদের চলতে শিখিয়েছে বলে তারা বিশ্বাস করে, সেই মতো তারা কাজ করেছে। আমার আশঙ্কা মনে হয়, ঠিক ; কিন্তু, সভ্যদেশে এমন জনগণের স্থান নেই যারা বিশ্বাস করে যে, তাদের ধর্ম তাদের হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ করতে অথবা নজরদারির মধ্যে তাদের বিদ্যালয়গুলিতে অথবা কারাগার ছাড়া নিজস্ব পুরুষানুক্রমিক ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করতে অস্বীকার করে এমন ব্যক্তিদের বিতাড়িত করতে শেখায়। ঠগেরা বিশ্বাস করে, তাদের বিশেষ আকারের ঈশ্বর তাদেরকে আদেশ দেন জনগণকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করতে, বিশেষ করে অর্থবান ভ্রমণকারীদের শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করার আদেশ দেন। এরকম ঈশ্বরের আইনকে একটি সভ্যদেশের আইনের ঊর্ধ্বে যেতে দেওয়া যায় না এবং বিংশ শতাব্দীতে বসবাসকারী মানুষ, মধ্যযুগের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এমন লোকদের হয় শিক্ষিত করবে, নয় তাদের নির্বাসন দেবে। তাদের মতের অংশীদার এমন দেশেগুলিতেই হবে তাদের জায়গা। সেখানে তারা এখনও তাদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে এমন কারুর বিরুদ্ধে এধরনের যুক্তি প্রয়োগ করতে পারবে। যেমন বস্তুত পারস্য এবং বহু আগে পার্সি এবং আমাদের নিজেদের সময়ে বাহাইপন্থীরা প্রকৃত পক্ষে গোঁড়া মুসলমানদের শাসনাধীন দেশে মুসলমান শাখা সম্প্রদায়গুলি নিরাপদ নয়। ভারতে ব্রিটিশ শাসন স্বাধীনতা রক্ষা করেছে সব শাখা সম্প্রদায়ের শিয়া, সুন্নি, সুফি, বাহাইপন্থীরা তাদের রাজশক্তির অধীনে নিরাপদে থাকে, যদিও এরা যেখানে সংখ্যালঘু সেখানে তা তাদের কাউকে সমাজচ্যুত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে না। মুসলমান শাসকেরা রয়েছেন। এমন দেশগুলির চেয়েও ব্রিটিশ শাসনে মুসলমানেরা বেশি স্বাধীন। স্বাধীন ভারতের কথা চিন্তা করার সময়, মুসলমান শাসনের আসন্ন বিপদ বিবেচনা করতে হবে।'

শ্রী চিত্তরঞ্জন দাসকে লেখা এক চিঠিতে* লালা লাজপত রায় অনুরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন—

'আরও একটি বিষয় আছে যা সম্প্রতি আমাকে খুব-ই বিচলিত করছে এবং আমি চাই আপনিও সতর্ক ভাবে চিন্তা করুন। প্রশ্নটি হচ্ছে হিন্দু মুসলমান ঐক্য। গত ছ' মাসে আমার বেশির ভাগ সময় আমি মুসলমানদের ইতিহাস ও মুসলমান আইন পড়ার কাজে নিয়োজিত করেছি। আর এই চিন্তা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি যে এটা সম্ভব বা প্রযোজ্য কোনওটাই নয়। অসহযোগ আন্দোলন মুসলমান নেতাদের আন্তরিকতা ধরে নিয়ে ও স্বীকার করে নিয়েও আমি মনে করি তাদের ধর্ম এ ধরনের কিছুর পক্ষে কার্যকর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আপনার মনে আছে, কলকাতায়, আপনাকে আমি হাকিম আজম খান ও ড. কিচলুর সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছিল, তা জানিয়েছিলাম। হিন্দুস্থানে হাকিম সাহেবের চেয়ে পরিমার্জিত মুসলমান নেই। কিন্তু অন্য কোনও মুসলমান নেতা কি কুরআনকে অগ্রাহ্য করতে পারেন? আমি শুধু আশা করতে পারি যে ঐস্লামিক আইন পড়ে আমি বুঝেছি, তা ভুল, এটা এরকম এবিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার চেয়ে আর কিছুই আমাকে বেশি স্বস্তি দেবে না। কিন্তু আমার বুঝা যদি ঠিক হয়, তবে তার অর্থ, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যদিও আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি, ব্রিটিশ ধারায় আমার হিন্দুস্থানকে শাসন করার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি না। গণতান্ত্রিক ধারায় হিন্দুস্থানকে শাসন করায় বিষয়েও আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি না। তাহলে প্রতিকার কী? হিন্দুস্থানের পাঁচ কোটি নিয়ে আমি ভীত নই। কিন্তু আমি মনে করি হিন্দুস্থানের সাত কোটির সঙ্গে আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, আরব মেসোপটেমিয়া ও তুরস্কের সশস্ত্র মুসলমানরা হবে অপ্রতিরোধ। আমি সত্যি সত্যিই এবং আন্তরিকভাবে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রযোজনীয়তা ও কাম্যতায় বিশ্বাস করি। মুসলমান নেতাদের বিশ্বাস করতেও আমি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত, কিন্তু কুরআন ও হাদীসের নিষ্ঠাচার ব্যাপারে কী হবে? নেতারা সেগুলিকে অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। তাহলে কি আমরা ধ্বংসের মুখে? আমি আশা করি তা হবে না। আমি আশা করি বিদগ্ধ মন ও প্রাজ্ঞ মস্তিষ্ক এই অসুবিধার মধ্যেই কোনও একটা পথ খুঁজে নেবে।'

১৯২৪-এ একটি বাংলা পত্রিকা ড. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। ওই সাক্ষাৎকার বিষয়ক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে*—

---

* ইন্দ্র প্রকাশের লেখা 'সভারকরের জীবনী'-এ উদ্বৃত

* ১৮-৪-২৪-এর 'টাইমস্ অভ্ ইন্ডিয়া'-তে 'থ্রু ইন্ডিয়ান আইস্' থেকে উদ্বৃত।

'আর একটি যে গুরুত্বপূর্ণ কারণ কবির মতে, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যসাধনকে বাস্তবে অসম্ভব করে তুলছে তা হচ্ছে মুসলমানরা তাদের দেশপ্রেমকে একটি দেশের প্রতি সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না..... কবি বললেন, তিনি খুব খোলাখুলিভাবে অনেক মুসলমানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোনও মুসলমান শক্তি ভারতকে আক্রমণ করলে তারা তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অভিন্ন ভূমিকে রক্ষা করবে কি না। তিনি বললেন, তিনি খুব নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন, এমনকি মহম্মদ আলির মতো মানুষ ঘোষণা করেছেন যে, কোনও অবস্থাতেই একজন মুসলমানের পক্ষে নিজের দেশটাই হোক না কেন, অন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো অনুমোদন যোগ্য নয়।'

২.

স্বাধীনতা যদি অসম্ভব হয়, তবে ভারতের পরবর্তী সর্বোত্তম ভবিষ্যৎ হিসাবে যা একজন একশো ভাগ ভারতীয়ের পক্ষে গ্রহণযোগ্য, তা হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে অধিরাজ্যের মর্যাদা লাভ। এই ভবিতব্যে কে সন্তুষ্টু হবে? আমি নিশ্চিতভাবে অনুভব করি, নিজেদের ওপর ছেড়ে দিলে মুসলমানরা অধিরাজ্যের মর্যাদায় সন্তুষ্ট হবে না, কিন্তু হিন্দুরা নিশ্চিতভাবেই হবে। এরকম বিবৃতি ভারতীয় ও ইংরেজদের পক্ষে শ্রুতিকটু ঠেকবে। কংগ্রেস স্বাধীনতার ওপর জোর দিতে সরব ও গর্জন করছে। তাই এই ধারণা প্রচলিত যে হিন্দুরা স্বাধীনতায় ও মুসলমানরা অধিরাজ্যের (Dominion) মর্যাদার পক্ষে। গোল টেবিল বেঠকে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হননি, এই ধারণা ইংরেজদের মনকে কতটা অধিকার করেছে এবং ঋণ স্বীকার বা পরিষোধ করতে অস্বীকার করা ও স্বাধীনতা—কংগ্রেসের তোলা এই দুটি দাবির ফলে হিন্দুদের স্বার্থ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই দাবিগুলি শুনে, ইংরেজরা ভেবেছিল যে, হিন্দুরা ব্রিটিশদের শত্রু এবং মুসলমান, তারা স্বাধীনতা বা ঋণ পরিশোধ করতে অস্বীকার করা কোনও দাবিই তোলেনি। তারা ব্রিটিশদের বন্ধু। এই ধারণা, কংগ্রেসের ঘোষিত পরিকল্পনার আলোকে, যতোই সত্য হোক, একটি মিথ্যা প্রচারে সৃষ্ট মিথ্যা ধারণা। কারণ এব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে হিন্দুরা তাদের অন্তরে অধিরাজ্যের মর্যাদায় সপক্ষে এবং মুসলমানদের তাদের অন্তরে স্বাধীনতার পক্ষে। এর প্রমাণ চাইলে, বহু প্রমাণ আছে।

স্বাধীনতার প্রশ্ন প্রথম তোলা হয়েছিল ১৯২১-এ, সেইবছর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নিলিখ ভারত খিলাফৎ সম্মেলন ও সারা ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক

অধিবেশনে আমেদবাদ শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রত্যেকেই তার সম্মেলনে স্বাধীনতার পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল। কংগ্রেস, খিলাফৎ সম্মেলন ও মুসলিম লীগের হাতে ওই প্রস্তাবের ভবিষ্যৎ কী রকম ছিল। সেটা সকৌতূহলে লক্ষ্য করার বিষয়।

কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন হাকিম আজমল খান। তিনি শ্রী চিত্তরঞ্জন দাসের হয়ে সভাপতিত্ব করেছিলেন। শ্রী দাস যথাযথভাবে নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও অধিবেশনে শুরুর আগে গ্রেপ্তার হওয়ায় পৌরোহিত্য করতে পারেননি। কংগ্রেসের ওই অধিবেশনে, মৌলানা হাসরৎ মোহানি কংগ্রেসের মতবাদ পরিবর্তনের ওপর জোর দিয়ে একটি প্রস্তাব আনলেন। সেই প্রস্তাবের ব্যাপারে অধিবেশনের কার্যাবলীর * সারসংক্ষেপ নিচে দেওয়া হল ঃ—

'মৌলানা হাসরৎ মোহানি, পূর্ণ স্বাধীনতার বিষয়ে তাঁর প্রস্তাবটি আনতে গিয়ে উর্দুতে এক দীর্ঘ ও আবেগপূর্ণ ভাষণ দেন। তিনি বললেন, যদিও স্বারজ এবং খিলাফৎ ও পঞ্জাবে অন্যায়ের প্রতিবিধান একবছরের মধ্যে করার প্রতিশ্রুতি গত বছর দেওয়া হয়েছিল, সেরকম কিছুই এ পর্যন্ত অর্জিত হয়নি। তাই এই কর্মসূচি আঁকড়ে থাকার অর্থহীন। ব্রিটিশ সাম্রাজে অথবা ব্রিটিশ রাষ্ট্রমণ্ডলে থেকে যদি তাঁরা স্বাধীনতা না পান, তবে, তিনি মনে করেন প্রয়োজন তাঁদের এর বাইরে বেরিয়ে আসতে দ্বিধা করা উচিত নয়। লোকমান্য তিলকের কথায় "স্বাধীনতা তাঁদের জন্মগত অধিকার" এবং কোনও সরকার যা বাক্ স্বাধীনতা ও কর্মের স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারকে অস্বীকার করে, সেই সরকার জনগণের আনুগত্য পাওয়ায় উপযুক্ত নয়। অধিরাজ্যের ধরনে হোম রুল বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন, তাদের কাছে জন্মগত স্বাধীনতার বিকল্প হতে পারে না। যে সরকার শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু লালা লাজপৎ রায় ও অন্যদের মতো বিশিষ্ট জননেতাদের কারারুদ্ধ করতে পারে, সেই সরকার জনগণের কাছে তার প্রতি শ্রদ্ধার দাবি হারিয়েছে, আর যেহেতু বর্ষশেষ স্বরাজ নিয়ে আসেনি, তাই, তাদের শাসনে একমাত্র যে পথ খোলা রয়েছে, তা গ্রহণ করা থেকে, কোনও কিছুর-ই তাদের নিবৃত্ত করা উচিত নয়। সেই একমাত্র পথ হচ্ছে সব বিদেশি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত স্বাধীনতাকে অর্জন করুন।

প্রস্তাবটি নিম্নরূপ ঃ—

'সব বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সব বিদেশি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত স্বরাজ' বা পূর্ণ স্বাধীনতা

* 'ভারতীয় বার্ষিক পঞ্জি' ১৯২২ পরিশিষ্ট পৃঃ ৬৪-৬৬ দেখুন।

অর্জন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য।'

বিভিন্ন প্রতিনিধি প্রস্তাবটির পক্ষে বলার পর, শ্রী গান্ধী প্রস্তাবটির বিরোধিতা করতে এগিয়ে এলেন। প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে শ্রী গান্ধী বললেন—

'বন্ধুগণ, শ্রী হসরত মোহানির প্রস্তাব সম্পর্কে আমি হিন্দিতে কয়েকটি কথা বলেছি। আমি আপনাদের ইংরেজিতে যা বলতে চাই, তা হচ্ছে যে লঘুভাবে আপনাদের কয়েকজন প্রস্তাবটিকে নিয়েছেন, তা আমাকে দুঃখ দিয়েছে। এটা আমাকে দুঃখ দিয়েছে, কারণ এটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক। দায়িত্বশীল পুরুষ ও মহিলা হিসাবে আমাদের নাগপুর ও কালকাতার দিনগুলিতে ফিরে যাওয়া উচিত এবং আমরা মাত্র একঘণ্টা আগে যা করেছি, তা মনে রাখা উচিত। এক ঘণ্টা আগে আমরা একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছি। তাতে প্রকৃতপক্ষে খিলাফৎ ও পঞ্জাবে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট উপায়ে আমলাতন্ত্রের হাত থেকে জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। একটি মিথ্যা বিষয় তুলে এবং ভারতীয় পরিমণ্ডলের মাঝখানে একটি বোমা ফাটিয়ে আপনারা কী সেই অবস্থানের পুরোটা আপনাদের মন থেকে মুছে ফেলতে যাচ্ছেন? আমি আশা করি, আপনাদের যাঁরা পূর্ববর্তী প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেছেন, তাঁরা এই প্রস্তাবটি বিবেচনা ও গ্রহণ করার আগে পঞ্চাশবার চিন্তা করবেন। বিশ্বের চিন্তাশীল অংশ আমাদের অভিযুক্ত করবে যে আমরা প্রকৃতই কোথায় তা আমরা জানি না। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতাগুলিকে বুঝে নিই। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে নিরঙ্কুশ ও অভঙ্গুর ঐক্য থাকুক। এখানে কে আছেন, যিনি আজ আস্থা সহকারে বলতে পারেন, "হ্যাঁ হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এক অভঙ্গুর উপাদান হয়েছে? কে এখানে আছেন যিনি আমাকে বলতে পারেন পার্সি ও শিখ, খ্রিস্টান ও ইহুদি এক, অস্পৃশ্যরা যাদের সম্পর্কে আজ অপরাহ্নে আপনারা শুনেছেন, সেই মানুষেরাই এরকম কোনও ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেন না, আমাকে কেউ কি তা বলতে পারেন? তাই এমন একটা পদক্ষেপ যা আপনাদের কৃতিত্ব দেবে না, যার ফলে আপনাদের সুবিধা হবে না, কিন্তু যা আপনাদের অপূরণীয় ক্ষতি করতে পারে তা গ্রহণ করার আগে আপনারা পঞ্চাশবার ভাবুন। আমরা প্রথমে আমাদের শক্তি সংহত করি; আমরা প্রথমে আমাদের অন্তস্তলে কী আছে তা জানার চেষ্টা করি। যে জলের গভীরতা আমরা জানি না তার মধ্যে আমরা যেন প্রবেশ না করি। শ্রী হস্‌রত মোহানির প্রস্তাব আমাদের সেই গভীরে ফেলে দেবে যা অতলস্পর্শ। মাত্র একঘণ্টা আগে যে প্রস্তাব আপনারা অনুমোদন করেছেন, তাতে যদি আপনাদের বিশ্বাস থাকে তাহলে

আমি আপনাদের সঙ্গে বিশ্বাসে নিয়ে ওই প্রস্তাবটি খারিজ করতে বলি। আপনাদের সামনে যে প্রস্তাবটি রয়েছে তা মাত্র একমুহূর্তে আগে যে প্রস্তাব আপনারা অনুমোদন করেছেন তার সমস্ত প্রভাবকে ধুয়ে মুছে দেবে। বিশ্বাস কি বস্ত্রের মত এতসহজ জিনিস যে মানুষ ইচ্ছা খুশির পরিবর্তন করতে পারে? বিশ্বাসের জন্য মানুষ মারা যায়। আর বিশ্বাসের জন্য মানুষ যুগে যুগে বেঁচে থাকে। নাগপুরের সব আলোচনা সহকারে এবং বিরাট বিতর্কের পর যে বিশ্বাস আপনারা গ্রহণ করেছিলেন তা কি আপনারা পরিবর্তন করতে চলেছেন? যখন আপনারা সেই বিশ্বাস গ্রহণ করেছিলেন তখন তার জন্য এক বছরের সময় সীমা ছিল না। এ-এক ব্যাপক বিশ্বাস; এ সবচেয়ে দুর্বল এবং সবচেয়ে শক্তিশালী সকলকেই গ্রহণ করে আর আপনারা যদি মৌলানা হস্‌রত মোহানির সীমিত বিশ্বাস গ্রহণ করেন তবে আপনাদের নিজেদের মধ্যে দুর্বলতমকে সুরক্ষায় আচ্ছাদিত করার সুবিধা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করবেন, মহানির সীমিত বিশ্বাস আপনাদের ভায়েদের মধ্যে দুর্বলতমকে স্বীকার করে না আমি তাই সমস্ত বিশ্বাস নিয়ে তাঁর প্রস্তাব আপনাদের নাকচ করতে বলি।"

প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হলে তা পরাজিত হয়েছে বলে ঘোষণা করা হল।

নিখিল ভারত খিলাফৎ সম্মেলনের অধিবেশনেরও সভাপতি ছিলেন হাকিম আজমল খান। স্বাধীনতার স্বপক্ষে একটি প্রস্তাবও সম্মেলনের বিষয় সমিতিতে উত্থাপতি হয়। এর কার্যাবলীর নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সার থেকে প্রস্তাবটির কি পরিণতি হয়েছিল তা স্পষ্ট। কার্যাবলী সংক্রান্ত প্রতিবেদন বলছে *ঃ—

'রাত্রি এগারোটায় সম্মেলেন মুলতুবি হবার আগে এবং পরদিন পর্যন্ত সভাপতি হাকিম আজমল খান ঘোষণা করলেন যে সম্মেলনের বিষয় সমিতি আজাদ শোভানি উত্থাপিত ও হস্‌রত মোহানি সমর্থিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করতে ও পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে চেষ্টা চালানোর জন্য সব মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

'প্রস্তাবে বলা হয়েছে ব্রিটিশ সরকারের নিরবিচ্ছিন্ন নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে থেকে কতকগুলি জিনিস আশা করা যায় না।

জাজিরত-উল-আরব ও ঐসলামিক দুনিয়াকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অমুসলমানদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকতে দেবে না। এর অর্থ শরিয়ৎ যে নিরাপত্তা দাবি করে সেই পরিধি পর্যন্ত খিলাফৎকে সুরক্ষিত রাখা যায় না।

* ভারতীয় বার্ষিক পঞ্জি, ১৯১২ পরিশিষ্ট ; পৃষ্ঠা ১৩৩-৩৪

তাই খিলাফৎ-এর স্থায়ী নিরাপত্তা এবং ভারতের সমৃদ্ধি সুরক্ষিত রাখতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংসের চেষ্টা করা প্রয়োজন। সম্মেলন এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে যে, মুসলমানদের ভারতের অন্যান্য অধিবাসীদের সঙ্গে একযোগে এই প্রয়াস চালানোর একমাত্র উপায় ভারতকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন করা। সম্মেলনের মতে, স্বরাজ সম্পর্কে মুসলমানদের মত একই অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ভারতের অন্যান্য অধিবাসীরাও একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে ফলে আশা করা যায়।

'দ্বিতীয় দিন ১৯২১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর সম্মেলনে আবার তার বৈঠক শুরু করলে দেখা গেল স্বাধীনতা বিষয়ক প্রস্তাব নিয়ে সংশ্লিষ্ট শিবিরে একটা বিভাজনে ঘটেছে—স্বাধীনতা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসকে তাঁদের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করে শ্রী হস্‌রত মোহানি যখন তাঁর প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে যাচ্ছেন তখন খিলাফৎ বিষয় সমিতির এক সদস্য এটি বিবেচনা করার আপত্তি জানালেন, এই যুক্তিতে যে তাঁদের গঠনতন্ত্র অনুসারে বিশ্বাসের পরিবর্তন সম্পর্কিত ধারণা বিষয়ে কোনও প্রস্তাব দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় বিষয় সমিতিতে অনুমোদিত না হলে তাকে গৃহীত বলে ধরা যায় না।

'সভাপতি হাকিম আজমল খান আপত্তি বহাল রাখলেন এবং স্বাধীনতা বিষয়ক প্রস্তাবটিকে অবৈধ বলে রায় দিলেন।

'শ্রী হস্‌রত মোহানি তীব্র প্রতিবাদ জানালেন এবং দেখালেন যে সভাপতি বিষয় সমিতিতে একই সদস্যের অনুরূপ আপত্তি অগ্রাহ্য করেছেন যদিও প্রকাশ্য সম্মেলনে সেই আপত্তি বহাল রেখেছে। তিনি বললেন, তাঁদের অর্থ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, সম্মেলন থেকে এই ঘোষণা করার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতেই সভাপতি কৌশলে তাঁর প্রস্তাবটিকে অবৈধ বলে রায় দিয়েছেন।'

সারা ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন মৌলানা হস্‌রত মোহানি। প্রস্তাব সম্পর্কে লীগের কার্যবিবরণী সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে*ঃ—

'১৯২১ এর ৩১ ডিসেম্বর রাত্রি ন'টায় মুসলিম লীগের বৈঠক হয়। কতকগুলি বিরোধহীন প্রস্তাব অনুমোদনের পর সভাপতি হস্‌রত মোহানি হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করলেন যে, স্বাধীনতা অর্জন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদে ধ্বংস বিষয়ে তাঁর প্রস্তাবটি বাতিল করে বিষয় সমিতির সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত এক লীগে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের

* ভারতীয় বার্ষিক পঞ্জি, ১৯১২, পরিশিষ্ট ; পৃষ্টা ৭৮

প্রতিনিধিত্বকারী বলে ধরা হবে। কিন্তু বিষয়টির অতীব গুরুত্বপূর্ণ, কোনও ভোটাভুটি না করে ওই প্রস্তাবটির ওপর অলোচনায় তিনি অনুমতি দেবেন।

'শ্রী আজাদ শোভানি যিনি বিষয় সমিতিতে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন লীগেও এটিকে উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন, তিনি বিশ্বাস করেন, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য একান্ত আবশ্যক, অহিংস অসহযোগ তাঁদের লড়াই চালানোর একমাত্র পথ এবং কংগ্রেস শ্রী গান্ধীকে যে একনায়কত্বের অধিকার দিয়েছে তিনি তার সম্পূর্ণ যোগ্য। কিন্তু তিনি এও বিশ্বাস করেন যে ভারত ও মুসলমান দুনিয়ার পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং তাঁদের সামনে স্বাধীনতার আদর্শকে স্থাপন করে একে ধ্বংস করতে হবে।

'কয়েকজন বক্তা শ্রী আজাদ শোভানির পর বললেন, এবং একইসুরে সমর্থন জানালেন।

'মাননীয় শ্রী রাজা আলি ঘোষণা করলেন, সভাপতির রায়ের কারণ এই যে কংগ্রেস যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি লীগ তা গ্রহণ করতে চাই না। না বুঝে বড় বড় কথা বলার বিরুদ্ধে তিনি তাঁদের সতর্ক করে দেন এবং শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্মরণ করিয়ে দেন যে বর্তমানে ভারত স্বাধীনতা অর্জিত হলেও তা রক্ষা করতে প্রস্তুত নয়।

'দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি প্রশ্ন করলেন আগামীকাল ব্রিটিশরা যদি (ভারত) ছেড়ে চলে যায় তাহলে তাঁদের সর্বাধিনায়ক হবেন কে? (ধ্বনি, এন্‌ভার পাশা)

'বক্তা জোর দিয়ে ঘোষণা করলেন যে তিনি কোনও বিদেশীদের মেনে নেবেন না। তিনি চান একজন ভারতীয় সর্বাধিনায়ক।''

১৯২৩-এর মার্চে কোকনাদে কংগ্রেস অধিবেশনে স্বাধীনতা প্রশ্নটি আবার উত্থাপিত হল কিন্তু কোনও সাফল্য এল না।

১৯২৪-এ বেলগাঁও-এ অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতিত্ব করে শ্রী গান্ধী বললেন, ঃ—

'আমার মতে ব্রিটিশ সরকার যদি যা বলেন তাই করেন এবং সাম্য অর্জনে আমাদের সততার সঙ্গে সাহায্য করেন তবে সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ সংস্রব ছিন্ন করার চেয়ে তা হবে বৃহত্তর জয়। তাই আমি সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বরাজের চেষ্টা করব কিন্তু ব্রিটেনের নিজের দোষে যদি প্রয়োজন হয় তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে

আমি দ্বিধা করব না। এইভাবে পৃথক হবার দায়ভার আমি ব্রিটিশ জনতার ওপর ন্যস্ত করব।"

১৯২৫-এ শ্রী চিত্তরঞ্জন দাশ ও একই বিষয় উত্থাপন করলেন। সেই বছরের মে মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে তাঁর ভাষণে তিনি, স্বাধীনতার ধারণাকে মোক্ষম আঘাত হানার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করেও রাজ্য মর্যাদার তুলনায় স্বাধীনতার ধারণা যে নিকৃষ্টতর তা দেখালেনঃ—

"........ আমার মতে স্বরাজ্যের তুলনায় স্বাধীনতা একটি সঙ্কীর্ণ আদর্শ এটা সত্যি এর অর্থ অধীনতাকে অস্বীকার করা। এক মুহূর্তের জন্যও আমি বলব না যে স্বাধীনতা স্বরাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় কিছু যা প্রয়োজন তা শুধু স্বাধীনতা নয়, স্বরাজের প্রতিষ্ঠা। ব্রিটিশ জনগণ আমাদের নিজেদের ভবিষ্যত আমাদের হাতে ছেড়ে দিতে পারে এই অর্থে ভারত আগামীকাল স্বাধীন হতে পারে। কিন্তু তার মানেই তা আমি স্বরাজ বলতে যা বুঝি সেটা আমাদের দেবে এমন নয়। গয়াতে আমার সভাপতির ভাষণে আমি দেখিয়ে ছিলাম ভারতীয় জনগণ যাঁদের নিয়ে তৈরি তাতে বাহ্যত পরস্পর বিরোধী অনেক উপাদান রয়েছে এঁদের সংহত করার এক আকর্ষণীয় কিন্তু জটিল সমস্যা ভারত আমাদের সামনে উপস্থাপন করে। সংহতি সাধনের এই কাজ একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া এমনকি একটা ক্লান্তিজনক প্রক্রিয়া, কিন্তু এটা ছাড়া কোনও স্বরাজ সম্ভব নয়........।

'দ্বিতীয়ত স্বরাজের সারমর্ম যে সুব্যবস্থার ধারণা স্বাধীনতা আপনাকে তা দেয় না। যে সংহতি সাধন কার্যে উল্লেখ আমি করেছি তার অর্থ ওই সুব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এটা স্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া হোক যে, যা প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া হচ্ছে তা অবশ্যই ভারতীয় জনগণের প্রতিভা, প্রকৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

আমার মতে স্বরাজের অর্থ প্রথমত এই যে ভারতীয় জনগণের ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের সংহতি সাধনের স্বাধীনতা আমাদের অবশ্যই থাকবে। দ্বিতীয়ত এই কাজে আমরা অবশ্যই জাতীয় ধারায় অগ্রসর হব, দু' হাজার বছর আগে পিছিয়ে গিয়ে নয় আমাদের জাতীয় প্রতিভা ও প্রকৃতির আলোকে এবং প্রাণশক্তিতে।

'তৃতীয়ত আমাদের সামনে যে কাজ রয়েছে তাতে কোনও বৈদেশিক শক্তির দ্বারা আমরা অবশ্যই বাধাপ্রাপ্ত হব না। তাই আদর্শের ব্যাপারে আমাদের যা স্থির করতে হবে তা হচ্ছে শুধু স্বাধীনতা, যা স্বরাজের অস্বীকৃতি হতে পারে তা নয়, বরং আমি যাকে স্বরাজ বলি তা আমাদের যখন জিজ্ঞাসা করা হয় আমাদের

স্বাধীনতার জাতীয় আদর্শ কী, তখন একমাত্র যে উত্তর দেওয়া সম্ভব তা হচ্ছে স্বরাজ। আমি হোমরুল বা স্বায়ত্ত শাসন কোনটাই পছন্দ করি না। সম্ভবত আমি যাকে স্বরাজ বলে বর্ণনা করেছি তার মধ্যেই এগুলি আসে। কিন্তু আমার ধারা যেকোন ভাবে 'রুল' বা 'শাসন' এই শব্দটির বিরুদ্ধোবাচক, সে হোমরুলই হোক বা বিদেশি শাসনই হোক।''

* * * *

'এরপর যে প্রশ্নটি আসে সেটি হচ্ছে এই আদর্শ সাম্রাজ্যের মধ্যে অথবা বাইরে কোথায় অর্জন করতে হবে? কংগ্রেস সর্বদা যে উত্তর দিয়েছে তা হচ্ছে—'সাম্রাজ্য যদি আমাদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় তবে সাম্রাজ্যের মধ্যে এবং এবং সাম্রাজ্য যদি আমাদের অধিকারকে স্বীকৃতি না দেয় তবে সাম্রাজ্যের বাইরে।' আমাদের জীবনযাপন করার সুযোগ অবশ্যই থাকবে—আত্মোপলব্ধি, আত্মবিকাশ এবং আত্মপরিপূর্ণতার সুযোগ প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের জীবনযাপনের।

সাম্রাজ্য যদি আমাদের জাতীয় জীবনের বৃদ্ধি ও বিকাশের পর্যাপ্ত অবকাশ দেয় তবে সাম্রাজ্যের ধারণাকে অপেক্ষাকৃত ভাল মনে করতে হবে। উল্টোদিকে যদি জগন্নাথের রথের মত সাম্রাজ্য তার সাম্রাজ্যবাদী অভিযানে আমাদের জীবনকে চূর্ণ করে তাহলে সাম্রাজ্যের বাইরে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার ধারণার পক্ষে ঔচিত্য থাকবে।

'বস্তুত সাম্রাজ্যের ধারণা অনেক সুবিধা সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট বোধ দেয়। অধিরাজ্যের মর্যাদা (Dominion Status) কোনও অর্থেই অধীনতা নয়। এর অর্থ সহযোগিতার প্রকৃত ভাবনা নিয়ে বাস্তব সুবিধাগুলির জন্য সাম্রাজ্যের যারা অংশ তাদের সম্মতিতে একটি জোট বন্ধন। স্বাধীনভাবে জোট গড়া হলে স্বাভাবিক ভাবেই তার সঙ্গে পৃথক হবার অধিকারও থাকে। যুদ্ধের আগে সাধারণভাবে বিশ্বাস ছিল যে এটা একটা বৃহৎ পরিসংখাই যাতে সাম্রাজ্য অথবা তার উপাদান অংশগুলি থাকে। এটা বোঝা যায় আধুনিক অবস্থায় কোনও জাতি বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচতে পারে না। রাজ্য মর্যাদা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বলে অভিহিত জাতিগুলির মহান রাষ্ট্রমণ্ডলের গঠনকারী প্রতিটি অংশকে সম্পূর্ণ সুরক্ষা প্রদান করে এবং প্রতিটির জন্য আত্মোপলব্ধি, আত্মবিকাশ ও আত্ম পরিপূর্ণতা অর্জন করে। আর তাই এটা আমি যে স্বরাজের উল্লেখ করেছি তাকে প্রকাশ করে ও তার সমস্ত উপাদানকে সূচিত করে।

'আমার কাছে গভীর ভাবাত্মক তাৎপর্যের দরুন ধারণাটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। বিশ্বশান্তি এবং পৃথিবীর এক চূড়ান্ত মহাসংঘের ধারণায় আমি বিশ্বাসী। আর আমি

মনে করি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বলে কথিত জাতিগুলির বৃহৎ রাষ্ট্রমণ্ডল বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠী বা জাতির মহাসংঘ, যাদের প্রত্যেকের জীবন স্বতন্ত্র, সভ্যতা স্বতন্ত্র, মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র, এই রাষ্ট্রমণ্ডলের শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রনেতারা যদি সঠিকভাবে একে পরিচালনা করতে পারেন তবে রাষ্ট্রনেতাদের সামনে যে বিরাট সমস্যা রয়েছে তার সমাধানের এটা স্থায়ী অবদান যোগাতে পারে। এই সমস্যা হচ্ছে পৃথিবীকে মহত্তর মহাসঙ্ঘে একত্রিত করা। সেই মহত্তর মহাসংঘর যে ধারণা মনে করতে পারে তা হচ্ছে মানব জাতির মহাসঙ্ঘ। কিন্তু সেটা সম্ভব যদি শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রনেতাদের সঠিক নেতৃত্ব এটি পায়। কারণ-ধারণাটি বিকাশের সদস্য জাতিগুলির বাহ্য আত্মত্যাগের বিষয়টি জড়িত। কতৃত্বের কুৎসিত বৈশিষ্ট্যযুক্ত সাম্রাজের যে ধারণা তাকে চিরকালের মত পরিত্যাগ করার বিষয়টিত এর সঙ্গে নিশ্চিত ভাবে জড়িত। আমি মনে করি ভারতের কল্যাণ এবং পৃথিবীর কল্যাণের জন্য ভারতের উচিত রাষ্ট্রমণ্ডলের মধ্যেই স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা এবং এইভাবে মানবসমাজের সেবা করা।'

শ্রী দাস, স্বাধীনতার চেয়ে রাজ্য মর্যাদা যে অপেক্ষাকৃত ভাল শুধু তার ওপরই জোর দিলেন না, আরও এগিয়ে গেলেন এবং ভারতের রাজনৈতিক বিবর্তন সম্পর্কে সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন ঃ—

'(১) এই সম্মেলনে ঘোষণা করছে যে স্বরাজের জাতীয় আদর্শে ভারতীয় জাতির নিজস্ব জীবনযাপন, আত্মোপলব্ধি; আত্মবিকাশ ও আত্মপরিপূর্ণতার সুযোগ এবং বিভিন্ন যে উপাদান ভারতীয় জাতিকে গঠন করে তাদের সংহতির জন্য বাইরে কোনও কর্তৃত্বের কোনও প্রতিরোধ ও বাধা ছাড়া কাজ করার স্বাধীনতা থাকবে।

'(২) ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যদি এরকম অধিকার—স্বীকার করে ও স্বরাজ অর্জনে বাধা না দেয় এবং এরকম সুযোগ দিতে প্রস্তুত থাকে ও এরকম অধিকারকে কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় ত্যাগের অঙ্গীকার করে তাহলে এই সম্মেলন ভারতীয় জাতিকে ব্রিটিশ রাষ্ট্রমণ্ডলের মধ্যে স্বরাজ অর্জনের আহ্বান জানাচ্ছে।'

উল্লেখ করা যেতে পারে যে শ্রী গান্ধী আগাগোড়া অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু মতপার্থক্যসূচক কিছু তিনি বলেননি। বরং শ্রী দাসের নেওয়া অবস্থানকে তিনি অনুমোদন করেছিলেন।

এইসব তথ্যের পর হিন্দুরা যে রাজ্য মর্যাদা এবং মুসলমানরা যে স্বাধীনতা পক্ষে সে বিষয়ে কার সন্দেহ থাকতে পারে? কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কিছু সন্দেহ থেকে থাকে তবে ১৯২৮-এ নেহরু সমিতির প্রতিবেদন সম্পর্কে মুসলমান মহলগুলির

প্রতিক্রিয়ায় তার সম্পূর্ণ নিরসন ঘটবে। ভারতের জন্য বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস নিযুক্ত নেহেরু সমিতি ভারতের সংবিধানের ভিত্তি হিসাবে রাজ্য মর্যাদাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং স্বাধীনতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। নেহরু প্রতিবেদনের প্রতি কংগ্রেসের এবং দেশে মুসলমান রাজনৈতিক সংগঠনগুলির মনোভাব লক্ষ্য করাটা শিক্ষপ্রদ হতে পারে।

১৯২৮-এ কলকাতায় কংগ্রেস তার অধিবেশনে শ্রী গান্ধীর উত্থাপন করা একটি প্রস্তাব নিম্নরূপ ঃ—

'সর্বদলীয় সমিতির প্রতিবেদনে সুপারিশ করা সংবিধান বিবেচনা করে কংগ্রেস তাকে ভারতের রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলির সমাধানের লক্ষে এক মহান অবদান হিসেবে স্বাগত জানায়। সমিতির সুপারিশগুলিতে কার্যত যে সর্বসম্মতি রয়েছে তার জন্য কংগ্রেস ওই সমিতিকে অভিনন্দন জানায়। মাদ্রাজ কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা বিষয়ক প্রস্তাবটি মেনে চলার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস সমতির প্রণয়ন করা সংবিধানটিকে বিশেষভাবে রাজনৈতিক অগ্রগমনে এবং মহান পদক্ষেপ হিসাবে অনুমোদন করে। কারণ এটিই দেশে গুরুত্বপূর্ণ দলগুলির মধ্যে অর্জিত মতৈক্যের বৃহত্তম মাত্রাকে সূচিত করে।

'রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাধ্য বাধ্যকতা সাপেক্ষে কংগ্রেস এই সংবিধানকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করবে যদি ১৯২৯শে ৩১শে ডিসেম্বর বা তার আগে ব্রিটিশ সংসদ এটিকে গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই তারিখের আগে এটি গৃহীত না হলে বা তার আগে এটিকে প্রত্যাখ্যান করা হলে কংগ্রেস, করপ্রদানের অস্বীকার করতে ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এরকম অন্যান্য উপায় অবলম্বন করতে দেশবাসীকে পরামর্শ দিয়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত করবে। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই প্রস্তাবের কোনওকিছুই কংগ্রেসের নামে পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপক্ষে প্রচার চালানোর কাজে অন্তরায় হবে না।"

দেখা যাচ্ছে হিন্দুদের মত স্বাধীনতার পক্ষে ছিল না। ছিল রাজ্য মর্যাদার পক্ষে এই বক্তব্যে কেউ কেউ আপত্তি করতে পারেন। তাহলে ১৯২৭-এ কংগ্রেস প্রস্তাবে কী ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন রাখা যেতে পারে। এটা সত্যি ১৯২৭-এ অনুষ্ঠিত মাদ্রাজ অধিবেশনে কংগ্রেসের পণ্ডিত জহওরলাল নেহরু উত্থাপিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি অনুমোদন করেছিলেনঃ—

'এই কংগ্রেস, পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনভাবে ভারতীয় জনগণের লক্ষ্য বলে ঘোষণা

করছে। কিন্তু এই প্রস্তাব যে কংগ্রেসে হিন্দুদের সত্যিকারের মনের কথা ব্যক্ত করেনি ও ব্যক্ত করে না, এই বক্তব্যের সমর্থনে পর্যাপ্ত প্রমাণ আছে। প্রস্তাবটির এসেছিল আশ্চর্যজনকভাবে। ১৯২৭-এর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন ডঃ আনসারি। ডঃ আনসারির বক্তৃতায় এর কোনও আভাস ছিল না। * অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি† শুধু প্রসঙ্গক্রমে এর উল্লেখ করেছিলেন তবে জরুরি কার্যধারা হিসাবে নয়, অনুষঙ্গিক কার্যধারা হিসাবে। প্রস্তাবটি নিয়ে আগাম কোনও চিন্তা ভাবনা ছিল না। এটি ছিল একটি অভুত্থানের ফল, এবং সেই অভ্যুত্থান সফল হয়েছে তিনটি কারণে।

প্রথমত তখন কংগ্রেসের একটি অংশ ছিল পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর ও শ্রী গান্ধীর প্রাধান্যের বিরোধী, বিশেষ করে প্রথম জনের। এই গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন শ্রী শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ছিলেন পণ্ডিত মতিলালের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁরা একটি পরিকল্পনার সন্ধানে ছিলেন যা পণ্ডিত মতিলাল ও শ্রী গান্ধীর ক্ষমতা ও মর্যাদাকে নষ্ট করবে। তাঁরা জানতেন, তাঁদের দিকে জনগণকে টেনে আনার একমাত্র উপায় হচ্ছে আরও চরম অবস্থান গ্রহণ করা এবং দেখানো যে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকৃতপক্ষে মধ্যপন্থী যেহেতু মধ্যপন্থাকে কংগ্রেসিদের কাছে পাপ বলে বিবেচিত হত। তারা মনে করেছিলেন এই পরিকল্পনা নিশ্চিতভাবে সফল হবে। ভারতের লক্ষ্যকে তাঁর যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করলেন এবং পণ্ডিত মতিলাল ও শ্রী গান্ধী রাজ্য মর্যাদার পক্ষে এটা জেনে স্বাধীনতার লক্ষ্যকে প্রয়োগ করলেন। দ্বিতীয়ত কংগ্রেসে

---

* ডঃ আনসারি বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর ভাষণে যা বলেছিলেন তা হচ্ছে এই ঃ

"সংবিধানের চূড়ান্ত আর যাই হোক কিছুটা নিশ্চয়তার সঙ্গে একটা জিনিস বলা যেতে পারে যে এটি হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারায়। এতে ইউনাইটেড স্টেটস অফ ইন্ডিয়া বা ভারতের যুক্তরাষ্ট্র এর সংস্থান থাকবে। যাতে বর্তমান ভারতীয় রাজ্যগুলি মহাসংঘের স্বশাসিত অঙ্গ হিসাবে থাকবে। তারা দেশের প্রতিরক্ষা, জাতির-বৈদেশিক বিষয়গুলির নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য যৌথ ও অভিন্ন স্বার্থের ব্যাপারে যথাযথ অংশ নেবে। The Indian Quarterly Register, 1927 Vol II. p.372

† শ্রী মুথুরঙ্গ মুদালিয়র বলেছিলেন ঃ

" আমাদের এটা জানানো উচিত সংসদ যদি তার বর্তমান উদ্ধতভাব বজায় রেখে চলে তবে আমরা অবশ্যই সুনিশ্চিতভাবে সাম্রাজ্য থেকে ভারতকে বিচ্ছিন্ন করার পক্ষে তীব্র প্রচার শুরু করব। ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে কার্যকরভাবে ঘোষণা সময় যখনই আসুক, ভারতীয় আকাঙ্ক্ষা হবে স্বাধীন জাতীয়তার জন্য, যে জাতীয়তা এমনি ইংলন্ডের রাজার নামমাত্র একাধিপত্যেও রুদ্ধ হবে না। ইংলন্ডের রাষ্ট্রনেতৃত্বের এই বিষয়টি সকর্ততার সঙ্গে অনুধাবন করা উচিত। তাঁরা যেন আমাদের নৈরাশ্যের দিকে ঠেলে না দেন।" The Indian, Quarterly Register, 1927, Vol-II p. 356

একটি অংশের নেতা ছিলেন শ্রী বিঠলভাই প্যাটেল। এই অংশ আইরিশ, সিন ফিয়েন পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন এবং ভারতের জন্য তাঁদের সাহায্য চাইছিলেন, ভারতীয়রা তাঁদের লক্ষ্য স্বাধীনতা চাইছিলেন। ঘোষণা না করলে আইরিশ সিন ফিয়েন পার্টি কোনও সাহায্য দিতে ইচ্ছুক ছিল না। আইরিশ সাহায্য পেতে কংগ্রেসের এই অংশ তাঁদের লক্ষ্য রাজ্য মর্যাদা থেকে স্বাধীনতা পরিবর্তন করতে উদগ্রীব ছিলেন। এই দুই কারণের সঙ্গে তৃতীয় একটি কারণ যুক্ত হয়েছিল সেটি ছিল সাইমন আয়োগে নিয়োগ উপলক্ষে তৎকালীন ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড এর ভাষণ। তিনি তখন একটি সংবিধান রচনায় ভারতীয়রা অক্ষুন্ন এই বলে বিদ্রূপ করেছিলেন। ভারতীয়রা রাজনীতিকদের বলছে এই ভাষণ চরম অপমান হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। এই তিনটি কারণের সংমিশ্রণই প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য দায়ী। বস্তুত দেশের রাজনৈতিক লক্ষ্যকে অভিহিত করার অভিপ্রায়ের চেয়েও লর্ড বার্কেনহেড যোগ্য জবাব দেবার অভিপ্রায় * থেকেই প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়েছিল। আর শ্রী গান্ধী ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু যদি নীরবে থেকে থাকেন তবে তা প্রধানত এই কারণে যে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে লর্ড বার্কেনহেড এর অসংযত ভাষা একটা ঝড় তুলেছিল। এই ঝড় এত প্রবল ছিল যে প্রস্তাবটিকে উড়িয়ে দেবার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করার চেয়ে এটি মেনে নেওয়া অধিকতর বুদ্ধিমত্তার বলে তারা ভেবেছিলেন অন্যথায় তাঁরা প্রস্তাবটি সহজেই উড়িয়ে দিতেন।

কংগ্রেস হিন্দুদের প্রকৃত মনোভাবকে যে এই প্রস্তাব প্রকাশ করে না তাতে সন্দেহ নেই। অন্যথায় এটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় কিভাবে নেহরু সমিতি তাঁদের রচিত সাংবিধানিক কাঠামোর ভিত্তি হিসাবে রাজ্য মর্যাদাকে গ্রহণ করে ১৯২৭-এর মাদ্রাজ প্রস্তাবকে অবজ্ঞা করতে পারলেন। এটাও ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় কিভাবে ১৯২৮-এ কংগ্রেস রাজ্য মর্যাদাকে গ্রহণ করলেন যদি তাঁরা ১৯২৭-এ প্রস্তাব যা বলছে সেইমত প্রকৃতই স্বাধীনতাকে গ্রহণ করে থাকেন।*

১৯২৯-এ ৩১শে ডিসেম্বরের আগে যদি দেওয়া হয় তবে কংগ্রেস রাজ্য মর্যাদা

---

* শ্রী সাম্বামূর্তি প্রস্তাবটি সমর্থন করে বলেছিলেন ঃ লর্ড বার্কেনহেড উদ্ধত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন, প্রস্তাবটি তার একমাত্র জবাব" দি ইন্ডিয়ান কোয়াটার্লি রেজিস্টার ১৯২৭ খণ্ড ২ পৃঃ ৩৮০

* পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রস্তাবটি উত্থাপন করে বলেছিলেন ঃ

" এটা ঘোষণা করা হচ্ছে যে আজ কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে। তবুও যাঁরা এবং চেয়ে ক্ষুদ্রতর লক্ষে সন্তুষ্ট হতে পারেন বলে মনে হয় এমন ব্যক্তিদের জন্য কংগ্রেসের দরজা খোলা থাকছে।" তদেব, পৃঃ ৩৮১

গ্রহণ করবে এবং যদি তা নয় তবে কংগ্রেস তার মতবাদকে রাজ্য মর্যাদা থেকে স্বাধীনতায় পরিবর্তন করবে—প্রস্তাবের এই ধারাটি মুখ রক্ষার একটি উপায় মাত্র এবং মনোভাবের প্রকৃত পরিবর্তন দ্যোদিত করে না। কারণ, দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের মত এরকম গভীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সময়ের প্রশ্নটি কখনই মূল বিষয় হয়ে উঠতে পারে না।

১৯২৭-এর প্রস্তাব সত্ত্বেও কংগ্রেস যে রাজ্য মর্যাদায় বিশ্বাস রেখে চলেছিল এবং স্বাধীনতার বিশ্বাসী ছিল না, কংগ্রেসের আপ্তপুরুষ শ্রী গান্ধীর বিভিন্ন সময়ের ঘোষণা থেকেই তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ১৯২৯-এর পর থেকে শ্রী গান্ধীর এ বিষয়ে ঘোষণাগুলির যদি কেউ অধ্যয়ন করেন তবে তাঁর এটা না মনে হয়ে যাবে না যে গান্ধী স্বাধীনতা বিষয়ক প্রস্তাবটিতে খুশি ছিলেন না এবং তখন থেকেই তিনি কংগ্রেসকে রাজ্য মর্যাদার পথে চালিত করা প্রয়োজন বলে মনে করেছিলেন। তিনি ধীর প্রক্রিয়ায় এটিকে বোঝানো দিয়ে শুরু করেছিলেন। লক্ষ্যকে প্রথমে স্বাধীনতা থেকে স্বাধীনতার মর্মার্থে সংঙ্কুচিত করা হল। স্বাধীনতা মর্মাথ থেকে তাকে নামিয়ে আনা হল সমান অংশীদায়িত্বে এবং সমান অংশীদায়িত্ব থেকে তাকে তার মূল অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হল। চক্রের একটি পাক সম্পূর্ণ হল যখন ১৯৩৭-এ শ্রী গান্ধী ইংরেজ জনতার জ্ঞাতার্থে শ্রী পোলককে নিম্নলিখিত পত্রটি দিলেন ঃ—

'তোমার প্রশ্ন হচ্ছে ১৯৩১-এ গোল-টেবিল বৈঠকে যা ছিল সেই একই মত আমি পোষণ করি কি না। আমি তখন বলেছিলাম এবং এখন তার আবার উল্লেখ করছি, আমার কথা ধরলে ওয়েস্ট মিনিস্টার ব্যবস্থা অর্থাৎ স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার এই আকারে ভারতকে যদি রাজ্য মর্যাদা দিতে চাওয়া হয় আমি নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করব।"†

নেহরু প্রতিবেদন সম্পর্কে মুসলমান রাজনৈতিক সংগঠনগুলির ঘোষণাগুলি প্রতি লক্ষ্য করলে এটি প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাঁদের পক্ষ থেকে দেওয়া কারণগুলি বেস কৌতূহলজনক। কারণগুলি সম্পূর্ণভাবে অপ্রত্যাশিত। সন্দেহ নেই, মুসলিম লীগের মত কয়েকটি মুসলমান সংগঠন প্রতিবেদনটিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল কারণ এতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী বিলোপের সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু খিলাফৎ সম্মেলন

† টাইমস অফ ইন্ডিয়া : এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৭-এর ২০শে মার্চ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনে স্বাধীনতার পক্ষে কৃত ঘোষণার কোন তাৎপর্য নেই। নতুন সংবিধান অনুসারে নতুন প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে এই সম্মেলন হয়েছিল। কিন্তু তাঁর ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু করা থেকে এটা বলা যেতে পারে শ্রী গান্ধী এখন স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

বা জামিয়াত-উল-উলেমা এই দুটি মুসলমান সংগঠন যারা কংগ্রেসের মত অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের একই অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল এবং যাদের বক্তব্য দেশের রাজনৈতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে অন্য যেকোন মুসলমান সংগঠনের তুলনায় মুসলমান জনতার প্রকৃত অভিমতের অনেক সত্যিভাবে প্রকাশ করেছিল, তাদের নেহরু প্রতিবেদনের নিন্দা করার কারণ নিশ্চিতভাবেই এটা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর বিলোপ নয়।

১৯২৮-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত খিলাফৎ সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে মৌলানা মহম্মদ আলির নেহরু প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যানের পক্ষে তাঁর কারণগুলি চিহ্নিত করেছিলেন, তিনি বললেন,

'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, এর কার্যসমিতি সারা ভারত মুসলিম লীগের আমি সদস্য ছিলাম। খিলাফৎ সম্মেলনে আমি এসেছি এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে আমার অভিমত প্রকাশ করতে। এগুলির প্রতি সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের গভীর মনোযোগ দেওয়া উচিত।

*　　*　　*　　*

'সর্বদলীয় সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন যে ভারতের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া উচিত এবং এতে কোনও সাম্প্রদায়িকতা নেই। তবুও প্রতি মুহূর্তে তিনি হেনস্থা হচ্ছেন এবং প্রতি পদে তাঁর ভাষণের সময় তাঁকে থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

*　　*　　*　　*

'নেহরু প্রতিবেদনের প্রস্তাবনা হিসাবে দাসত্বের বন্ধনকে স্বীকার করা হয়েছে স্বাধীনতা ও রাজ্য মর্যাদা একেবারেই পৃথক বস্তু।

*　　*　　*　　*

'আমি প্রশ্ন করি, আপনাদের জাতীয়তাবাদের সব আপনারা যখন করেন এবং সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা করেন পৃথিবীতে আপনাদের ভারত—আপনাদের জাতীয়তাবাদী ভারতের মত একটি দেশ আমাকে দেখান ।

*　　*　　*　　*

'প্রতিদিন আপনাদের সংবিধানে মিথ্যা তত্ত্ব, অনৈতিক ভাবনা চিন্তা ও ভুল

---

* দি ইন্ডিয়ান কোয়টার্লি রেজিস্টার ১৯২৮, খণ্ড ২; পৃঃ : ৪০২-৪০৩

ধারণার সঙ্গে আপনারা আপস করেন কিন্তু আমাদের সাম্প্রাদায়িকতাবাদীদের সঙ্গে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও সংরক্ষিত আসনের সঙ্গে আপনারা কোনও আপস করেন না। জনসংখ্যায় আমাদের অংশ শতকরা পঁচিশভাগ। আর তবুও ব্যবস্থাপক সভায় আপনারা আমাদের তেত্রিশ শতাংশ আসন দেবেন না। আপনি একজন ইহুদি, একজন বানিয়া। কিন্তু ইংরেজদের কাছে, আপনার রাজ্যের মর্যাদা আপনি দিয়ে দেন।''

নিম্নলিখিত ওজস্বিনী শব্দে একটি সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব সম্মেলন অনুমোদন করলেন।ঃ—

'এই সম্মেলন আরও একবার ঘোষণা করছে যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের লক্ষ্য।''

১৯৩১-এ এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত জামায়েত-উল-উলেমা সম্মেলন সভাপতি হিসাবে মৌলানা হস্‌রত মোহানি সভাপতি হিসাবে নেহরু প্রতিবেদনকে নিন্দা করার পক্ষে এক-ই যুক্তি দিলেন। পরিমিত শব্দে হলেও তাঁর বক্তব্য কম কঠোর ছিল না। মৌলানা বললেন,* ঃ—

'ভারত সম্পর্কে আমার রাজনৈতিক বিশ্বাস এখন প্রত্যেকের কাছেই সুবিদিত। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বলে কোনও কিছুই আমি মেনে নিতে পারি না, আর সেই স্বাধীনতাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত রাশিয়ার আদালে হওয়া চাই যা অপরিহার্যভাবে (এক গণতান্ত্রিক, দুই, যুক্তরাষ্ট্রীয় ও তিন) কেন্দ্রাতিগ হবে এবং যাতে মুসলমান সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে।

'দিল্লির জামায়েত-উল-উলেমা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এই বিশ্বাসে কিছুদিন দৃঢ় ছিল এবং প্রধানত এই কারণেই জামিয়াত-নেহরু প্রতিবেদকে প্রত্যাখ্যান করেছে, যা এক যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের পরিবর্তে এককেন্দ্রিক সংবিধানের পরিকল্পনা করেছে। এছাড়াও লাহোর অধিবেশনের পরেই কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে ইরাবতী নদীর তীরে যখন নেহরু প্রতিবেদনের সমাধি ঘোষণা করল এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাবে সর্বসম্মত মতৈক্য হল, তখন দিল্লি জামিয়াত কংগ্রেসের সঙ্গে এবং এর আইন অমান্য কর্মসূচির সঙ্গে সহযোগিতা করতে অগ্রসর হল। এর একমাত্র কারণ ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা। হিন্দু বা মুসলমান প্রতিটি ভারতীয়ের কর্তব্য।

'কিছু দুর্ভাগ্যবশত গান্ধীজি—খুব শীঘ্রই তাঁর কথা থেকে সড়ে গেলেন এবং (১) কারাগারের থাকার সময়ই তিনি ব্রিটিশ সাংবাদিক শ্লোকোম্বি-কে বললেন যে

---

* দি ইন্ডিয়ান কোয়টার্লি রেজিস্টার ১৯৩১, খণ্ড ২ পৃঃ ২৩৮-২৩৯

সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বলতে তিনি স্বাধীনতার সারবস্তুকে বুঝিয়েছিলেন, (২) এছাড়াও আপসের অভিপ্রায় প্রকাশ করার পর তাঁকে যখন মুক্তি দেওয়া হল তখন তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতার জায়গায় একটি ভ্রমাত্মক শব্দ 'পূর্ণ স্বরাজ' উদ্ভাবন করলেন এবং খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করলেন যে 'পূর্ণ-স্বরাজ' ব্রিটিশ সংস্রব ছিন্ন করার কোনও অবকাশ নেই, (৩) লর্ড আরউইন গোপন চুক্তি করে তিনি নিশ্চিতভাবেই ব্রিটিশ রাজের অধীনে রাজ্য মর্যাদার আদর্শ গ্রহণ করলেন।

'গান্ধীজির এই অবস্থান পরিবর্তনের পর দিল্লি জামিয়তের, মহাত্মাকে অন্ধভাবে সমর্থন করা থেকে বিরত থাকা উচিত ছিল। আর, নেহরু প্রতিবেদনের মত, কংগ্রেস কর্মসমিতির যে সূত্র অনুসারে বোম্বেতে নেহরু প্রতিবেদনকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাওয়া হয়েছিল তাও (দিল্লি জামিয়তের) সম্পূর্ণভাবে নাকচ করা উচিত ছিল।

'কিন্তু আমরা জানি না কোন দুর্বোধ্য কারণ পূর্ণ স্বরাজের নিজের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে দিল্লি জামিয়ত-উল-উলেমা উদ্বুদ্ধ করেছিল, যদিও এটা জানা ছিল যে পূর্ণ স্বরাজ মানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নয় বরং সম্পূর্ণ স্বাধীনতাকে চেয়ে অনেক খারাপ এমন কিছু এই মতকে গ্রহণ করার একমাত্র ব্যাখ্যা হিসাবে বলা যেতে পারে যে গান্ধীজির রাজ্য মর্যাদা মেনে নিলেও তখনও এটার ওপর জোর দেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভারতীয়দের বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার ব্রিটিনের মেনে নিতে হবে।

'এটা পুরোপুরি স্পষ্ট যে এই অধিকার নিয়ে জোরাজুরি সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ঘোষণার চেয়ে কোনওভাবেই উন্নততর নয়। অন্যভাবে বললে রাজ্য মর্যাদার দাবিকে মেনে নিতে ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করার একমাত্র লক্ষে গান্ধীজি। সম্পূর্ণ স্বাধীনতার ওপর জোর দিয়েছিলেন। রাজ্য মর্যাদার ছিল মহাত্মার একমাত্র চরম লক্ষ্য। ঠিক একইভাবে কংগ্রেসের নেতারা ব্রিটিশ জনতার কাছ থেকে সর্বোচ্চ মাত্রায় রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারের ওপর জোর দিয়েছিলেন। কারণ তারা যাতে অসন্তুষ্ট না হন সেইজন্য ব্রিটিশ জনগণ নির্দিষ্ট একটা সীমার বাইরে যেতে পারেন না। অন্যথায় গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামীরা সম্যক জানতেন যে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার ভারতীয়দের যদি দেওয়া হয় তা সম্ভবত কখনই প্রয়োগ করা হবে না।

'আমার এই বক্তব্যের ভিত্তি সন্দেহ এমন যদি কেউ বিবেচনা করেন এবং কেউ তর্ক করেন যে প্রয়োজন হলেই কংগ্রেস সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কথা ঘোষণা করবে, আমি তাকে বলব ব্রিটিশ সংসদ প্রত্যাহৃত হবার পর ভারতীয় সরকারের

আধার কী হবে, তা আমাকে জানাতে। এটা স্পষ্ট কেউই একনায়কতন্ত্রী আকারের কথা চিন্তা করতে পারেন না। একটা কেন্দ্রাভিমুখী গণতান্ত্রিক আকার, সে এককেন্দ্রীক বা যুক্তরাষ্ট্রীয় যাই হোক হিন্দু রাজ্যের বেশি কিছু হবে না;

যেটা মুসলমানরা কোনও অবস্থাতেই মেনে নেবে না। এখন তাহলে শুধু একটি আবার বাকি থাকে তা হচ্ছে ব্রিটিশ সংস্রব সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত হবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র বা সোভিয়েত রাশিয়ার আদলে স্বশাসিত প্রদেশ ও রাজ্যগুলিকে নিয়ে ভারত একটি ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রাতিগক গণতান্ত্রিক সরকারের গঠন করুক। কিন্তু মহাসভাবাদী কংগ্রেস বা মহাত্মাগান্ধীর মত একজন ব্রিটেন প্রেমীর কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

'এইভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার ব্যপারে দিল্লির জামিয়ত-উল-উলেমা তাঁর হাত ধুয়ে ফেলার পর নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করল। কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বাদাউন প্রভৃতি স্থানের উলেমারা এখনত তাঁদের সম্বন্ধে দৃঢ় এবং ভগবান ইচ্ছা করলে তারা এমনই থাকবে কিছু দুর্বল ব্যক্তি এই উচ্চতম আদর্শের বিরুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছে যে বর্তমানে যখন এটা অর্জন করা সম্ভব নয় তখন এনিয়ে কথা বলার কোনও মানে হয় না। আমরা তাদের বলি এটা একেবারেই নিরর্থক নয় বরং একান্ত জরুরি কারণ উচ্চতম আদর্শ যদি দৃষ্টির সামনে না থাকে তা বিস্মৃত হতে পারে।

'তাই আমরা অবশ্যই সব অবস্থায় রাজ্য মর্যাদার বিরোধিতা করব কারণ এটা আমাদের গন্তব্য পথের মধ্যস্থিত কোনও পান্থশালা নয় বা আমাদের চরম লক্ষের অংশ নয়। এটা তার বিরোধী এক প্রতিদ্বন্দ্বী ধারণা। গান্ধীজি—যদি ইংলন্ডে পৌছান এবং ভারতের রক্ষাকবচ সহ বা রক্ষাকবচ ব্যতীত কোনরকমের রাজ্য মর্যাদা দিয়ে গোল-টেবিল বৈঠকের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে তবে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার ধারণা পুরোপুরি অন্তর্হিত হবে অথবা ভবিষ্যৎ কোনও অবস্থাতেই দীর্ঘদিন তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হবে না।'

নিখিল ভারত খিলাফৎ সম্মেলন ও জামায়েত-উল-উলেমা নিশ্চিতভাবেই স্পষ্টই ব্রিটিশ বিরোধী চরমপন্থী সংগঠন কিন্তু নিলিখ ভারত মুসলমান সম্মেলন আদৌ ও চরমপন্থীদের বা ব্রিটিশবিরোধী মুসলমানদের সংগঠন ছিল না তবুও ১৯২৮-এর ৪ঠা নভেম্বর কানপুরে এর উত্তরপ্রদেশ শাখার অধিবেশনের নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি অনুমোদিত হলঃ—

সর্বদলীয় উত্তরপ্রদেশ মুসলমান সম্মেলনের মতে ভারতের মুসলমানরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য সমর্থন করে। যে স্বাধীনতার যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের আকার নেবে।”

প্রস্তাব উত্থাপনকারীর মতে ইসলাম সর্বদাই স্বাধীনতার শিক্ষা দিয়েছে এবং সেইকারণে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে গেলে ভারতের মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হবে। বক্তা এবিষয়ে নিশ্চিত যে দরিদ্র হলেও ভারতীয় মুসলমানরা পৃথিবীর অন্য কোনও এক শ্রেণীভুক্ত লোকসমূহের চেয়ে ইসলামের প্রতি অধিকতর নিষ্ঠাবান।

এই সম্মেলনে বিষয় সমিতিতে মৌলানা আজাদ শোভানি যখন প্রস্তাব করেন যে সম্মেলনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে এটা ঘোষণা করা উচিত তখন কৌতূহলদ্দীপক একটি ঘটনা* ঘটে।

খান বাহাদুর সামুদুল হাসান ও অন্য কয়েক ব্যক্তি একরকম ঘোষণাই আপত্তি জানান। তাঁদের মতে এটা মুসলমানদের সর্বোত্তম স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে। এতে পর্দার আড়াল থেকে কয়েকজন মহিলা সভাপতিকে একটি লিখিত বিবৃতি পাঠান। এতে বলা হয় পুরুষদের যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পক্ষে দাড়ানোর সাহস না থাকে তবে মহিলারা পর্দা থেকে বেরিয়ে আসবেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের স্থান নেবেন।

৩

নিজেদের চূড়ান্ত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই মত পার্থক্য সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমানদের একই দেশে একটি সংবিধানের রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ রেখে একজাতি হিসেবে বসবাস করার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। ধরা যাক এটা করা গেলে এবং মুসলমানদের কোনওভাবে কৌশলে এর মধ্যে আনা গেল তাহলেও সংবিধান যে ভেঙে পড়বে না তার কী নিশ্চয়তা আছে?

অসংদীয় সরকারের কাজকর্মের সাফল্যের জন্য কয়েকটি শর্ত থাকতে হবে বলে ধরে নেওয়া হয়। যখন এসব শর্ত বিদ্যমান তখনই কেবল সংসদীয় সরকার তার শিকড় প্রসারিত করতে পারে। ১৯২৫ এ প্রয়াত লর্ড বেলফ্যুর তাঁর আত্মীয়া ব্লাঙ্কি ডগড্যাল-এর সঙ্গে কথাবার্তার সময় আরব জাতিগুলির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে নিয়ে এরকম একটি শর্তের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

কথাবার্তার সময় তিনি বলেছিলেন* ঃ—

প্রতিনিধিত্ব মূলক সরকারের এই ধারণা জাতিগুলির মাথায় ঢুকেছে অথচ এর ভিত্তি অবশ্যই কী হবে সে সম্পর্কে সামান্যতম ধারণা তাদের নেই, এটা আংশিকভাবে ব্রিটিশ জাতির এবং অংশও আমেরিকানদের দোষ। আমরা তাদের কাউকেই তাদের দোষী হওয়া থেকে অব্যাহতি দিতে পারি না। এটা ব্যাখ্যা করা কঠিন এবং এটা দেখানোর ক্ষেত্রে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জবাসী জাতিরা খারাপ জায়গায় রয়েছে। তার ওপর আমরা নিজেরা এটা এত ভাল জানি যে আমাদের মনে হয়না এটা ব্যাখ্যা করা জরুরি। আমার সন্দেহ আছে ব্রিটিশ সংবিধান নিয়ে তুমি দেখতে পাবে যে রচিত কোনও বইতে ব্রিটিশ সংসদীয় সরকারের সামগ্রিক সারমর্ম, যাতে কাজ করা যায় এই অভিপ্রায়ের মধ্যে নিহিত এটা লেখা আছে। আমরা যেটা ধরেই নিয়েছি। শুধু সেইটার ওপর দাড়িয়ে আছে এই ব্যবস্থাকে বিশদ করে আমরা কয়েকশ বছর কাটিয়েছি। এটা আমাদের মধ্যে এত গভীর ভাবে রয়েছে যে আমরা তাকে দেখতে পাই না। কিন্তু অন্যদের কাছে এটা অত স্পষ্ট নয়। ভারতীয়, মিশরীর এবং এদের মধ্যে আরো অনেক জাতি আমাদের বিদ্যার শিক্ষা করে। তারা আমাদের ইতিহাস, আমাদের দর্শন ও আমাদের রাজনীতি পড়ে। তারা আমাদের বাধা দেওয়া সংসদীয় পদ্ধতিগুলি শেখে কিন্তু কেউই তাদের কাছে ব্যাখ্যা করে না যে যখন এই অবস্থা আসে তখন আমাদের সব সংসদীয় দল ব্যবস্থা যাতে থমকে না পড়ে তার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ডিউক অর ওয়েলিংটন যেমন বলেছেন, ''রাজার সরকার অবশ্যই চলতে থাকবে'' কিন্তু তাদের ধারণা এই যে বিরোধীদের কাজ শাসনযন্ত্রটা থামিয়ে দেওয়া। অবশ্যই এর চেয়ে সহজ কিছু কিন্তু তা নৈরাশ্যজনক।''

ইংলন্ডে বিরোধীরা শাসনযন্ত্র বন্ধ করে দেওয়া এতদূর পর্যন্ত কেন যায় না, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন ঃ—

''আমাদের সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা আগে থেকেই একটি জাতিকে মূলগতভাবে এক ধরে নিয়েছে।

''সংসদীয় সরকারের সকল কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত সম্পর্কে বেলফ্যুর-এর এইসব পর্যবেক্ষণের সুন্দর সারসংক্ষেপ করেছেন লাস্কি।

---

* Dugdale's Balfour (Hutotinson), Vol.II, : pp, 363-64

তিনি বলেছেন † ঃ—

"সংসদীয় সরকারের শক্তি, সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় এর মৌলিক উদ্দেশ্যগুলির সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্যদিয়ে।

প্রতিনিধিত্ব মূলক সরকারের সফল কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা বর্ণনা করা, এইসব অবস্থা ভারতে বিদ্যমান কিনা তা পরীক্ষা করলে ভাল হবে। প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারকে কাজ করানোর অভিপ্রায় হিন্দু ও মুসলমানদের আছে, এটা আমরা কতদূর পর্যন্ত বলতে পারি? প্রতিনিধিত্ব মূলক ও দায়িত্বশীল সরকারের নিরর্থকতা ও অকার্যকারীতা প্রমাণ করতে, দুটি দলের একটিও যদি সরকারি মন্ত্রকে থামিয়ে দেবার অভিপ্রায় প্রদর্শন করে সেটাই যথেষ্ট এই অভিপ্রায় যদি যথেষ্ট হয় তখন এটা হিন্দুদের মধ্যে দেখা গেছে না মুসলিমদের মধ্যে তাতে কিছু যায় আসে না। মুসলমানরা, হিন্দুদের তুলনায় অধিকতর সরব তাই হিন্দুদের মনোভাব জানার চেয়ে তাদের মনোভাব বেশি করে জানতে হবে। মুসলমান মানসিকতা কিভাবে কাজ করে এবং কোনও কোনও বিষয় তবে চালিত করে তা স্পষ্ট হবে, যদি ইসলামের মূল সূত্র যা মুসলমান রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ভারতীয় সরকারের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করবে বিশিষট মুসলমানদের প্রকাশিত এমন মতামত বিবেচনা করা হয়। ইসলামের এরকম ধর্মীয় মূলসূত্রের কয়েকটি এবং মুসলমান নেতাদের কয়েকজনের দৃষ্টিভঙ্গি নিচে দেওয়া হল। যারা নিরসিক্তভাবে জিনিসগুলিকে দেখতে পারেন, বেলফ্যুর **স্বীকৃত** অবস্থা ভারতে আছে কিনা তা যাতে তাঁরা নিজেরাই বিচার করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে এগুলি দেওয়া হল।

মূলসূত্রগলির মধ্যে একটি যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হচ্ছে ইসলামের এই মূলসূত্র যাতে বলা হয়েছে মুসলমান শাসনাধীন নয় এমন একটি দেশে যদি মুসলমান আইন ও সেদেশের আইনের মধ্যে বিরোধী দেখা দেয় তবে দেশের আইনের ওপর স্থান পাবে মুসলমান আইন এবং একজন মুসলমান, মুসলমান আইনকে মান্য করে এবং দেশের আইনকে অমান্য করে ঠিক কাজই করবেন। এরকম ক্ষেত্রে মুসলমানকে কর্তব্য কি তা ১৯২১-এ করাচির কমিটির ম্যাজিস্ট্রেট (কারাধ্যক্ষের হাতে সম্পন্ননকারী ন্যায়ধীশ)-এর সামনে তার বিবৃতি প্রসঙ্গে মৌলানা মহম্মদ আলি ভালভাবে দেখিয়েছিলেন। সরকার তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ মামলা এনেছিলেন তিনি তারই উত্তর দিচ্ছিলেন। ১৯২১-এর ৮ই জুলাই করাচিতে নিখিল

† Parliamentary Government in England; p. 37

ভারত খিলাফৎ সম্মেলন অধিবেশনে অনুমোদিত একটি প্রস্তাব থেকে এই মামলার সূত্রপাত। ওই অধিবেশনে মহম্মদ আলি সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং বিতর্কিত প্রস্তাবিট উত্থাপন করেছিলেন। প্রস্তাবটি ছিল নিম্নরূপ ঃ—

"এই সভা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে যে বর্তমান মুহূর্তে একজন মুসলমানের পক্ষে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে থেকে যাওয়া, অথবা ওই সেনাবাহিনীতে ঢোকা, অথবা ওই সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে উদ্বুদ্ধ করা সব দিক দিয়ে ধর্মত বেআইনী আর সাধারণভাবে সব মুসলমানদের বিশেষভাবে উলেমাদের এটা দেখা কতর্ব্য যে এই ধর্মীয় নির্দেশগুলি প্রতিটি মুসলমানের কাছে যাতে পৌছায়।

মৌলানা মহম্মদ আলির সঙ্গে অন্য ছয় ব্যক্তির* বিরুদ্ধে মামলা আনা হল। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২০ এতে বি ও ১৩১ ধারা, ৫০৫ ও ১৪৪ ধারা এবং ৫০৫ ও ১১৭ ধারা অনুসারে মামলাটি আনা হয়েছিল। তিনি যে দোষী নন এই বক্তব্যের সমর্থনে মৌলানা মহম্মদ আলি বলেছিলেন † ঃ—

"শেষমেষ এই বহুমূল্য মামলার অর্থ কী? কোন বিশ্বাসে আমরা ভারতের হিন্দুরা ও মুসলমানরা পরিচালিত হব।' একজন মুসলমান হিসেবে বলছি, আমি যদি আমার ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছি বলে মনে হয় তবে আমার ভুল হয়েছে এটা আমাকে বোঝানোর একমাত্র উপায় পবিত্র কোরান অথবা মোহাম্মদের যে উপদেশও কার্যবলীর বিষয় কোরানে লিপিবদ্ধ হয়নি, কিন্তু না বিশ্বাস্য, তার কাছে অতীত ও বর্তমানের স্বীকৃত মুসলমান ধর্মশাস্ত্র বেত্তাদের ধর্মীয় ঘোষণা কাছে আমাকে নিদের্শ করতে পয়গম্বরের ঐশ্লামিক কতৃত্বের দুটি মূল। উৎস এর ভিত্তি বলে মনে করা হয়। বর্তমান অবস্থায় যা আমার কাছে দাবি করছে এক নির্দিষ্ঠ কাজ যার জন্য সরকার, যা শয়তান বলে অভিহিত হতে চায়না, আজ আমার বিচার করছে।

যদি সেটা যেটা আমি অবজ্ঞা করি আমার অবজ্ঞায় এক মাদ্রাক্ষ পাপ হয়ে দাঁড়ায় এবং এটা অমি অবজ্ঞা না করলে আমার অপকার্য হয় তখন কিভাবে আমি নিজেকে এদেশে নিরাপদ বিবেচনা করি?

"আমি অবশ্যই ছয় একজন পাপী না হয় একজন অপরাধী হয়, ইসলাম শুধু

* খুবই আশ্চর্যের যে এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন সারদাপীঠের শঙ্করাচার্য।

† 'The Trial of Ali Brothers' by R.V. Thandani ; PP. 69-71

এক সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে ভগবানের সার্বভৌমত্ব যা চূড়ান্ত নিঃশর্ত, অবিভাজ্য ও অবিচ্ছেদ।

* * * *

"একজন মুসলমান সে অসামরিক ব্যক্তি বা সৈন্য হোক, মুসলমান অথবা অমুসলমান প্রশাসনের অধীনে বাস করুক তার একমাত্র অনুগত্য নির্দেশিত হয় কোরান দ্বারা যা তাকে ভগবানের প্রতি, পয়গম্বরের প্রতি এবং শেষে বর্ণিত মুসলমান প্রধানদের মধ্যে কর্তৃত্বে যাঁরা আছেন তাঁদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে বলে। শেষোক্তদের মধ্য অবশ্যই পয়গম্বরের উত্তরাধিকারি ও বিশ্বাসীদের নির্দেশক রয়েছেন। ঐক্যের এই তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় চিন্তাবিদদের দ্বারা বিশদীভূত গাণিতিক সূত্র নয়, শিক্ষিত বা নিরক্ষর প্রতিটি মুসলমানের কার্যকর বিশ্বাস। মুসলমানরা এবং আগেও এবং অন্যত্রও অ-মুসলমান প্রশাসনের অধীনে শান্তিতে থেকেছে। কিন্তু অপরিবর্তনীয় নিয়ম যা আছে বা সর্বদা ছিল তা হচ্ছে, মুসলমান হিসেবে তারা শুধু তাদের ঐতিহ্য শাসকদের জারি করা সেইসব আইন ও আদেশই মান্য করতে পারে যাতে ভগবানের আদেশকে অমান্য করার ব্যাপারটি জড়িত নেই। ভগবান পবিত্র কুরআন ব্যঞ্জনাময়, ভাষায়, 'সর্বনিয়ন্ত্রশাসক'। বাধ্যতার এই অতিস্পষ্ট ও কঠোর ভাবে নির্দিষ্ট সীমা শুধু অমুসলমান শাসকের কর্তৃত্ব সম্পর্কে বেধ দেওয়া নেই বরং যেগুলি সার্বজনীনভাবে প্রযোজ্য এবং সেগুলিকে কোনক্ষেত্রেই প্রসারিত বা সংকুচিত করা যায় না।"

একটি স্থিতিশীল সরকার চান এমন যে কাউকে এটা শাঙ্কিত করে তুলতে কিন্তু মুসলমান মূলতত্বের কাছে এটা কিছু নয়। ঐ তত্ত্বে মুসলমানদের বলা আছে একটি দেশ মাতৃভূমি হলে তারা কি করবে এবং মাতৃভূমি না হলে কি করবে। মুসলমান ধর্ম সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী পৃথিবী দুটি বিভক্ত—দার-উল-ইসলাম (ইসলামের অবাস্থল) ও দার-উল-হার্য (যুদ্ধের অবাস্থল)। একটি দেশ মুসলমানদের শাসিত হলে দার-উল-ইসলাম। মুসলমানরা যখন একটি দেশে বাস করে কিন্তু তার শাসক নয় তখন সেটি দার-উল-হার্য। এটি মুসলমানদের ধর্মসংক্রান্ত আইন হওয়ার উচিত। হিন্দুদের ও মুসলমানদের অভিন্ন মাতৃভূমি হতে পারে না। এটি মুসলমানদের দেশ হতে পারে কিন্তু এটি সমভাবে বসবাসকারী হিন্দুদের ও মুসলমানদের দেশ হতে পারে না। পরন্তু এটি মুসলমানদের দেশ হতে পার শুধু যখন এটি মুসলমানদের দ্বারা শাসিত হয়। যেমুহূর্তে দেশটি অমুসলমান শক্তির কর্তৃত্বাধীন হয় সেই মুহূর্তে

এটি আর মুসলমানদের দেশ থাকে না। দার-উল-ইসলামের পরিবর্তে হয়ে যায় দার-উল-হার্ব। এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু পণ্ডিতোচিত আগ্রহে এটা যেন অবশ্যই মনে না করা হয়। কারণ এটা মুসলমানদের আচরণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম এমন একটি সক্রিয় শক্তি হয়ে উঠতে পারে। ব্রিটিশ যখন ভারত অধিকার করে এটা তখন মুসলমানদের আচরণকে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল। ব্রিটিশ দখলকারী হিন্দুদের মনে কোনও আকস্মিক সংশয় জাগিয়ে তোলেনি। কিন্তু মুসলমানদের কথা ধরলে এটা তৎক্ষণাৎ এই প্রশ্ন তুলেছিল যে ভারত মুসলমানদের বসবাসের পক্ষে আর উপযুক্ত স্থান আছে কিনা। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আলোচনা শুর হল। ড. টিটাস বলেছেন, এই আলোচনা অর্ধশতাব্দী ধরে চলেছিল যে ভারত দার-উল-হার্ব না দার-উল-ইসলাম। অধিকতর উৎসাহী ব্যক্তিদের কয়েকজন সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে প্রকৃতপক্ষে এক পবিত্র যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। মুসলমান শাসনাধীন দেশগুলিতে অভিবাসনের (হিজরৎ-এর) প্রয়োজনীয়তা প্রচার করেছিল এবং ভারতের সর্বত্র তাদের আন্দোলন চালিয়েছিল।

ভারত, মুসলমান শাসনাধীন নয় শুধু এই কারণে ব্রিটিশ শাসিত ভারতকে দার-উল-হার্ব হিসেবে গণ্য না করতে ভারতীয় মুসলমানদের উপলব্ধি করানোর জন্য আলিগড় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা স্যার, সৈয়দ আহমেদের সমস্ত উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োজন হয়েছিল। মুসলমানরা তাদের ধর্মের সবব আবশ্যক আচার অনুষ্ঠান করার ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীন এই কারণে একে (ভারতকে) দার-উল-ইসলাম হিসেবে গণ্য করার জন্য তিনি মুসলমানদের আবেদন জানিয়েছিলেন, হিজরতের জন্য আন্দোলন সাময়িকভাবে পিছিয়ে পড়ল। কিন্তু ভারত যে দার-উল-হার্ব এই তত্ত্ব পরিত্যক্ত হল না। ১৯২০-২১-এ খিলাফৎ আন্দোলন চলার সময় মুসলমান দেশপ্রেমিকরা আবার তা প্রচার করলেন। মুসলমান জনতার কাছ থেকে এই আন্দোলন সাড়া পেল না। বহু সংখ্যক মুসলমান তারা যে মুসলমান ধর্মসংক্রান্ত আইন অনুসারে কাজ করতে প্রস্তুত শুধু তাই দেখালেন না প্রকৃতপক্ষে ভারতে তাঁদের বাসস্থান ত্যাগ করলেন এবং আফগানিস্তানের চলে গেলেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে মুসলমানরা যাঁরা নিজেদের বসবাসের জায়গাটিকে দার-উল-হার্ব হিসাবে দেখেন হিজরৎই তাঁদের একমাত্র বহির্গমনে রাস্তা নয়। মুসলমান ধর্মীয় আইনে অপর একটি বিধান রয়েছে যাকে জিহাদ বলা হয়। এই অনুযায়ী “সমগ্র পৃথিবী মুসলমান শাসনে না আসাপর্যন্ত একজন মুসলমান শাসকের পক্ষেল ঐশ্লামিক শাসন সম্প্রসারিত করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে ওঠে। পৃথিবী দার-উল-ইসলাম

(ইসলামের) ও দার-উল-হার্ব (যুদ্ধের আবাসস্থল) এই দুটি শিবিরে বিভক্ত হওয়ায় সব দেশই হয় এই শ্রেণী নয় তো অন্য শ্রেণীতে পড়ে। তত্ত্বগতভবে দেখালে একজন মুসলমান শাসক যদি সক্ষম হন তবে দার-উল-হার্বকে, দার-উল-ইসলাম রূপান্তরিত করা তার কর্তব্য। ভারতে মুসলমানদের হিজরতের শরণাপন্ন হবার দৃষ্টান্ত যেমন রয়েছে, ঠিক তেমনই তারা জিহাদ ঘোষণা করতে দ্বিধা করেনি এটা দেখানোর দৃষ্টান্ত রয়েছে। আগ্রহান্বিত কেউ ১৮৫৭-র বিদ্রোহের ইতিহাস সমীক্ষা করে দেখতে পারেন। আর এটা যদি তিনি করেন তবে তিনি দেখবেন যেকোনও বিচারে অংশত, বিদ্রোহে ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ঘোষিত জিহাদ, আর মুসলমানদের কথা ধরলে, বিদ্রোহ সৈয়দ আহমেদের লালন করা বিদ্রোহের পুনরাবির্ভাব। কয়েক দশক ধরে তিনি মুসলমানদের কাছে প্রচার করেছিলেন যে ব্রিটিশরা ভারত দখল করলে দেশটি দার-উল-হার্ব হয়ে গেছে। এই বিদ্রোহ ছিল, ভারতকে পুনরায় দার-উল-ইসলামে পরিণত করার জন্য মুসলমানদের প্রয়াস। আরো সাম্প্রতিক উদাহরণ ১৯১৯ আফগানিস্তানের ভারত আক্রমণ। ভারতের মুসলমানদের এর পরিকল্পনা করেছিলেন। এই মুসলমানরা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি খিলাফৎপন্থীদের বিদ্বেষ দ্বারা চালিত হয়ে, ভারতে মুক্ত করতে আফগানিস্তানের সাহায্য চেয়েছিলেন।* এই আক্রমণের ফলে ভারত মুক্ত হত নাকি এর ফলে ভারত অধীন হত, তা বলা সম্ভব নয়। কারণ এই আক্রমণ কার্যকর হয়নি। এছাড়াও একথাটা থেকেই যায় যে ভারত যদি একান্তভাবে মুসলমান শাসনে না থাকে, তাহলে তা দার-উল-হার্ব এবং ইসলামের দলতত্ত্ব অনুযায়ী জিহাদ ঘোষণা করলে, তাদের অন্যায় হবে না।

তারা শুধু জিহাদ-ই ঘোষণা করতে পারে না, জিহাদকে সফল করতে বিদেশী মুসলমান শক্তির সাহায্যের আহ্বানও জানাতে পারে। অথবা কোনো বৈদেশিক মুসলমান শক্তি যদি জিহাদ ঘোষণা করতে চায় তবে তার প্রয়াসকে সফল করতে মুসলমানরা ওই শক্তিকে সাহায্য করতে পারে। দায়রা আদালতে মহম্মদ আলি, কাছে তাঁর বক্তব্যে এটা স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছিলেন। মহম্মদ আলি বললেন ঃ—

“কিন্তু কীভাবে আমাদের ধর্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে এবং কীভাবে তা আমাদের সকল কার্যকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে সরকার বাহত্য অনবহিত। এইসব কার্যের মধ্যে এমন কার্য ও রয়েছে, যেগুলিকে সুবিধার্থে সাধারণভাবে সাংসারিক কার্য

* এই কৌতূহলদ্দীপক ও ভয়ঙ্কর বাহিনী ওই বছরের মারাঠা পত্রিকায় কয়েকটি ধারাবাহিক নিবন্ধে শ্রী কারাডিকার (Karadinkar) কিছুটা বিস্তারিতভাবে সমীক্ষা করছেন। এই সব নিবন্ধে এতে শ্রী গান্ধীর কী-অংশ ছিল তাও দেওয়া আছে।

বোলে বর্নিত হয়। এই কারণে একটি জিনিস অবশ্যই স্পষ্ট করতে হবে। আর তা হচ্ছে এই ইসলাম একজন বিশ্বাসীকে অধিকতর সংশয় শূন্য প্রমাণব্যক্তিকে অন্য এক বিশ্বাসীর বিরুদ্ধে প্রতিকূল রায় ঘোষণা করতে অনুমতি দেয় না। তাই আমরা অবশ্যই আমাদের মুসলমান ভাইদের বিরুদ্ধে, তারা অবিবেকী আক্রমণের জন্য দোষী এবিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে, যুদ্ধ করিনা এবং তাদের বিশ্বাসের প্রতি সমর্থন জানাতে অস্ত্রধারণ করি না।" (এটা ১৯১৯-এ ব্রিটিশ ও আফগানদের মধ্যে যুদ্ধে চলছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা) "এখন আমাদের অবস্থান এই। আমীরের দুষ্টবুদ্ধি অথবা পাগলামির আরো ভালো প্রমাণ ছাড়া, আমরা নিশ্চিতভাবেই চাই না যে মুসলমানরা সহ ভারতীয় সৈন্যরা, বিশেষ করে আমাদের নিজেদের উৎসাহ ও সাহায্যে আফগানিস্তানকে আক্রমণ করুক ও কার্যকর ভাবে গ্রামে দখল করুক এবং পরে আরো কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ও মানসিক অশান্তির শিকার হই।"

"ভিন্ন বিপরীতপক্ষে, মহমহিম আমীরের যদি ভারত ও তার জনগণের সঙ্গে কোনো কলহ না থাকে এবং তাঁর অভিপ্রায়ের কারণ, বিদেশসচিব প্রকাশ্যে যেরকম বলেছেন, সেইমতো যদি মুসলমান দুনিয়ায় যে বিক্ষোভ রয়েছে, যে বিক্ষোভের প্রতি তিনি প্রকাশ্যে আন্তরিক সহানুভূতি জানিয়েছেন, তাই নয়, তবে মহামহিম আমীর জিহাদের কথা চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের সীমিত উপায়গুলির মধ্যে না রয়েছে। তাতে যে ধর্মীয় অভিপ্রায় দ্বারা চালিত হয়ে মুসলমানরা চিন্তা করতে বাধ্য হয় হিজরতের কথা, না দুর্বলদের বিকল্প সেই একই অভিপ্রায় দ্বারা চালিত হয় মহামহিম আমীর চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছেন জিহাদের কথা যা অপেক্ষাকৃত শক্তিমানদের বিকল্প এবং না তিনি তার আয়ত্তে বোলে, দেখেছেন, তিনি শক্তি ও আগে বেশি শক্তিতে বিশ্বাসী কারোর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে থাকেন। খিলাফৎ ও জিহাদে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যারা মুসলমানদের লড়িয়ে দিতে চায় তাদের সঙ্গে যাঁরা অন্যায়ভাবে জাজিরদ-উল-আবর ও পবিত্রস্থান দখল করে রেখেছে তাদের সঙ্গে যাদের ইসলামকে দুর্বল করা তাদের সঙ্গে আরা ইসলামের বিরুদ্ধে তারতম্য করে তাদের সঙ্গে এবং যারা ইসলামকে প্রচারে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে তাদের সঙ্গে হেস্তনেস্ত করে নিতে চান। এও কোনও একটি যাই ঘটুক ইসলামের স্পষ্ট আইন এইটাই সাব্যস্ত করে যে প্রথমত কোনও মুসলমান তার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য দেবে না। দ্বিতীয়ত জিহাদ যদি আমার অঞ্চলের কাছাকাছি আসে ওই অঞ্চলে প্রতিটি মুসলমান অবশ্যই মুজাহিদিনদের সঙ্গে যোগ দেবে এবং তার ক্ষমতা মত তাদের সাহায্য করবে।

'এরকমই হচ্ছে ইসলামের স্পষ্ট ও অবিতার্কিত আইন, আর আমরা আমাদের বিষয়ে অনুসন্ধানকারী সমিতিকে এটা ব্যাখ্যা করেছি। একটি অনুসন্ধান শক্তির বিরুদ্ধে যখন জোহাদ ঘোষণা করা হয়েছিল তখন এবং মুসলমান শক্তির অধীন এবং মুসলমান প্রজার ধর্মীয় কর্তব্য সম্পর্কে সমিতি আমাদের প্রশ্ন করেছিলেন। এটা অবশ্য সীমান্তে গোলযোগের ধারণার অনেক আগে এবং তখন প্রয়াত আমিরও জীবিত ছিলেন।'

প্রশ্নটির পক্ষে প্রাসঙ্গিক হওয়ায় যে তৃতীয় মূল তত্ত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে ইসলাম আঞ্চলিক নৈকট্যকে স্বীকার করে না। এই নৈকট্য সামাজিক ও ধর্মীয় এবং তাই অঞ্চল অতিক্রমকারী। এখানেও মৌলানা মহম্মদ অলি শ্রেষ্ঠ সাক্ষী হবেন। করাচিতে দায়রা আদালতে জুরিদের সম্বোধন করার সময় মহম্মদ আলি বলেছিলেনঃ—

'একটা জিনিস স্পষ্ট করতে হবে যে তত্ত্বের প্রতি আমরা এখন মনোনিবেশ কর তা সাধারণভাবে অমুসলমান এবং বিশেষভাবে সরকারি মহলে জানা নেই—যেভাবে তা জানা উচিত তা জানা নেই এটা আমরা আবিষ্কার করেছি। একগুচ্ছ তত্ত্বে বিশ্বাস করা ও নিজে সেই বিশ্বাস মত চলা শুধু এটুকুই মুসলমানের বিশ্বাসের সবকিছু নয়। সে অবশ্যই তার ক্ষমতার পূর্ণতম মাত্রায় নিজেকে জাহির করবে অবশ্যই কোনও বাধ্য বাধ্যকতার আশ্রয় না নিয়ে। শেষপর্যন্ত অন্যরাও যাতে নির্বাচিত বিশ্বাস ও অভ্যাস মেনে চলে শেষ পর্যন্ত সে তাই করবে। পবিত্র কোরানে একে বলা হয়েছে আমরিং বিল মারুফ ও নাহি আনিলমুঙ্কার; এবং মোহাম্মদের যে উপদেশ এ কার্যবলীর বিষয় কোরানে লিপিবদ্ধ হয় নাই তার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অধ্যায় ইসলামের মূলতত্ত্ব সম্পর্কিত। একজন মুসলমান বলতে পারে না ঃ

'আমি, আমার ভাইয়ের রক্ষক নই—কারণ একঅর্থে সে রক্ষক এবং তার নিজেকে যুক্তি তারা নিজের কাছে নিশ্চিত হতে পারে না যদি না সে অন্যদেরও ভাল কাজ করার উপদেশ দেয় এবং অন্যদের খারাপ কাজ করা থেকে নিবৃত্ত করে। তাই কোনও মুসলমান যদি ইসলামের মুজাহিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয় তবে সে শুধু নিজেকেই একজন বিবেকি আপত্তিকারী হবে না রক্ত অবশ্যই যে তার নিজের যুক্তিকে মূল্যবান মনে করবে। ভাইয়েদের নিজের মতো বুঝিয়েই একই রকম আপত্তি আনাতে প্রণোদিত করবে। তারপর এবং তার আগে নয়, সে মুক্তির আশা করতে

পারে। এটা আমাদের এবং মুসলমানদের অন্য প্রত্যেকের বিশ্বাস আমরা বিনীতভাবে সেইমত চলতে চায়। আমাদের যদি সেই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার স্বাধীনতা অঙ্গীকার করা হয় আমরা অবশ্যই সিদ্ধান্ত করব যে যেদেশে এই স্বাধীনতা নেই তা ইসলামের পক্ষে নিরাপদ নয়।'

'এটাই ইসলাম জগতের সম্মেলনের ভিত্তি। এটাই ভারতে একজন মুসলমানদের বলায় যে যে প্রথমে একজন মুসলমান এবং তার আগে ভারতীয়। এই অনুভূতি ব্যাখ্যা করে ভারতীয় মুসলমান ভারতকে অগ্রগতিতে কেন এত ক্ষুদ্র অংশ নিয়েছে কিন্তু মুসলমানদেশগুলি স্বার্থে নিজে ক্লান্তি বা পরিশ্রম করেছে এবং কেন মুসলিমদেশগুলি তার চিন্তার প্রথম স্থান এবং ভারত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।* মহামান্য আশা করি এই বলে বিষয়টিকে সমর্থন করেছেন † ঃ

'এটাই সঠিক বৈধ ইসলাম জগতের সম্মেলন যেখানে প্রতিটি আন্তরিক ও বিশ্বাসী মুসলমান রয়েছে। এটাই আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্বে ও পয়গম্বরের সন্ততিদের ঐক্যের তথ্য। এটা পারস্য আরবীয় সংস্কৃতিতে এক গভীর স্থায়ী উপাদান। যা সভ্যতার এবং মহান পরিবার যাকে আমরা প্রথম অধ্যায়ে ঐসলামিক এই নাম দিয়েছিলাম। চিন থেকে মরক্কো, ভলগা থেকে সিঙ্গাপুর সর্বত্র সমধর্মবিশ্বাসীদের প্রতি দাতব্য ও শুভেচ্ছাকে টো দ্যোদিত করে এর অর্থ ইসলামের সাহিত্য, সুন্দর শিল্প রমণীয় স্থাপত্য এবং সম্মোহনী কারো স্থায়ী আগ্রহ এর অর্থ এক সত্যিকারের সংস্কার বিশ্বাসের প্রারম্ভিক বিশুদ্ধ সাফল্যে প্রত্যাবর্তন। বোঝানো ও যুক্তির মাধ্যমে প্রচারে প্রত্যাবর্তন। বক্তিগত জীবনগুলিতে অধ্যাত্মিক শক্তির প্রকল্পে প্রত্যাবর্তন। মানবজাতির কল্যাণকর কাজে প্রত্যাবর্তন। স্বাভাবিক ও মূল্যবান অধ্যাস্থির আন্দোলন শুধু ঈশ্বর ও তার বাণীকেই নয় তাঁর সন্ততিদের তুরস্ক বা আফগান, ভারতীয় বা মিশরীয় এদের কাছে ভালবাসাকে বস্তু করে তোলে। দুর্ভিক্ষ অথবা কালগড় বা সারোজোভোতে মুসলমান মহল্লার বিধ্বংসী অগ্নিকান্ড তৎক্ষণাৎ সহানুভূতি উদ্রেক করবে এবং দিল্লি বা কাইরো মুসলমানদের কাছ থেকে বৈষয়িক সাহায্য নিয়ে আসবে।

ইসলামের অধ্যাত্বিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য অবশ্যই বৃদ্ধি পেতে থাকবে কারণ

---

* ১৯১২ যখন প্রথম বলকান যুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৯১২ যখন তুরস্ক ইউরোপীয় শক্তিস্থানি সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে। এই দুই সময়ের মধ্যে ভারতীয় মুসলমানরা ভারতীয় রাজনীতি নিয়ে আগেও মাথা ঘামায়নি। তাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ ছিল তুরস্ক ও আরবের ভাগ্যের প্রতি।

† India is Transition : P. 157

পরগম্বরের অনুগামীর কাছে এটা আত্মার জীবনের ভিত্তি।

মুসলমান জনগণের সম্মেলন যদি রাজনৈতিক ভাবে মুসলমান জগতের সম্মেলনের সৃষ্টি করতে চায় তাকে, অস্বাভাবিক বলা যায় না সম্ভবত আশা খানের মনে এই অনুভূতিই ছিল যখন তিনি বললেন,*ঃ—

'ভারতীয় দেশপ্রেমিককে এটা স্বীকার করতে হবে যে পারস্য, আফগানিস্তান এবং সম্ভবত আরব আগে বা পরে এক মহাদেশীয় শক্তির কক্ষপথে প্রবেশ করবে। যেমন, জার্মানি অথবা রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার ফলে যা গড়ে উঠতে পারে। অথবা পারস্য, আফগানিস্তান ও আরব ভারতীয় সাম্রাজ্যের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্যকে জড়িত করবে, যে সাম্রাজ্যের সঙ্গে তাদের এত সত্যিকারের নৈকট্য হয়েছে। বিশ্বশক্তিগুলি যা শক্তিশালী প্রতিবেশীর সঙ্গে ছোট রাষ্ট্রগুলিকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কস্থাপনে চালিত করে অপরিহার্যভাবে তাদের উপস্থিত এশিয়ায় অনুভব করার। শক্তিশালী প্রতিবেশীর সঙ্গে ছোট রাষ্ট্রে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এপর্যন্ত ইউরোপে সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। ভারত যদি শক্তিশালী ও সম্ভবত শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশীকে লক্ষ্য রাখতে হবে এরকম সম্ভাবনা এবং সেই কারণে উদ্ভূত প্রচণ্ড সামরিক ব্যয়তা মেনে নিতে ইচ্ছুক না থাকে তাহলে পারস্পরিক স্বার্থ ও সদিচ্ছার বন্ধনে মুসলমান প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে নিজের কাছে টেনে নেয়ার বিষয়টি ভারত উপেক্ষা করতে পারে না।

এককথায় কল্যাণকর ও ক্রমবর্ধমান সংঘের পথের ভিত্তি অবশ্যই এক যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারত। সেখানে প্রতিটি সদস্য তার ব্যক্তিগত অধিকার ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য, প্রাকৃতিক স্বার্থ ব্যবহার করছে তবুও এক অভিন্ন প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা এবং বহিঃশুল্ক সঙ্ঘের সাহায্যে বাইরে বিপদ ও অপেক্ষাকৃত বলশালী শক্তিহানির অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে। এরকম যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারত তাৎক্ষণিকভাবে সিংহল-কে তার স্বাভাবিক জননীর বুকে টেনে আনবে এবং অন্য যেসব ঘটনাবলীর আভাস আমরা দিয়েছি তা পরে ঘটবে। আমরা এক মহৎ দক্ষিণ এশিয়া মহাসংঘ গড়ে তুলতে পারি। ন্যায়, স্বাধীনতা প্রতিটি সম্প্রদায়ের, প্রতিটি ধর্ম এবং প্রতিটি ঐতিহাসিক অধিত্বের স্বীকৃতির ভিত্তিতে এই মহাসঙ্ঘের ভিত এখনই স্থাপন করা যায়।

'বর্তমান অবস্থার দাবি অনুযায়ী পারস্য ও আফগানিস্তানকে তাদের আক্রমণের সাহায্য করার আন্তরিকনীতি ভারতের পথে উত্তর-দক্ষিণ দুটি প্রাকৃতিক প্রসার গড়ে

---

* India in Transition ; P : 169

তুলেবে। এটা জর্মন বা শ্লাভ, তুর্কি কিংবা মঙ্গল কেউই ধ্বংস করার আশা করতে পারে না। এতে তারা নিজেদেরই মূল শক্তির প্রতি তারা আকৃষ্ট হবে। এটা ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয়তার এক স্বাস্থ্যকর আকার সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষা প্রদান করে, ঐ যুক্তরাষ্ট্রীয়তার প্রতিটি প্রদেশের জন্য প্রকৃত স্বশাসন রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার এবং নিজেদের অধীনে সহ-পুনরুজ্জীবিত ও মুক্ত হায়দ্রাবাদ রাজ্যের সংস্থান করেছে। তারা ভারতে দেখবে স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা, স্বশাসন অথচ রাজকীয় সঙ্ঘ। পরিসঙ্ঘের সুবিধাগুলিও তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে এতে সদিচ্ছা যে মহাসাম্রাজ্যের সূর্য কখনও অস্ত যাবে না তাকে প্রভূত ও অসীম ক্ষমতার ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ স্বশাসন অব্যাহত রাখা সুনিশ্চিত থাকবে। মেসোপটেমিয়া ও আরবের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ অবস্থান তার নাম মাত্র আকার যাই হোক আমি যে নীতির সপক্ষে বলেছি তাঁর দ্বারা অসীম শক্তি পাবে।"

দক্ষিণ এশিয়া মহাসংঘ ভারতের চেয়েও আরব, মেসোপটেমিয়া এবং আফগানিস্তানের মতো মুসলমান দেশগুলির পক্ষে অধিকতর শুভকর *। ভারতের চেয়েও অন্যান্য মুসলমান দেশের ভাবনা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে মুসলমানদের চিন্তাকে অধিকার করে রেখেছিল এটা তাই দেখায়। কর্তৃত্বের প্রতি মান্যতার সরকারের ভিত্তি। কিন্তু হিন্দুদের ও মুসলমানদের স্বশাসন প্রতিষ্ঠা করতে যারা আগ্রহী তারা মনে হয় না এই অনুসন্ধান করার জন্য চেয়েছেন যে এরকম মান্যতা কিসের ওপর নির্ভর করে এবং স্বাভাবিক সময়ে সঙ্কটের মুহূর্তে এই মান্যতা কতটা আসবে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কারণ, মান্যতা যদি না পাওয়া যায় স্বশাসনের অর্থ হয়ে দাঁড়ায় একসঙ্গে কাজ করা, অধীনে কাজ করা নয়। কাল্পনিক অর্থে এরকমটা হতে

---

* এই দক্ষিণ এশীয় মহাসঙ্ঘ সৃষ্টি হলে কি ভয়ানক জিনিস হত? হিন্দুদের নিপীড়িত সংখ্যালঘুর অবস্থায় নামিয়ে আনা হত। 'ভারতীয় বর্ষপঞ্জি' বলছেঃ

"ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থকরা আরব থেকে মালয়দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটেনের শাসনের স্থিতিশীল করতে একটি ইন্দো-মুসলমান জোট গঠনের চেষ্টায় সচেষ্ট ছিল। ওই জোটে বর্তমানে মুসলমানরা ছোট অংশীদার হত এই আশায় যে, কথা সময়ে বড় অংশীদারের স্তরে তারা উন্নীত হবে। কিছুটা এই অনুভূতি ও আশঙ্কা নিয়ে আমরা যুদ্ধের সময় প্রকাশিত মহামান্য আগা খানের বই India in Transition. (পরিবর্তনের পথে ভারত)-এ তিনি যে প্রকল্পের রূপরেখা দিয়েছেন। ওই প্রকল্পে একটি দক্ষিণ পশ্চিম এশীয় মহাসঙ্ঘ স্থাপনের পরিকল্পনা ছিল। ভারত এর একটি শরিক হতে পারত। যুদ্ধের পর শ্রী উইনস্টন চার্চিল যখন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার উপনিবেশ বিষয়ক সচিব ছিলেন, তখন মধ্যপ্রাচ্য বিভাগে লেখ্যাগার গুলিতে এক মধ্যপ্রাচ্য সাম্রাজ্যের পুরোপুরি তৈরি একটি প্রকল্প দেখতে পেলেন।" 1938, Vol II, Section on 'India in Home Policy'; পৃষ্ঠা-৪৮

পারে। কিন্তু ব্যবহারিক ও কাজের দুনিয়ায় যদি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের অধীনে আনা অংশগুলি যদি সামঞ্জস্যহীন সংখ্যায় থাকে সংখ্যালঘু অংশকে সংখ্যাগুরু অংশের অধীনে কাজ করতে হয় এবং এটা সংখ্যাগুরু অংশের অধীনে কাজ করে কি, করে না তা নির্ভর করে সংখ্যাগুরু অংশচালিত সরকারের কর্তৃত্ব মানতে কতটা আগ্রহী তা ওপর। স্বয়ত্তশাসনের সাফল্যের ক্ষেত্রে এই উপাদানটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, বেলফ্যুর যখন এর সাফল্য দলগুলির মূলগতভাবে এক হওয়ার ওপর নির্ভরশীল বলে মতো প্রকাশ করেন, তখন তিনি হয়ত সত্যের অংশমাত্র বলে থাকতে পারেন। তিনি এটা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে স্বায়ত্তশাসনের যেকোন প্রকল্পের সাফল্যের জন্য সরকারের কর্তৃত্বকে মান্য করার আগ্রহ একটি সমান প্রয়োজনীয় উপাদন।

এই দ্বিতীয় শর্ত যার অস্তিত্ব সংসদীয় সরকারের সফল কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় তার গুরুত্ব আলোচনা করেছেন জেমস্ ব্রাইস *। রাজনৈতিক সংলগ্নতার ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে Bryce দেখিয়েছেন, রাষ্ট্রগঠনে শক্তি অনেককিছু পড়ে থাকতে পারে কিন্তু শক্তি অনেকগুলি উপাদানের একটিমাত্র এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়। রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলিকে সৃষ্টি করার তাদের আশা দেওয়া, সম্প্রসারিত করা ও ঐক্যবদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে শক্তির চেয়েও যা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে মান্যতা। সরকারের আদেশগুলি মেনে চলা ও পালন করার আগ্রহ নির্ভর করে ব্যক্তি নাগরিক ও গোষ্ঠীগুলির কয়েকটি মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ওপর। ব্রাইস-এর মতে যে মানসিকতা, মান্যতার জন্ম দেয় তা হচ্ছে উদ্যমহীনতা, সম্ভ্রম, সহানুভূতি, ভয় ও যুক্তি। সবগুলির মূল্য সমান নয়। মান্যতার আগ্রহ সৃষ্টির কারণ হিসাবে তাদের গুরুত্ব প্রকৃতপক্ষে আপেক্ষিক। ব্রাইস-এর অভিমত অনুসারে মান্যতার সামগ্রিক যোগফলে ভয় ও যুক্তির শতাংশ যথাক্রমে উদ্যমহীনতার চেয়ে অনেক কম এবং সম্ভ্রম বা সহানুভূতির চেয়ে কম। এই মত অনুযায়ী সম্ভব ও সহানুভূতি সরকারের কর্তৃত্ব মেনে চলা জনসাধারণের আগে থেকে আগ্রহী ব্যাপারে সবচেয়ে শক্তিশালী দুটি উপাদান।

সরকারের কর্তৃত্বের প্রতি মান্যতা প্রদর্শনের ইচ্ছা রাষ্ট্রের মূলবিষয়গুলির সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্যের মতই সরকারের স্থিতিশীলতার জন্য আবশ্যক। রাষ্ট্রকে বজায় রাখার ক্ষেত্রে মান্যতার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা কোনও কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। আইন অমান্যয় বিশ্বাস করার অর্থ অরাজকতার বিশ্বাস করা।

*Studies in History and Jurisprudence, Vol II, Essay I.

হিন্দুদের নিয়ে গড়া ও হিন্দুদের নিয়ন্ত্রিত সরকারের কর্তৃত্বকে মুসলমানরা কতটা মানবেন এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য খুব অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। মুসলমানদের কাছে একজন হিন্দু হচ্ছে কাফের *। একজন কাফের শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য নয় সে নিম্নজাত ও মর্যাদাহীন। এই কারণেই কাফের শাসিত একটি দেশ একজন মুসলমানের কাছে দার-উল-হার্ব। এটা হলে মুসলমানরা যে হিন্দু সরকারের মান্য করবেন তা প্রতিপন্ন করতে আর কোনও প্রমাণের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। সম্ভ্রম ও সহানুভূতির মৌলিক মনোভাব যা লোকেদের সরকারের কর্তৃত্ব মেনে চলতে আগে থেকেই আগ্রহী করে তা সোজা কথায় তা একেবারেই নেই। কিন্তু প্রমাণ যদি চাওয়া হয় তার অভাব নেই। প্রমাণ এত প্রচুর আছে যে সমস্যা হচ্ছে কোনটা পেশ করা হবে, আর কোনটা উল্লেখ করা হবে না। তা নিয়ে।

খিলাফৎ আন্দোলনের মধ্যেই হিন্দুরা যখন মুসলমানদের সাহায্য করতে এতকিছু করছিল তখনও মুসলমানরা ভোলেনি যে তাদের তুলনায় হিন্দুরা একটি নিম্ন ও নিকৃষ্টতর জাতি। 'ইনসাফ' নামে খিলাফৎ পত্রে একজন মুসলমান লিখেছিলেন † ঃ—

'স্বামী ও মহাত্মার অর্থ কী? মুসলমানরা কি পদের বক্তৃতা ও রচনায় অমুসলমানদের সম্পর্কে এই শব্দগুলি ব্যবহার করতে পারেন? তিনি বলেছেন যে, স্বামীর অর্থ 'প্রভু' এবং মহাত্মার অর্থ উচ্চতম আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী ও 'রুহ-ই-আজম' এবং পরমপুরুষ।'

অ-মুসলমানদের এরকম সম্ভ্রমপূর্ণ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিধায় সম্বোধিত করা একজন মুসলমানের পক্ষে বিধিসম্মত কিনা তা এক কর্তৃত্বপূর্ণ ফতোয়ার সাহায্যে নির্ণয় করার জন্য তিনি মুসলমান ধর্মবেক্তাদের বললেন।

১৯২৪-এ কারাগার থেকে শ্রী গান্ধীর মুক্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে দিল্লিতে হাকিম আজমল খান পরিচালিত পুনানি চিকিৎস বিষয়ক টিবিয়া কলেজের অনুষ্ঠান থেকে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার খবর পাওয়া গেল।‡ প্রতিবেদন অনুসারে একটি হিন্দু ছাত্র শ্রী গান্ধীকে হযরত ও যীশুর-এর সঙ্গে তুলনা করেছিল। মুসলমান ভাবাবেগের দূষিত করার এই ঘটনায় সব মুসলমান ছাত্ররা জ্বলে উঠল এবং হিন্দু ছাত্রাটিকে

---

* কাফের বলায় হিন্দুদের আহত অনুভব করার কোন অধিকার নেই। মুসলমানদের তারা বলে ম্লেচ্ছ—মেলামেশা করার পক্ষে অযোগ্য ব্যক্তি।

† See 'Through Indian Eyes', Times of India, dated 11-3-24.

‡ See 'Through Indian Eyes', Times of India, dated 21-3-24

পীড়ন করার হুমকি দিল। অভিযোগ করা হয়েছে যে মুসলমান অধ্যাপকরা ও ক্রুদ্ধ মনোভাব প্রদর্শনে তাঁদের সমধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে যোগ দেন।

১৯২৩-এ মহম্মদ আলি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেছিলেন। তাঁর ভাষণে তিনি গান্ধী সম্পর্কে এই কথাগুলি বলেছিলেন ঃ—

'অনেকেই মহাত্মার শিক্ষাকে এবং সম্প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত কৃচ্ছসাধনের সঙ্গে তুলনা করেছেন যিশুখ্রিস্টের সঙ্গে (যাঁর ওপরে শান্তি)। যিশুখ্রিস্ট তার যাজনের প্রারম্ভে যখন পৃথিবীর কথা ভেবেছিলেন তখন তাঁকে সংস্কারের অস্ত্র বেছে নিতে হয়েছিল। কষ্টভোগ ও ত্যাগের সাহায্যে সর্বশক্তিমান হাওয়া এবং বিত্তের বিশুদ্ধতার শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার ধারণা মানুষের প্রথম সন্ততিদের সময় আবেল ও কেইন-এর সময়ের মতই প্রাচীন।

'সে যাই হোক মহাত্মা গান্ধীর ক্ষেত্রেও এইরকম বিশেষত্ব ; কিন্তু আমাদের সময়ে সবচেয়ে খ্রিস্টতুল্য মানুষটিকে গুরুতর অপরাধী হিসাবে পণ্য করা (ছি-ছি) এবং শান্তির রাজপুত্রের সবচেয়ে কাছে যিনি আসনে জনগণের বিষয়ে নিয়োজিত সেই মানুষটিকে জনগণের শান্তির বিঘ্নকারী হিসাবে শাস্তিদানের কাজটি একটি খ্রিস্টান সরকারের জন্য তোলা ছিল। মহাত্মার আবির্ভাবের ঠিক আগে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা যীশুর আবির্ভারের পূর্বে জুডিয়া-এর রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তুলনীয় ছিল। ভারতের দুর্দৈব্য নিরাময়ের সম্মানে যারা ছিলেন তাদের কাছে মহাত্মা যে ব্যবস্থা পত্রের প্রস্তাব করেছিলেন তা ছিল জুডিয়ায় যিশু যা প্রয়োগ করেছিলেন তার অনুরূপ। কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি, সরকারের দায়িত্বের জন্য নৈতিক প্রস্তুতি, স্বরাজের প্রাক-শর্ত হিসাবে আত্মশৃঙ্খলা ছিল মহাত্মার অভিমত ও বিশ্বাস এবং আমাদের মধ্যে যাদের আমেদাবাদে কংগ্রেস অধিবেশনে উপনীত হাওয়ার আগেকার গৌরবময় বর্ষাটিতে থাকায় সুযোগ হয়েছে তাকে দেখেছি জাতির এরকম বৃহৎ জনতার চিন্তার, অনুভূতি ও কাজে কী উল্লেখযোগ্য ও দ্রুত পরিবর্তন তিনি সাধন করেছিলেন।'

এক বছরবাদে আলিগড় ও আজমিরে মহম্মদ আলি বলেছিলেন * ঃ

'শ্রী গান্ধীর চরিত্র যতই শুদ্ধ হোক, ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে আমার যে কোন মুসলমানের চেয়ে নিকৃষ্টতর মনে হয় সে (ওই মুসলমান) যতই চরিত্রহীন হোক।'

---

*'Through India Eyes', 'Times of India', dated 21-3-24

বিবৃতিটি প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অনেকেই বিশ্বাস করেননি যে মহম্মদ আলি যিনি মহাত্মা গান্ধীর প্রতি এত শ্রদ্ধা মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করেছিলেন তিনি তার সম্পর্কে এরকম অনুদার ও অবমাননা কর মনোভাব পোষণ করতে পারেন। লক্ষ্ণৌয়ের আমিনাবাদ পার্কে অনুষ্ঠিত এক সভায় মহম্মদ আলি যখন ভাষণ দিয়েছিলেন; তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয় তাঁর মনোভাব বলে যা প্রচারিত হয়েছে তা সত্য কি না। মহম্মদ আলি কোনও দ্বিধা ও অনুতাপ ছাড়াই উত্তর দিলেন *ঃ

'হ্যাঁ, আমার ধর্ম ও বিশ্বাস অনুসারে আমি একজন ব্যাভিচারী ও পতিত মুসলমানকে শ্রী গান্ধীর চেয়ে ভাল বলে মনে করি।'

ঐসময় মনে করা হয়েছিল ** মহম্মদ আলিকে তাঁর পূর্বেকার মত প্রকাশ্যে পরিত্যাগ করতে হয়। কারণ, গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণভাবে একজন কাফের শ্রী গান্ধীকে যিশুর সমান বেদিতে স্থাপন করে তাঁর (আলির) এরকম শ্রদ্ধা প্রদর্শনে তাঁকে অপরাধী করেছিল। তারা মনে করেছিল একজন কাফেরের এরকম প্রশংসা মুসলমান ধর্মসংক্রান্ত বিবৃতি নিষিদ্ধ।

১৯২৮-এ হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক বিষয়ে জারি করা এক ইস্তাহারে খাজা হাসান নিজামই ঘোষণা করলেন ঃ

'মুসলমানরা হিন্দুদের থেকে আলাদা। তারা হিন্দুদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। রক্তাক্ত যুদ্ধের পর মুসলমানরা ভারত জয় করে, আর তাদের কাছ থেকে ইংরেজরা ভারতকে নেয়। মুসলমানরা একটা ঐক্যবদ্ধ জাতি এবং তারা একাই ভারতের ওপর প্রভুত্ব করবে। তারা তাদের স্বাতন্ত্র কখনই বিসর্জন দেবে না। কয়েক'শ বছর ধরে তারা ভারত শাসন করেছে আর সেই কারণেই দেশের ওপর তাদের ধারাবাহিক অধিকার রয়েছে বিশ্বে হিন্দুরা একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তারা কখনই নিজেদের মধ্যে পরস্পর বিধ্বংসী ঝগড়া থেকে মুক্ত নয় তারা গান্ধীকে বিশ্বাস করে। এবং গো-আরাধনা করে; অন্য লোকের (জাতের) জল পান করলে তারা অসূচি হয়। হিন্দুরা স্বায়ত্তশাসনের তোয়াক্কা করে না। এরজন্য দেওয়ার মত সময় তাঁদের নেই; তারা তাদের নিজেদের ঝগড়াঝাঁটি চালিয়ে থাকে। মানুষের ওপর রাজত্ব করার কি ক্ষমতা তাদের আছে? মুসলমানরা শাসন করেছে এবং শাসন করবে।'

---

* 'Through Indian Eyes', Times of India dated 31-3-24.

** 'Through Indian Eyes', Times of India, dated 26-4-24

হিন্দুদের প্রতি মান্যতা প্রদান তো নয়ই বরং মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে আবার হেস্তনেস্ত করতে তৈরি বলেই মনে হয়। ১৯২৬--এ একটা বিতর্ক উঠল ১৭৬১-এ হওয়া পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে কে জয়লাভ করেছিল? মুসমানদের পক্ষে বলা হল তাদের পক্ষে এটা ছিল মহান বিজয় কারণ আহম্মদ-শা-আবদালির সৈন্যছিল ১ লক্ষ সেখানে মারাঠাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল চার থেকে ছয় লক্ষ। হিন্দুরা উত্তর দিল এটা ছিল তাদের জয় বিজিতদের জয় কারণ এটা মুসলিম আক্রমণের জোয়ারকে রোধ হয়েছিল। হিন্দুদের হাতে পরাজয়ের বিষয়টি স্বীকার করতে মুসলমানরা প্রস্তুত ছিল না এবং দাবি করল তারা যে হিন্দুদের চেয়ে উৎকৃষ্ট তা সবসময় চিরন্তন উৎকর্ষ প্রমাণ করতে নাজিবাবাদের একজন মৌলালা আকরব-শা-খান খুব গম্ভীরভাবে প্রস্তাব দিলেন, পরীক্ষামূলক অবস্থায় হিন্দু ও মুসলমানদের। পানিপথের একই নিয়ন্ত্রিত সমতলে চতুর্থ যুদ্ধ করার। সেইমত মৌলানা নিম্নলিখিত ভাষায় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়াকে একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন ‡ ঃ

'মালব্যজি পানিপথের ফলাফলের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা যদি আপনি করেন তো (পরীক্ষার্থে) আমি, আপনাকে একটি সহজ ও চমৎকার উপায় দেখাব। আপনার সুবিদিত প্রভাবকে কাজে লাগান এবং কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনও বাধা ছাড়া পানিপথের চতুর্থ যুদ্ধ লড়ার জন্য অনুমতি দিতে ব্রিটিশ সরকারকে প্রভাবিত করুন। হিন্দু ও মুসলমানদের সৌর্য ও যোদ্ধৃ—মানসিকতার একটি তুলনামূলক পরীক্ষা দিতে আমি প্রস্তুত। যেহেতু ভারতে ৭ কোটি মুসলমান রয়েছেন। নির্ধারিত তারিখে ভারতে সাত কোটি মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী সাতশো মুসলমানকে নিয়ে আমি পানিপথের সমতলে পৌছাব। আর যেহেতু ভারতে ২২ কোটি হিন্দু রয়েছেন আমি আপনাকে বাইশশো কিন্তু নিয়ে আসতে দেব। সঠিক ব্যাপার হবে কামান, মেশিনগান বা বোমা ব্যবহার না করা। শুধু তরবারি, বর্শা ও বল্লম, তীর ধনুক এবং ছুরি ব্যবহার করা যায়। হিন্দু বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ যদি আপনি গ্রহণ করতে না পারেন তাহলে সদাশিব রাও বা বিশ্বেশ্বর রাও* এর কোনও উত্তরাধিকারিকে আপনি সেই পদ দিতে পারেন যাতে তাদের বংশধররা ১৭৬১-তে তাদের পূর্বপুরুষদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পায়। কিন্তু যেভাবেই হোক একজন দর্শক হিসাবে আসুন; কারণ এই যুদ্ধের ফলাফল দেখে আপনাকে আপনার মতামত

---

‡ 'Through Indian Eyes', 'Times of India', dated 20-6-26

* পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে এরা ছিলেন হিন্দুদের পক্ষে সামরিক সেনাপতি

পরিবর্তন করতে হবে। আর আমি আশা করি তখন দেশে বর্তমান বিরোধ ও লড়াইয়ের অবসান ঘটবে। উপসংহারে আমি বিনীতভাবে পেশ করতে চাই যে আমি সাতশো লোককে আনব তাদের মধ্যে যে পাঠান বা আফগানদের সম্পর্কে আপনারা মারাত্মকভাবে ভিত তাদের কেউ থাকবে না। তাই আমি আমার সঙ্গে শরিয়তের কঠোর অনুসারি ভাল পরিবারের ভারতীয় মুসলমানদেরই শুধু আনব।

৪

এরকমই ছিল হিন্দুদের ও মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চূড়ান্ত নিয়তি এবং সেগুলোর সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক প্রকল্প। চূড়ান্ত ভবিতব্য সম্পর্কে ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত ছিল তারা সহযোগী হবে না সংঘাতপন্থী হবে সেই কার্যধারা নির্ণয়ে মুখ্য চালিকাশক্তি।

অতীত অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে ওই কার্যাধারাগুলির মধ্যে পুনরায় মেলবন্ধন ঘটানো যায় না এবং হিন্দুদের ও মুসলমানদের কখনও একটি একক জাতি গঠন করতে অথবা একসমগ্রের দুটি সুসমঞ্জস্য অংশ হতে দেওয়ার পক্ষে এগুলি অত্যন্ত সঙ্গতিবিহীন। এই ব্যবধানের নিশ্চিত ফল তাদের শুধু পৃথক করেই রাখেনি পরস্পরকে সঙ্গে যুদ্ধরত রেখেছে। ব্যবধানগুলি স্থায়ী এবং হিন্দু, মুসলমান সমস্যা চিরস্থায়ী সম্ভব বলেই বোধ হয়। হিন্দুরা ও মুসলমানরা এবং অথবা এখন তারা যদি এক না হয় এরপর তারা এক হবে, এই ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা নিষ্ফল কাজ হতে বাধ্য—যেমন তা নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছিল চেকশ্লোভিয়ার ক্ষেত্রে। বরং সময় এসেছে যখন কয়েকটি তথ্য বিনা তর্কে স্বীকার করে নিতে হবে এরকম স্বীকৃতি যতই অপ্রীতিকর হোক।

প্রথমত এটা স্বীকার করে নেওয়া উচিত হিন্দুদের ও মুসলমানদের মধ্যে ঐরূপ আশার সম্ভাব্য সব চেষ্টা করা হয়েছে এবং সেগুলির সবকটিই ব্যর্থ হয়েছে। এইসব চেষ্টার ইতিহাস শুরু হয়েছে, বলা যেতে পারে ১৯০৯-এ মুসলিম প্রতিনিধি দলের দাবিগুলিকে ব্রিটিশরা মঞ্জুর করলে হিন্দুরা সেগুলিতে সম্মতি দিয়েছিল। এই হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন শ্রী গোখেল। পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর নীতিতে তিনি তার সম্মতি দেওয়ায় অনেক হিন্দুই তাঁকে দোষারোপ করেছিল। তাঁর সমালোচকরা ভুলে যান যে সম্মতি না দেওয়াটা বিজ্ঞোচিত হত না। কারণ, মহম্মদ আলি যথার্থ বলেছেন ঃ—

'যতই বিরোধাভাসপূর্ণ মনে হোক পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর সৃষ্টি হিন্দু-মুসলমান ঐক্য আনার বিষয়টিকে ত্বরান্বিত করছিল। প্রথমবাক্যের জন্য প্রকৃত ভোটাধিকার যতই নিয়ন্ত্রিত হোক, ভারতীয়দের হচ্ছিল। ব্রিটিশ শাসকের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যেমন তেমনই যদি হিন্দুরা ও মুসলমানরা বিভক্ত থাকত এবং প্রায়শই পরস্পরকে প্রতি বৈরি থাকত তাহলে মিত্র নির্বাচকমণ্ডলী আন্তঃ সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের জন্য সর্বোতম যুদ্ধক্ষেত্র হত এবং দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য অধিকারী ব্যবধানকে আরও বাড়িয়ে দিত। নির্বাচনে প্রত্যেক প্রার্থীই ভোটের জন্য তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন জানাতে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর বিদ্বেষের তীব্রতারকে ভিত্তি করে তিনি তাকে পছন্দ করার দাবি জানাতেন। এই বিদ্বেষ যতই প্রছন্ন হোক "তার সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা' এরকম একটা সূত্র অনুসারে এটা করা হোত। এটা তো খারাপ হতই, একটা নির্বাচন যেখানে দুটি সম্প্রদায় সমানভাবে পরস্পরের সমতুল্য নয়, সেখানে নির্বাচনের পরিণতি হত খারাপ। কারণ যে সম্প্রদায় তার প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করাতে পারত না সেই সম্প্রদায়ের অবশ্যম্ভাবীভাবে তার সফল প্রতিদ্বন্দ্বির বিরুদ্ধে গভীরতর আক্রোশ পোষণ করত। দুটি সম্প্রদায় বিভক্ত হওয়ায় নির্বাচনের সময় কোনও রাজনৈতিক নীতি আদর্শ স্পষ্ট হওয়ার সুযোগ ছিল না। পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর সৃষ্টি এই আন্ত সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ বন্ধে অনেকটাই করেছিল যদিও আমি একটি বিষয়ে বিস্মৃত হয়নি। তা হচ্ছে যখন আন্ত সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা তীক্ষ্ণ তখন সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী থেকে যে মানুষগুলি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তারাও প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষের জন্য পরিচিতি লোকগুলির মতই হন।'

কিন্তু ১৯০৯-এ পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর যে সুবিধা হিন্দুরা দিয়েছিল তার ফলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য হয়নি। এরপর ১৯১৬-তে এল লখনউ চুক্তি। এই অনুসারে প্রতিটি বিষয়ে হিন্দুরা, মুসলমানদের সন্তুষ্ট করল। তবুও দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও ঐক্য হল না। ৬ বছর বাদে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য আনার আর একটি চেষ্টা হল ১৯২৩ এর মার্চে লখনউ এ অনুষ্ঠিত তাদের বার্ষিক অধিবেশনের সারা ভারত মুসলিম লীগ একটি প্রস্তাব* গ্রহণ করল। এতে ভারতে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সৌহার্দ্য সুনিশ্চিত করতে একটি জাতীয় চুক্তি প্রণয়নের

* লীগের প্রস্তাবটির সম্পূর্ণ মূলের জন্য দেখুন; 'Indian Annual Register 1923' Vol I পৃষ্ঠা : ৩৯৫-৯৬

আহ্বান জানানো হল। অন্যান্য সংগঠন যেসব সমিতি নিয়োগ করবে তাদের সঙ্গে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে লীগ একটি সমিতি নিয়োগ করলেন। ১৯২৩ এর সেপ্টেম্বরে দিল্লিতে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন লীগ যে মনোভাব প্রকল্প করেছিল তাকে স্বীকার করে অনুরূপ মনোভাব নিয়ে একটি প্রস্তাব অনুমোদন করল। কংগ্রেস (১) সংবিধান সংশোধন করতে এবং (২) জাতীয় চুক্তির একটি খসড়া তৈরি করতে দুটি সমিতি নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন। ভারতীয় জাতীয় চুক্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদনে[†] স্বাক্ষর করেছিলেন ডঃ আনসারি ও লালা রাজপত রায়। এটি ১৯২৩-এ কোকনদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে পেশ করা হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় চুক্তির শর্তগুলি তৈরি করার পাশাপাশি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতি ও বাংলার মুসলমানদের শ্রী চিত্তরঞ্জন দাসের প্রেরণীয় 'বাংলা চুক্তি' [‡] সম্পাদিত হল।

ভারতীয় জাতীয় চুক্তি এবং 'বাংলা চুক্তি'র দুটি কংগ্রেসের বিষয় সমিতিতে আলোচনার[§] জন্য উঠল। 'বাংলা চুক্তি'র পক্ষে ৪৫৮ ও বিপক্ষে ৬৭৮ ভোটে খারিজ হয়ে গেল। জাতীয় চুক্তির ব্যাপারে কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিল।[¶] যে সমিতি তাদের তৈরি চুক্তির খসড়াটি সম্পর্কে আরো মতামত আহ্বান করবে এবং ১৯২৪-এর ৩১শে মার্চের মধ্যে তাদের প্রতিবেদন বিবেচনার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির জন্য পেশ করবে। তবে সমিতি এব্যাপারে আর এগোলেন না। কারণ বাংলা চুক্তির বিরুদ্ধে হিন্দুদের মনোভাব একটা কঠোর ছিল যে লালা লাজপত রায়ের[#] মতে সমিতির যে কাজ করেছে তা নিচে এগোনো আর সুবিধাজনক বিবেচিত হল না। তার ওপর শ্রী গান্ধী ঐসময় কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন এবং এটা চিন্তা করা হল তিনি প্রশ্নটি বিবেচনা করবেন। তাই ডঃ আনসারি তিনি যেসব তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন তা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে হাতে তুলে দিয়েই

† বাংলা চুক্তি শর্তগুলির জন্য দেখুন : Indian Annual Register 1923, p,127

‡ চুক্তির প্রতিবেদন ও খসড়া শর্তাবলীর জন্য দেখুন : Indian Annual Register 1923. Vol II·পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা ১০৪-১০৮

§ এই দুটি চুক্তি নিয়ে বিতর্কের ব্যাপারে দেখুন : Indian Annual Register p,121-127

¶ প্রস্তাবটির জন্য দেখুন : Indian Annual Register 1923, p,122

১৯২৫-এ অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনের বিষয়ে তাঁর বিবৃতি দেখুন : Indian Quarterly Register, 1925, Vol-I, পৃষ্ঠা—৭০

নিজে সন্তুষ্ট থাকলেন। কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শ্রী গান্ধী সূত্রগুলি হাতে তুলে নিলেন। ১৯২৪-এর নভেম্বরে বোম্বেতে ঘরোয়া আলোচনা হল এইসব আলোচনার ফলে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন ঘটিত হল এবং ঐক্য আসার প্রশ্নটি নিয়ে বিবেচনা করতে একটি সমিতি নিযুক্ত হল। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, জাস্টিস পার্টি, লিবারেল ফেডারেশন, ইন্ডিয়ান খ্রিস্টানস, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দল থেকে প্রতিনিধিদের নেওয়ায় সম্মেলন সত্যই একটি সর্বদলীয় সম্মেলন হয়ে উঠল। ১৯২৫-এর ২৩শে জানুয়ারি সর্বদলীয় সম্মেলন নিযুক্ত সমিতির* একটি সভা দিল্লির ওয়েস্টার্ন হোটেলে অনুষ্ঠিত হল। শ্রী গান্ধী সভাপতিত্ব করলেন। ২৪শে জানুয়ারি সমিতির ৪০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক উপসমিতি নিয়োগ করলেন।

(ক) সব দল কংগ্রেসে যোগ দিতে সমর্থ হবে এরকম সুপারিশ প্রণয়ন করতে, (খ) স্বরাজের আওতায় ব্যবস্থাকে এবং অন্যান্য নির্বাচিত সংস্থার সব সম্প্রদায়, জাতি ও উপরিভাগের প্রতিনিধিত্বের জন্য একটি প্রবন্ধ রচনা করতে এবং দক্ষতার ক্ষতি না করে চাকুরিগুলিতে সম্প্রদায়গুলির ন্যায্য ও উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব অর্জনের সর্বোত্তম পদ্ধতি সুপারিশ করতে এবং যে দেশের বর্তমান চাহিদাগুলি পূরণ করবে স্বরাজের এরকম একটি প্রবন্ধ প্রণয়ন করতে। ১৫ই ফেব্রুয়ারি বা তার আগে সমিতির প্রতিবেদন দিতে বলা হল। কাজ দ্রুত করার স্বার্থে, স্বরাজের প্রকল্প প্রণয়নের জন্য কয়েকজন সদস্য নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট সমিতি গঠন করলেন। সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত প্রকল্প রচনার কাজ মূল সমিতির জন্য রেখে দেওয়া হল।

শ্রীমতী বেসান্ট-এর পৌরোহিত্যে স্বরাজ উপসমিতি সংবিধান সম্পর্কে প্রতিবেদন রচনায় সফল হলেন এবং সেটি সর্বদলীয় সম্মেলনে সাধারণ সমিতির কাছে পেশ করলেন কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত প্রবন্ধ রচনার জন্য নিযুক্ত উপসমিতির পয়লা মার্চ-দিল্লিতে বৈঠকে বসলেন এবং কোনও সিদ্ধান্তে না পৌঁছেই অনির্দিষ্টকালের জন্য বৈঠক মুলতুবি করে দিলেন। এটা ঘটল লালা লাজপাত রায় ও হিন্দুদের অন্য প্রতিনিধিত্ব উপ-সমিতির বৈঠকে উপস্থিত না হওয়ায়। শ্রী গান্ধী ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু নিজে বিবৃতিটি জারি করলেন † ঃ—

* সমিতির কার্য বিবরণীর জন্য দেখুন : Indian Quarterly Register, 1925; Vol-I : পৃষ্ঠা-66-67

† সমিতির কার্যবলীর জন্য দেখুন : Indian Quarterly Register, 1925; Vol-I : পৃষ্ঠা-77

'সর্বশ্রী জয়কার, শ্রী নিবাস আয়েঙ্গার ও জয়রাম দাসের উপস্থিত হতে অক্ষমতার কারণে লালা রাজপত রায় (উপসমিতির বৈঠক) স্থগিত করার জন্য বলেছিলেন। আমরা, আমাদের নিজ দায়িত্বের বৈঠক স্থগিত রাখতে অপারগ ছিলাম। আমরা তাই লালা বাজপত রায়কে জানিয়ে ছিলাম যে স্থগিত রাখার প্রশ্নটি বৈঠকে রাখা হোক। পরবর্তীকালে তাই করা হয়েছিল। কিন্তু লালা রাজপত রায় এবং তাঁর উল্লিখিত ভদ্রমহোদয়গণের অনুপস্থিতি ছাড়াও কোনও সিদ্ধান্তে আসার পক্ষে বৈঠকে উপস্থিতি ছিল খুবই কম। আমাদের মতে কোনও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছানোর মত তথ্য বিষয়াদিতে ছিল না। অদূর ভবিষ্যতে কোনও সিদ্ধান্তে পৌছানো যাবে এরকম সম্ভাবনাও নেই।

সন্দেহ নেই দলগুলির মনোভাব কি ছিল, এই বিবৃতির সংক্ষেপে তা তুলে ধরেছে। সমিতিতে হিন্দুদের মুখপাত্র প্রয়াত লাল রাজপত রায় এলাহাবাদের 'লিডার' পত্রিকায় ইতিমধ্যেই বলেছিলেন যে একটি নতুন চুক্তির জন্য আসু কোনও তাড়াহুড়ো নেই এবং কয়েকটি প্রদেশে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং অন্য কয়েকটিতে মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠতা, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের একমাত্র পথ। এই মত গ্রহণ করতে তিনি অস্বীকার করেন।

হিন্দু মুসলমান ঐক্যের প্রশ্নটি আবার ১৯২৭ এ উঠেছিল। 'সাইমন আয়োগের' তদন্তের ঠিক আগে এই চেষ্টাটি হয়েছিল। এই আশায় যে ১৯১৬-তে যেমন মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড অনুসন্ধানের আগে চেষ্টা হয়েছিল এবং তার পরিণতিতে লক্ষ্ণৌ চুক্তি হয়েছিল তেমনই এই চেষ্টাতে সফল হবে। প্রারম্ভিক হিসাবে ১৯২৭-এর ২০শে মার্চ নেতৃত্বে স্থানীয় মুসলমানদের এক সম্মেলন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হল। এতে মুসলমানদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব* বিবেচনা করা হল। দিল্লি প্রস্তাব নামে পরিচিত এই প্রস্তাবগুলি ১৯২৭-এর ডিসেম্বরে মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশনে বিবেচনা করা হয়েছিল। একই সময়ে কংগ্রেস একটি প্রস্তাব† অনুমোদন করে এতে, ভারতের জন্য একটি স্বরাজ সংবিধান রচনা করতে, অন্য সংগঠনগুলির দ্বারা নিযুক্ত হবে এমন সমিতিগুলির সঙ্গে আলোচনা চালানো কংগ্রেস কর্মসমিতিকে অধিকার দেওয়া হল। লিবারেল ফেডারেশন ও মুসলিম লীগ অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ

---

* এই প্রস্তাবগুলি দেখতে পাওয়া যাবে : Indian Quarterly Register, 1927; Vol-I : পৃষ্ঠা : 33 এই প্রস্তাবগুলি পরবর্তীকালে শ্রী জিন্নাহ্ ১৪ দফার ভিত্তিতে হয়েছিল।

† এই প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রস্তাবের জন্য দেখুন Indian Quarterly Register 1927, Vol-II পৃষ্ঠা-397-98

করে আলোচনায় যোগ দেবার জন্য তাদের প্রতিনিধিদের নিয়োগ করল। কংগ্রেস কর্মসমিতি অন্য সংগঠনগুলিকেও তাদের মুখপাত্রদের পাঠানোর জন্য আমন্ত্রণ জানাল। সর্বদলীয় সম্মেলন †, যে নামে সমিতিকে ডাকা হত ১৯২৮ এর ১২ই ফেব্রুয়ারি মিলিত হলেন এবং একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে এবং উপসমিতি নিয়োগ করলেন। সমিতি সংবিধানের একটি খসড়া সহ এক প্রতিবেদন প্রস্তুত করলেন যা নেহরু প্রতিবেদন নামে পরিচিত। প্রতিবেদনটি কংগ্রেস অধিবেশনের ঠিক আগে ১৯২৮ এর ২২শে ডিসেম্বর ডাঃ আনসারির সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সম্মেলনে পেশ করা হল।

কোনও প্রশ্নে এমনকি সাম্প্রদায়িক প্রশ্নেও কোন মতৈক্যে না পৌঁছেই ১৯২৯ এর পয়লা জানুয়ারি সম্মেলন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হয়ে গেল। এটা কিছুটা বিস্ময়কর কারণ মুসলমানদের প্রস্তাবগুলি এবং নেহরু সমিতির প্রতিবেদনে নেওয়া প্রস্তাবগুলির মধ্যে মতপার্থক্যের বিষয়গুলি খুব গুরুতর ছিল না। শ্রী জিন্নাহ্ সর্বদলীয় সম্মেলনে তার সংশোধনীগুলির সমর্থনে যে ভাষণ* দিয়েছিলেন। তা থেকে এটা একেবারে স্পষ্ট। শ্রী জিন্নাহ্ নেহরু সমিতির প্রতিবেদনে চারটি সংশোধনী সন্নিবেশিত করতে চেয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় ৩৩ $\frac{১}{৩}$ শতাংশ প্রতিনিধিত্বের জন্য মুসলমানদের দাবি সংক্রান্ত প্রথম সংশোধনী সম্পর্কে তার বক্তব্যের শ্রী জিন্নাহ্ বললেন ঃ—

'নেহরু প্রতিবেদন বলেছে যে তারা যে প্রকল্পের প্রস্তাব করছে তাতে মুসলমানদের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার $\frac{১}{৩}$ শতাংশ এবং বোধহয় তারও বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা করেছে। এই যুক্তি দেখানো হয়েছে যে পঞ্জাব ও বাংলার মুসলমানরা জনসংখ্যায় তাদের যা অনুপাত তার চেয়েও বেশি পাবে। আমরা যা অনুভব করি তা হচ্ছে এই মুসলমানদের যদি এক তৃতীয়াংশ পেতে যায় তাহলে আপনারা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা মুসলমানরা সংখ্যালঘু এরকম প্রদেশগুলির প্রতি সম্পূর্ণ ন্যায়োচিত নয়। কারণ পঞ্জাব ও বাংলা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে যা পাওয়া উচিত তার চেয়ে বেশি পাবে। আপনারা ধনীদের আরও বেশি দিতে চলেছেন এবং দারিদ্রদের জনসংখ্যা অনুসারে

---

† সর্বদলীয় সম্মেলনের মূল ইতিহাস ও গঠনের বিচারে এবং প্রতিবেদনের মূলের জন্য দেখুন : Indian Quartirly Registor, 1928 Vol I., পৃষ্ঠা-1-142

* দেখুন Indian, Quarterly Register. 1928, Vol-I পৃষ্ঠা : 1-142

রাখতে চাইছেন। এটা ভালো যুক্তি হতে পারে কিন্তু বিজ্ঞতা নয়.....।

তাই নেহরু প্রতিবেদনের প্রস্তাব মত মুসলমানরা যদি এক তৃতীয়াংশ বা তার বেশি পায় তাহলে তারা পঞ্জাব বা বাংলাকে বেশি দিতে পারে না। ছয় বা সাতটি অতিরিক্ত আসন যেসব প্রদেশে ইতিমধ্যেই অত্যন্ত কম সংখ্যক আসন পেয়ে বেশ সংখ্যালঘু অবস্থায় রয়েছে যেমন মাদ্রাজ ও বোম্বাই তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হোক। কারণ, মনে রাখবেন সিন্ধুকে যদি আলাদা করে নেওয়া হয় বোম্বে প্রদেশের ভাগও কমে হবে ৮ শতাংশের মত। অন্যান্য প্রদেশও রয়েছে যেখানে আমরা খুবই সংখ্যালঘু এই কারণেই আমরা বলছি এক তৃতীয়াংশ ধার্য করুন এবং এটা আমাদের নিজেদের ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করা হোক। তার দ্বিতীয় সংশোধনীটি ছিল পঞ্জাব ও বাংলায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন সংরক্ষণের বিষয়ে অর্থাৎ একবিধিবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি সম্পর্কে। এনিয়ে শ্রী জিন্নাহ্ বললেন ঃ—

'আপনাদের মনে আছে, আদিতে প্রস্তাবগুলি এনেছিল ১৯২৭-এর মার্চে কয়েকজন মুসলমান নেতার কাছ থেকে। এগুলি 'দিল্লি প্রস্তাব' নামেও পরিচিত। বোম্বেতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক ও মাদ্রাজ কংগ্রেসে এগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল এবং গত বছর কলকাতার মুসলিম লীগ প্রস্তাবটির এই অংশ ভালভাবে অনুমোদন করেছিলেন। আমি বিস্তারিত যুক্তি তর্কের মধ্যে যাচ্ছি না। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি প্রস্তাবে পর্যবসিত হয় তা হচ্ছে এই পঞ্জাব ও বাংলার মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তাদের ভোটের ক্ষমতা জনসংখ্যা অনুপাতে নয়। এটি কারণগুলির একটি। নেহরু প্রতিবেদনে এখন একটি বিকল্প পাওয়া গেছে। তারা বলছেন, প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার পদ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটি প্রতিষ্ঠিত না হলে আমরা কোনও সন্দেহ রাখতে চাই না সেক্ষেত্রে পঞ্জাব ও বাংলার মুসলমানদের তাদের জনসংখ্যা অনুযায়ী আসন সংরক্ষণ হওয়া উচিত তবে তারা অতিরিক্ত আসনের অধিকারি হবে না।

তাঁর তৃতীয় সংশোধনী ছিল অবশিষ্ট ক্ষমতা সম্পর্কে যেটি নেহরু সমিতি কেন্দ্রীয় সরকারে ন্যস্ত করেছিলেন। এই ক্ষমতাগুলি প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকা উচিত। এই মর্মে তার সংশোধনী উত্থাপন করে শ্রী জিন্নাহ্ যুক্তি দেখিয়েছিলেন ঃ—

'ভদ্রমহোদয়গণ এটি পুরোপুরিভাবে একটি সাংবিধানিক প্রশ্ন এবং এর সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিষয়ের কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা দৃঢ়ভাবে এই অভিমত পোষণ করি — আমি জানি হিন্দুরা বলবেন, মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক বিবেচনায় চালিত

হয়েছেন। আমরা দৃঢ়ভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করি যে প্রশ্নটি আপনারা যদি সতর্কভাবে পরীক্ষা করেন তবে আমরা বলছি যে, অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রদেশগুলির হাতেই থাকা উচিত।"

তাঁর চতুর্থ সংশোধনীটি ছিল হিন্দুকে পৃথক করার বিষয়ে। নেহরু সমিতি হিন্দুকে পৃথক করার ব্যাপারে রাজি হয়েছিলেন তবে একে শর্তসাপেক্ষ করেছিলেন। সেই শর্তটি ছিল 'প্রতিবেদনে যে রূপরেখা দেওয়া আছে সেই অনুয়ায়ী সরকারি ব্যবস্থা স্থাপিত হলেই শুধু' এই পৃথকীকরণ হওয়া উচিত। শ্রী জিন্নাহ্ এই শর্ত বিলোপের প্রস্তাব করে বললেন ঃ— 'আমরা এই সমস্যা অনুভব করি.....। ধরা যাক সরকার আগামী ৬ মাস, একবছর বা দু'বছরের মধ্যে এই সংবিধানের অনুযায়ী একটি সরকার স্থাপনের আগেই সিন্ধুকে পৃথক করতে চাইলেন তখন মুসলমানরা কি বলবে আমরা এটা চাই না.....। যতক্ষণ এই ধারাটি থাকবে তার অর্থ হবে, মুসলমানদের সিন্ধুকে আলাদা করার বিরোধিতা করা উচিত, যতক্ষণ পর্যন্ত এই সংবিধান অনুসারে একটি সরকার গঠিত না হয়। আমরা বলি এই শব্দগুলি বাদ দিন। আর আমি, আমার যুক্তিকে এই তথ্য দিয়ে সমর্থন করছি যে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সম্পর্কে আপনারা এরকম মন্তব্য করেন না.....। সমিতি বলছেন, তারা এটা মানতে পারেন না কারণ প্রস্তাবটির, লক্ষ্ণৌতে স্বাক্ষরকারি পক্ষগুলির মধ্যে মতৈক্যকে লিপিবদ্ধ করেছে। সমিতির সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়েও আমি সাহস করে বলছি সেটা যথার্থ কারণ নয়.....। এই সম্মেলনে কি আমাদের হাত পা বাধা, কারণ একটি বিশেষ প্রস্তাব কয়েকজনের মধ্যে মতৈক্যের সাহায্যে অনুমোদিত হয়েছিল?'

এই সংশোধনীগুলি দেখাচ্ছে যে, হিন্দুদের ও মুসলমানদের মধ্যে মত পার্থক্য কোনওভাবেই ব্যাপক ছিল না। তবুও তা মিটিয়ে ফেলার কোন আগ্রহ ছিল না। হিন্দুরা ও মুসলমানরা যা করতে ব্যর্থ হল তা ছেড়ে দেওয়া হল ব্রিটিশ সরকারের জন্য এবং তারা তা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সাহায্যে।

হিন্দুদের ও অবদমিত কার্যগুলির মধ্যে যে 'পুনা চুক্তি' হয়েছিল তা ঐক্য আনার প্রয়াসকে আর একবার সহসা অপমানের জন্য মতি দিয়েছিল।* ১৯৩২ এর নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে মুসলমানরা ও হিন্দুরা কোন একটা সমঝোতায় আসার জন্য তাদের যথাসাধ্য করেছিলেন। মুসলমানরা তাদের সর্বদলীয় সম্মেলনগুলিতে মিলিত

* এইসব প্রয়াসের বিবরণের জন্য দেখুন : Indian Quarterly Register, 1932, Vol-II, পৃষ্ঠা : 296.....

হয়েছিলেন, এবং হিন্দুরা, মুসলমানরাও শিখেরা ঐক্য সম্মেলনগুলিতে প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ওই বাঁটোয়ারার পরিবর্তে একটি চুক্তির জন্য এইসব আলোচনায় কোনও ফল হল না। সমিতির ২৩টি বৈঠক করার পর শেষে আলোচনা পরিত্যক্ত হল।

রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি সম্পর্কে ঐক্য আনার প্রয়াস চালানোর সঙ্গে সঙ্গে বিরোধ রয়েছে এমন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রশ্নগুলি নিয়েও ঐক্য আনার চেষ্টা হয়েছিল। যেমন ঃ—

(১) গো-হত্যা (২) মস্‌জিদের সামনে বাজনা ও (৩) ধর্মান্তর এই লক্ষ্যে প্রথম চেষ্টা হয়েছিল ১৯২৩-এ যখন ভারতীয় জাতীয় চুক্তির প্রস্তাব করা হয়। তা ব্যর্থ হয়। শ্রী গান্ধী তখন কারাগারে। ১৯২৪-এর ৫ই ফেব্রুয়ারি শ্রী গান্ধী কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য তিনি যে কাজ করেছিলেন তা নষ্ট হতে দেখে শ্রী গান্ধী ২১ দিন অনশনের সিদ্ধান্ত নিলেন, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে খুনোখুনি ও দাঙ্গা হয়েছে তার জন্য নিজেকে নৈতিকভাবে দায়ী সাব্যস্ত করে। এই অনশনের সুযোগ নিয়ে ভারতের সব সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এক ঐক্য সম্মেলনে† সমবেত হলেন। সম্মেলনে কলকাতার পুরবাসীরাও (মেট্রোপলিন) যোগ দিলেন। ১৯২৪-এর ২৬শে সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত সম্মেলন দীর্ঘ বৈঠক করলেন। বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতাতে নীতিকে কার্যকর করতে এবং কোনও প্ররোচনাতেই ওই নীতি থেকে বিচ্যুতির নিন্দা করতে নিজেদের যথাসাধ্য প্রয়াসকে কাজে লাগানোর অঙ্গীকার সম্মেলনের সদস্যরা করলেন। শ্রী গান্ধীকে সভাপতি করে একটি কেন্দ্রীয় জাতীয় পঞ্চায়েত নিযুক্ত হল। ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণ ও প্রকাশ করার স্বাধীনতা এবং ধর্মাচরণ, উপাসনাস্থলের পবিত্রতা, গোহত্যা ও মসজিদের সামনে বাজনার বিষয়ে কয়েকটি মৌলিক অধিকার সম্মেলনে স্থির করা হল। এগুলি কোন কোন সীমার অধীন হবে সে সম্পর্কে একটি বিবৃতিও রইল। ঐক্য সম্মেলন দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি আনতে পারেনি। এটা শুধু যে দাঙ্গা তখনকার দিনে নিত্য ব্যাপারে হয়ে দাড়িয়েছিল তাতে সাময়িক বিরতি এনেছিল। ১৯২৫ থেকে ১৯২৬ এর মধ্যে যে তীব্রতার সঙ্গে ও যে নিন্দনীয় ভাবে দাঙ্গা নতুন করে শুরু হল তা আগে জানা ছিল না। এই দাঙ্গায় দুঃখিত ভারতের বড়লাট লর্ড আরউইন ১৯২৭ এর ২৯শে আগস্ট কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁর

† পট্টভি সীতারামাইয়া, History of the Congress, পৃষ্ঠা : 532

ভাষণে, দাঙ্গা বন্ধ করে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করতে দুটি সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন জানালেন। সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার জন্য লর্ড আরউইনের সনির্বন্ধ অনুরোধের পর আর একটি ঐক্য সম্মেলন হল। এটি সিমলা ঐক্য সম্মেলন* বলে পরিচিত। ১৯২৭-এর ৩০শে আগস্ট এই ঐক্য সম্মেলনের বৈঠক হল এবং একটি সন্তোষজনক নিষ্পত্তিতে পৌছানোর জন্য নেতাদের চেষ্টায় তাদের সমর্থন করার জন্য উভয় সম্প্রদায়কে অনুনয় করে একটি আবেদন জারি করা হল। সম্মেলন একটি ঐক্য সমিতি নিয়োগ করলেন। সমিতি সেপ্টেম্বরের ১৬ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত শ্রী জিন্নার সভাপতিত্বে সিমলায় বৈঠক করলেন।

গরু ও বাজনার প্রশ্নে যে প্রধান বিষয়গুলি জড়িত ছিল তার কোনটির সম্পর্কেই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল না। সমিতির সামনে অন্য যে বিষয়গুলি ছিল সেগুলিকে ছোঁয়াও হল না। কয়েকজন সদস্য মনে করেছিলেন যে, সমিতি ভেঙে যেতে পারে। হিন্দু সদস্যরা জোর দিলেন যে ভবিষ্যতে কোনও সুবিধাজনক তারিখে সমিতির বৈঠক আবার হোক। সমিতির মুসলমান সদস্যদের মধ্যে প্রথমে মতভেদ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমিতিকে ভেঙে দিতে তারা একমত হলেন। সভাপতিকে অনুরোধ করা হল যে, ১১ জন নির্দিষ্ট সদস্যের কাছ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে দাবিপত্র বা অনুরোধ পেলে তিনি যেন বৈঠক ডাকেন। এরকম দাবি কখনও করা হয়নি আর সমিতিও কোনও বৈঠকে বসেনি।

সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার পর কংগ্রেসের ততকালিন সভাপতি শ্রী শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার হিন্দুদের ও মুসলমানদের এক বিশেষ সম্মেলন ডাকলেন। ১৯২৭-এর ২৭ ও ২৮-এ অক্টোবর কলকাতার ওই সম্মেলন বসল এটি কলকাতা ঐক্য সম্মেলন † বলে পরিচিত। তিনটি জ্বলন্ত প্রশ্ন সম্পর্কে সম্মেলন কয়েকটি প্রস্তাব অনুমোদন করল কিন্তু এই প্রস্তাবের পিছনে কোনও সমর্থন ছিল না কারণ হিন্দু মহাসভা বা মুসলিম লীগের প্রতিনিধি সম্মেলনে ছিলেন না। একটা সময় এটা বলা সম্ভব ছিল যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য একটি আদর্শ যা শুধু রূপায়িতই হবে না, যা রূপায়িত করাও যেতে পারে এবং এটির রূপায়ণে পর্যাপ্ত প্রয়াস না চালানোর জন্য নেতাদের দায়ী করা হয়েছিল। ১৯১১-তে এমনকি মৌলানা মহম্মদ আলি যিনি তখনও হিন্দু—মুসলমান ঐক্য অর্জনে বিশেষ কোন প্রয়াস চালাননি তিনিও

* এই সম্মেলনের কার্য-বিবরণীর জন্য দেখুন : Indian Quarterly Register, Vol-II, পৃষ্ঠা : 49-50

† সম্মেলনের কার্যাবলীর জন্য দেখুন : The Indian Quarterly Register, Vol II, পৃষ্ঠা : 50-58

এরকম মত-ই প্রকাশ করেছিলেন। ১৯১১-এর ১৪ই জানুয়ারি 'কমরেড'-এ লিখতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন* ঃ

'ভারত ঐক্যবদ্ধ — এই চিৎকারে আমাদের বিশ্বাস নেই। ভারত যদি ঐক্যবদ্ধ হত তাহলে এবছরের কংগ্রেসের মাননীয় সভাপতিকে তাঁর দূরের বাড়ি থেকে টেনে আনার প্রয়োজন কি ছিল? একটা ভোজের নিছক কল্পনা ক্ষুধার তীব্রতা দূর করতে পারে না। যে কপট ধার্মিকতা তার সূক্ষ্ম রসায়নে লুব্ধ একচেটিয়া ব্যবসায়কে জ্বলন্ত দেশপ্রেমে রূপান্তর করে তাতে আমাদের বিশ্বাস এখনও কম.....। যে ব্যক্তিকে আমরা সবচেয়ে ভালবাসি, সবচেয়ে ভয় করি এবং সবচেয়ে কম বিশ্বাস করি যে অস্থির আদর্শবাদীবায়রণ সম্পর্কে গেটে বলেছিলেন তিনি একজন বিরাট কবি কিন্তু তিনি যখন চিন্তা করেন তিনি একজন শিশু। ঠিক আছে, যে মানুষ মহান আদর্শ এবং বৃহত্তর অধীরতাকে সমন্বিত করেন, তিনি ভাল কি মন্দ তা নিয়ে আমরা ভাবিনা। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন এবং খারাপভাবে সংঘটিত এতরকম প্রয়াস এই বিভ্রান্ত দেশে ঐক্য আনতে ব্যর্থ হয়েছে যে আর একটি দুর্বিবেচনা প্রসূত প্রয়াসের কবরের জন্য ভাবাবেগের সস্তা ও গন্ধহীন ফুলকেও আমরা ছাড়তে চাই না। আমরা ভাঙা কাচের টুকরোগুলিকে আঠা দিয়ে জোড়ার ভুল করব না। আর তারপর আমরা ব্যর্থতার পরিণতিতে বিলাপ করব অথবা বাষ্পীভবনযোগ্য দ্রবতাসাধক চূর্ণদ্বারা আচ্ছাদিত ভাণ্ড খণ্ড (যার দ্বারা অন্য ভাণ্ড সমূহের চাকচিক্য সম্পাদিত হয়)-কে আমরা দোষারোপ করব। অন্য কথায় সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার চেষ্টা আমরা করব এবং যত কার্য বা যত প্রতিকূলই হোক সত্যকে আমরা সম্মান জানাব। অসুবিধাজনক বাস্তব অবস্থাকে দেখেও না দেখা খারাপ রাজনীতিজ্ঞতা। আর সবশেষে, ঐক্যের পক্ষে প্রতিবন্ধ বা বদ্ধমূল পূর্ব সংস্কার এবং যে বিরাট মতপার্থক্য আমাদের বিভক্ত করে তাকে তাকে সৎ ও খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে নেওয়ায় ঐক্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য।—'

এই তিরিশ বছরের ইতিহাস পিছন ফিরে দেখলে একজন জিজ্ঞেস করতেই পারেন হিন্দু-মুসলমান ঐক্য অর্জিত হয়েছে কি? এটা অর্জনের জন্য তো চেষ্টা করা হয়নি। আর কোনও চেষ্টা বাকি আছে। গত তিরিশ বছরের ইতিহাস দেখাচ্ছে যে হিন্দু মুসলমান ঐক্য অর্জিত হয়নি বরং এখন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনৈক্য বিরাজ করছে ঃ এটা অর্জনে আন্তরিক ও নিরবিচ্ছিন্ন প্রয়াস চালানো হয়েছে এবং

---

* ১৯২৩-এ কংগ্রেসের কোকনদ অধিবেশনে সভাপতি হিসাবে তাঁর ভাষণে ; উদ্ধৃতি।

এখন এক পক্ষের কাছে অন্য পক্ষের আত্মসমর্পণ ছাড়া এটা অর্জনের জন্য আর কিছু করার বাকি নেই। আশাবাদীতার সৃষ্টির অভ্যেস যার নেই এবং যেখানে তার যৌক্তিকতাও নেই এমন কেউ যদি বলেন, হিন্দু মুসলমান ঐক্যের সন্ধান মরিচিকার মত এবং সেই ধারণাকে এখন অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে তাহলে তাঁকে নৈরাশ্যবাদী বা অস্থির আদর্শবাদী বলার সাহস কারও থাকতে পারে না। হিন্দুদের বলতে হবে তারা তাদের সব অতীত প্রয়াসের দুঃখজনক পরিণতি সত্ত্বেও নিজেদের এই ব্যর্থ সন্ধানে নিয়োজিত রাখবেন না ঐক্যের সন্ধান পরিত্যাগ করে অন্য কোনও ভিত্তিতে নিষ্পত্তির চেষ্টা করবেন। দ্বিতীয়ত এটা অবশ্যই স্বীকার করতেই হবে যে মুসলমান দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পূর্ণ বিপ্লব ঘটে গেছে। এই বিপ্লব কতটা সম্পূর্ণ তা তাঁদের কয়েকজনের অতীত ঘোষণা থেকেই দেখা যাবে তাঁরা দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর জোর দেন এবং বিশ্বাস করেন যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার একমাত্র সমাধান — পাকিস্তান। এঁদের মধ্যে অবশ্যই শ্রী জিন্নাকে অগ্রগণ্য বলে মানতে হবে। হিন্দু মুসলমান প্রশ্নে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিপ্লব সংশান্বিত না করলেও বিস্মিত করে। এই বিপ্লবের প্রকৃতি, চরিত্র ও বিশালতা বুঝতে গেলে বিষয়টি সম্পর্কে তার অতীত ঘোষণাগুলি জানা প্রয়োজন যাতে সেগুলিকে তার বর্তমান ঘোষণাগুলির সঙ্গে তুলনা করা যায়। তার অতীত ঘোষণাগুলি সম্পর্কে শুরু হতে পারে ১৯০৬ সাল থেকে। ওইবছর মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতারা লর্ড মিন্টোর কাছে যান এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনমণ্ডলী দাবি করেন। এটা লক্ষ্ণীয় যে শ্রী জিন্নাহ্ ওই প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন না। এটা জানা নেই, তিনি ওই প্রতিনিধিদানে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রিত হননি; না কি, তাকে যোগদিতে আমন্ত্রণ জানানো হলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু ঘটনা এই ১৯০৬-এ যখন পৃথক প্রতিনিধিত্বের জন্য মুসলমানদের দাবি হল তিনি তা সমর্থন করেননি।

১৯১৮ তে শ্রী জিন্নাহ্ রাউলাট * বিলের প্রতিবাদে রাজকীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যপদে ইস্তকা দেন। ইস্তফা দিতে গিয়ে শ্রী জিন্নাহ্ বলেছিলেন ঃ—

'আমি মনে করি বর্তমান অবস্থায়, আমার লোকেদের জন্য এই পরিষদে থাকা নিরর্থক। যে সরকার পরিষদ কক্ষে জনপ্রতিনিধিদের মতামত এবং বাইরে জনসাধারণের অনুভূতি ও ভাবাবেগের প্রতি এরকম চূড়ান্ত অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে,

* পরিষদের ভারতীয় সদস্যদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিধেয়কটি আইনে পরিণত হয় এবং 'অরাজকতামূলক ও বিপ্লবাত্মক আইন' হিসাবে ১৯১৯-এর আইন XI. হয়।

কারোর পক্ষে আত্মসম্মান বজায় রেখে সেই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা, সম্ভব নয়।'

১৯১৯-এ শ্রী জিন্নাহ্, তখন আলোচনাধীন ভারত সরকার সংস্কার বিধেয় সম্পর্কে সংসদ নিযুক্ত যৌথ চয়ন সমিতির সামনে সাক্ষ্য দিলেন। হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নে সমিতির সদস্যদের করা প্রশ্নের উত্তরে নিম্নলিখিত অভিমত তিনি প্রকাশ করলেন।

মেজর ওর্মসবি গোরে-এর জেরা

প্রঃ- ৩৮০৬—আপনি, মুসলিম লীগ অর্থাৎ মুসলমান সংগঠনের প্রতিনিধি হিসাবে কি হাজির হয়েছেন? —হ্যাঁ।

প্রঃ- ৩৮০৭—একটা ব্যাপারে আমি খুবই বিস্মিত আজ সকালে আপনার প্রারম্ভিক বক্তব্যে ভারতে মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থের প্রসঙ্গে কোনওভাবে ওঠালেন না: এটা কী এই কারণে যে আপনি কিছু বলতে চাননি? — না। কিন্তু আমার ধারণা সাউথবরো সমিতি বিষয়টি হাতে নিয়েছে এবং আমি ওই সমিতির সদস্যদের ওপরেই, চাইলে আমাকে যেকোনও প্রশ্ন করার বিষয়টি ছেড়ে দিয়েছি। লক্ষ্ণৌয়ের সমঝোতায় আমি খুব বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলাম সেখানে আমি মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করছিলাম।

প্রঃ ৩৮০৯— সারাভারত মুসলিম লীগের পক্ষে ভারত সরকারের প্রস্তাব কি আপনি এই সমিতিকে খারিজ করতে বলেন? — আমি এটা বলার অধিকার প্রাপ্ত, বাংলা (প্রদেশ) সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রস্তাব আপনারা খারিজ করুন। (অর্থাৎ লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে বাংলার মুসলমানদের যা দেওয়া হয়েছিল তার তুলনায় তাদের বেশি প্রতিনিধিত্ব দেওয়া)

প্রঃ ৩৮১০—আপনি বলেছেন, আপনি ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে বক্তব্য পেশ করেছেন। আপনি প্রকৃতই একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী হিসাবে বলেছেন?— হ্যাঁ। বলছি।

প্রঃ ৩৮১১— সেই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, আপনি কি মুসলমান সম্প্রদায়ের পৃথক সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব শীঘ্র অবসান হবে বলে ভাবেন? — আমি সেরকমই মনে করি।

প্রঃ ৩৮১২— তার মানে মুহূর্তে সম্ভব সেই মুহূর্তে আপনি রাজনৈতিক জীবনে মুসলমানদের ও হিন্দুদের মধ্যে পার্থক্য বিলোপ করতে চান? — হ্যাঁ। সেইদিন

যদি আসে তখন তার চেয়ে আমাকে আর কোনওকিছু বেশি খুশি করবে না।

প্রঃ ৩৮১৩— আপনার কি মনে হয়না যে এটা সত্যি ভারতের মুসলমানদের অনেক বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক স্বার্থ রয়েছে যার অস্তিত্ব শুধু ভারতের ভেতরেই নয় ভারতের বাইরেও? আর এইসব স্বার্থের জন্য এক পৃথক মুসলমান সম্প্রদায় হিসাবে চাপ সৃষ্টি করতে তারা সর্বদাই উদগ্রীব? — দুটি জিনিস আছে। ভারতের মুসলমানদের প্রকৃতপক্ষে খুব কম জিনিসই আছে যাকে আপনি তাদের পক্ষে বিশেষ স্বার্থের ব্যাপার বলতে পারেন — আমি লৌকিক জিনিসগুলির কথা বলছি।

প্রঃ ৩৮১৪ — আমি অবশ্যই সেগুলির প্রসঙ্গ অবতারণা করছি মাত্র? — আর সেইকারণেই আমি প্রকৃতপক্ষে আশা করি এবং সম্ভবপর বলে মনে করি, সেইদিন খুব বেশি দূরে নয় যখন পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর অবসান ঘটবে।

প্রঃ ৩৮১৫ — একইসঙ্গে এটাও ঠিক যে ভারত সরকারের বৈদেশিক নীতিতে মুসলমানরা বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন? — তারা দেখায়; এক অত্যন্ত, — না। আপনি যা করার প্রস্তাব করছেন তা হচ্ছে খুব গভীর আগ্রহ তৈরি করা আর তাদের এক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অত্যন্ত তীব্র ভাবাবেগ ও অত্যন্ত দৃঢ় মতামত পোষণ করে।

প্রঃ ৩৮১৬ — সেটিই কি কারণগুলির একটি, যার জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে বলতে গিয়ে ভারত সরকার যাতে নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি আরও দায়িত্বশীল হয় তা করাতে আপনি এত উদগ্রীব? — না।

প্রঃ ৩৮১৭ — আপনি কী মনে করেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থাকার সঙ্গে, ভারতের জন্য একটি বিদেশনীতি এবং লন্ডনে তাঁর মন্ত্রীদের পরামর্শ—মত ব্রিটিশকাজের জন্য আর একটি বিদেশনীতি; এই ব্যাপারটি সঙ্গতি পূর্ণ হওয়া সম্ভব?—আমাকে স্পষ্ট করতে দিন। এটা আদৌ বিদেশনীতিক প্রশ্ন নয়। ভারতের মুসলমানরা যা মনে করে এটা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন একটা অবস্থা। আধ্যাত্মিকভাবে সুলতান বা খালিফা তাদের প্রধান।

প্রঃ ৩৮১৮ একই সম্প্রদায়ের? — সুন্নি মতাবলম্বীদের কিন্তু তারাই বৃহত্তম; সারা ভারতে তারা ব্যাপকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমাদের দৃষ্টিতে খলিফা হচ্ছেন পবিত্র স্থানগুলির একমাত্র ন্যায়সঙ্গত রক্ষক। আর কারই সে অধিকার নেই। মুসলিমরা খুব গভিরভাবে যা অনুভব করে তা হচ্ছে পবিত্র স্থানগুলিকে অটোম্যান সাম্রাজ্য

থেকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয় — সেগুলি সুলতানের অধীনে অটোম্যান সাম্রাজ্যেই থাকা উচিত।

প্রঃ ৩৮১৯ — আমি বিদেশনীতি সম্পর্কে সংস্কার বিধেয়ক থেকে সরে যেতে চাইনা — আমি বলছি বিদেশনীতির সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। আপনার প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতের মুসলমানরা, সারা বিশ্বে মুসলমানদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে বিদেশনীতি সম্পর্কে একটা বিশেষ মনোভাব গ্রহণ করবে কিনা।

প্রঃ ৩৮২০ — আমার প্রশ্ন তারা কি ভারত সরকারের বিদেশনীতির ওপর নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করতে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর কিছু নিয়ন্ত্রণ চাইছে? — না।

শ্রী বিনোয়েটের (Benoett)-এর জেরা

প্রঃ ৩৮৫৩..... সেইরকম ঘটনার ক্ষেত্রে (অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা) এটা কি সুবিধাজনক হবে না যদি আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার ভার সরকারের শাসনবিভাগকে ছেড়ে দেওয়া হয়— আমি এমন মনে করি না যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু আপনি যা বলছেন সেরকম অপ্রীতিকর ব্যাপারের মধ্যে আমি যেতে চাইনি।

প্রঃ ৩৮৫০ — পুরানো কোনও গোলযোগকে আবার তুলে আনার আগ্রহে আমি এই প্রশ্ন করছি না। আমি সেগুলো ভুলতেই চাই — আপনি যদি আমাকে প্রশ্ন করেন প্রায়শই কিছু ভুল বোঝাবুঝির কারণে দাঙ্গা হয় আর যেহেতু পুলিশ একপক্ষ যা অন্যপক্ষ নেয়, তা একপক্ষ বা অন্যপক্ষকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। আমি খুব ভালভাবে জানি ভারতীয় রাজ্যগুলিতে আপনি কদাচিৎ হিন্দু - মুসলমান দাঙ্গার কথা শুনবেন এবং সমিতিকে নামোল্লেখ না করে আমায় বলতে দ্বিধা নেই শাসক একজন রাজাকে আমি জিজ্ঞাসা করে ফেলেছিলাম, আপনারা কিভাবে এর কারণ নির্ণয় করেন। আর তিনি আমাকে বললেন 'যেই কোনও গোলযোগ হয়, আমরা সতত পুলিশকে, পুলিশের একপক্ষ বা অন্যপক্ষ নেওয়াকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করি। আর আমরা দেখেছি যে একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে, জানতে পারা মাত্র পুলিশ আধিকারিককে ওই জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়া। আর তাহলেই সমস্ত গোলযোগ শেষ।'

প্রঃ ৩৮৫৫ — এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। কিন্তু এব্যাপারটা তো থেকেই যায়, দাঙ্গা সবসময়ই দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে—একদিকে হিন্দু, অন্যদিকে মুসলমান। সেরকম

সময়ে এটা কি সুবিধাজনক হবে যদি এক সম্প্রদায়ের বা অন্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ২৮ মন্ত্রী তিনি আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকেন? — নিশ্চয়ই।

প্রঃ ৩৮৫৬ — তা সুবিধাজনক হবে? — আমি যদি অন্যরকম চিন্তা করি তবে তা হবে আমার নিজেকেই কটাক্ষ করা। আমি যদি মন্ত্রী হই, আমি সাহস করে বলব ন্যায় এবং যা সঠিক তা ছাড়া আর কোনওকিছুই আমার বিবেচ্য নয়।

প্রঃ ৩৮৫৭ — আমি বুঝতে পারছি আপনি অন্য পক্ষের প্রতি ন্যায়ের চেয়েও বেশি কিছু করবেন কিন্তু তাহলেও একটা দিক আছে যেখানে ব্যক্তিগত দিক বলা যেতে পারে। শুধু এটা নয়, যে পক্ষপাতহীনতা থাকবে। জনসাধারণ যারা কোনওরকম সন্দেহের মনোভাব পোষণ করেন তাদেরও একথা মত থাকে — একটি অংশ বা অন্য অংশের ব্যাপারে আপনি বলতে চান যে তারা ভাববে তাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে বা ন্যায় করা হবে না?

প্রঃ ৩৮৫৮ — হ্যাঁ। এর বস্তুনিষ্ঠ অংশ থেকে সেটা সম্পূর্ণ আলাদা? — আমার উত্তর হচ্ছে এই ঃ এই অসুবিধাগুলি দ্রুত অন্তর্হিত হচ্ছে এমন কী সম্প্রতি, সম্পূর্ণ থানা জেলার ও বোম্বেতে, ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত প্রতিটি আধিকারিক ছিলেন ভারতীয় আধিকারিক আমার মনে হয় না তাদের মধ্যে একজনও মুসলমান ছিলেন। সকলেই ছিলেন হিন্দু। কিন্তু আমি কখনও কোনও অভিযোগ শুনিনি। সাম্প্রতিককালে এরকমই হয়েছে। আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, এখন আপনি আমাকে যা বলছেন ১০ বছর আগে সেই ধারণা ছিল। কিন্তু এখন তা দ্রুত অন্তর্হিত হচ্ছে।

লর্ড ইসলিংটন (Lord Islington)-এর জেরা

প্রঃ ৩৮৯২..... সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে এইমাত্র আপনি বললেন, মনে হয় মেজর ওর্মসবি গোরে এর প্রশ্নের উত্তরে কয়েক বছরেই আপনি সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব মুছে ফেলতে পারবেন। এই সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব বর্তমানে স্থাপন করার প্রস্তাব হয়েছে এবং স্থাপন করা হয়েছে যাতে মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে তাদের প্রতিনিধিত্ব পেতে পারে। আপনি বললেন, আপনি তা দেখতে চেয়েছিলেন। অত তাড়াতাড়ি আপনি মনে করেন সেইরকম একটা সন্তোষজনক অবস্থা অর্জন করা যেতে পারে—? আমি আপনাকে শুধু কয়েকটি তথ্য দিতে পারি তার বেশি আমি কিছু বলতে পারি না। আপনাকে কিছুটা ধারণা দেবে এমন কিছু আমি বলছি ঃ ১৯১৩-তে আগ্রায় থাকা ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে পৃথক নির্বাচনমণ্ডলীর ওপর মুসলমানদের যোগ দেওয়া উচিত কি না সেই বিষয়টি আমরা পরীক্ষা করি।

এবং আমাদের মতবিভাজন হয় এবং সেই বিভাজন প্রদেশ ভিত্তিক। কয়েকটি মাত্র ভোট একেকটি প্রদেশে প্রতিনিধিত্বকারী আর মতবিভাজনে নির্বাচকমণ্ডলী পক্ষে ভোট পড়ে ৪০ আর ৮০-এর কিছু বেশি ভোট — আমি সংখ্যাটা ঠিক মনে করতে পারছি না — পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী রাখার পক্ষে। সেটা ছিল ১৯১৩-তে। তারপর থেকে বিভিন্ন মুসলমান নেতাদের সঙ্গে আলোচনার অনেক সুযোগ আমার হয়েছে এবং তাঁরা এব্যাপারে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করছেন। আমি আপনাকে সময় সীমা দিতে পারছি না, কিন্তু আমার মনে হয় এটা (পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ব্যবস্থা) খুব বেশিদিন স্থায়ী হবে না, সম্ভবত আগামী অনুসন্ধানেই— এবিষয়ে কিছু আপনারা শুনবেন।

প্রঃ ৩৮৯৩ — আপনার কি মনে হয় যে পরবর্তি অনুসন্ধানে মুসলমানরা সমগ্রের মধ্যে মিশে যেতে চাইবে — হ্যাঁ। আমি মনে করি পরবর্তি অনুসন্ধানে সম্ভবত এবিষয়ে কিছু শোনা যাবে।

মুসলিম লীগের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হলেও শ্রী জিন্নাহ্ তাঁর লীগের সদস্যপদকে দেশে অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতি তাঁর আনুগত্যের পথে বাঁধা হতে দেননি। মুসলিম লীগের সদস্য হওয়া ছাড়াও শ্রী জিন্না, হোমরুল লীগ এবং কংগ্রেসেরও সদস্য ছিলেন। যৌথ সংসদীয় সমিতির সামনে তাঁর সাক্ষ্যে তিনি বলেছিলেন, তিনি তিনটি সংগঠনেরই সদস্য। যদিও কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সঙ্গে তার খোলাখুলি মতভেদ রয়েছে এবং হোমরুল লীগ যে মত পোষণ করে তার কয়েকটির তিনি শরিক নন। তিনি যে স্বাধীন ও জাতীয়তাবাদী তা দেখতে পাওয়া যায় খিলাফৎ পন্থীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক থেকে ১৯২০-তে মুসলমানরা, খিলাফৎ সম্মেলন সংগঠিত করলেন। এটা এতটাই শক্তিশালী সংগঠন হয়ে উঠল যে, মুসলিম লীগ ভেঙে পড়ল এবং ১৯২৪ পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় অবস্থায় টিকে রইল। এই বছরগুলিতে খিলাফৎ সম্মেলনের সদস্য না হলে কোনও মুসলমান নেতা, মুসলমান মঞ্চ থেকে, মুসলমান জনতার কাছে ভাষণ দিতে পারত না। মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হবার সেটাই ছিল একমাত্র মঞ্চ। তখনও শ্রী জিন্নাহ্ খিলাফৎ সম্মেলনে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। নিঃসন্দেহে এটার কারণ ছিল এই যে তিনি তখন ছিলেন শুধু বিধিবদ্ধ ভাবে একজন মুসলমান। গোঁড়া মুসলমানের যে ধর্মীয় আগুন এখন তাঁর মধ্যে জ্বলছে বলে তিনি এখন বলেন তার কিছুই তখন তাঁর মধ্যে ছিল না। কিন্তু তিনি যে খিলাফৎ-এ যোগ দেননি তার প্রকৃত কারণ ছিল, তিনি ভারতের বাইরের মুসলমানদের অপার্থিব বিষয়ে ভারতীয় মুসলমানদের নিজেদের

যুক্ত করার বিরোধী ছিলেন। অসহযোগ আইন অমান্য এবং পরিষদ বয়কটের বিষয়টি কংগ্রেস গ্রহণ করার পর শ্রী জিন্না, কংগ্রেস ছাড়েন। তিনি এর সমালোচক হলেন কিন্তু কখনই এটি একটি হিন্দু সংস্থা এই বলে কংগ্রেসকে দোষারোপ করেননি। এরকম বিবৃতি তাঁর, এই মর্মে তাঁর বিরোধীরা যখনই বলেছেন তিনি তাঁর প্রতিবাদ করেছেন। কংগ্রেস সম্পর্কে শ্রী জিন্নার, বর্তমান মত ও তাঁর অতীতের মতের মধ্যে যে দারুণ বৈসাদৃশ্যকে ফুটিয়ে তোলে এমন একটি সময় সম্পর্কে 'টাইমস্ অব্ ইন্ডিয়া'-র সম্পাদকের কাছে জিন্না, একটি চিঠি লিখেছিলেন। নিচে তিনটি* দেওয়া হল ঃ—

"সম্পাদক সমীপেষু,

দি টাইমস্ অব্ ইন্ডিয়া,

মহাশয়,

আমার বিবৃতি বলে যা চালানো হয়েছে এবং যেটিকে আপনারা প্রচার করেছেন আমি তা আরও একবার সংশোধন করতে চাই। আমি একটি 'হিন্দু সংস্থা' হিসেবে কংগ্রেসের নিন্দা করেছি এই মর্মে আপনাদের ১লা অক্টোবর সংখ্যার দ্বিতীয় স্তম্ভে লিখে আপনাদের সংবাদদাতা 'ব্যাঙ্কার (Banker) আগে একবার সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করেছেন। আমার বক্তৃতা সম্পর্কে এই বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদন আপনাদের সংবাদপত্রে বেরোনোর পরই আমি প্রকাশ্যে সংশোধন করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তা আপনাদের কাগজের স্তম্ভে জায়গা পায়নি। তাই এটি প্রকাশ করে (আমাকে) বাধিত করতে আপনাকে অনুরোধ জানাব।" খিলাফৎ-এর ঝড় শান্ত হওয়ার পরে এবং মুসলমানরা ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ফিরে আমার আগ্রহ দেখানোর পর মুসলিম লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হল। ১৯২৪-এর ৩০শে ডিসেম্বর বোম্বেতে রাজা আলির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত লীগের অধিবেশন ছিল জীবন্ত। জিন্না ও মহম্মদ আলি উভয়ই এতে অংশ নিলেন।*

৩.১০.২৫ - এক 'দি টাইমস্ অব ইন্ডিয়া'-তে প্রকাশিত।

* শ্রী মহম্মদ আলি বুঝান যে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে মহম্মদ আলি রসিকতা করে বলেছিলেন ঃ "শ্রী জিন্নাহ্ শীঘ্রই আমাদের কাছে ফিরে আসবেন (হর্ষধ্বনি)। আমি উল্লেখ করতে পারি একজন বিধর্মী কাফের হয় এবং একজন কাফের বিধর্মী হয়। সেইরকম জিন্নাহ্ যখন কংগ্রেসে ছিলেন সেই দিনগুলিতে আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম না। আর আমি যখন কংগ্রেসে ও মুসলিম লীগে ছিলাম তখন তিনি আমার থেকে দূরে ছিলেন। আমি আশা করি কোনও একদিন আমরা বুঝাপড়ায় পৌছাব (হাসি।)"

লীগের অধিবেশনে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হল এতে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্বকারি বিভিন্ন মুসলমান সংস্থার প্রতিনিধিদের শীঘ্র দিল্লিতে বা অন্য কোনও কেন্দ্রীয় স্থলে এক সম্মেলনে মিলিত হবার বাঞ্ছনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হল। উদ্দেশ্য মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রয়োজনগুলি পূরণে এক 'ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ় ব্যবহারিক সক্রিয়তাকে বিকশিত করা। প্রস্তাবটি ব্যাখ্যা করে শ্রী জিন্নাহ্ বললেন† ঃ—

'এর লক্ষ্য মুসলমান সম্প্রদায়কে সংগঠিত করা, হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঝগড়া করা নয়, বরং ওই সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং তাদের মাতৃভূমির জন্য তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা। তিনি নিশ্চিত যে তারা নিজেদের সংগঠিত করলে হিন্দু মহাসভার সঙ্গে হাত মেলাবে এবং বিশ্বের কাছে ঘোষণা করবে হিন্দুরা ও মুসলমানরা ভাই ভাই।

ওই একই অধিবেশনে তার একটি প্রস্তাব লীগ অনুমোদন করল এতে মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক দাবিগুলি প্রণয়ন করতে ৩৩ জন বিশিষ্ট মুসলমানকে নিয়ে একটি সমিতি নিয়োগ করা হল। প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন শ্রী জিন্না'।†

'একজন সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিসেবে তিনি লীগের মঞ্চে দাড়িয়েছেন এই অভিযোগ খণ্ডন করলেন। তিনি, তাদের আশ্বস্ত করলেন যে বরাবরের মতই তিনি জাতীয়তাবাদী। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কোনও দ্বিধা নেই। তিনি দেশের ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সবচেয়ে ভাল ও সবচেয়ে যোগ্য লোকেদের চান (শোন শোন ও প্রশংসাধ্বনি)। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর স্বদেশীয় মুসলমানরা তাঁর মত এতটা যেতে প্রস্তুত নন। পরিস্থিতির প্রতি তিনি চোখ বুঝে থাকতে পারেন না। ঘটনা হচ্ছে বহু সংখ্যক মুসলমান আছেন যারা ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে এবং দেশের কৃত্যকগুলিতে (Services) পৃথকভাবে প্রতিনিধিত্ব চান তারা সাম্প্রদায়িক ঐক্যের কথা বলছেন। কিন্তু ঐক্য কোথায়? কোনও উপযুক্ত নিষ্পত্তিতে পৌঁছে তাঁকে অর্জন করতে হবে। আর কোনকিছু শোনা যায়না এমন হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি বললেন, তিনি জানেন তাঁর সমধর্মাবলম্বীরা স্বকাজের জন্য লড়াই করতে তৈরি ও প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তাঁরা কিছু রক্ষাকবচ চান। তাঁর মত যাইহোক তাঁরা জানতেন একজন ব্যবহারিক রাজনীতিক হিসাবে তাঁকে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে

† পয়লা জানুয়ারি ১৯২৫-এর 'The Times of India'-এর প্রতিবেদন থেকে।

† The Indian Quarterly Register, 1924, Vol II, পৃ : ৪৮১

হত। ঐক্যের প্রকৃত প্রতিবন্ধক সম্প্রদায়গুলি নিজেকে নয়, উভয়পক্ষেরই কিছু অনর্থ-সৃষ্টিকারি ব্যক্তি।'

এইভাবে সম্ভাব্য কঠোরতম ভাষায় অনর্থ সৃষ্টিকারিদের ওপর দোষারোপ করতে তিনি দ্বিধা করলেন না। এটা একজন আন্তরিক জাতীয়তাবাদীর কাছ থেকেই আসতে পারে। ১৯২৪-এর ২৪শে যে লাহোরে অনুষ্ঠিত লীগের অধিবেশনে সভাপতি হিসাবে তিনি বললেন* ঃ—

'আমরা যদি মুক্ত জন সমাজ হতে চাই, তাহলে আমরা যেন ঐক্যবদ্ধ হই। কিন্তু আমরা যদি আমলাতন্ত্রের কৃতদাসই থেকে যেতে চাই, তাহলে যেন নিজেদের মধ্যে লড়াই করি এবং তুচ্ছ ব্যাপারে, তুচ্ছ আত্মপর্বকে পরিতৃপ্ত করি, আমাদের সালিশ হিসাবে ইংরেজদের রেখে।'

১৯২৫ এবং ১৯২৮ এ অনুষ্ঠিত দুটি সর্বদলীয় সম্মেলনে শ্রী জিন্নাহ্ যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে হিন্দু মুসলমান প্রশ্নের নিষ্পত্তি করতে প্রস্তুত ছিলেন। ১৯২৭-এ লীগের মঞ্চ থেকে তিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন ঃ—

'পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীতে আমি বিশ্বাসি নয়। যদিও আমি অবশ্যই বলব মুসলমানদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দৃঢ়ভাবে ও আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে এটা একমাত্র পদ্ধতি যাতে তারা নিশ্চিত হতে পারে।'

১৯২৮ এ সাইমন আয়োগ বয়কটে কংগ্রেসের সঙ্গে শ্রী জিন্নাহ্ যোগ দিলেন। যদিও হিন্দুরা ও মুসলমানরা একটা নিষ্পত্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছিল তা সত্ত্বেও তিনি এরকম করলেন এবং করলেন লীগ দু'টুকরো হয়ে যাবার বিনিময়ে।

এমনকি সাম্প্রদায়িক পাহাড়ের ধাক্কায় 'গোল-টেবিল বৈঠকে'র জাহাজ যখন ভাঙতে বসেছে তখনও শ্রী জিন্নাহ্, সাম্প্রদায়িকতাবাদী আখ্যায় মুগ্ধ হলেন যদিও (বৈঠকের) পরিণতির জন্য তিনি দায়ী ছিলেন। তিনি বললেন, তিনি ব্রিটিশ সরকারের সালিশির চেয়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যার মতৈক্যভিত্তিক এক সমাধান পছন্দ করেন। এবার ১৯৩১-এর ৮ই আগস্ট এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত উত্তরপ্রদেশ মুসলমান সম্মেলনে ভাষণ† দিতে গিয়ে শ্রী জিন্নাহ্ বললেন ঃ—

'প্রথম যে জিনিসটি আমি, আপনাদের বলতে চাই তা হচ্ছে এটা এখন

* দেখুন Indian Quarterly Review. 1924 Vol I. পৃষ্ঠা : 658

† The Indian Annual Register. 1931. Vol II. পৃষ্ঠা : 230-31

একান্তভাবে জরুরি ও অপরিহার্য যে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ভগবানের দোহাই আপনারা নিজেদের সমর্থকদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি বন্ধ করুন এবং এই পরস্পর বিধ্বংসী লড়াই বন্ধ করুন। আমি এটির জন্য জোরালোভাবে আবেদন জানিয়েছি এবং আমার সাধ্যমত ড. আনসারি শ্রী টি.এ.কে শেরওয়ানি, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং ড. সৈয়দ মামুদের কাছে মিনতি করেছি। আমি আশা করি ভারতের সমুদ্রতট ছাড়ার আগে আমি এই সুখবর শুনব যে আমাদের বৈসাদৃশ্য যাই হোক, আমাদের নিজেদের মধ্যেকার বিশ্বাস যাই হোক এটা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করার সময় নয়।

'আর একটি জিনিস যা আমি, আপনাদের বলতে চাই তা হল এই : সংবাদপত্র পত্রিকাগুলির একাংশ, হিন্দুদের একাংশ আমাকে নিরন্তর বিভিন্ন উপায়ে ভ্রান্তভাবে বর্ণনা, করে। আজ সকালে আমি শ্রী গান্ধীর বক্তৃতা পড়ছিলাম। শ্রী গান্ধী বলেছেন, তিনি হিন্দুদের ও মুসলমানদের একইরকম ভালবাসেন। এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি আবার বলছি যে, সেই দাবি আমি না করতে পারি কিন্তু আমি এটা সততার সঙ্গে ও আন্তরিকতার সঙ্গে বলছি যে আমি দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরপেক্ষ ও ন্যায্য ব্যবহার চাই'।

শ্রী জিন্নাহ্, তাঁর ভাষণে আরও বললেন : 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমার মনে হয় হিন্দু-মুসলমান বোঝাপড়ার যে প্রশ্ন, সে সম্পর্কে আমি, আপনাদের যা বলতে পারি তা হচ্ছে, আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে পঞ্জাব ও বাংলার মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হিন্দুদের মেনে নেওয়া উচিত। আর তা যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে আমি মনে করি খুব স্বল্প সময়ে একটি সমঝোতায় পৌঁছানো যেতে পারে।

পরবর্তী যে প্রশ্নটি ওঠে, তা হচ্ছে পৃথক বনাম যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর প্রশ্ন। আপনাদের মধ্যে অধিকাংশই জানেন যে পঞ্জাব ও বাংলায় যদি মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা মেনে নেওয়া হয়, তাহলে আমি ব্যক্তিগতভাবে যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে এক নিষ্পত্তি পছন্দ করব (প্রশংসাধ্বনি)। কিন্তু আমি এও জানি মুসলমানদের এক বিচার্য অংশ, আমি বিশ্বাস করি মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অংশ পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর পক্ষপাতী। আমার অবস্থান হচ্ছে আমি বরং পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে একটা নিষ্পত্তি চাইব, এই আশা ও বিশ্বাস নিয়ে যে যখন আমরা, আমাদের নতুন সংবিধান তৈরি করব, যখন হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই অবিশ্বাস, সন্দেহ ও ভয় থেকে মুক্ত হবে ও যখন তারা তাদের স্বাধীনতা পাবে

তখন আমরা সমুচিতভাবে নির্দিষ্ট কর্তব্য সাধন করব এবং সম্ভবত আমাদের মধ্যে অধিকাংশ যা ভাবছি, সম্ভবত তার আগেই পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর অবসান ঘটবে।

'তাই আমি প্রথমে মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে নিষ্পত্তি ও শান্তির পক্ষে; হিন্দুদের ও মুসলমানদের মধ্যে নিষ্পত্তি ও শান্তির পক্ষে এটা তর্কের সময় নয় এটা প্রচারমূলক কাজের সময় নয় এবং এটা দুটি সম্প্রদায়ের মনোভাবকে তিক্ত করার সময়ও নয়। কারণ শত্রু আমাদের উভয়ের দ্বারপ্রান্তে। আর আমি নির্দিধায় বলছি যে হিন্দু — মুসলমান প্রশ্নের নিষ্পত্তি যদি না হয়, আমার কোনও সন্দেহ নেই যে ব্রিটিশদের সালিশি করতে হবে আর যে সালিশি করবে সে নিজের কাছে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সারবস্তু রেখে দেবে। তাই আমি আশা করি তারা আমাকে অপবাদ দেবে না। সর্বোপরি শ্রী গান্ধী নিজেই বলছেন যে, মুসলমানরা যা চাই তিনি তাদের তাই দিতে ইচ্ছুক। আর আমার একমাত্র পাপ এই যে আমি হিন্দুদের বলছি মুসলমানদের ১৪ দফা দাও। এই ১৪ দফা শ্রী গান্ধী যে 'ব্ল্যাঙ্ক চেক' ('টাকার পরিমাণ অঙ্কে বা শব্দে লেখা নেই এমন চেক') দিতে ইচ্ছুক তার চেয়ে অনেক কম। আমি 'ব্ল্যাঙ্ক চেক' চাই না। কিন্তু ১৪ দফা মানবেন না কেন? যখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন, আমাদের 'ব্ল্যাঙ্ক চেক' দিন'। যখন শ্রী প্যাটেল বলেন ঃ 'আমাদের 'ব্ল্যাঙ্ক চেক' দিন এবং আমরা একটি স্বদেশি কাগজের ওপর একটি স্বদেশি কলম দিয়ে এটিতে স্বাক্ষর করব'। তখন তাঁরা সাম্প্রদায়িকতাবাদী হন না। আর আমি একজন সাম্প্রদায়িকতাবাদী! আমি হিন্দুদের বলি প্রত্যেকের বিষয়ে ভ্রান্তভাবে বর্ণনা কর না। আমি আশা ও বিশ্বাস করি। তবু আমরা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের শান্তি ও সুখ আনবে এমনভাবে প্রশ্নটির নিষ্পত্তিকর অবস্থায় যাব।

'আগে একটি জিনিস আমি তোমাদের বলতে চাই এবং তা বলেওছি। গোল-টেবিল বৈঠকের' সময় — এটা এখন একটা খোলা বই এবং যে কেউ এটা পড়তে চায়। নিজেকে অবহিত করতে পারেন — আমি একটি, শুধু একটি নীতিই পালন করেছি আর তা হচ্ছে আমি যখন বোম্বের তীর ছেড়ে রওনা হলাম তখন আমি জনগণকে বলেছি ভারতের স্বার্থকে পবিত্র রাখব এবং আমাকে বিশ্বাস করুন, আপনারা যদি সম্মেলনের কার্যবিবরণী পড়েন তাহলে দেখবেন আমি গর্ব করছি না, আমি আমার কর্তব্য করেছি। নিষ্ঠা ও বিশ্বাস নিয়ে আমি পূর্ণতম মাত্রায় আমার প্রতিশ্রুতি পালন করেছি এবং আমি সাহস করে বলছি কংগ্রেস ও শ্রী গান্ধী যদি আমি যার জন্য লড়াই করেছি তার চেয়ে কিছু বেশি পান আমি তাদের অভিনন্দন জানাব।

উপসংহারে শ্রী জিন্নাহ্ বলেন, তারা অবশ্যই একটা নিষ্পত্তিতে পৌঁছাবেন। অবশেষে তারা অবশ্যই বন্ধ হবে। আর তিনি তাই মুসলমানদের সম্মেলনে যে আলোচনা হতে পারে এবং যে প্রস্তাব অনুমোদিত হতে পারে তাতে সংযম, বিচক্ষণতা ও সম্ভব হলে তুষ্টভাব দেখাতে আবেদন জানালেন।'

মুসলমান আদর্শবাদের রূপান্তরের অতিরিক্ত আর একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে আমি বরকত আলির একসময় যে মতামত পোষণ করতেন তা লিপিবদ্ধ করতে চায়। বরকত আলি বর্তমানে শ্রী জিন্নার একজন অনুগামি ও পাকিস্তানের দৃঢ় সমর্থক।

'সাইমন আয়োগে'র সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্নে মুসলিম লীগ যখন দু'টুকরো হল তখন সহযোগিতার পক্ষে ছিল স্যার মহম্মদ শফির নেতৃত্বাধীন অংশ কংগ্রেসের বয়কট পরিকল্পনার সমর্থক শ্রী জিন্নার নেতৃত্বে ছিল আর একটি অংশ। শ্রী বরকত আলি ছিলেন লীগের জিন্নাপন্থী অংশে। লীগের দুটি গোষ্ঠী ১৯২৮-এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাদের বার্ষিক অধিবেশন করল। সাফি গোষ্ঠী মিলিত হয় লাহোরে। আর জিন্না গোষ্ঠী কলকাতায়। বরকত আলি যিনি পঞ্জাব মুসলিম লীগের সম্পাদক ছিলেন, লীগের জিন্নাহ্ গোষ্ঠীর কলকাতা অধিবেশনে যোগ দেন। এবং সাম্প্রদায়িক বন্দোবস্ত সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বন্দোবস্তের ভিত্তি ছিল যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী। প্রস্তাব উত্থাপন করে শ্রী বরকত আলি বললেন* ঃ—

'লীগের ইতিহাসে এই প্রথম তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের সাহায্যে আমরা, আমাদের হিন্দু দেশবাসিদের মধ্যে যারা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর নীতিতে আপত্তি করেছিলেন, তাঁদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত আন্তরিকভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছি।'

১৯২৮-এ ডঃ আনসারির নেতৃত্বে 'ন্যাশনালিস্ট পার্টি' (জাতীয়তাবাদী মুসলিম দল)† গঠিত হয়। ন্যাশনালিষ্ট মুসলিম পার্টি (জাতীয়তাবাদী মুসলিম দল), মুসলিম লীগের জিন্নাহ্ গোষ্ঠীর চেয়ে এক কদম এগিয়ে এমনকি শ্রী জিন্নাহ্ যেগুলির ওপর জোর দিচ্ছিলেন সেগুলি, ছিল এবং কোন সংশোধনী, ছাড়াই— অপরিবর্তিত আকারে নেহরু প্রতিবেদন গ্রহণে প্রস্তুত ছিল। শ্রী বরকত আলি, যিনি ১৯২৭-এ লীগের জিন্না গোষ্ঠীর সঙ্গে ছিলেন, ওই গোষ্ঠী যথেষ্ট জাতীয়তাবাদী না হওয়ায় তা ত্যাগ করলেন এবং ডঃ আনসারির ন্যাশানালিস্ট মুসলিম পার্টি তে যোগ দিলেন। শ্রী বরকত আলি কতবড় জাতীয়তাবাদী ছিলেন, তা স্যার মহম্মদ ইকবাল ভারত

* The Indian Quarterly Register, 1927, Vol II, পৃষ্ঠা : 448

† The Indian Quarterly Register 1929, Vol II, পৃষ্ঠা : 350

ভাগের জন্য যে প্রকল্পের* প্রস্তাব করেছিলেন তার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে বরকত আলির দরবার ও তীব্র আক্রমণ থেকে দেখতে পাওয়া যাবে। স্যার ইকবাল ১৯৩০-এ এলাহাবাদে সারা ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন (ভারত ভাগের)। এই প্রকল্প এখন শ্রী জিন্নাহ্ ও শ্রী বরকত আলি হাতে তুলে নিয়েছেন এবং তা চলছে পাকিস্তান নামে। ১৯৩১-এ লাহোরে পঞ্জাব ন্যাশনালিস্ট মুসলিম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী বরকত আলি-এর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। পাকিস্তান সম্পর্কে তখন তিনি যে মত পোষণ করেছিলেন তা স্মরণযোগ্য†। তাঁর দলের প্রত্যয় ও রাজনৈতিক বিশ্বাসকে আবার উল্লেখ ও নিশ্চিতভাবে ব্যক্ত করে সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মালিক বরকত আলি বললেন ঃ

'আমরা প্রথমে ও সর্বাগ্রে বিশ্বাস করি পূর্ণ স্বাধীনতায় এবং ভারতের মর্যাদার। আমাদের জন্ম যে দেশে এবং যে স্থানের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ও যত্নে লালিত সম্পর্কগুলি জড়িত সেই ভারত অবশ্যই আমাদের ভালবাসা ও আকাঙ্ক্ষায় প্রথম স্থান দাবি করবে। আমরা প্রথমেই মুসলমান ও পরে ভারতীয়। প্রকাশ্যে এই ঘোষণা করে দুষ্ট ধরনের যে প্রচার অজ্ঞভাবাবেগের কাছে আবেদন জানায় আমরা তাতে কোনও পক্ষ হতে অস্বীকার করি। আমাদের কাছে এ ধরনের শ্লোগান শুধু প্রশ্ন, নিরর্থক প্রবণতাই নয়, স্পষ্টত দূরাভিসন্ধিমূলক ও ইসলাম, ও সর্বোত্তম ও চরম স্বার্থে কোনভাবে ভারতের সর্বোত্তম ও স্থায়ী স্বার্থের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন বা তার বিরোধী এমন কথা চিন্তা করতে পারি না। ভারতে, ভারত ও ইসলাম অভিন্ন এবং ভারতের পক্ষে যেটাই ক্ষতিকর সেটা তার প্রকৃতি থেকে ইসলামের পক্ষেও ক্ষতিকারক, অর্থনৈতিকভাবে রাজনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে অথবা এমনকি নৈতিকভাবে যেভাবেই হোক ইসলাম ও ভারতের কল্যাণের মধ্যে অন্তর্নিহিত বিরোধের কথা যারা বলেন, সেই রাজনীতিকরা তাই মিথ্যা প্রচারকদের একটি শ্রেণী এবং প্রকৃতপক্ষে ইসলামের শত্রু উপরন্তু ভারতের বাইরে আমাদের মুসলিম ভায়েদের যেমন তুর্কি ও মিশরী অথবা আরব এদের প্রতি আমাদের যত সহানুভূতিই থাক এবং এই সহানুভূতি মহৎ ও স্বাস্থ্যকর আমরা কখনই সেই সহানুভূতিকে ভারতের জরুরি স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর এমন কিছুর জন্য কাজ করতে দিতে পারি না। বস্তুত: ওই দেশগুলির প্রতি আমাদের সহানুভূতি তাদের পক্ষে তখনই মূল্যবান

* তাঁর ভাষণের জন্য দেখুন : The Indian Annual Register, 1930, Vol II ; পৃ : 334-345

† Indian Annual Register 1931 Vol II পৃ: 234-35.

হতে পারে যদি ভারত ওই সহানুভূতির উৎস লালন কেন্দ্র ও প্রস্রবন হিসেবে মহান হয়। আর ভগবান না করুন, এমন যদি সময় আসে যখন সীমান্ত পেরিয়ে কোনও মুসলিম শক্তি ভারতের সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করতে এবং এর জনগণের স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নিতে চায় তবে ইসলাম জনমতের সম্মেলনের কোনও অনুভূতিই তার অর্থ যাই হোক স্বাধীনতার রক্ষায় অমুসলমান ভারতের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুসলমান ভারতের যুদ্ধ করার পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে না।

তাই কোন অ-মুসলমান মহলের এব্যাপারে কোনও ধরনের আশঙ্কা যেন না থাকে। আমি এ বিষয়ে সচেতন সঙ্কীর্ণ মনস্ক হিন্দু রাজনীতিকদের কোনও কোনও শ্রেণী নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গিরিপথের এদিক থেকে ভারতের পক্ষে ঐসলামিক বিপদের ধূয়ো তুলে আছে। কিন্তু আমি আবারও বলতে চাই এ ধরনের বিবৃতি ও এরকম ভয় মূলগত ভাবেই ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। মুসলমান ভারত, অ-মুসলমান ভারতের মতই, ভারতের স্বাধীনতাকে রক্ষা করবে এমনকি যদি সেই আক্রমণকারী ইসলামের অনুগামী হয় তাও।

এরপরে, আমরা শুধু স্বাধীন ভারতেই বিশ্বাস করি না। এক ঐক্যবদ্ধ ভারতের বিশ্বাস করি—মুসলমানদের ভারত নয়, হিন্দুদের অথবা শিখদের ভারত নয়। এই সম্প্রদায় বা ওই সম্প্রদায়ের ভারত নয় সকলের ভারত। যেহেতু এটা আমাদের বরাবরের বিশ্বাস আমরা ভবিষ্যতে হিন্দু অথবা মুসলমান ভারতে এইভাবে ভারত বিভাজনে কোনও পক্ষ হতে অস্বীকার করি। একটি হিন্দু ও একটি মুসলমান ভারতের ধারণার আবেদন যতই হোক এবং যতই তাদের দলগুলির অস্বাভাবিক গোঁড়া মনোভাব তাতে উন্মত্ত আনন্দ পাক আমরা জোরালোভাবে উচ্চকক্ষে তাঁর বিরোধিতা করি। শুধু এই কারণে নয় যে এটা বিশেষভাবে অব্যবহারিক এবং পুরোপুরি ক্ষতিকর এই কারণেও যে এটা ভারতে আধুনিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যা মহৎ ও স্থায়ী তার মৃত্যুঘন্টায় শুধু বাজায় না, ভারতের প্রধান ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী ও বিরোধী।

অশোক ও চন্দ্রগুপ্তের সময় ভারত এক ছিল। এমনকি সাম্রাজ্যবাদী শাসনের রাজশক্তি ও রাজদণ্ড যখন হিন্দুদের থেকে মুঘল বা মুসলমানদের হাতে গেছে তখনও ভারত এক থেকেছে। আর আমরা যখন আমাদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করব আর স্বাধীনতার সেই উচ্চভূমিতে পৌঁছাব তখনও ভারত এক থাকবে। সেখানে আমাদের উদ্ভাসিত করে এমন সব আলো প্রতিফলিত গরিমা হবে না। হবে আমাদের মুখমণ্ডল থেকে সরাসরি দীপ্তিমান আলোর মত।

খণ্ডিত ভারতের ধারণা স্যার মহম্মদ ইকবাল, লীগের মঞ্চ থেকে তাঁর সভাপতির ভাষণে দিয়েছেন। তিনি এটা দিয়েছেন এমন সময়ে যখন ওই সংস্থা কার্যত বিলুপ্ত এবং আর মুক্ত ইসলামের প্রতিনিধিত্বকারী নয়। আমি এটা বলতে পেরে খুশি যে স্যার মহম্মদ ইকবাল পরে তা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তাই কেউ বিভ্রান্ত হবেন না এই ভেবে যে খণ্ডিত ভারতের ধারণাই, ভারত কী হবে, সে বিষয়ে ইসলামের ধারণা। ডঃ স্যার মহম্মদ ইকবাল এটা যদি প্রত্যাহার করে নাও নিতেন তাহলেও, কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি এটির প্রস্তাব করতে পারেন না, এই কারণে আমি জোরের সঙ্গে ও নির্দ্বিধায় এটিকে প্রত্যাখ্যান করতাম ইসলামের উদীয়মান প্রজন্মের প্রতিভা ও মূলভাবের পক্ষে অনুপযুক্ত বলে। ভারতের সাম্প্রদায়িক প্রদেশগুলিতে ভাগ করা হবে না, ভারতের সীমানার মধ্যে ইসলাম ও হিন্দুধর্ম পাশাপাশি বজায় থাকবে। ক্ষুদ্রতর গণ্ডিতে কোনও ধর্মকেই রুদ্ধ করে, আবদ্ধ করে বা নিগড়িত করে রাখা হবে না। এক মুসলিম ভারত ও এক হিন্দু ভারতের বিষয়ে ডঃ ইকবালের ধারণার সমগোত্রে পড়ে কয়েকজন শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদীর পঞ্জাবকে খণ্ডিত ও বিভক্ত করার অশুভ প্রস্তাব।

দেশের জনগণ সমান মাত্রায় এবং কোন ধরনের তারতম্য ও আইনগত অক্ষমতা ছাড়াই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তৈরি আইনের সুরক্ষা ভোগ করছে; আর তা করছে এক প্রকৃত গণতন্ত্রের সম্ভাব্য ব্যাপকতম ভিত্তিতে; এই ভিত্তি, প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ও যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে; এক প্রশাসন, যাকে আইনগুলি নিরপেক্ষভাবে কার্যকর করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, বা তার কাজের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধ, দূর বা প্রত্যন্ত বিদেশিদের সংসদের কাছে নয়, দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে— মুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ ভারতের বিষয়ে এই বিশ্বাস এত সুবিস্তৃত যে আমি এগুলির বিশদে প্রবেশ করব এবং আপনাদের সামনে আমার ছবির সব রঙকে তুলে ধরব, এটা আপনারা আশা করবেন না। প্রকৃতপক্ষে আমার উচিত ছিল। এখানে ন্যাশনালিস্ট মুসলিম পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমার সাধারণ মন্তব্যগুলির একটি উপসংহার দিতে চাওয়া। তবে যৌথ বা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর বহু আলোচিত প্রশ্নটি আজ এমন বিরাট আকার নিয়েছে যে কোনও জননেতাই সম্ভবত তবে উপেক্ষা করতে পারেন না।

পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর মূল্য বা উপযোগিতা যাই হোক না কেন আমরা মনে করি আজকের পরিস্থিতিতে এবং ভবিষ্যতের ভারতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর কোনও স্থান থাকা উচিত নয়। কারণ, এই সময় এমন একটা সময় যখন কৃত্রিমভাবে কৌশলে সাধিত, প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারি প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ফল হচ্ছে একটি প্রদেশের মোট জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে নির্বাচক তালিকায়

সংখ্যালঘুতে পরিণত করা। আর যখন সাম্প্রদায়িক তীব্র আবেগ ও অনুভূতি চড়া পর্দায় থেকে সর্বজনীন অবিশ্বাস এক সাধারণ ও সর্বব্যাপী বীজাণু সমগ্র পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলে।'

জাতীয়তাবাদ পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী এবং পাকিস্তান সম্পর্কে শ্রী জিন্নাহ্ ও শ্রী বরকত আলি এরকম মত পোষণ করতেন। এই সমস্যাগুলির ব্যাপারেই কটা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত তারা পোষণ করেন।

এ পর্যন্ত ব্যাপারগুলি, হিন্দু মুসলমান ঐক্য আনার চেষ্টায় চরম ব্যর্থতা এবং মুসলমান নেতাদের মনে তত্ত্বের উদ্ভব আমি দেখানোর চেষ্টা করছি। তৃতীয় একটি ব্যাপার আছে যেটি আমি বর্তমান প্রসঙ্গে, আলোচনা করব। তার কারণ, উদ্ভূত হচ্ছে তার প্রাসঙ্গিকতা এবং বিবেচনাধীন বিষয়টির ওপর তার প্রভাব থেকে। বিষয়টি হচ্ছে এই মুসলমান তত্ত্বের পিছনে কোন যৌক্তিকতা আছে কি — যা রাজনৈতিক দর্শনকে তারা মেনে নিতে পারেন।

অনেক হিন্দু মনে হয় এই ধারণা পোষণ করেন যে পাকিস্তানের কোন যৌক্তিকতা নেই। আমরা যদি পাকিস্তানের তত্ত্বে নিজেদের আবদ্ধ রাখি তাহলে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না যে এটা একটা দারুণভাবে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। পাকিস্তানের দার্শনিক যৌক্তিকতা দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি সম্প্রদায় ও একটি জাতির মধ্যে পার্থক্যের ওপর। প্রথমত, অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে এটি স্বীকৃত হয়েছে। দীর্ঘসময় ধরে রাজনৈতিক দার্শনিকরা প্রধানত দুটি প্রশ্নে সংক্ষেপিত বিতর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রশ্ন দুটি ছিল শুধু সংখ্যাগুরুদের, সংখ্যালঘুদের শাসন করার অধিকার সরকারের বড় যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি হিসাবে কতদূর পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য। আর শাসিতদের সম্মতির ওপর সরকারের বৈধতা কতদূর নির্ভর করে এমনকি যারা জোর দিয়ে বলেছেন যে সরকারের বৈধতা শাসিতদের সম্মতির ওপর নির্ভর করে তারাও তাঁদের বক্তব্য জয়ী হয়েছে এই ভেবে সন্তুষ্ট থেকেছেন। বিষয়টি নিয়ে আরও অনুসন্ধান করার প্রয়োজন বোধ করেননি। 'শাসিতদের' বর্গের মধ্যে কোনওরকম পৃথকীকরণের প্রয়োজন তারা অনুভব করেননি। তারা স্পষ্টতই ভেবেছিলেন যে শাসিতদের বর্গে যারা অন্তর্ভুক্ত তারা একটি সম্প্রদায় বা জাতি এটা গুরুত্বহীন। পরিস্থিতির চাপে অবশ্য রাজনৈতিক দার্শনিকরা এই পার্থক্য মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। দ্বিতীয়ত এটা প্রভেদহীন কোনও বিভিন্নতা নয়। এই বিভিন্নতা গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রভেদ পরিণতির দিক থেকে মৌলিক। একটি সম্প্রদায় ও একটি জাতির মধ্যে পার্থক্য যে মৌলিক তা একটি সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক দার্শনিকরা যে রাজনৈতিক অধিকার দিতে প্রস্তুত সেই পার্থক্য থেকে স্পষ্ট হবে। একটি সম্প্রদায়কে তারা শুধু রাজবিদ্রোহের অধিকার দিতে প্রস্তুত। কিন্তু একটি জাতিকে তারা (রাষ্ট্র) ভাঙা বা

ছিন্ন করার অধিকার দিতে ইচ্ছুক। দুটির মধ্যে প্রভেদ স্পষ্ট। কারণ, এটি মৌলিক। রাজদ্রোহের অধিকার, সরকারের পদ্ধতি ও আবার প্রকারে পরিবর্তনের ওপর জোর দেওয়াতেই সীমিত। ছিন্ন করার অধিকার রাজদ্রোহের অধিকারের চেয়ে বৃহত্তর এবং একটি রাষ্ট্রের সদস্যদের একটি গোষ্ঠী পৃথক হয়ে যাওয়া এবং ওই রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডে যে অংশ ওই গোষ্ঠীর দখলে থাকে, তাকে পৃথক করে নেওয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পার্থক্যের ভিত্তি কী হবে তা নিয়ে প্রশ্ন থাকে। রাজনৈতিক দর্শনের লেখকরা যারা বিষয়টি আলোচনা করেছেন, একটি সম্প্রদায়ের রাজদ্রোহের* এবং একটি জাতির বিচ্ছিন্ন** হওয়ার দাবি করার অধিকারের যৌক্তিকতার পক্ষে কারণ দেখিয়েছেন। পার্থক্য দাঁড়ায় এই: একটি সম্প্রদায়ের রক্ষাকবচের অধিকার রয়েছে, একটি জাতির

---

* সিডজুইক এই কথাগুলিতে যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন "রাজদ্রোহের দোষগুলি, অধীনতার দোষগুলির কাছে তুলনামূলকভাবে তুচ্ছ হয়ে যায়। এটা যুক্তিসঙ্গতভাবে চিন্তা করা যেতে পারে, যেখানে বিতর্কিত প্রশ্নটি অপরিহার্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ.....। রাজদ্রোহ; কোন কোনসময় অভাব অভিযোগ দূরীকরণে প্রভাবিত করতে পারে এমনকি যখন শারীরিক শক্তিতে রাজদ্রোহীরা স্পষ্টতই দুর্বলতর; যেহেতু এটা সংখ্যাগরিষ্ঠকে তাদের কাজকর্মের ফলে উদ্রিক্ত আহত মনোভাবের তীব্রতা সম্পর্কে অবহিত করে। অনুরূপকারণে একটি সমঝোতা পরবর্তীকালে এক সংঘর্ষ বা বিরোধের পূর্বাভাস দিতে পারে। সংক্ষেপে, বিশৃঙ্খলাকে প্ররোচনা দেবার ভয়, গণতান্ত্রিক ও অন্যান্য ধরনের সরকারের অধীনে সাংবিধানিকভাবে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের ওপর কল্যাণকর নিয়ন্ত্রণ হিসেবে কাজ করতে পারে.....। আমি তাই মনে করি, রাজদ্রোহের নৈতিক অধিকার সর্বাধিক লোকপ্রিয় সরকারশাসিত গোষ্ঠীতে অবশ্যই থাকতে হবে — Elements of Politics (১৯১৯, পৃষ্ঠা ৬৪৬-৪৭)

** ছিন্ন হবার অধিকার সম্পর্কে সিডজুইক যা বলেছিলেন তাই হচ্ছে এই ঃ ". . . . . সরকারকে বৈধ হতে হলে শাসিতদের সম্মতির ওপর তা নির্ভর করবে এটা যারা মনে করেন তাদের কেউ কেউ এই অনুমান সিদ্ধান্ত না করে পারেন না ঃ মনে হয় তারা একটি রাষ্ট্রের সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন করার অধিকারকে উপযুক্ত প্রদান করেন, একটি সংখ্যালঘু যখন পুরনো রাষ্ট্রের এক নিরবিচ্ছিন্ন অংশে সংখ্যাগুরু, তখন ওই সংখ্যালঘুর বিচ্ছিন্ন হবার ১৩১ নতুন রাষ্ট্রগঠন করার অধিকার প্রয়োগের ফলে যে সংখ্যালঘু অসুবিধা ভোগ করে; তার দাবিকে মঞ্জুর করে..... আর আমি মনেকরি, বিচ্ছিন্নতার সাহায্যে সমগ্রের প্রভূত স্বার্থ বিকশিত হয়, এমন ক্ষেত্র রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি রাষ্ট্রের দুটি অংশ সেখানে সমুদ্রের দীর্ঘ ব্যবধান, বা অন্য ভৌত প্রতিবন্ধক যেমন আন্ত: অংশ অতি-সক্রিয় যোগাযোগ থেকে পৃথকীকৃত, এবং যখন জাতি বা ধর্মের, অতীত ইতিহাস অথবা বর্তমান সামাজিক অবস্থার থেকে সেগুলির সংশ্লিষ্ট অধিবাসীদের, আইনের প্রভেদ ১৩১ অন্যান্য সরকারি হস্তক্ষেপের ব্যাপারে প্রয়োজন ও চাহিদা আলাদা, এটা সহজেই অনুপযোগী হতে পারে যে অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির জন্য তাদের একটি অভিন্ন সরকার থাকবে যদি একই সময়, তাদের মিলিত বা ঐক্য ছাড়াও, বৈদেশিক সম্পর্কেও খুব আলাদা হয়, তবে এটা খুবই সম্ভব যে প্রতিটি অংশ অন্যের কলহে মুক্ত হওয়ার ঝুঁকির মাধ্যমে তার ক্ষতি হতে পারে বেশি, অন্যের সামরিক শক্তির সাহায্যে সম্ভাব্য লাভের চেয়ে। এগুলির মতো অবস্থায়, এটা চাওয়া যায় না যে ঐতিহাসিক দেশাত্মবোধের ভাবাবেগ বা এক বিস্তৃত ভূখন্ডের ভারতীয় মালিকানা নিয়ে গর্ব, সমগ্রের তার স্বাভাবিক অংশগুলিতে শান্তিপূর্ণভাবে ভেঙে যাওয়াকে স্থায়িভাবে প্রতিরোধ করবে।" (এলিমেন্টস্ অব্ পলিটিক্স্, ১৯১৯) পৃ: ৬৪৮-৪৯।

রয়েছে বিচ্ছিন্নতার দাবি জানানোর অধিকার। পার্থক্যটি একই সঙ্গে স্পষ্ট ও গুরুতর। কিন্তু, অধিকার রাজদ্রোহিতায় সীমিত এবং অন্যের অধিকার বিচ্ছিন্নতা পর্যন্ত প্রসারিত কেন, তার কোনও কারণ তাঁরা দেননি। এমনকি, তাঁরা এরকম কোনও প্রশ্নও তোলেননি। ধারাগুলির বাহ্যত স্পষ্টও নয়। কিন্তু, এই পার্থক্য কেন করা হয়েছে, তা জানাটা চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষণীয়। আমার মনে হয়, এই পার্থক্য চূড়ান্ত ভবিতব্যতার প্রশ্নের অথবা জাতিগুলির একটি পরম্পরা নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। সম্প্রদায়গুলির পরস্পর নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রে, এক সম্প্রদায়, অন্য একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে গোষ্ঠিবদ্ধ হতে পারে অথবা দুটি সম্প্রদায় পরস্পরের বিরুদ্ধে থাকতে পাবে। কিন্তু, তাদের চূড়ান্ত ভবিতব্যের ব্যাপারে, তারা এক-এটাই অনুভব করে। কিন্তু জাতিগুলির পরম্পরা বিদ্রোহ বা অস্ত্রধারণ করে, তখন চূড়ান্ত ভবিতব্যের ব্যাপারে পার্থক্যই নিয়েই বিরোধ। এটাই সম্প্রদায়গুলি ও জাতিগুলির মধ্যে পার্থক্য এবং এটাই তাদের রাজনৈতিক অধিকারের পার্থক্যকে ব্যাখ্যা করে। এই জায়গায় নতুন বা মৌলিক কিছু নেই। এটা শুধু, অন্যভাবে বলা, ডেন সম্প্রদায়ের একধরনের অধিকার রয়েছে, ও জারি রয়েছে একেবারে অন্য এক ধরনের অধিকার। একটি সম্প্রদায়ের রাজ-দ্রোহিতার অধিকার আছে। কারণ; এটাতেই সে সন্তুষ্ট। সে যা চায় তা হচ্ছে, সরকারের পদ্ধতি ও সরকারে পরিবর্তন। চূড়ান্ত ভবিতব্য নিয়ে, মতপার্থক্য নিয়ে। সে ঝগড়া করে না। একটি জাতিকে বিচ্ছিন্নতার অধিকার কারণ শুধু সরকারের আকার পরিবর্তনে সে সন্তুষ্ট হবে না। তার ঝগড়া চূড়ান্ত ভবিতব্যের প্রশ্নে। যে অস্বাভাবিক বন্ধন তাদের বেঁধে রেখেছে তা না ভাঙা পর্যন্ত সে যদি সন্তুষ্ট না হয় তা হলে, বিচক্ষণতা, এমনকি নীতি বিজ্ঞান দাবি করে যে এই বন্ধন ছিন্ন হোক এবং তারা প্রত্যেকে নিজের নিজের ভবিতব্য অনুসরণে স্বাধীন থাকুক।

৫

হিন্দু মুসলমান ঐক্যের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে এবং মুসলমান মতাদর্শে একটা সম্পূর্ণ বিপ্লব ঘটে গেছে, এটা স্বীকার করা যেমন জরুরি, তেমনই নির্দিষ্ট কোনও কারণে এসব পরিণতি ঘটেছে তা জানাও সমানভাবে জরুরি। হিন্দুরা বলেন ভেদ ও শাসনের ব্রিটিশনীতি এই ব্যর্থতা এবং এই মতাদর্শ সম্পর্কীত বিপ্লবের প্রকৃত কারণ। এতে বিস্ময়কর কিছু নেই। সর্বদা সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করা ছাড়া অন্য কোনও রাজনীতি না করার আইরিশ মানসিকতাকে হিন্দুরা লালন করেছে, এবং সেজন্য খারাপ আবহাওয়া সহ সবকিছুর জন্য দাবি করতে তারা তৈরি। কিন্তু সময় এসেছে, হিন্দুদের এত প্রিয় এই ওপর ওপর ব্যাখ্যাকে বাতিল করার। কারণ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে এটা হিসাবের মধ্যে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রথমত,

ব্রিটিশরা ভেদ ও শাসননীতির আশ্রয় নেয়, এটা ধরে নিলেও একটা তথ্যকে তা উপেক্ষা করে। তা হচ্ছে, ওই নীতি সফল হতে পারে না, যদি না বিভাজন কে সম্ভব করে এমন উপাদান থাকে। উপরন্তু ওই নীতি যদি এত দীর্ঘ সময়ের জন্য সফল হয় তবে, তার অর্থ; যে উপাদানগুলি বিভক্ত করে সেগুলি কমবেশি স্থায়ী ও পরস্পর বিরুদ্ধ এবং অনিত্য বা অগভীর নয়। দ্বিতীয়ত, হিন্দুদের বক্তব্য এটা ভুলে যায় যে শ্রী জিন্নাহ্, যিনি মতাদর্শগত রূপান্তরের প্রতিনিধিত্ব করেন, এমনকি তাঁকে তাঁর চরমশত্রুরাও কখনও ব্রিটিশদের হাতের ক্রীড়নকে বলে সন্দেহ করতে পারেন না। তিনি অত্যন্ত আত্মগর্বিত, একজন মুখোশহীন অহংবাদী হতে পারেন এবং সম্ভবত তাঁর কিছু পরিমাণ দাম্ভিকতাও থাকতে পারে, যেটা অন্যান্য সাধারণ মেধা বা সজ্জায় ঢাকা পড়ে না। হতে পারে এই কারণে, তিনি দ্বিতীয় স্থানে নিজেকে মানিয়ে নিতে এবং জনস্বার্থে সেই পদে থেকে অন্যদের সঙ্গে কাজ করতে অপারগ। ধারণার প্রাচুর্যে তিনি পরিপ্লাবিত না করতে পারেন, যদিও অন্যদের ধারণাকে উপজীব্য করেন এমন ক্ষীণমস্তিষ্ক সৌখীন পুরুষ তিনি নন, তাঁর সমালোচকেরা প্রতিপন্ন করেন। হতে পারে, তাঁর খ্যাতির বেশিটা তৈরি হয়েছে কলাকৌশলে, কমটা সারবস্তুতে। একই সঙ্গে, এটা নিয়ে সন্দেহ আছে ভারতে কোনও রাজনীতিক আছেন কিনা, যার ক্ষেত্রে অদূষণীয় বিশেষণটি আরও উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী, তা জানেন। এমন সকলেই স্বীকার করবেন যে তিনি সব সময়ই তাঁদের সমালোচক, যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁদের শত্রু নন। কেউ তাঁকে কিনে নিতে পারেন না। তাঁর প্রশংসায়, এটা বলতেই হবে যে তিনি কখনওই ভাগ্যান্বেষী সৈনিক নন। প্রামাণিক হিন্দুব্যাখ্যা শ্রী জিন্নাহ্‌র মতাদর্শগত রূপান্তরের কারণ দেখাতে পারে না।

তাহলে ঐক্য প্রয়াসের ব্যর্থতা মুসলমান মতাদর্শে রূপান্তর, এই সব দুঃখজনক ঘটনায় প্রকৃত ব্যাখ্যা কী?

হিন্দু-মুসলমান ঐক্যপ্রয়াসের ব্যর্থতার প্রভূত ব্যাখ্যা গৃহীত রয়েছে এই অনুধাবনে ব্যর্থতার মাধ্যমে হিন্দুদের ও মুসলমানদের মধ্যেকার ব্যবধান শুধু পার্থক্যের একটা ব্যাপার নয়, আর এই বিরুদ্ধতার জন্য কোনও বৈষয়িক কারণকেও নির্দেশ করা যায় না। এই বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে এমন সব কারণে যাদের মূলে রয়েছে ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিদ্বেষ। রাজনৈতিক বিদ্বেষ সেগুলির প্রতিফলন মাত্র। এগুলি অসন্তোষের এক গভীর নদী সৃষ্টি করেছিল, যা এই উৎসগুলি থেকে পুষ্ট হত, একটা উচ্চতায় উঠত এবং স্বাভাবিক প্রণালীগুলিকে ছাপিয়ে উঠত। অন্য

কোনও উৎস থেকে প্রবাহিত জলধারা যতো বিশুদ্ধই হোক, যখন এতে মিলিত হত, এর পূর্ণ পরিবর্তন বা এর শক্তিকে ক্ষীণ করার পরিবর্তে মূল ধারায় হারিয়ে যেত। বিরুদ্ধতার এই পলি, যা এই ধারা জমা করেছে, স্থায়ী ও গভীর হয়েছে। যতক্ষণ এই পলি জমা হতে থাকবে যতোক্ষণ এই বিরুদ্ধতা স্থায়ী হবে, হিন্দুদের ও মুসলমানদের মধ্যে এই বিরুদ্ধতা, ঐক্যকে জায়গা করে দিতে এমন ভাবটা অস্বাভাবিক।

তুর্কি সাম্রাজ্যে খ্রিস্টানদের ও মুসলমানদের মতো ভারতে হিন্দু ও মুসলমানরা শত্রুভাবে বহু ক্ষেত্রে মুখোমুখি হয়েছে এবং যুদ্ধের পরিণতি প্রায়-ই তাদের বিজয়ী ও বিজিতের সম্পর্কে নিয়ে এসেছে। যে পক্ষই জিতুক, দুয়ের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান স্থির থেকেছে এবং মুঘল বা ব্রিটিশদের অধীনে তাদের মধ্যে বলবৎ হওয়া রাজনৈতিক মিলন, অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতো মৌলিক ঐক্যে পর্যবসিত না হয়ে, তাদের পারস্পরিক বিরুদ্ধতাকেই শুধু বাড়িয়েছে। ধর্ম বা সামাজিক বিধি এই ব্যবধান মুছে দিতে পারে না। দুটি বিশ্বাস পারস্পরিকভাবে অন্যান্য সাধারণ, এবং ভালো সামাজিক আচরণের স্বার্থে যে সমন্বয় সাধিত হোক, মূলে ও কেন্দ্রে তারা পরস্পরবিরুদ্ধ। দুয়ের মধ্যে এক অন্তর্নিহিত বিরুদ্ধতা রয়েছে, যা কয়েক শতাব্দীতেও ভাঙা যায়নি। বিশ্বাস দুটিতে একসঙ্গে আনার জন্য আকবর ও কবীরের মতো সংস্কারকদের প্রয়াস সত্ত্বেও, প্রতিটির পশ্চাতে আচার সম্বন্ধীয় বাস্তবতা রয়ে গেছে। বাণিজ্যিক ভাষায় প্রয়োগ করলে, সংখ্যাগুলির অভিন্ন হয়ে থাকবে এমনভাবে কিছুই সেগুলিকে পরিবর্তন বা তৈরি করতে পারে না। একজন হিন্দু, হিন্দুধর্ম থেকে খ্রিস্টধর্মে যেতে পারে, কোনও জলস্থল না বাধিয়েই, ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি না করেই।কিন্তু সে হিন্দুধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে যেতে পারে না, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না ঘটিয়ে, এবং নিশ্চিত ভাবেই বিবেকের তাড়না সৃষ্টি না করে। মুসলমানদের থেকে হিন্দুদের বিভক্ত করে রেখেছে যে বিরুদ্ধতা সেটাই থেকে দেখা যাচ্ছে।

ইসলাম ও হিন্দুধর্ম যদি মুসলমানদের ও হিন্দুদের তাদের বিশ্বাসের ব্যাপারে আলাদা করে রাখে, ওই দুই ধর্ম তাদের সামাজিক সমীভবনকেও প্রতিরোধ করে। হিন্দুধর্ম যে হিন্দুদের ও মুসলমানদের মধ্যে (অন্তধর্মীয়) বিবাহকে নিষিদ্ধ করে, তা সুবিদিত। এই সঙ্কীর্ণ মনস্কতা শুধু হিন্দুধর্মের দোষ নয়। সামাজিক বিধির ব্যাপারে ইসলাম ধর্ম ও সমানভাবে সঙ্কীর্ণ, এটাও মুসলমানদের ও হিন্দুদের মধ্যে বিবাহকে নিষিদ্ধ করে। এই সব সামাজিক বিধিগুলি থাকায়, কোনও সামাজিক সমীভবন হতে পারে না এবং ফলত, পন্থা, পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সামাজিকীকরণ, তীব্রতাকে খর্বকরা

এবং যুগ যুগ ধরে চলে আসা মাধুর্যশূন্যতাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে আসা হয় না।

হিন্দুদের ও মুসলমানদের মধ্যে ক্ষতকে প্রকাশ্য ও অব্যাহত রাখার জন্য, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের অন্য ত্রুটিও রয়েছে। বলা হয়, হিন্দুধর্ম মানুষদের বিভক্ত করে; অন্যদিকে ইসলাম মানুষদের একত্রে বাঁধে। এটা অর্ধ সত্য মাত্র। কারণ, ইসলাম ধর্ম যেমন একত্রে বাঁধে, তেমনি নিষ্ঠুর ভাবে বিভক্তও করে। ইসলাম ধর্মব্যক্তি হিসাবে কাজ করার অধিকার প্রাপ্ত এক আবদ্ধ সমাজ। এবং তা মুসলমানদের ও অমুসলমানদের মধ্যে যে পার্থক্য করে তা অত্যন্ত বাস্তব, অত্যন্ত সার্থক এবং অত্যন্ত বিচ্ছিন্নকারি পার্থক্য। ইসলামের সৌভ্রাতৃত্ব মানুষের সৌভ্রাতৃত্ব নয়। এটা মুসলমানদের জন্য শুধু মুসলমানদের সৌভ্রাতৃত্ব। সেখানে মৈত্রীভাব রয়েছে কিন্তু তার সুবিধা শুধু ওই সমাজের মধ্যে যারা, তাদের মধ্যে সীমিত। ওই সমাজের বাইরে যারা আছে তাদের জন্য ঘৃণা ও শত্রুতা ছাড়া আর কিছু নেই। ইসলামের দ্বিতীয় ত্রুটি এই যে এটি সামাজিক স্বায়ত্তশাসনের একটি ব্যবস্থা এবং এটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে অসঙ্গতি পূর্ণ কারণ একজন মুসলমানের আনুগত্য তার দেশের কোথায় সে বাস করছে তার ওপর নির্ভর করে না। এটা নির্ভর করে সে কোন ধর্মে আছে তার ওপর। যেখানেই ইসলামের শাসন রয়েছে সেটাই তার দেশ। অন্যভাবে বললে ইসলাম কখনই একজন মুসলমানকে তার মাতৃভূমি হিসাবে ভারতকে গ্রহণ করতে এবং একজন হিন্দুকে তার আত্মীয় বলে ভাবতে দেয়নি। সম্ভবত এই কারণেই একজন মহান ভারতীয় কিন্তু প্রকৃত মুসলমান ভারতের চেয়ে জেরুসালেমে সমাহিত হতে চেয়েছেন।

মুসলমান নেতাদের মতাদর্শগত রূপান্তরের প্রকৃত ব্যাখ্যা তাদের মতামতের কোনও অসৎ ঝোঁকের কারণে এটা বলা যায় না। এটা এক নতুন দৃষ্টির উষালগ্ন বলে মনে হয়, যে দৃষ্টি পাকিস্তান এই নতুন নামের প্রতীকে এক নতুন ভবিতব্যের প্রতি নির্দেশ করছে। এই প্রথম এক নতুন ভবিতব্যের নতুন ভাবে আরাধনা মুসলমানরা শুরু করেছে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমন নয়। আরাধনা নতুন, কারণ তাদের নতুন ভবিতব্যের সূর্য এতদিন মেঘে ঢাকা থাকার পর এখন সবে পূর্ণ ছটায় উদিত হয়েছে। এই নতুন ভবিতব্যের চৌম্বক আকর্ষণ, এর প্রতি মুসলমানদের না টেনে পারে না। এই টান এতটাই প্রবল যে শ্রী জিন্নার মত মানুষও দারুণভাবে আলোড়িত এবং এর শক্তিকে প্রতিহত করতে পারেন না। এই ভবিতব্য ভারতের মানচিত্রে এক সুনির্দিষ্ট আকারে নিজেকে প্রসারিত করে। মানচিত্রে চোখ এমন কেউই তা এড়িয়ে যেতে পারেন না। এটা সেখানে এমনভাবে আছে

যেন এটা মুসলমানদের জন্য এক পৃথক জাতি ও রাষ্ট্র হিসাবে উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবে দৈব পরিকল্পিত। এই নতুন ভবিতব্যকে শুধু সহজে পরিস্ফুট করা ও সুনির্দিষ্ট আকার দেওয়াই যায় না। এটি (মুসলমানদের) মনেও ধরছে কারণ এটি কয়েকটি সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করে। সম্ভাবনাগুলি হচ্ছে, সব মুসলিম পরিবারকে এক ঐশ্লামিক রাষ্ট্রে সংযুক্ত করার ধারণাটি বাস্তবায়িত করা এবং এইভাবে বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের তাদের দেশের জাতীয়তা গ্রহণ করা ও এইভাবে ঐশ্লামিক সমাজে* বিচ্ছেদ নিয়ে আসা বিপদকে এড়ানো। হিন্দুস্থান থেকে পাকিস্তান আলাদা হওয়ার পর, ইরান, ইরাক, আরব, তুরস্ক ও মিশর মুসলমান দেশগুলির একটি মহাসংঘ গঠন করছে যা কনস্টানটিনোপোল থেকে লাহোর পর্যন্ত বিস্তৃত এক ঐশ্লামিক রাষ্ট্র গঠন করবে। একজন মুসলমান সত্যিই অত্যন্ত নির্বোধ যদি সে এই নতুন ভবিতব্যের চাকচিক্যে আকৃষ্ট না হয় এবং ভারতীয় ভাবরাজ্যে মুসলমানদের স্থান সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন না করে।

এই ভবিতব্য এত স্পষ্ট যে, এটা কিছুটা বিস্ময়কর যে মুসলমানরা এত দীর্ঘ সময় এটি মুক্ত কণ্ঠে বলেনি। প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯২৩ সালেই তাদের কয়েকজন এটা মুসলমানদের চরম ভবিতব্য বলে জানতেন তার প্রমাণ রয়েছে। এর সমর্থনে খান সাহেব সর্দার এম.গুল খানের সাক্ষ্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। খান সাহেব ওই বছর ভারত সরকার নিযুক্ত উত্তর পশ্চিম সীমান্ত সমিতির সামনে সাক্ষী হিসাবে হাজির হয়েছিলেন স্যার ডেনিস ব্রে'র সভাপতিত্বে গঠিত ওই সমিতিকে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নির্ধারিত জেলাগুলি ও উপজাতি অঞ্চলগুলির মধ্যে প্রশাসনিক সম্পর্ক বিষয়ে এবং পঞ্জাবের সঙ্গে নির্ধারিত জেলাগুলির সংযুক্তির বিষয় প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছিল। খান সাহেবের সাক্ষ্যের গুরুত্ব শ্রী এন. এম. সমর্থ ছাড়া সমিতির অন্য কোনও সদস্য অনুধাবন করেননি। শ্রী সমর্থ ছিলেন একমাত্র সদস্য যিনি তার সংখ্যালঘু প্রতিবেদনে বিষয়টির প্রতি তীক্ষ্ণভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর প্রতিবেদনের নিম্নলিখিত অংশ বিশেষ এই নতুন ভবিতব্যের* বিকাশের ইতিহাসে এক অন্ধকার কোনে আলো ফেলেছে। শ্রী সমর্থ বলেছেন;- 'এই সমিতির সামনে অন্যকোনও সাক্ষী শুধু উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও স্বাধীন অঞ্চলই নয়, বেলুচিস্তান, পারস্য ও আফগানিস্তানের ব্যাপারে

* স্যার মহম্মদ ইকবাল মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগ অর্থে ভারতীয় মুসলমানদের কোনও অ-মুসলমান দেশে মুসলমানদের জাতীয়তাবাদের তীব্র নিন্দা করেছিলেন।

* উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অনুসন্ধান সমিতির প্রতিবেদন, ১৯২৪ ; পৃষ্ঠা : ১২২-২৩

ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রামাণ্যতা নিয়ে কথা বলতে পারেন। এই সাক্ষী খুব সঙ্গতভাবে তা দাবি করতে পারেন। এটা উল্লেখযোগ্য যে তিনি সমিতির সামনে সাক্ষী হিসাবে হাজির হয়েছেন, "সভাপতি, ইসলামিক আঞ্জুমান" ডেরা ইসমাইল খান" এই পদাধিকারী রূপে। (এই সাক্ষী খান সাহেব, খান সাহেব "সর্দার মহম্মদ গুল খানকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম "এখন মনে করুন, সীমান্ত প্রদেশে আসামরিক সরকারের ধাঁচে সিন্ধুতে যে ভিত্তিতে হয়েছে সেই ভিত্তিতে হল। তাহলে সিন্ধু যেমন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির, এই প্রদেশটিও, পঞ্জাব প্রদেশের অংশ হবে এতে আপনার কী বলার আছে?" তার জবাবে তিনি আমাকে সরাসরি এই উত্তর দিলেন: "ইসলাম যে পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এবং জাতিপুঞ্জে যে ধারণা মুসলমানদের রয়েছে তাতে আমি এর বিরুদ্ধে।" এই উত্তরে আমি তাকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করলাম। তিনি আমাকে কোন রাখঢাক না করে খোলাখুলি ও স্পষ্ট উত্তর দিলেন। প্রাসঙ্গিক অংশ আমি নিচে উদ্ধৃত করছি ঃ—

'প্রঃ আপনাদের আঞ্জুমানের পিছনে রয়েছে ইসলাম জগতের সম্মিলনের ধারণা। আর সেই ধারণা হচ্ছে ইসলাম একটি জাতিপুঞ্জ। আর এই কারণে এই প্রদেশকে পঞ্জাবের সঙ্গে যুক্ত করা হানিকর এবং ওই ধারণার পক্ষে ক্ষতিকর হবে। আপনার মতো যারা চিন্তা করেন তাদের মনেও কি এই ধারণাই প্রবল? এটা কি এরকমই?

'উঃ এটা এরকম-ই। কিন্তু আমার আর কিছু যোগ করার আছে। তাঁদের ধারণা হিন্দু-মুসলিম ঐক্য কখনও বাস্তবে ঘটবে না। এটা কখনই সম্পাদিত বাস্তব হবে না আর তাঁরা মনে করেন যে এই প্রদেশের পৃথক এবং ইসলাম ও ব্রিটিশ রাষ্ট্রমণ্ডলের মধ্যে যোগসূত্র হয়ে থাকা উচিত। বস্তুত যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় আমার মত কী — আমি, আঞ্জুমানের একজন সদস্য হিসাবে এই মত প্রকাশ করছি — আমরা বরং দেখব হিন্দুদের ও মুসলিমদের আলাদা হয়ে যাওয়া। ২৩ কোটি হিন্দু দক্ষিণে এবং ৮ কোটি মুসলমান উত্তরে।

রসকুমারি† থেকে আগ্রা পর্যন্ত সমগ্র অংশ হিন্দুদের দাও এবং আগ্রা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত মুসলমানদের। আমি বলছি, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় লোকদের চলে যাওয়ার কথা। এটা একটা বিনিময়ের ধারণা। এটা সংহরণের ধারণা নয়। বর্তমানে বলশেভিকবাদ ব্যক্তি সম্পত্তি মালিকানার বিলোপ ঘটিয়েছে। এটা সব জিনিসকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে আর এটা একটা ধারণা যা অবশ্যই শুধু বিনিময়

† মূলে এটাই আছে। সম্ভবত এটা কণ্যাকুমারির মুদ্রণ প্রমাদ।—বাংলা সংস্করণের সম্পাদক

সম্পর্কিত। এটা অবশ্যই অব্যবহারিক। কিন্তু এটা যদি ব্যবহারিক হত আমরা বরং অন্যটার চেয়ে এটাই চাইতাম।

'প্রঃ— এই প্রবল ধারণাই কী আপনাকে পঞ্জাবের সঙ্গে সংযুক্তি না চাইতে বাধ্য করে?'

'উঃ— ঠিক।'

* * * *

'প্রঃ— আপনি যখন ঐস্লামিক জাতিপুঞ্জের কথা বললেন, আমি বিশ্বাস করি, ধর্মীয় দিকটি রাজনৈতিক দিকের চেয়ে অধিকতর স্পষ্টভাবে আপনার মনে ছিল?'

'উঃ— অবশ্যই, রাজনৈতিক। আঞ্জুমান একটি রাজনৈতিক ব্যাপার। প্রথমে অবশ্যই মুসলমান বলতে সব কিছুই ধর্মীয়। কিন্তু আঞ্জুমান অবশ্যই একটি রাজনৈতিক সংস্থা।'

'প্রঃ— আমি, আপনার আঞ্জুমানের কথা বলছি না। বলছি, মুসলমানদের কথা। আমি জানতে চাই, এই ঐস্লামিক জাতিপুঞ্জ সম্পর্কে মুসলমানরা কী ভাবছে। সবচেয়ে স্পষ্টভাবে কী আছে, ধর্মীয় দিক না রাজনৈতিক দিক?'

'উঃ— আপনি জানেন ইসলাম ধর্মীয় ও রাজনৈতিক, দুই-ই।'

'প্রঃ— তাহলে রাজনীতি আর ধর্ম পরস্পর জড়িত?'

'উঃ— হ্যাঁ। অবশ্যই।'

* * * *

সীমিত উদ্দেশ্যে শ্রী সমর্থ এই সাক্ষ্যকে কাজে লাগিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এটা দেখানো যে, আফগানিস্তান ও ভারতের বাইরে মুসলমান দেশগুলির সঙ্গে পাঠানদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্জাবের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সংযুক্তিতে অসম্মতি জানিয়ে পৃথক পাঠান প্রদেশকে চিরস্থায়ী করা। কিন্তু এই সাক্ষ্য এটা দেখায় যে, পাকিস্তান প্রকল্পের অন্তর্লীন ধারণা ১৯২৩-এই জন্ম নেয়।

১৯২৪-এ বোম্বাইতে মুসলিম লীগের অধিবেশনে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের

---

* এই প্রসঙ্গের জন্য দেখুন ১৯২৫-এর ১১ই এপ্রিল কলকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভা অধিবেশনে লালা রাজপত রায়ের সভাপতির ভাষণ : The Indian Quarterly Register; 1925; পৃ: 379

ক্ষেত্রে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। প্রস্তাবটির ওপর বলতে গিয়ে মহম্মদ আলি কথিত রূপে প্রস্তাব করেন* যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানদের, তারা ভারতে বা কাবুলে কার শাখা হবে — তা বেছে নেবার আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার থাকা উচিত। তিনি একজন ইংরেজকে উধৃত করলেন। ওই ইংরাজ বলেছিলেন, যে কনষ্টানটিনোপল থেকে যদি দিল্লি পর্যন্ত একটি সরলরেখা টানা যায়, তাহলে তা সাহারানপুর পর্যন্ত একটি মুসলমান ছিটমহলকে প্রকাশ করবে। এটা সম্ভব যে মহম্মদ আলি, শ্রী সমর্থের উল্লেখিত সাক্ষীর সাক্ষ্যে বেরিয়ে আসা পাকিস্তান সম্পর্কিত সমগ্র প্রকল্পের বিষয়ে জানতেন। এক অসতর্ক মুহূর্তে তিনি সাক্ষী যা প্রকাশ করতে পারেনি অর্থাৎ চূড়ান্তভাবে আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানকে যুক্ত করার পক্ষে বলে ফেলেছিলেন।

এই প্রবন্ধ সম্পর্কে ১৯২৪ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত মুসলমানরা কিছু বলেননি বা করেন নি বলে মনে হয়। মনে হয় মুসলমানরা এটা চাপা দিয়ে রেখেছিলেন এবং চিরাচরিত এক জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বিভাজন থেকে সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন যে রক্ষা কবচ সেগুলি নিয়ে হিন্দুদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৩০-এ 'গোল-টেবিল বৈঠক' চলাকালে কয়েকজন মুসলমান নিজেদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করলেন। এর সদর দফতর হল লন্ডনে। উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের কর্মসূচিকে গোল-টেবিল বৈঠকে যাতে বিবেচনা করা হয় তা দেখা। সমিতি পাকিস্তানের সমর্থনে ক্ষুদ্র পত্র ও সাধারণপত্র জারি করলেন এবং 'গোল-টেবিল বৈঠকে'র সদস্যদের কাছে পাঠালেন। তখনও কেউ এতে আগ্রহী হন নি এবং গোল-টেবিল বৈঠকের মুসলমান সদস্যরা কোনভাবেই একে প্রোৎসাহিত করেন নি।*

এটা সম্ভবত যে শুরুতে মুসলমানরা ভেবেছিলেন, এই ভবিতব্য একটা স্বপ্ন মাত্র এবং তাকে রূপায়িত করা যাবে না। এটা সম্ভব যে পরবর্তীকালে যখন তারা অনুভব করলেন যে এটা একটা বাস্তবতা হতে পারে— তখন তারা এটা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন নি কারণ তারা তখন ব্রিটিশদের ও হিন্দুদের এতে রাজি হতে বাধ্য করানোর মত যথেষ্টভাবে সুসংগঠিত ছিলেন না। এটা ব্যাখ্যা করা কঠিন, কেন

---

* এক অভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়ে আপত্তিকে যদি পাকিস্তান সম্পর্কিত প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্য ধরা হয়, তাহলে 'গোল্-টেবিল বৈঠকে' একমাত্র সদস্য যিনি কথিত রূপে এর নাম উল্লেখ না করেও একে সমর্থন করেছিলেন তিনি হচ্ছেন স্যার মহম্মদ ইকবাল। গোল-টেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশনে স্যার মহম্মদ ইকবাল এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, ভারতের জন্য কোনও কেন্দ্রীয় সরকার থাকা উচিত নয়। প্রদেশগুলিতে স্বশাসিত এবং লন্ডনে ভারত সচিবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে বিশিষ্ট স্বাধীন রাজ্য হওয়া উচিত।

মুসলমানরা 'গোল-টেবিল বৈঠকে' পাকিস্তানের জন্য চাপ দেননি। সম্ভবত তারা জানতেন, প্রকল্পটি ব্রিটিশদের অসন্তুষ্ট† করবে আর যেহেতু মুসলমানদের, ১৪ দফা নিয়ে হিন্দুদের সঙ্গে বিরোধে নিষ্পত্তির জন্য ব্রিটিশদের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল। মুসলমানরা নিখুঁত রাষ্ট্রনেতাদের মতো এবং বিসমার্কের কথা মতো রাজনীতিতে 'সম্ভবের খেলা' বলে জেনে অপেক্ষা করাটাই পছন্দ করলেন। পছন্দ করলেন ১৪ দফা নিয়ে বিরোধে তাদের অনুকূলে ব্রিটিশদের কাছ থেকে সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত নিজেদের নখদন্ত প্রদর্শন না করা।

পাকিস্তান প্রকল্পের প্রস্তাবের এই বিলম্বের আরও একটি ব্যাখ্যা আছে। এটা আরও বেশি সম্ভব যে মুসলমান নেতারা অতি সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত পাকিস্তানের পক্ষে দর্শনগত যৌক্তিকতা জানতেন না। সর্বোপরি ভারতীয় রাজনৈতিক দাবার ছকে পাকিস্তান কোনও ছোট চাল ছিল না। এটা ছিল এ পর্যন্ত নেওয়া সবচেয়ে বড় চাল। কারণ, এতে রাষ্ট্র ভাঙনের বিষয়টি জড়িত ছিল। কোন মুসলমান যদি সাহস করে এর প্রবক্তা হতে এগিয়ে আসতেন, তবে এটা নিশ্চিত যে তাকে প্রশ্ন করা হত, এত উগ্র একটি প্রকল্পের সমর্থনে কোন নৈতিক ও দার্শনিক যৌক্তিকতা তার রয়েছে। কেন তারা পাকিস্তানের পক্ষে দার্শনিক যৌক্তিকতা এতদিন আবিষ্কার করেন নি তার কারণও সমানভাবে বোধগম্য। মুসলমান নেতারা তাই ভারতের মুসলমানদের একটি সম্প্রদায় বা সংখ্যালঘু হিসাবে বলছিলেন। তারা মুসলমানদের একটি জাতি হিসাবে বলেন নি। একটি সম্প্রদায় ও একটি জাতির মধ্যে পার্থক্য খুবই সূক্ষ্ম। আর এটা অন্যরকম হলেও সব ক্ষেত্রে এটা এত বিস্ময়কর নয়। প্রতিটি রাষ্ট্রই কমবেশি একটি বিমিশ্র রাষ্ট্র। এবং সেগুলির অধিকাংশতেই জনগণের মধ্যে ব্যাপক বৈচিত্র্য, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ধর্মীয় বিধি ও সামাজিক ঐতিহ্য রয়েছে। আর সেগুলি আলগাভাবে সম্বৃদ্ধ গোষ্ঠীগুলির এক পুঞ্জ গঠন করে। কোনও রাষ্ট্রই একক সমাজ নয়। চিন্তা ও কাজের ক্ষেত্রসমেত এক পরিব্যাপী সংস্থা নয়। অবস্থাটা এরকম হওয়ায় একটি গোষ্ঠী, একটি জাতি হওয়ার উপাদানগুলি তার থাকলেও ভুলক্রমে নিজেকে সম্প্রদায় আখ্যা দিতে পারে। দ্বিতীয়ত আগেই দেখানো হয়েছে একটি জনসমাজ, জাতি হওয়ার পক্ষে সব উপাদানগুলি থাকা সত্ত্বেও জাতীয় সচেতনতার অধিকারী নাও হতে পারে।

---

† বলা হয় যে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এটি নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা হয়েছিল। ব্রিটিশরা এর পক্ষে ছিলেন না। এটা সম্ভব মুসলমানরা তাঁদের (ব্রিটিশদের) অসন্তোষ উৎপাদনের ভয়ে এর ওপর জোর দেননি।

সংখ্যালঘুদের অধিকার ও রক্ষাকবচের দিক থেকে এই পার্থক্য আবার গুরুত্বহীন। সংখ্যালঘু, সম্প্রদায় বা জাতি যাই হোক না কেন, এটি সংখ্যালঘুই। সংখ্যালঘু জাতির সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচ, একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুরক্ষার জন্য রক্ষা কবচের চেয়ে আলাদা নয়। সংখ্যাগুরুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সুরক্ষা চাওয়া হয়। সংখ্যালঘুদের ওপর এ-রকম অত্যাচারের সম্ভাবনা একবার প্রতিষ্ঠিত হলে রক্ষাকবচ চাইতে বাধ্য হয়েছে এমন সংখ্যালঘু, সম্প্রদায় বা জাতি কিনা তাতে কিছু যায় আসে না। এমন নয়, সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বস্তুত পার্থক্য খুব-ই বড়। এটা এইভাবে সংক্ষেপিত করা যায় যে একটি সম্প্রদায় অন্য সংখ্যালঘু বা সংখ্যালঘুদের সম্প্রদায়গুলির চেয়ে যতই আলাদাই হোক বা তাদের যত বিরোধীই হোক, সকলের চূড়ান্ত ভবিতব্যের ব্যাপারে অবশিষ্টদের সঙ্গে একমত। অন্যদিকে একটি জাতি রাষ্ট্রের অন্যান্য অংশগুলির চেয়ে আলাদাই শুধু না এটি এক পৃথক ভবিতব্যে বিশ্বাস করেও তাকে লালন করে। এই ভবিতব্য রাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গ উপাদান যে ভবিতব্যকে মনে স্থান দেয় তার প্রতি পুরোপুরি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। আমার কাছে এই পার্থক্য এত গভীর যে আমার কথা বলতে গেলে একটি জাতির থেকে একটি সম্প্রদায়কে আলাদা করতে গেলে আমি এটিকে পরীক্ষার নিরিখ হিসাবে গ্রহণ করতে দ্বিধা করব না। এক জনসমাজ যা তাদের পার্থক্য সত্ত্বেও নিজেদের জন্য ও তাদের প্রতিপক্ষদের জন্য এক অভিন্ন ভবিতব্যকে গ্রহণ করে তারা একটি সম্প্রদায়। একটি জনসমাজ যারা বাকিদের চেয়ে আলাদাই শুধু নয়, যারা অন্যদের গৃহীত ভবিতব্যকে নিজেদের ভবিতব্য বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তারা একটি জাতি। এই অভিন্ন ভবিতব্য গ্রহণ করা বা না করা দিয়েই ব্যাখ্যা করা যেতে পারবে অস্পৃশ্য, খ্রিস্টান ও পার্সিরা হিন্দুদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেন শুধু - সম্প্রদায় আর মুসলমানরা কেন একটি জাতি। তাই রাষ্ট্রে বা ব্যবস্থাবদ্ধ সমাজে সৌহার্দ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে যে পার্থক্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে চূড়ান্ত ভবিতব্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য। এই পাথর্ক্যের শক্তিশালী চরিত্রকে অস্বীকার করা যায় না। এটা যদি স্থায়ী হয় এটার ফল রাষ্ট্রের খণ্ডে খণ্ডে বিভাজন ছাড়া আর কিছু নয়। রক্ষা কবচের ক্ষেত্রে একটি জাতি ও একটি সম্প্রদায়ের মতো কোন পার্থক্য নেই। একটি সম্প্রদায়, একটি জাতির মতই একটি অধিকার ও রক্ষাকবচের দাবি জানানোর অধিকারী।

পাকিস্তানের পক্ষে দার্শনিক যৌক্তিকতা আবিষ্কারের বিলম্ব এই কারণে যে মুসলমান নেতারা মুসলমানদের একটি সম্প্রদায় এবং এক সংখ্যালঘু হিসাবে বলতে অভ্যস্ত

হয়ে গিয়েছিলেন। এই পরিভাষার ব্যবহার তাদের ভুল দিশায় নিয়ে গিয়েছিল এবং এক বন্ধ্যা জায়গায় নিয়ে এসেছিল। তারা নিজেদের যেমন সংখ্যালঘু হিসাবে স্বীকার করেছিলেন তেমনই তারা অনুভব করেছিলেন তাদের পক্ষে- রক্ষাকবচ চাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই। এটা তারা করেছিলেন এবং কার্যত প্রায় অর্ধ শতাব্দী নিজেদের এতেই নির্দিষ্ট রেখেছিলেন। এটা যদি তাদের মনে আসত যে নিজেদের সংখ্যালঘু বলে স্বীকার করাটা বন্ধ করা প্রয়োজন কিন্তু সংখ্যালঘু বা একটি জাতি তার থেকে সংখ্যালঘু যা একটি সম্প্রদায় তাকে আলাদা করতে তারা আরও অগ্রসর হতে পারেন তাহলে তারা পাকিস্তানের পক্ষে দার্শনিক যৌক্তিকতা আবিষ্কারের পথে এগিয়ে যেতে পারতেন। সেক্ষেত্রে সম্ভবত পাকিস্তান যে সময়ে এসেছে তার আগেই আসত।

সে যাই হোক। ঘটনা এই মুঘলমানদের একটা পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে এবং সেই রূপান্তর এসেছে কোনও অপরাধমূলক প্ররোচনায় নয়, এসেছে কী তাদের সত্য ও চরম ভবিতব্যে সেই আবিষ্কার থেকে। কাউকে কাউকে এই রূপান্তরের আকস্মিকতায় ধাক্কা দিতে পারে কিন্তু যারা ২০ বছরে হিন্দু-মুসলমান রাজনীতির গঠনক্রমকে অধ্যয়ন করেছেন এই অনুভূতিকে স্বীকার না করে পারেন না যে দুইয়ের এই বিচ্ছেদ এগিয়ে চলেছিল। হিন্দু-মুসলমান রাজনীতির ঘটনাক্রমে দুঃখজনক ও অশুভ সমান্তরাল ঘটনায় বিশিষ্ট। হিন্দুরা ও মুসলমানরা সমান্তরাল পথে হাঁটছিল। সন্দেহ নেই তারা এক-ই দিশায় চলেছিল। কিন্তু সন্দেহ নেই তারা এক-ই রাস্তায় হাঁটেনি। ১৮৮৫-তে হিন্দুরা, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে কংগ্রেসের সূচনা করেছিল। কংগ্রেসে যোগদানের জন্য হিন্দুদের দ্বারা প্রলুব্ধ হতে মুসলমানরা অস্বীকার করেছিল। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত মুসলমানরা হিন্দু রাজনীতির এই ধারার বাইরে ছিল। ১৯০৬-এ তারা অনুভব করল যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তখন তারা মুসলমান রাজনৈতিক জীবনের ধারার জন্য পৃথক প্রণালি তৈরি করল। এই ধারা নিয়ন্ত্রিত হত মুসলিম লীগ নামে একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠনের দ্বারা। মুসলিম লীগের গঠনের সময় থেকে মুসলমান রাজনীতির জল এই পৃথক প্রণালিতে প্রবাহিত হয়েছে। ব্যক্তিক্রমী ক্ষেত্রগুলি ছাড়া কংগ্রেস ও লীগ আলাদা থেকেছে এবং আলাদাভাবে কাজ করেছে। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সর্বসময় এক থাকেনি। এমনকি একই স্থানে বার্ষিক অধিবেশনের আয়োজনও তারা পরিহার করেছে। যাতে একের ছায়া অন্যের ওপর না পড়ে। এমন নয় যে লীগ ও কংগ্রেস বৈঠক করে নি। দুটি

সংগঠন বৈঠক করেছে আলোচনার জন্য। কয়েকবার বৈঠক সফল হয়েছে। বেশির ভাগ বারই ব্যর্থ হয়েছে। ১৯১৬-তে লখনউতে তারা মিলিত হয়েছিল এবং তাদের প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। ১৯২৫-এ তারা মিলিত হয়েছিল কিন্তু তারা সফল হয়নি। ১৯২৮-এ মুসলমানদের একাংশ কংগ্রেসের সঙ্গে বৈঠকের জন্য প্রস্তুত ছিল। অন্য একটি অংশ বৈঠক করতে অস্বীকার করল। তারা বরং ব্রিটিশের ওপর নির্ভর করতে চাইল। কথা হচ্ছে, তারা মিলিত হয়েছে কিন্তু কখনও মিশে যায়নি। শুধু খিলাফৎ আন্দোলনের সময় দুই প্রণালীর জল তাদের নির্ধারিত গতিপথ ছেড়ে এক প্রণালীতে এক ধারা হিসাবে প্রবাহিত হয়েছিল। এবং বিশ্বাস করা হয়েছিল যে ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে তাকে যুক্ত করছেন সেই জলকে আর কোনকিছুই আলাদা করতে পারবে না। কিন্তু সেই আশা মিথ্যা প্রতিপন্ন হল। দেখা গেল দুটি জলের উপাদানে এমন কিছু আছে যে তাদের পৃথক হতে বাধ্য করবে। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের সঙ্গম এবং যেইমাত্র খিলাফৎ আন্দোলনের সারবস্তু নিঃশেষিত হল বা অন্তর্হিত হল এক ধারার জল অন্য ধারার উপস্থিতিতে তীব্রভাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করল। যেমন কারও শরীরে বাইরের কোন বস্তু ঢুকলে সে করে। প্রত্যেকেই অন্যকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া ও অন্যের থেকে আলাদা হওয়ার প্রবণতা দেখাতে শুরু করল। ফল হল জলধারাগুলি আলাদা হওয়ার সময় তা করল ধৈর্যহীন গতিবেগ ও পরস্পরের বিরুদ্ধে সঙ্কল্পবদ্ধ হিংসা যদি জলের সম্পর্কে বলতে গিয়ে কেউ এরকম ভাষা প্রয়োগ করতে পারেন। এরপর তারা নিজেদের প্রণালীতে প্রবাহিত হচ্ছে অনেক গভীরে এবং আগে যা ছিল তার তুলনায় পরস্পরের থেকে অনেক দূর দিয়ে। বস্তুত যে গতিবেগ ও হিংসায় নিয়ে জলধারা দুটি সামরিকভাবে সঞ্চিত জলাশয় থেকে ফেটে বেরিয়েছে তাতে তারা যে দিশায় প্রবাহিত হচ্ছিল সেটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। একটা সময় তাদের দিশা ছিল সমান্তরাল। এখন তারা বিপরীত। একটি আগের মতই পূর্বদিকে প্রবাহিত হচ্ছে, অন্যটি বিপরীত দিশায় পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। আলঙ্কারিক কথনের বিষয়ে সম্ভাব্য আপত্তি ছাড়া আমি নিশ্চিত এটাকে হিন্দু মুসলমান রাজনীতির ইতিহাসের ভুল অধ্যায়ন বলা যাবে না। এই সমান্তরালতাকে যদি কেউ মনে রাখেন তাহলে তিনি জানবেন যে রূপান্তরের বিষয়ে কোনকিছুই হঠাৎ নয়। কারণ রূপান্তর যদি বিপ্লব হয় হিন্দু - মুসলমান রাজনীতিতে সমান্তরালতা সেই বিপ্লবের বিবর্তনকে সূচিত করে। মুসলমান রাজনীতির একটি সমান্তরাল ধারা থাকা উচিত এবং কখনই তা রাজনীতির হিন্দু - প্রবাহের সঙ্গে মিলিত হওয়া উচিত হয়নি। এই বিষয়টি আধুনিক ভারতীয়

ইতিহাসের এক আশ্চর্যজনক ঘটনা। নিজেদের এইভাবে পৃথক করে নিয়ে কিছু রহস্যময় অনুভূতিতে প্রবাহিত হল যাদের উদ্দেশ্য তারা বর্ণনা করতে পারে নি। তারা পরিচালিত হয়েছিল এক অদৃশ্য হাতের দ্বারা, যে হাতকে তারা দেখতে পারে নি। কিন্তু সেই হাত-ই তাদের, হিন্দুদের থেকে আলাদা থাকার নির্দেশ দিচ্ছিল। এই রহস্যময় অনুভূতি ও অদৃশ্য হাত, পাকিস্তানের প্রতীকে তাদের পূর্বনির্বাচিত নিয়তি ছাড়া আর কিছু নয়। অজানা থাকলেও এটাই তাদের মধ্যে কাজ করছিল। এইভাবে দেখলে পাকিস্তান সম্পর্কিত ধারণায় কোনকিছুই নতুন বা আকস্মিক নয়। শুধু যে জিনিসটা ঘটেছে তা ছিল অস্পষ্ট। তা এখন পরিপূর্ণ আলোকে দেখা হচ্ছে এবং যা ছিল নামহীন তা এখন একটি নাম নিয়েছে।

৬

সমগ্র আলোচনাকে সংক্ষেপিত করলে এটা মনে হয় এক অখণ্ড ভারত, স্বাধীন ভারত, এমনকি রাজ্য হিসাবে এক ভারতের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ভারত এক অখণ্ড সমগ্র হবে এই ভিত্তিতে ভবিষ্যতে স্বাধীনতার জন্য তার সব আশা নিয়ে নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে। নৈরাশ্য এই কারণে জাতীয় ভবিতব্যকে যদি স্বাধীনতার অর্থে ভাবা হয়, হিন্দুরা সেই পথ অনুসরণ করবে না। তাদের তা অনুসরণ না করার যুক্তিও রয়েছে। তার ভয় পায় যে সেই পথে হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। হিন্দুরা, মুসলমানদের স্বাধীনতার জন্য উদ্যোগকে নির্দোষ মনে করে না। এই স্বাধীনতাকে ব্যবহার করা হবে হিন্দুদের, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সুরক্ষা প্রদানকারী ছত্র ছায়ার বাইরে খোলা জায়গায় আনতে এবং তারপর প্রতিবেশী মুসলমান দেশগুলির সঙ্গে জোট বেঁধে ও তাদের সাহায্যে হিন্দুদের পরাধীন করতে। মুসলমানদের পক্ষে স্বাধীনতা অন্তিম লক্ষ্য নয়। এটা শুধু মুসলমানরাজ প্রতিষ্ঠার উপায়। রাজ্য মর্যাদার অর্থে যদি জাতীয় ভবিতব্য চিন্তা করা হয় তাহলেও নৈরাশ্য মুসলমানরা এটা জানতে রাজি হবে না। তাদের ভয় রাজ্য মর্যাদার আওতায় হিন্দুরা তাদের ওপর হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করবে একজন একভোট ও একভোট একইমূল্য এইনীতির সুবিধা নিয়ে মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব দিয়ে এই নীতির সুবিধা যতটাই হ্রাস করা হোক পরিণতিতে হিন্দুদের দ্বারা হিন্দুদের জন্য হিন্দুর সরকার না হয়ে যাবে না। ভারতের ভবিতব্য নিয়ে সম্পূর্ণ নৈরাশ্যই মনে হয় ভারতের বিধিলিপি। যদি ভারত এক অখণ্ড সমগ্র হিসাব থাকবে এর ওপর জোর দেওয়া হয়, একটা প্রশ্ন বিবেচনাযোগ্য অখণ্ড ভারতের জন্য সমগ্র করা যথাযথ কিনা। প্রথমত ভারত যদি এক অখণ্ড সমগ্র হিসাবও থাকে তাহলে তা কখনই প্রকৃত

গঠনগত সমগ্র হবে না। ভারত, নামে এক দেশ হিসাবে পরিচিত হয়ে যেতে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এটি হবে দুটি পৃথক দেশ। পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানে যারা যুক্ত হতে বাধ্য হয়েছে ও একটি কৃত্রিম সঙ্ঘ হয়েছে। বিশেষত দ্বিজাতি তত্ত্বের চাপে এমনটাই হবে। ভারতীয় তথ্য ও বাস্তবতায় জগতে ঐক্যের ধারণার খুব সামান্যই প্রভাব এবং সাধারণ ভারতীয় হিন্দু বা মুসলমানকে সামান্যই মোহিত করে। সাধারণ ভারতীয়ের দৃষ্টি যে উপত্যকায় এসে বাস করে তার মধ্যেই সীমিত। দুপক্ষেরই কল্পনাপ্রবণ ও অকৃত্রিম মানুষদের মনে এর আবেদন রয়েছে এমনকি দ্বিজাতি তত্ত্বও ঐক্যের জন্য ভাবাবেগপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার বিকাশকেও জায়গা দেবে না। রাষ্ট্র দ্বৈততার জীবাণুর এই বিস্তার কোনও একদিন নিশ্চিতভাবেই একটা মানসিকতার সৃষ্টি করবে যেটা বাধ্য হয়ে গড়া এই সংঘকে ভেঙে ফেলার জন্য জীবন-মরণ সংগ্রামের ডাক দেবে। যদি কোনও উন্নততর শক্তির কারণে এই ভেঙে যাওয়ার ব্যাপারটি নাও ঘটে তাহলেও একটা জিনিস যে ভারতে ঘটবে তা নিশ্চিত, তা হচ্ছে এই সংযোগ যদি অব্যাহত থাকে তাহলে ভারতের প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হতে থাকবে, সংলগ্নতা আলগা হতে থাকবে। জনগণের ভালবাসা ও বিশ্বাসের ওপর এর প্রভাব দুর্বল হতে থাকবে এবং বিকাশকে ব্যাহত না করলেও এর নৈতিক ও বৈষয়িক সম্পদ এর ব্যবহার কে রোধ করবে। ভারত হয়ে উঠবে একটি রক্তশূন্য দুর্বল রাষ্ট্র, অকার্যকর এক জীবন্ত শব সমাহিত না হলেও মৃত।

জোর করে সংঘটিত এই সংযোগ বা মিলনে দ্বিতীয় অসুবিধা হবে, হিন্দু, মুসলমান সমঝোতা একটি ভিত্তি খুঁজে দেখার প্রয়োজন হবে। একটা নিষ্পত্তিতে পৌঁছানো যে কত কঠিন তা কাউকে বলার প্রয়োজন রাখে না। ভারতকে বিভাজনের কমে আর বেশ কোনও প্রস্তাব ভারতকে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানে বিভাজনের কমে, দেশে অন্যান্য স্বার্থকে ক্ষুন্ন না করে, একটি নিষ্পত্তি আনার জন্য; ইতিমধ্যেই যা মেনে নেওয়া হয়েছে তার চেয়ে বেশি আর কী দেওয়া যেতে পারে, তা চিন্তা করা কঠিন, কিন্তু যে অসুবিধাই থাক, এটা অস্বীকার করা যায় না যে, জোর করে সংঘটিত এই সংযোগ বা মিলন যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে একই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক নিষ্পত্তি না হলে ভারতের কোনও রাজনৈতিক অগ্রগতি হতে পারে না। বস্তুত হিন্দুদের ও মুসলমানদের দুটি জাতি হিসাবে গণ্য করা হবে এখন ও পরবর্তীকালে এই আন্তর্জাতিক নিষ্পত্তির চেয়ে এক সাম্প্রদায়িক নিষ্পত্তি, জোর পূর্বক মিলনের এই প্রকল্পের অধীনে সামান্যতম রাজনৈতিক প্রগতির পূর্বশর্ত হয়ে থাকবে।

জোর পূর্বক সংঘটিত এই রাজনৈতিক মিলনে তৃতীয় একটি অসুবিধাও থাকবে।

এটা তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিকে বাদ দিতে পারবে না। প্রথমত যদি কোনও সংবিধান সৃষ্টি হয় তবে তা হবে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অমৈত্রীভাবাপন্ন রাষ্ট্রগুলির মহাসংঘ। তারা নিজে থেকেই বিরোধের ক্ষেত্রে আবেদন জানাতে তৃতীয় একটি পক্ষের উপস্থিতি চাইবে। কারণ পরস্পরের প্রতি সন্দেহ পূর্ণ ও অমৈত্রীভাবাপন্ন সম্পর্ক দুটি জাতির আলোচনার পদ্ধতিতে সন্তোষ জনক সমাধানে পৌঁছনোর পর্বে প্রতিবন্ধক হবে। ভবিষ্যতে এমনকি ব্রিটিশ-এর প্রতি বিরোধিতার ঐক্য ও ভারতে থাকবে না। যে ঐক্য অতীতে এত মানুষের হৃদয়কে আনন্দিত করেছে। কারণ দুটি জাতি আগের তুলনায় পরস্পরের প্রতি এত বেশি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হবে যে তারা ব্রিটিশ-এর বিরুদ্ধে কখনও ঐক্যবদ্ধ হবে না। দ্বিতীয়ত সংবিধানের ভিত্তি হবে হিন্দুদের ও মুসলমানদের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সংবিধানই যাতে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে তার জন্য তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি, লক্ষণীয় পর্যাপ্ত সসস্ত্রবাহিনী সম্পন্ন তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে, যাতে সমঝোতা ভেঙে না যায়, তা দেখার জন্য।

অবশ্যই এই সবকিছুর অর্থ রাজনৈতিক ভবিতব্য সম্পর্কিত নৈরাশ্য, যে ভবিতব্য হিন্দুরা ও মুসলমানরা উভয়ই লালনকরার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে এবং যার দ্রুত সিদ্ধি এত নিষ্ঠা সহকারে চায়। যাইহোক একই দেশের বুকে ও একই সংবিধানে যদি দুটি যুযুধান জাতি আবদ্ধ হয় তবে এ ছাড়া আর কী আশা করা যেতে পারে?

ভারত, পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান বিভক্ত হলে অনাগত ঘটনা পরম্পরার যে মানসচিত্র ফুটে ওঠে, তার সঙ্গে এই অন্ধকার অতীত ঘটনা পরম্পরার মানসচিত্র কে তুলনা করুন। দেশভাগ, প্রত্যেকের নিজের জন্য নির্ধারিত ভবিতব্য কে পরিপূর্ণ ভাবে অর্জনের পথ খুলে দেয়। মুসলমানরা স্বাধীনভাবে তাদের পাকিস্তানের স্বাধীনতা বা রাজ্য মর্যাদা যেটা নিজেদের জন্য ভালো মনে করবে, স্বাধীনভাবে বেছে নেবে। হিন্দুরা তাদের হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা বা রাজ্য মর্যাদা যেটাকে নিজেদের অবস্থার পক্ষে সদবিবেচনাপূর্ণ মনে করবে স্বাধীনভাবে বেছে নিতে পারবে। মুসলমানরা হিন্দুরা যে দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্ত হবে তাই উভয়পক্ষেরই রাজনৈতিক প্রগতির পথ মসৃণ হবে। উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না এই ভয়ের জায়গা নেবে আকাঙ্ক্ষা পূরণের আশা। যদি ভারত এক অখণ্ড সমগ্র হিসাবে কোনও রাজনৈতিক অগ্রগতি করার অভিলাষী হয় তবে সাম্প্রদায়িক সমঝোতা অবশ্যই একটি প্রয়োজনীয় পূর্ব শর্ত হয়ে থাকবে। কিন্তু পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান এ ধরনের প্রাক শর্তের কঠিন নিগড়

থেকে মুক্ত থাকবে। এমনকি, যদি সংখ্যালঘুদের সঙ্গে এক সাম্প্রদায়িক সমঝোতা প্রাক শর্ত হয়ে থাকে তাও পূর্ণ করা কঠিন হবে না। প্রত্যেকের পথ থেকেই এই বাধা সরে যাবে। পাকিস্তানের আর একটি সুবিধাও উল্লেখ করতে হবে। এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে হিন্দুদের ও মুসলমানদের মধ্যে এক ধরনের পরস্পর বিরুদ্ধতা রয়েছে যেটা ভাঙা না গেলে, তা ভারতের শান্তি ও প্রগতির পক্ষে প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু এটা উপলব্ধি করা হয় না যে ধ্বংসাত্মক পারস্পরিক বিরুদ্ধতা থাকায় ততটা ক্ষতি হয় না যতটা ক্ষতি হয় এটা প্রদর্শনের জন্য অভিন্ন নাটক থাকায়। এই অভিন্ন নাটকই বিরুদ্ধতাকে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানায়। এরকম না হয়ে পারে না। দুজনকে যখন সমান স্বার্থ নিয়ে কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানান হয় তখন তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত পারস্পরিক বিরুদ্ধতা প্রদর্শন ছাড়া আর কী হতে পারে? এখন পাকিস্তানের প্রকল্পের এই সুবিধা আছে। প্রকল্পের সুবিধা হচ্ছে এই যে, এটা সামাজিক বিরুদ্ধতার অভিনয়ের জন্য কোনও নাটককে রাখে না। এই সামাজিক বিরুদ্ধতাই হিন্দুদের ও মুসলমানদের মধ্যে বিরাগের কারণ। শান্তি ও স্থিরতা বিঘ্নিত হওয়া থেকে কষ্ট ভোগ করার কোনও ভয় ভারত ও পাকিস্তানের থাকবে না। এই ভয়ই ভারত কে এত বছর ছিন্ন ভিন্ন ও খণ্ড বিখণ্ড করে রেখেছে সব শেষে যেটাকে কোনও ভাবেই সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বলা যাবে না, তা হচ্ছে শান্তি বজায় রাখতে তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজনীয়তাকে বাদ দেওয়া যাবে। এই জোর করে গড়া মিলন বা সংযোগের কারণে একজন অন্য আর একজনের ওপর যে শৃঙ্খলা আরোপ করে তা থেকে মুক্ত হয়ে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান প্রতেক্যেই ভেতর থেকে বিচ্ছিন্নতার ভয় ছাড়াই এক শক্তিশালী ও স্থিতিশীল রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে ওঠবে। দুটি পৃথক সত্তা হিসাবে তারা নিজ নিজ ভবিতব্যে পৌঁছতে পারবে যেটা এক সমগ্রের অংশ হিসাবে কখনই পারবে না। যারা অখণ্ড ভারত চান তারা অবশ্যই ১৯২৩ এ কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে মহম্মদ আলি যা বলেছিলেন তা প্রণিধান করবেন। ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্য বিষয়ে মহম্মদ আলি বলেছিলেন :—

‘বিভ্রান্তিকর বিরোধিতার ঐক্যছাড়া, যদি আর নতুন কোনও শক্তি যদি ঐক্যবদ্ধ না করে তবে এই বিশাল ভারতের মহাদেশ একটা ভৌগোলিক ভ্রান্ত নাম হয়ে থাকবে।”

আর নতুন কোনও শক্তি কি অবশিষ্ট আছে? যাকে কাজে লাগানো যায়? অন্যসব শক্তি ব্যর্থ হওয়ার পর কংগ্রেস সময়ের সরকারে পরিণত হবার পর

জনসংযোগের পরিকল্পনায় এক নতুন শক্তিকে দেখতে পেল। মুসলমানদের নেতাদের অবজ্ঞা বা প্রতারিত করে হিন্দুদের ও মুসলমান জনতার মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য-সৃষ্টিই ছিল এর অভিপ্রায়। সারবস্তু দেখলে এটা ছিল টোরি সোনা দিয়ে শ্রমিকদলকে কিনে নেবার জন্য ব্রিটিশ রক্ষণশীল পরিকল্পনাটি যেমন ব্যর্থ, তেমনই দুরভিসন্ধিমূলক। কংগ্রেস ভুলে গিয়েছিল যে কতকগুলি জিনিস এত দামি যে কোনও মালিক-ই যে তার দাম জানে, সেগুলি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবে না এবং সেগুলির সঙ্গে তাদের বিযুক্ত করার জন্য প্রতারণার যে কোনও প্রয়াস নিশ্চিতভাবে ক্ষোভ ও তিক্ততার সৃষ্টি করবে। একটি সম্প্রদায়ের জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হচ্ছে, রাজনৈতিক ক্ষমতা বিশেষত তার সম্প্রদায়ের অবস্থাকে যদি নিরন্তর চ্যালেঞ্জ জানানো হয় এবং যদি ওই সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রয়োজন হয় চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেই এই রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখার। রাজনৈতিক ক্ষমতা হচ্ছে একমাত্র উপায় যার দ্বারা সে তার অবস্থাকে অক্ষুন্ন রাখতে পারে। মিথ্যা প্রচার, মিথ্যা কথন অথবা পদ বা সোনার লোভ দেখিয়ে ওই সম্প্রদায়কে ক্ষমতা ত্যাগ করানোর প্রয়াসের অর্থ তাকে নিরস্ত্র করার, তার বন্দুককে থামিয়ে দেওয়া এবং তাকে নিষ্ক্রিয় ও দাসবৎ করা। কিন্তু এই পথ নিন্দনীয়। কারণ এর অর্থ মিথ্যা ও নিন্দনীয় পদ্ধতিতে বিরোধিতাকে চাপা দেওয়া। এটা কোনও ঐক্য সৃষ্টি করতে পারে না এটা শুধু রোষ, তিক্ততা ও শত্রুতা সৃষ্টি করতে পারে।* সংক্ষেপে কংগ্রেসের জনসংযোগ পরিকল্পনা এটাই করেছিল। কারণ এতে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না, জন সংযোগের এই উন্মাদ পরিকল্পনার সঙ্গে পাকিস্তানের উদ্ভবে অনেকটাই সম্পর্ক রয়েছে।

---

* স্যার আব্দুল রহিমের মতো স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিও, ১৯২৫-এর ৩০শে ডিসেম্বর আলিগড়ে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে, হিন্দু কৌশলের ফলে সৃষ্ট এই তিক্ততাকে প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে তিনি, "স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও লালা লাজপৎ রায়ের মতো রাজনৈতিকদের নেতৃত্বে শুদ্ধি, সংগঠন ও হিন্দু মহাসভা আন্দোলন ও কর্মসূচির আকারে মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণের নিন্দা করেন।" তিনি বললেন, "স্পেনদেশবাসিরা, ম্যুরদের যেমন স্পেন থেকে বহিষ্কৃত করেছিল, হিন্দুনেতাদের কয়েকজনও মুসলমানদের ভারত থেকে বিতাড়িত করার কথা প্রকাশ্যে বলেছিলেন। হিন্দু বন্ধুদের দ্বারা ভক্ষিত হবার পক্ষে মুসলমানরা খুব-ই বড় গ্রাস। যে কৃত্রিম অবস্থার মধ্যে তারা থাকত, তার সুবাদে, তাদের স্বীকার করতে হয়েছিল যে হিন্দুরা দারুন সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। এমন কি ইংরেজরাও তাদের বিষাক্ত প্রচারে ভয় পেতে শিখেছিল। হিন্দুরা, সরকারি পদে আসীন সর্বোত্তম মুসলমানদেরও সম্ভাব্য প্রতিটি উপায়ে তুচ্ছ করার কৌশলেও সমান পটু। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন সেই মুসলমানরা যারা হিন্দু রাজনৈতিক মতবাদকে স্বীকার করেন। বস্তুত, তাদের প্ররোচনামূলক ও আক্রমণাত্মক আচরণের দ্বারা মুসলমানদের কাছে আগেকার যেকোনও সময়ের চেয়ে স্পষ্টতর করে তুলেছিলেন যে মুসলমানরা তাদের ভাগ্য হিন্দুদের যাতে সঁপে দিতে না পারে এবং আত্মরক্ষায় সম্ভাব্য সব উপায় তারা অবশ্যই অবলম্বন করবে।'— All-India Register, 1925, Vol II; P-356.

এটা বলা যেতে পারত যে জনসংযোগকে রাজনৈতিক যন্ত্র হিসাবে চিন্তা ও প্রয়োগ করা হয়েছিল, এটা দুর্ভাগ্যজনক; এটাকে অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে সামাজিক ঐক্যের জন্য এক শক্তি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারত। কিন্তু যে সামাজিক প্রাচীর হিন্দুদের ও মুসলমানদের বিভক্ত করে তাকে কি এটা ভেঙে ফেলতে পারত? প্রতিটি ভারতীয়দের কাছে এটা গভীরতম দুঃখের বিষয় যে তাদের একত্রে টেনে আনার কোনও সামাজিক বন্ধন নেই। দুয়ের মধ্যে একত্র আহার বা বিবাহ হয় না। এগুলো কি প্রবর্তন করা যেতে পারে? তাদের উৎসবগুলি ভিন্ন হিন্দুদের কি ঐসব উৎসব পালনে বা সেগুলোতে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে? তাদের ধর্মীয় ধারণা শুধু পরস্পরের থেকে পৃথক দূরবর্তী এই নয়, প্রবেশের অর্থ অন্যজনের প্রস্থান। তাদের সংস্কৃতি ভিন্ন, তাদের সাহিত্য ও ধর্মও ভিন্ন। সেগুলি শুধু ভিন্নই নয়, সেগুলি পরস্পরের পক্ষে এত অরুচিকর যে সেগুলি নিশ্চিতভাবে বিতৃষ্ণা ও বমনেচ্ছা সৃষ্টি করবে। জীবনের এইসব স্থায়ী উৎসের এক-ই উৎপত্তিস্থল থেকে কেউ তাদের পান করাতে পারে? মিলিত হওয়ার কোনও অভিন্ন ক্ষেত্র নেই। এরকম কোনও ক্ষেত্র তৈরিও করা যেতে পারে না। অভিন্ন সাংস্কৃতিক ও হৃদয়াবেগপূর্ণ জীবনের অংশীদার হওয়া পরের কথা তাদের মধ্যে পর্যাপ্ত স্থূল শারীরিক সংস্পর্শও নেই। তারা একসঙ্গে থাকে না; হিন্দুরা ও মুসলমানরা নিজেদের পৃথক পৃথক দুনিয়ায় বাস করে। যে সব প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে গ্রামগুলিতে বাস করে হিন্দুরা ও শহরগুলিতে মুসলমানরা। যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে গ্রামগুলিতে মুসলমানরা ও শহরগুলিতে হিন্দুরা বাস করে। তারা যেখানেই থাকুক, আলাদা ভাবেই থাকে প্রতিটি শহরে ও প্রতিটি গ্রামে। হিন্দু মহল্লা ও মুসলমান মহল্লা রয়েছে, যেগুলি একে অন্যের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। উভয়ের অংশগ্রহণের মতো কোনও অভিন্ন ব্যবধানরহিত চক্র নেই। তারা মিলিত হয়, হয় ব্যবসা করতে নয় হত্যা করতে। একে অন্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য তারা মিলিত হয় না। যেখানে ব্যবসা করার প্রয়োজন নেই বা হত্যা করার প্রয়োজন নেই। সেখানে তারা মেলামেশা বন্ধ করে। যখন শান্তির সময়, হিন্দু মহল্লাগুলি ও মুসলমান মহল্লাগুলি, মনে হয় যেন ভিনদেশি বসতি। যে মুহূর্তে সংঘর্ষ শুরু হয় বসতিগুলি মনে হয় যেন সশস্ত্র শিবির। শান্তির কাল বিভাগগুলি ও সংঘর্ষের কাল বিভাগ গুলি সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাদের মধ্যবর্তী সময় থাকে নিরন্তর উত্তেজনা। জনসংযোগ; এরকম বেড়াগুলির ব্যাপারে কী করতে পারে? এটা এমন কী টপকে বেড়ার অন্যদিকেও যেতে পারে না, আর খুব কম-ই গঠনগত ঐক্য সৃষ্টি করতে পারে।

□ □ □

অংশ V

পাকিস্তান প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত পৃষ্ঠায় যা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে চিন্তা করেছেন। এক শ্রেণীর মানুষের অভিযোগ যে আমি শুধু বিচার্য বিষয়ের দুটি দিক এবং তা থেকে উদ্ভূত সমস্যাবলীর উল্লেখ করেছি কিন্তু ওই দিকগুলির কোনওটির সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করি নি। এটা সঠিক নয়। পূর্ববর্তী খণ্ডগুলি যিনি পড়েছেন, তাঁকে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সবগুলি না হলেও অনেকগুলি বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় আমি আমার অভিমতগুলি ব্যক্ত করেছি। বিশেষ করে বিতর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির জন্যে অন্তত দু'টির কথা আমি উল্লেখ করতে পারি, যথা, মুসলমানরা কি একটি জাতি (Nation); এবং পাকিস্তান দাবি করার কোনও যৌক্তিকতা তাঁদের আছে কি না। অন্য এক দল মানুষ আছেন তাঁদের সমালোচনার ধারা ভিন্ন ধরনের। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিমতগুলি ব্যক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছি এ অভিযোগ তাঁরা করেন না। তাদের অভিযোগ এই যে, আমি আমার সিদ্ধান্ত উপনীত হতে গিয়ে আমি সেই সব প্রস্তাবগুলির (Propositions) ওপর নির্ভর করেছি এটা ধরে নিয়ে যে, প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেগুলি ছিল সুনিশ্চিত এবং কোনও ব্যতিক্রম যে থাকতে পারে তা আমি মেনে নিই নি। আমাকে বলা হয়েছে যে, "আপনি কি আপনার সিদ্ধান্তগুলিকে অত্যন্ত সাধারণ ভাষায় ব্যক্ত করেননি? একটি সাধারণ প্রস্তাবের কি শর্তাবলী ও সীমাবদ্ধতা থাকে না? কিন্তু জটিল সমস্যাবলীকে কি আপনি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও শিষ্টাচার বর্জিত ভাবে নিষ্পন্ন করেন নি? কী করে ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণভাবে পাকিস্তানের অস্তিত্বকে বাস্তবায়িত করা যায়, তা কি আপনি দেখাননি? এমন কী এই সমালোচনাও সম্পূর্ণ সঠিক নয়। এই বিষয়গুলির আলোচনা আমি পরিহার করেছি এ কথা বলাও সঙ্গত নয়। হয়তো সেগুলির আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং বিক্ষিপ্ত হয়েছে। যাই হোক, এই সমালোচনায় যে যুক্তি আছে তা মেনে নিতে আমি প্রস্তুত এবং এই ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে আমি নীতিগতভাবে বাধ্য। তাই এই খণ্ডটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিচার বিবেচনার জন্য অভিপ্রেত এবং উৎসর্গীকৃত। ঃ—

১। পাকিস্তান দাবি করার জন্য মুসলমানদের যৌক্তিকতাকে প্রভাবিত করে এমন সীমাবদ্ধতাকারী বিচার-বিবেচনাগুলি কী কী?

২। পাকিস্তানের সমস্যাবলী কী কী?

৩। পাকিস্তান সম্পর্কিত বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাধিকার কার আছে?

অধ্যায় ১৩

পাকিস্তান হওয়াটা কি আবশ্যিক?

১

ইতিপূর্বে যা কিছু ঘটে গেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সন্দেহবাদী, জাতীয়বাদী, রক্ষণশীল এবং প্রাচীনপন্থী ভারতীয় এ প্রশ্ন অবশ্যই করবেন যে "পাকিস্তান হওয়াটা কি আবশ্যিক?" কেউই এই দৃষ্টিভঙ্গিটিকে হালকা করে দেখতে পারে না। কারণ পাকিস্তানের সমস্যাটি অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একথা অবশ্য স্বীকার্য যে মুসলমান এবং তাদের অধিবক্তাদের কাছে প্রশ্নটি শুধু প্রাসঙ্গিক ও ন্যায্যই নয়, সেই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণও বটে। এর গুরুত্ব নিহিত আছে এই বিষয়ের মধ্যে যে, পাকিস্তানের দাবি করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে সীমাবদ্ধতাগুলি যুক্তি বলে এতটাই বিচার্য যে সেগুলিকে সহজে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। এই সীমাবদ্ধতাগুলিকে কেবলমাত্র বিবৃত করলেই সেগুলির যুক্তিকে উপলব্ধি করার পক্ষে যথেষ্ট হবে। এগুলির মধ্যেই তা জাজ্বল্যমান। ফলত পাকিস্তানের অনুকূলে জরুরি প্রয়োজনটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুসলমানদের তরফ থেকে প্রমাণ করার দায়িত্বটি বেশ গুরুতর। প্রকৃত পক্ষে পাকিস্তান সম্পর্কিত অথবা স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় ভারতের বিভাজনের বিচার্য বিষয়টির গুরুত্ব এতই গুরুত্বপূর্ণ ধরনের যে, মুসলমানদের শুধু যে প্রমাণের দায়িত্ব কী পালন করতে হবে তা নয়, সেই সঙ্গে এমন ধরনের সাক্ষ্য প্রমাণ যোগ করতে হবে যাতে তাদের বিবাদাত্মক বিষয়ে জয়লাভ করার আগে আন্তর্জাতিক বিবেকবুদ্ধিতে প্রত্যয় জন্মাতে হবে। এখন দেখা যাক, কীভাবে এই সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান দাবি করার যৌক্তিকতা টিকে থাকতে পারে।

২

ভারতের বাকি অংশ থেকে সহজেই বিচ্ছিন্ন করা যায় এমন কিছু সুনির্দিষ্ট এলাকায় ভারতের মুসলমান জনসংখ্যার একটা বড় অংশ কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে সেই কারণেই পাকিস্তান হওয়াটা কি আবশ্যিক? কয়েকটি সুনির্দিষ্ট এলাকায় মুসলমান জনগণ যে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে, একথা অনস্বীকার্য এবং সম্ভবত সেই এলাকাগুলি বিভাজন যোগ্য। কিন্তু তাতে কী হয়েছে? এই বিষয়টি সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা

করতে গিয়ে সেই মৌলিক সত্যটিকে কখনই উপেক্ষা করা যাবে না যে প্রকৃতি ভারতবর্ষকে একটি অনন্য ভৌগোলিক একক হিসাবে গঠন করেছে। ভারতীয়রা অবশ্য কলহ-প্রবণ এবং এই ভবিষ্যদ্বানী কেউ করতে পারবে না যে, কবে এই কলহের অবসান হবে। কিন্তু এই সত্যটিকে অবধারিত ধরে নিলেও এ থেকে কি প্রমাণিত হচ্ছে? এটাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয়রা কলহপ্রিয় মানুষ। ভারত যে একটি অনন্য ভৌগোলিক একক, এ সত্যটিকে নির্মূল করা যায় না। ভারতের ঐক্য প্রকৃতির মতই সুপ্রাচীন। এই ভৌগোলিক এককের মধ্যে এবং তার সামগ্রিকতার মধ্যে স্মরণাতীত কাল থেকে এক সাংস্কৃতিক ঐক্য বন্ধনে চলে আসছে। এই সাংস্কৃতিক ঐক্য রাজনৈতিক ও জাতিগত বিভাজনকে অস্বীকার করেছে। এবং যাই হোক না কেন, গত দেড়শত বছর ধরে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আইনগত এবং প্রশাসনিক প্রভৃতি সকল প্রতিষ্ঠানগুলি একটি অনন্য সমধর্মী কর্মোচ্ছ্বাস হিসাবে কাজ করে আসছে। পাকিস্তান সম্পর্কিত যে কোনও আলোচনায় এই সত্যটিকে দৃষ্টির অগোচরে রাখা চলবে না। যেমন, যেখান থেকে যাত্রা শুরু, যদি না সেটি নিয়ন্ত্রণ করা হয়, বিষয়টি হল ভারতের মৌলিক ঐক্য সম্বন্ধে। এই সত্যটি জানা প্রয়োজন যে, বিভাজনের প্রকৃতপক্ষে দুটি যৌক্তিকতা আছে, যা বিশেষ করে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করতে হবে। একটি ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক বিষয়টি হল পৃথকীকরণের পূর্বাহ্নে বিদ্যমান থাকা একটি অবস্থা, যাতে বিভাজন কেবলমাত্র অংশগুলির বিলুপ্তি সাধন ছাড়া আর কিছু না, এবং যেগুলি এক সময়ে পৃথক ছিল ও পরবর্তীকালে একত্রিত হয়েছিল। এই বিষয়টি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর, যেখানে প্রারম্ভিক ঘটনাটি সবক্ষেত্রে ছিল ঐক্যের অবস্থা। পরিণামে ঐরূপ ক্ষেত্রে বিভাজন হল একটি অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন করণ, যা পৃথক পৃথক অংশে ছিল একটি সমগ্র রূপ। যেক্ষেত্রে প্রারম্ভিক ঘটনাটি আঞ্চলিক ঐক্য হিসাবে ছিল না, অর্থাৎ যেখানে ঐক্যের পূর্ববর্তীকালে অনৈক্য ছিল, সেখানে বিভাজন—যা কেবল মূল অবস্থায় প্রত্যাবর্তন মাত্র—সাময়িক আঘাত হানতে নাও পারে। কিন্তু ভারতে প্রারম্ভিক কেন্দ্রবিন্দুটি হল ঐক্য। যেহেতু কিছু মুসলমান অসন্তুষ্ট, শুধুমাত্র সেই কারণে এর ঐক্যকে চূর্ণ করার কী প্রয়োজন? যখন এই এককটি অতি প্রাচীনকাল থেকে একটি সমগ্ররূপ হিসাবে চলে আসছে, তখন তাকে বিদীর্ণ করার প্রয়োজনটা কী?

৩

হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রদায়গতভাবে বিরোধিতা থাকার জন্যই কি পাকিস্তান হওয়া আবশ্যিক? সাম্প্রদায়িক বিরোধিতা যে আছে একথা কেউ-ই অস্বীকার

করতে পারেন না। এখন প্রশ্নটি হল এই যে, এই বিরুদ্ধাচরণ কি এমনই যে, এক-ই দেশে এবং একই সংবিধানের অধীনে মিলেমিশে থাকার ইচ্ছাটাই নেই? একথা সত্য যে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত মিলেমিশে থাকার ইচ্ছাটি ছিল না। ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫, এর শর্তাবলী সূত্রবদ্ধ করার সময় হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই এই মতটি মেনে নিয়েছিল যে, তারা এক-ই দেশে এবং এক-ই সংবিধানের অধীনে অবশ্যই একসাথে বসবাস করবে এবং ওই আইনটি অনুমোদিত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিল। ভারতে ১৯২০ এবং ১৯৩৫ সালে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের অবস্থা কেমন ছিল? পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেই অনুসারে ১৯২০ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস ছিল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের এক দীর্ঘ কাহিনী, যাতে জীবন ও সম্পত্তির হানির সীমা এক লজ্জাজনক স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫, অনুমোদিত হবার পূর্ববর্তী এই বিভৎসার সময়কালে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি এত তীব্র আর কখনো হয়নি, এবং বিরুদ্ধাচারণের এই দীর্ঘ ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও তা এক-ই দেশে ও এক-ই সংবিধানের অধীনে বসবাস করার ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমানদের রাজি হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয় নি। তাহলে এখন কেন এত সাম্প্রদায়িক বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছে?

ভারত-ই কি একমাত্র দেশ যেখানে সাম্প্রদায়িক বিরুদ্ধাচরণ আছে? কানাডার ব্যাপারটা কী? কানাডায় ইংরাজ ও ফরাসিদের সম্পর্ক সম্বন্ধে মিঃ আলেকজান্ডার ব্রাডি যা বলেছেন সেটা অনুধাবন করুন।

'চারটি মূল প্রদেশের মধ্যে তিনটিতে নোভা স্কোটিয়া, নিউ ব্রনসউইক এবং ওন্টারিওতে অ্যাংলো স্যাকসন বংশ ও ঐতিহ্যের সমপরিমাণ অধিবাসী ছিল। মূলত মার্কিন বিপ্লবের উপজাত এই উপনিবেশগুলি স্থাপিত হয়েছিল সংযুক্ত সাম্রাজ্যের ৫০,০০০ রাজ ভক্তদের দ্বারা, যারা নির্যাতিত হয়ে উত্তরাঞ্চলে দেশান্তরি হয়েছিল এবং বিজনপ্রান্তে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করে। মার্কিন বিপ্লবের আগে নোভা স্কোটিয়াতে পর্যাপ্ত সংখ্যক স্কচ ও মার্কিন ঔপনিবেশিকরা এসেছিল এবং বিপ্লবের পর রাজভক্তদের বসতির প্রায় সব কটি উপনিবেশে জনসংখ্যার শক্তি বৃদ্ধি হয় গ্রেট ব্রিটেন এবং আয়ারল্যান্ড থেকে আগত অধিবাসীদের দ্বারা।

* * * * *

'কুইবেক প্রদেশের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। জাতি, ভাষা এবং ধর্মের প্রতিবন্ধকতার দ্বারা ব্রিটিশ সম্প্রদায়গুলি থেকে বিচ্ছিন্ন ফরাসি-কানাডা ১৮৬৭ সালে

ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি একক। এর জীবন যাত্রা প্রবাহিত ভিন্ন আদর্শে। ক্যাথলিক ধর্মের দ্বারা প্রণোদিত মধ্যযুগীয় আতিশয্য নিয়ে এরা নীতিনিষ্ঠ পিউরিটানদের মতো বাক্যের সঙ্গে প্রধানত উদারপন্থী ক্যালভিনীয় প্রটেস্টান্ট যাদের পারলৌকিকতার সংমিশ্রণকে নামমাত্র সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখাতো। এই দুই জাতির ধর্মবিশ্বাস অবশ্যই ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর। সব সময়ে ধর্মের ক্ষেত্রে না হলেও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইংরেজদের প্রটেস্টান্টবাদের ঝোঁক ছিল গণতন্ত্র, বাস্তববাদ এবং আধুনিকতাবাদের দিকে। ফরাসিদের ক্যাথলিকবাদের প্রবণতা ছিল পিতৃত্ববাদ, আদর্শবাদের দিকে এবং ছিল অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

* * * * *

'১৮৬৭ সালে ফরাসি-কানাডা যা ছিল এখনও প্রকৃত অর্থে তাই থেকে গেছে। এবং এখনও ধর্মবিশ্বাস, দেশান্তর এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে সযত্নে লালিত করে, ইংরেজদের প্রদেশগুলিতে যার আধিপত্য খুব-ই কম। ওদের আছে বিশিষ্ট চিন্তাধারা এবং গভীর আগ্রহ এবং আছে নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিবাহ ও বিবাদ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে ফরাসি-কানাডার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কেবলমাত্র কানাডার বাকি অংশই নয়, অ্যাংলো স্যাক্সন উত্তর আমেরিকার বাকি অংশের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধ ছিল।

* * * * *

'এই দুই জাতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের আদান-প্রদানের অপ্রতুলতা ব্যাঘাত হয়েছে কানাডার বৃহত্তম শহর মন্ট্রিয়ালে। অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় ৬৩ শতাংশ ফরাসি এবং ২৪ শতাংশ ব্রিটিশ। যদি কোথাও হয়ে থাকে তবে এখানে মেলামেশার প্রচুর সুযোগ আছে। কিন্তু কার্যত যেখানে ব্যবসা এবং রাজনীতি বাধ্য করে তাদের একত্রিত হতে সেখানে ছাড়া অন্যত্র তারা পৃথকভাবে নিজেদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে থাকে। তাদের নিজস্ব আবাসিক বিভাগ আছে এবং তাদের নিজস্ব কেনাকাটার কেন্দ্র আছে, এবং জাতিগত সংরক্ষণের জন্য উভয়ের মধ্যে যদি কেউ বেশি উল্লেখযোগ্য হয়, তবে তারা হল ইংরেজ।

* * * * *

'মনট্রিয়ালের ইংরেজি ভাষাভাষী অধিবাসীরা মোটামুটিভাবে তাদের ফরাসি ভাষাভাষী সহনাগরিকদের জানায় তাদের ভাষা শেখার, তাদের ঐতিহ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলিকে

অনুধাবন করার, তাদের গুণাবলী ও তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে বিচক্ষণতার দৃষ্টি দিয়ে সহানুভূতিশীল মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করার কোনও চেষ্টা করে নি। এই দুই জাতের পৃথকীকরণকে ভাষার বাধা উৎসাহিত করেছে। ১৯২১ সালের আদমসশুমরি যে তথ্য উদঘাটিত করেছে তার অন্তর্নিহিত গুরুত্ব প্রচুর; যেমন, ফরাসি বংশজ কানাডিয়াবাসীদের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ ইংরেজি বলতে পারত না এবং ব্রিটিশ বংশজাতদের ৯৫ শতাংশ ফরাসি ভাষা বলতে পারত না। এমন কী, মনট্রিয়াল শহরেও ৭০ শতাংশ ব্রিটিশ নাগরিক ফরাসি বলতে এবং ৩৪ শতাংশ ফরাসি নাগরিক ইংরেজি বলতে পারত না। একটি সাধারণ ভাষার অনুপস্থিতি এই দুই জাতির মধ্যে ব্যবধান বজায় রেখেছিল এবং মিলেমিশে যাওয়ার ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল।

'সংঘের তাৎপর্য এই যে, তা এমন এক সরকারি মাধ্যমের উপস্থাপনা করেছিল যা নিজেদের স্বতন্ত্র জাতীয় জীবন সুরক্ষিত করে রেখে ফরাসিদের সমর্থ করেছিল ব্রিটিশদের সুখী অংশীদার হয়ে উঠতে এবং কানাডায় অতিজাতীয়তা লাভ করতে, তাদের নিজস্ব গোষ্ঠীর সীমা অতিক্রম করে সামগ্রিকভাবে অধিরাজ্যের প্রতি বিশ্বস্ততাকে বরণ করে।

*   *   *   *   *

'যখন যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি কানাডাতে ব্যাপকতর জাতীয়তাবাদের পথ খুলে দিয়েছিল সাফল্যের সঙ্গে, তখন তা যে সহযোগিতার প্রবর্তন করেছিল তা মাঝে মাঝে ফরাসি ও ব্রিটিশদের মধ্যে প্রচণ্ড মতদ্বৈধতার দ্বন্দ্বের কঠোর চাপের মধ্যে পড়েছিল। অতি-জাতীয়তাবাদ অবশ্যই ঘনঘন অলীক বস্তুতে পরিণত হয়েছিল।'

দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারটাই বা কী? যাঁরা বুয়র (Boors) এবং ব্রিটিশদের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি জানেন না তাঁরা ভাবতে পারেন এ বিষয়ে মিঃ ঈ.এইচ.ব্রুক্স কী বলেছেন।—

'দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ জাতি দুটির মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয়তাবাদ উভয় ক্ষেত্রে কতটা বর্তমান? একথা অবশ্য ঠিক যে, একটি অত্যন্ত বাস্তব সম্মত এবং প্রগাঢ় আফ্রিকান্দের (দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ইউরোপীয় বিশেষ করে ওলন্দাজ) জাতীয়তাবাদ আছে; কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, এটা হল শ্বেতাঙ্গ জাতিদের অন্যতম একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ ভাবালুতা এবং যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে আফ্রিকাবাসীদের ভাষার প্রতি ভালবাসার দ্বারা বিশেষিত, যে ভাষাটি হল্যান্ড

থেকে আগত গোড়ার দিকের উপনিবেশবাসীদের মুখের ভাষা, যা কিছুটা বাধমানে রূপান্তরিত হয়েছিল হিউগানট (ফরাসি প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের লোক) (Huguenot) এবং জার্মান প্রভাবে এবং বহুলপরিমাণে কালপ্রবাহে। আফ্রিকান্দের জাতীয়তাবাদের প্রবণতা আছে স্বাতন্ত্র বজায় রাখার এবং সেই ব্যক্তিটির স্থান সেখানে এত নগণ্য যে, সর্ব প্রকারে দক্ষিণ আফ্রিকার অনুগত সন্তান হওয়া সত্ত্বেও, সামগ্রিকভাবে অথবা প্রধানত ইংরেজি ভাষাভাষী।

*   *   *   *   *

বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকা জাতি আছে কি?

'দক্ষিণ আফ্রিকানদের জীবনযাত্রায় এমন কিছু বিষয় আছে, যেগুলি ইতিবাচক উত্তরের পরিপন্থী।'

*   *   *   *   *

'ইংরেজি ভাষাভাষী দক্ষিণ আফ্রিকানদের মধ্যে এমন বহু প্রবণতা দেখা যায় যেগুলি জাতীয় ঐক্যের বিষয়টিকে বাধা দেবার পক্ষে অনুকূল। জাতিটির সকল মহৎগুণাবলী থাকা সত্ত্বেও, তাদের একটি মৌলিক ত্রুটি আছে—কল্পনার অভাব, নিজেকে অপরের স্থলাভিষিক্ত করতে পারার অসুবিধা। অন্য কোথায়ও এটা ততো সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে না, যতটা ওঠে ভাষার প্রশ্নে। কিছুকাল আগে পর্যন্ত তুলনামূলক ভাবে মুষ্টিমেয় ইংরেজি ভাষাভাষী দক্ষিণ আফ্রিকানরা আফ্রিকানদের ভাষা অধ্যয়ন করেছে বাণিজ্য সম্পর্কিত কাজের জন্য অথবা (জন-পালন কৃত্যকের ক্ষেত্রে যেমন হয়) কম বেশি বাধ্যতামূলক ভাবে; এবং আরও অল্প সংখ্যক ব্যক্তি একে কথোপকথনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে। অনেকে খোলাখুলিভাবে এর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেছে, যে ঘৃণা তাদের ভাষাজ্ঞানের পরিমাণের প্রত্যানুপাত—এবং গরিষ্ঠসংখ্যকেরা মেনে নিয়েছে নিছক পরমত-সহিষ্ণুতার জন্য, ও মেজাজ অনুসারে হয় অত্যন্ত কুপিত হয়েছে, নয়, মজা পেয়েছে।'

এই এক-ই বিষয়ে অপর একজন সাক্ষীর কথা শোনা যাক। তিনি হলেন মিঃ ম্যানফ্রেড নাথান।* দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত বুয়র এবং ব্রিটিশদের মধ্যেকার সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি কী বলেন।—

'তারাও, প্রধানত উভয়পক্ষই প্রটেস্টান্ট ধর্মাবলম্বী—যদিও বর্তমানকালে এর খুব বেশি একটা গুরুত্ব নেই, যখন বিশেষ করে ধর্মের পার্থক্যগুলির তেমন কোনও

* দক্ষিণ আফ্রিকার কমনওয়েলথ্, পৃঃ ৩৬৫।

গুরুত্ব না থাকায়। তারা অবাধে পরস্পরের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন করে।'

* * * * *

'তৎসত্ত্বেও, সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে এ-কথা বলা যাবে না যে অদ্যাবধি শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের এই দুই বিশাল বিভাগের মধ্যে সম্পূর্ণ খোলামেলা সামাজিক আদান-প্রদান হচ্ছে। এমন আভাস দেওয়া হয়েছে যে, এর আংশিক কারণ হল এই যে বড় বড় পৌর কেন্দ্রগুলির অধিবাসী প্রধানত ইংরেজরা এবং শহরবাসীরা দেশের মানুষজন এবং তাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর কথা খুব অল্পই জানে। কিন্তু এমন কি প্রাদেশিক শহরগুলিতেও সাধারণভাবে অনেক বেশি সৌহার্দ্য আছে এবং বুয়ররা অভ্যাগতদের প্রতি যথেষ্ট আতিথেয়তা দেখায়, তবুও প্রয়োজনীয় ব্যবসা অথবা পেশাগত সম্পর্ক এবং সেই ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান, দাতব্য অথবা সরকারি, যাতে সহযোগিতার প্রয়োজন আছে, সেখানে এই দুই বিভাগের মধ্যে ততটা সামাজিক আদান-প্রদান নেই।'

স্পষ্টতই ভারত-ই একমাত্র দেশ নয় যেখানে সাম্প্রদায়িক বিরুদ্ধাচরণ আছে। যদি কানাডায় ইংরেজদের সঙ্গে রাজনৈতিক ঐক্য রেখে ফরাসিদের একত্র বসবাসে সাম্প্রদায়িক বিরুদ্ধাচারণ বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় ওলন্দাজদের সঙ্গে রাজনৈতিক বিরুদ্ধাচারণ বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, যদি সুইজারল্যান্ডে জর্মনদের সঙ্গে রাজনৈতিক ঐক্য রেখে ফরাসি ও ইতালীয়দের একত্র বসবাস বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, তবে কেন ভারতে এক-ই সংবিধানের অধীনে হিন্দু ও মুসলমানরা একত্রে বসবাস করতে সম্মত হওয়াটা অসম্ভব হবে?

৪

কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আস্থা হারিয়েছে বলেই কি পাকিস্তান হওয়াটা আবশ্যিক? এই আস্থা হারানোর কারণ হিসাবে মুসলমানরা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করে যে দু বছর তিন মাস কংগ্রেস ক্ষমতাসীন ছিল সেই সময়ে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীগুলি কর্তৃক গোপনে পরোক্ষ সম্মতি দান এবং হিন্দুদের দ্বারা নিষ্ঠুর অত্যাচার ও নিপীড়ন করার কয়েকটি ঘটনার। দুর্ভাগ্যবশত মিঃ জিন্নাহ্ এই সব অভিযোগ সম্বন্ধে 'রয়াল কমিশন' দিয়ে তদন্ত করার দাবি নিয়ে জেদাজেদি করেন নি। যদি তিনি তা করতেন তবে ওইসব অভিযোগের সত্যতার বিষয়টি আমরা জানতে পারতাম। 'মুসলিম লীগ' কমিটি

কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদনের* দৃষ্টান্তগুলি পড়লে পাঠকের মনে এই ধারণার-ই উদয় হবে যে, ওই সব অভিযোগে কিছুটা সত্যতা থাকলেও, তবে বেশির ভাগ অংশই নিছক অতিশয়োক্তি। সংশ্লিষ্ট কংগ্রেস মন্ত্রীপরিষদগুলি এই অভিযোগগুলি খণ্ডন করে বিবৃতি পেশ করেছে। সম্ভবত কংগ্রেস ক্ষমতাশীল থাকার দুই বছর তিন মাসের সময়কালে কূটনীতিকতার পরিচয় দিতে পারেনি, সংখ্যালঘুদের মধ্যে আস্থা জাগাতে পারেনি, কেবল তাই নয় তাদের দমিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এটাই কি ভারত বিভাজনের কারণ হতে পারে? এটা আশা করা কি সম্ভব নয় যে, যে-সব ভোটদাতারা গতবার কংগ্রেসকে সমর্থন করেছিল তারা আরও বেশি বিচক্ষণ হয়ে উঠবে এবং কংগ্রেসকে সমর্থন করবে না? অথবা এটাও যে না হতে পারে তা নয় যে, যদি কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় আসে তবে তারা তাদের কৃত ভুলগুলি থেকে উপকৃত হবে, তাদের ক্ষতিকারক নীতির পুনঃপরীক্ষা করতে এবং তাদের অতীত আচরণের দ্বারা সৃষ্ট ভীতির উপশম ঘটাবে?

৫

মুসলমানরা একটি জাতি, সেই কারণেই কি পাকিস্তান হওয়া আবশ্যিক? দুঃখের কথা এই যে, ঠিক সেই সময়ে মিঃ জিন্নাহ্‌র হওয়া উচিত ছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদের উপাসক ও সমর্থক, যখন কি সারা পৃথিবী জাতীয়তাবাদের অপকারিতার বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং এক ধরনের আন্তর্জাতিক সংগঠনের আশ্রয়ে যেতে চাইছে। মিঃ জিন্নাহ্‌র মুসলিম জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর নবলব্ধ মুসলিম জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর নবলব্ধ বিশ্বাসের দ্বারা এতটাই আবিষ্ট হয়েছিলেন যে সমাজের একাংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং যে সমাজের একাংশ কেবল শিথিল হয়ে গেছে তাদের মধ্যেকার পার্থক্যটি তিনি দেখার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, যা কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ উপেক্ষা করতে পারে না। যখন কোনও সমাজ বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে—এবং দ্বি-জাতি তত্ত্ব সমাজ ও দেশের এক ইতিবাচক বিভাজন—তখন এই সত্য যা প্রমানিত হয় যে, কার্লাইল যেটাকে "গঠনমূলক সূক্ষসূত্র" বলেছেন, তার অস্তিত্ব থাকে

* এই বিষয়ে কংগ্রেস (প্রভাবিত) প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের অভিযোগগুলি সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য অখিল ভারত মুসলিম লীগ কর্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনটি দ্রষ্টব্য, যেটি 'পীরপুর প্রতিবেদন' নামে সর্বজন বিদিত। বিহারে মুসলমানদের কিছু অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য বিহার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রতিবেদন এবং ১৩-৩-৩৯ তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকাতে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে প্রত্যাশিত অভিযোগের কিছু কিছু সম্পর্কে উত্তর দিতে গিয়ে বিহার সরকারের তথ্য ও সংবাদ আধিকারিক কর্তৃক জারি করা সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতিটিও দ্রষ্টব্য।

না—অর্থাৎ অংশগুলিকে একসঙ্গে বেঁধে রাখার কাজটি করে যে অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ শক্তিগুলি, সেগুলি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে দ্বিখণ্ডীকরণের ব্যাপারে দুঃখ করা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না; এটাকে বাধা দেওয়া যায় না। যেখানে, অবশ্য এই ধরনের গঠনমূলক সূক্ষ্মসূত্র বর্তমান, সেখানে সেগুলিকে উপেক্ষা করা, এবং সমাজ ও দেশের বিখণ্ডীকরণ যা মুসলমানরা ইচ্ছাকৃতভাবে জোর করে করতে চাইছে বলে মনে হয় সেটা অপরাধ। মুসলমানরা যদি একটা পৃথক জাতি হতে চায়, তবে তারা তা হতে চায় বলেই। মুসলমানদের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে, যদি তারা চায় তবে তারা সেগুলিকে একত্রিত করে একটা জাতিতে পরিণত করতে পারে। কিন্তু হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে এমন অনেক কিছু যুগপৎ বর্তমান যা, যদি সেগুলিকে বিকশিত করা যায়, তবে তাদের একটি জাতিতে গঠিত করে তুলতে পারা যায় না? একথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না যে এমন বহু রীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং প্রথা আছে যা উভয়ের মধ্যে যুগপৎ বর্তমান। এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে ধর্মভিত্তিক এমন অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠান, প্রথা এবং প্রচলিতধারা আছে যা হিন্দু ও মুসলমানকে বিভক্ত করে। প্রশ্নটি এই যে, এগুলির মধ্যে কোনটির উপরে জোর দেওয়া উচিত। যেগুলি যুগপৎ উভয়ের মধ্যে বর্তমান, জোর যদি সেগুলির উপর দেওয়া হয় তবে ভারতে দুটি জাতির প্রয়োজন হবে না। যদি পার্থক্যের বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হয় তবে নিঃসন্দেহে দুটি জাতির উদ্ভব হবে। যে ধারণার বশবর্তী ছিলেন মিঃ জিন্নাহ্ সেটি হল এই যে, ভারতীয়রা কেবলমাত্র এক অধিবাসী মাত্র, এবং তারা কখনই একটি জাতি হয়ে উঠতে পারবে না। এটি ব্রিটিশ লেখকদের বক্তব্য অনুসরণ করে যারা ঠিক-ই করে নিয়ে ছিলেন যে তারা ভারতীয়দের ভারতের অধিবাসী হিসাবেই উল্লেখ করবেন এবং ভারতীয় জাতির প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবেন। ধরে নেওয়া যাক যে ভারতীয়রা জাতি নয়, তারা কেবলমাত্র অধিবাসীবৃন্দ। তাতে হয়েছেটা কী? ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে যে এক বিশাল সম্মিলিত ব্যক্তিবর্গ জাতি হিসাবে উদ্ভূত হবার আগে, নিছক অধিবাসীবৃন্দই ছিল। ভারতীয়রা যদি কেবল অধিবাসী বৃন্দের অতিরিক্ত কিছু না হয় তাতে লজ্জিত হবার কিছু নেই। এবং হতাশ হবারও কোনও কারণ নেই যে, ভারতের অধিবাসীরা যদি তারা চায় একটি জাতি হয়ে উঠবে না। কারণ ডিজরেলির ভাষায়, জাতি শিল্পের অবদান, কালের কৃত্য। যদি হিন্দু এবং মুসলমানরা সম্মত হয়, সেই বিষয়গুলির ওপর ছেড়ে দিতে, যা তাদের যুক্ত করে রেখেছে এবং যেগুলি তাদের পৃথক করে রেখেছে সেগুলিকে

যদি ভুলে যায়, তাতে এমন কোনও কারণ নেই যে তারা কালক্রমে একটি জাতিতে পরিণত হয়ে উঠবে না। তবে হয়তো তাদের জাতীয়তাবাদ ফরাসি অথবা জর্মনদের মতো অতো দৃঢ়বদ্ধ হবে না। কিন্তু তারা সহজেই সাধারণ বিষয়গুলি সম্বন্ধে একটি সাধারণ মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে, যা জাতীয়তাবোধ যেটা সৃষ্টি করতে পারে তার যোগফল এবং যার জন্য একে এত মূল্যবান মনে করা হয়। যে শক্তি গুলি তাদের ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছে সেগুলিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা এবং প্রভেদগুলির ওপর আরোপ করাটা কি 'মুসলিম লীগে'র পক্ষে সঙ্গত হচ্ছে? একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, যদি দুটি জাতির বাস্তব রূপ পায় তবে তার কারণ এই নয় যে, সেটা হওয়া ছিল পূর্ব নির্ধারিত ব্যাপার। তা হবে একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিসন্ধির পরিণাম।

আমি বলেছি যে, ভারতের মুসলমানেরা আইনত অথবা বাস্তবিকভাবে এখনও জাতি হয়ে ওঠেনি এবং শুধু এই টুকুই বলা যায় যে, তাদের মধ্যে সেইসব প্রয়োজনীয় উপাদান আছে যা তাদের জাতি করে তুলতে পারে। আবার যদি ধরেই নেওয়া হয় যে ভারতের মুসলমানরা একটি জাতি, তবে কী ভারত-ই কি একমাত্র দেশ যেখানে দুটি জাতি হতে চলেছে? সবাই জানে যে কানাডায় দুটি জাতি আছে, ইংরেজ ও ফরাসি। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও কি ইংরেজ ও ওলন্দাজ দুটি জাতি নেই? আর সুইজারল্যান্ডের ব্যাপারটাই বা কি? কে জানে না যে সুইজারল্যান্ডে তিনটি জাতি বাস করে, জর্মন, ফরাসি ও ইতালিয়ান? পৃথক জাতি হিসাবে ফরাসিরা কি কানাডার বিভাজন দাবি করেছে? যেহেতু তারা বুয়রদের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক এক জাতি তাই কি ইংরেজরা দক্ষিণ আফ্রিকার বিভাজন দাবি করে? কেউ কি একথা কখনো শুনেছে যে, যেহেতু ফরাসি, জর্মন এবং ইতালীয়রা সম্পূর্ণ পৃথক জাতি তাই তারা সুইজারল্যান্ডের বিখণ্ডীকরণের কথা কখনো উত্থাপন করেছে? জর্মন, ফরাসি ও ইতালীয়রা কি কখনো এটা মনে করেছে যে, যদি তারা একই দেশে এবং একই সংবিধানের অধীনে থাকে তবে তাদের নিজস্ব বিশিষ্ট সংস্কৃতিকে হারাবে? পক্ষান্তরে, এই সব বিশিষ্ট পৃথক জাতিগুলি তাদের জাতীয়তা ও তাদের নিজস্ব বিশিষ্ট সংস্কৃতিকে হারাবার ব্যাপারে ভয়শূন্য হয়ে একটি দেশে একসঙ্গে বসবাস করে পরিতৃপ্ত। ইংরেজদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করে কানাডাস্থিত ফরাসিরা যে আর ফরাসি থাকে নি তা নয়, কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়রদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করার ফলে ইংরেজরাও তাদের ইংরাজত্ব হারিয়েছে। একটি সর্বসাধারণের দেশ এবং একটি সর্বসাধারণের সংবিধানের প্রতি তাদের যুগপৎ আনুগত্য থাকা

সত্ত্বেও জর্মন, ফরাসি ও ইতালীয়রা পৃথক জাতি হয়েই আছে। সুইজারল্যান্ডের ঘটনাটিবিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। দেশটি বহু দেশের দ্বারা পরিবেষ্টিত, যার জাতিসত্তাগুলি সুইজারল্যান্ডের জাতিসত্তাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ধর্মীয় ও জাতিগত নিকট সম্পর্ক আছে। এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্ত্বেও সুইজারল্যান্ডের জাতিসত্তাগুলি প্রথম সুইজারল্যান্ডীয়, এবং পরে জার্মান, ইতালীয় ও ফরাসি।

কানাডায় ফরাসিদের, দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজদের এবং সুইজারল্যান্ডে ফরাসি ও ইতালীয়দের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে প্রশ্নটির উদয় হয়, সেটি হল এই যে, তবে কেন ভারতে অন্য রকম হবে? ধরে নেওয়া যাক, হিন্দু ও মুসলমানরা দুটি জাতিতে বিভক্ত হয়ে গেল, তবুও কেন তারা একটি দেশে এবং একটি সংবিধানের অধীনে বসবাস করতে পারবে না? কেন দ্বি-জাতি তত্ত্বের উদ্ভব বিভাজনকে অপরিহার্য করে তুলবে? হিন্দুদের সঙ্গে বসবাস করার ফলে কেন তারা তাদের জাতীয়তা এবং জাতীয় সংস্কৃতি হারাবার ভয়ে ভীত? মুসলমানরা যদি পৃথকীকরণের জন্য জেদ ধরে, তবে ছিদ্রান্বেষীরা সঙ্গত কারণেই এই সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারে যে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাধারণ মিল এত বেশি আছে যে মুসলমান নেতৃবৃন্দ এমন আশঙ্কা করছেন যে, বিভাজন যদি না হয় তবে যেটুকু স্বতন্ত্র ইসলামীয় সংস্কৃতি তাদের বেঁচে আছে তা হিন্দুদের সঙ্গে অবিরাম সামাজিক সংস্পর্শের ফলে শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যাবে যার ফলে অবশেষে দুটি জাতির পরিবর্তে ভারতে গড়ে উঠবে একটি মাত্র জাতি। মুসলিম জাতীয়তাবাদ যদি এতই দুর্বল, তাহলে তো বিভাজনের উদ্দেশ্যটি হবে কৃত্রিম এবং পাকিস্তানের দাবির বিষয়টি তার নিজস্ব বুনিয়াদটি হারিয়ে ফেলবে।

৬

পাকিস্তান হওয়াটা যে সত্যিই আবশ্যিক কারণ তা না হলে স্বরাজ হয়ে উঠবে হিন্দু রাজ? এই প্রচারের দ্বারা মুসলমানরা এত সহজেই প্রভাবিত হয় যে, এর অন্তর্নিহিত ভ্রমাত্মক ধারণাটির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা প্রয়োজন।

প্রথম ক্ষেত্রে, হিন্দুরাজ সম্পর্কে মুসলমানদের আপত্তি কি বিবেকবুদ্ধি সঞ্জাত আপত্তি অথবা রাজনৈতিক আপত্তি? এটা যদি বিবেকবুদ্ধি সঞ্জাত আপত্তি হয়, তবে শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে যে এটা একটা অদ্ভুত ধরনের বিবেকবুদ্ধি। ভারতে প্রকৃত পক্ষে লক্ষ লক্ষ মুসলমান আছে যারা হিন্দু রাজকুমারদের লাগাম-হীন ও অনিয়ন্ত্রিত হিন্দু রাজের অধীনে বসবাস করছে এবং এ ব্যাপারে মুসলমান অথবা

মুসলীম লীগের পক্ষ থেকে কোনও আপত্তি তোলা হয় নি। একদা মুসলমানরা বিবেক-বুদ্ধি সঞ্জাত আপত্তি তুলেছিল ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে। বর্তমানে তার বিরুদ্ধে মুসলমানদের কোনও আপত্তি তো নেইই। বরং তারা এর সবচেয়ে বড় সমর্থক। ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে বা হিন্দুরাজকুমারের অবিমিশ্র হিন্দুরাজের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি থাকা উচিত নয়, অথচ ব্রিটিশ ভারতে স্বরাজের ব্যাপারে আপত্তি থাকা উচিত এই কারণে যে এটা হিন্দুরাজ এবং সেটি যেন প্রতিবন্ধকতা ও ভারসাম্যের শর্তাধীন নয় এই দৃষ্টিভঙ্গীর যুক্তিটি অনুধাবন করা কষ্টকর।

হিন্দুরাজ সম্বন্ধে রাজনৈতিক আপত্তিগুলি অনেকগুলি কারণের ওপর নির্ভর করছে। প্রথম কারণটি এই যে, হিন্দু সমাজ গণতান্ত্রিক সমাজ নয়। সত্যিই তা নয়। এ প্রশ্ন করা সঙ্গত নাও হতে পারে যে, ধর্মান্তরিতকরণ ব্যতিরেকে হিন্দু সমাজের সংস্কার সাধনার জন্য বহুবিধ আন্দোলনে মুসলমানরা কোনও অংশ গ্রহণ করেছে কিনা। কিন্তু এ প্রশ্ন করা সঙ্গত হবে যে, হিন্দু সমাজের অ-গণতান্ত্রিক চরিত্রের ফলে উদ্ভূত পরিণাম থেকে যে-সব অভিষ্ট সাধন হয়েছে বলে মেনে নেওয়া হয়, তাতে একমাত্র মুসলমানরাই কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হিন্দু সমাজের অ-গণতান্ত্রিক চরিত্রের জন্য নিকৃষ্টতম পরিণামগুলির জন্য লক্ষ লক্ষ শূদ্র, অব্রাহ্মণ অথবা লক্ষ লক্ষ অস্পৃশ্যরা কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি? হিন্দু জনসংখ্যার এমন কি দশ শতাংশও নয় এমন উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নিয়ে গঠিত হিন্দু শাসক শ্রেণী ছাড়া আর কারা শিক্ষার, সরকারি চাকরির এবং রাজনৈতিক সংস্কার সাধন থেকে উপকৃত হয়েছে? হিন্দু রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হিন্দু শাসক শ্রেণী কি শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের অধিকার ও স্বার্থ সুরক্ষিত করার চেয়ে মুসলমানদের অধিকারস্বার্থ সুরক্ষিত করতে বেশি আগ্রহ দেখায়নি? অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দানের বিরোধিতা করতে বদ্ধপরিকর মিঃ গান্ধী কি মুসলমানদের অনুকূলে ফাঁকা চেকে সই করতে প্রস্তুত ছিলেন না? এ কথা অবশ্য ঠিক যে, হিন্দু শাসক শ্রেণীরা শূদ্র এবং অস্পৃশ্যদের সঙ্গে ক্ষমতা বন্টন করার চেয়ে মুসলমানদের সঙ্গে ক্ষমতা বন্টনে অনেক বেশি আগ্রহী ছিল। নিঃসন্দেহে হিন্দু সমাজের অ-গণতান্ত্রিক চরিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার ন্যূনতম কারণ ছিল মুসলমানদের পক্ষে।

হিন্দুরাজ সম্বন্ধে মুসলমানদের আপত্তির ব্যাপারটি অপর যে বিষয়ের উপর নির্ভর করত সেটা হল এই যে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এবং মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়। এটা সত্য। কিন্তু ভারতই কি একমাত্র দেশ যেখানে এই ধরনের পরিস্থিতির অস্তিত্ব আছে? কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সুইজারল্যান্ডের অবস্থার সঙ্গে ভারতের

অবস্থার তুলনা করা যাক। প্রথমে জনসংখ্যার শ্রেণী বিভাজনকে নেওয়া যাক। কানাডাতে মোট জনসংখ্যা ১০,৩৭৬,৭৮৬-এর মধ্যে মাত্র ২,৯২৭, ৯৯০ জন ছিল ফরাসি। দক্ষিণ আফ্রিকায় ওলন্দাজদের সংখ্যা ছিল ১,১২০,৯৯০ জন এবং ইংরেজ ছিল মাত্র ৭,৮৩,০৭১ জন। সুইজারল্যান্ডে মোট জনসংখ্যা ৪,০৬৬,৪০০ জন এর মধ্যে জর্মন ছিল ২,৯২৪,৩১৩ জন, ফরাসি ৮,৩১,০৯৭ জন এবং ইতালীয় ২,৪২,০৩৪ জন।

এ থেকে দেখা যায় যে ক্ষুদ্রতর জাতিগুলির কোনও আশঙ্কা নেই প্রধান জাতির রাজের অধীন হয়ে থাকার। এই ধরনের মনোভাব তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত বলে মনে হয়। কিন্তু কেন এমন হয়? এই কারনেই কি যে প্রধান জাতির পক্ষ থেকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সেই সব কেন্দ্রগুলিতে, যথা বিধানমণ্ডলে এবং নির্বাহিকে, প্রাধান্য স্থাপন করার কোনও সম্ভাবনা নেই? ব্যাপারটি কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। দুর্ভাগ্যবশত সুইজারল্যান্ড, কানাডা এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় বিভিন্ন প্রধান ও ক্ষুদ্র জাতিগুলির প্রতিনিধিত্বের প্রকৃত পরিমাণ দেখানোর মতো কোনও সংখ্যাতত্ত্ব উপলব্ধ নয়। তার কারণ এই যে সেখানে ভারতের মতো সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। অবাধ প্রতিযোগিতায় প্রতিটি জাতি যে যতসংখ্যক বেশি পারে আসনে জয়লাভ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু বিধানমণ্ডলের মোট আসনের সঙ্গে এর জনসংখ্যার অনুপাতের ভিত্তিতে প্রতিটি জাতি সম্ভাব্য কতকগুলি আসন জিততে পারে তা হিসাব করে বার করা বেশ সহজ। এই ভিত্তিতে অগ্রসর হলে কি দেখতে পাব আমরা? সুইজারল্যান্ডে নিম্ন কক্ষে মোট প্রতিনিধির সংখ্যা ১৮৭ জন। এর মধ্যে জার্মানদের ১৩৮, ফরাসিদের ৪২ এবং ইতালীয়দের মাত্র ৭টি আসনে জয়লাভ করার সম্ভাবনা আছে। *দক্ষিণ আফ্রিকার মোট ১৫৩ টি আসনের মধ্যে ইংরেজদের ৬২টি, এবং ওলন্দাজদের ৯৪টি আসন লাভ করার সম্ভাবনা। কানাডায় মোট সংখ্যা ২৪৫। তার মধ্যে ফরাসিদের* আছে মাত্র ৬৫ টি। এর ভিত্তিতে এটা সুস্পষ্ট যে এইসব দেশগুলিতে ক্ষুদ্র জাতিগুলির ওপর প্রধান জাতির প্রাধান্য বিস্তারের সম্ভাবনা আছে। অবশ্যই এমন কথা আইনগত ভাবে বলতে

---

* কানাডা বর্ষপঞ্জি, ১৯৩৬

*দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ষপঞ্জি ১৯৪১

*স্টেটসম্যান বর্ষপঞ্জি, ১৯৪১

* এটা কুইবেক প্রদেশের জন্য।

গেলে বলা যায় এবং কানাডায় নিছক আকারগতভাবে ফরাসিরা ব্রিটিশরাজের অধীনে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজরা ওলন্দাজরাজের অধীনে এবং সুইজারল্যান্ডে ইতালীয় ও ফরাসিরা জর্মন রাজের অধীনে বসবাস করছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অবস্থাটা কেমন? কানাডায় ফরাসিরা কি দাবি জানিয়েছে যে তারা ব্রিটিশ রাজের অধীনে থাকবে না? দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজরা কি দাবি জানিয়েছে যে, তারা ওলন্দাজ রাজের অধীনে থাকবে না? সুইজারল্যান্ডে জার্মান রাজের অধীনে থাকতে ফরাসি ও ইতালীয়দের কি কোনও আপত্তি আছে? তবে কেন মুসলমানরা হিন্দু রাজের বিরুদ্ধে এইভাবে সোচ্চার হচ্ছে?

এমন কথা কি প্রস্তাবিত হচ্ছে যে হিন্দুরাজ হবে একটি প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠদের শাসন? সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সম্ভাব্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ কি মুসলমানদের সুনিশ্চিত করা হয়নি? কানাডায় ফরাসিদের, দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজদের, এবং সুইজারল্যান্ডে ফরাসি ও ইতালীয়দের যে রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে মুসলমানদের দেওয়া হয়নি? রক্ষাকবচ গুলির তালিকা থেকে কেবল একটি বিষয় নেওয়া যাক। বিধানমন্ডলে প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে মুসলমানরা প্রচুর মাত্রায় গুরুত্ব পায় নি? এই গুরুত্বের কথা কানাডা, দক্ষিন আফ্রিকা এবং সুইজারল্যান্ডের জানা আছে কি? এবং এই গুরুত্ব আরোপনের কি প্রভাব পড়ে মুসলমানদের ওপরে? এতে কি বিধানমন্ডলে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কমে যাচ্ছে না? এই হ্রাস পাওয়ার মাত্রাটি কত? কেবল মাত্র ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে এবং ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫-এর অধীনে কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলের নিম্নকক্ষে আঞ্চলিক নির্বাচন ক্ষেত্রগুলিতে কেবলমাত্র হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি ধরলে এটা সুস্পষ্ট হয় যে মোট ১৮৭টি আসনের মধ্যে হিন্দুদের আছে ১০৫টি এবং মুসলমানদের ৮২টি আসন। এই সংখ্যাতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে একথা মানুষ প্রশ্ন করতে বাধ্য যে তাহলে হিন্দুরাজ সম্বন্ধে আশঙ্কা কোথায়?

হিন্দুরাজ যদি সত্যিই বাস্তবায়িত হয়, তবে নিঃসন্দেহে বিপর্যয়। হিন্দুরা কি বলে সেটা বড় কথা নয়, হিন্দুত্ববাদ স্বাধীনতা, সাম্য এবং সৌভ্রাতৃত্বের পক্ষে এক ভয়াবহ বিপদ। এই ব্যাপারে গণতন্ত্রের সঙ্গে এর অসঙ্গতি আছে। যে কোনও মূল্যে হিন্দুরাজকে বাধা দিতে হবে কিন্তু পাকিস্তানই কি এর প্রকৃত প্রতিকার? সাম্প্রদায়িক রাজ তখনই সম্ভব হয় যখন একটি দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির তুলনামূলক শক্তিকে উল্লেখযোগ্য বৈষম্য থাকে। উপরে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এই বৈষম্য কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সুইজারল্যান্ডে যতটা আছে, ভারতে তার

পরিমান তত বেশি নয়। তৎসত্ত্বেও কানাডায় কোনও ব্রিটিশ রাজ নেই, দক্ষিণ আফ্রিকায় ওলন্দাজ রাজ নেই এবং সুইজারল্যান্ডে জার্মান রাজ নেই। কিভাবে ফরাসি, ইংরাজ এবং ইতালীয়রা তাদের দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের রাজ প্রতিষ্ঠায় বাধা দিতে সফল হয়েছে? নিঃসন্দেহে বিভাজনের দ্বারা নয়। তাদের পদ্ধতিটি কী? পদ্ধতিটি হল, রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক দলগুলির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা। কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সুইজারল্যান্ডের কোনও সম্প্রদায় কোনও একটি পৃথক সম্প্রদায়িক দল তৈরি করার কখনো চিন্তাও করে না। যেটা লক্ষণীয় তা হল এই যে, সংখ্যালঘু জাতিরাই সাম্প্রদায়িক দল গঠনের বিরোধিতায় নেতৃত্ব দিয়েছে। কারণ তারা জানে যে, তারা যদি একটি সাম্প্রদায়িক দল গঠন করে তাহলে প্রধান সাম্প্রদায়টিও একটি সাম্প্রদায়িক দল গঠন করতে এবং তার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় দেখতে পাবে যে সাম্প্রদায়িক রাজ প্রতিষ্ঠা করা সহজ। আত্ম-রক্ষার এটি একটি ত্রুটিযুক্ত পদ্ধতি। তার কারণ এই যে, সংখ্যালঘু জাতিরা পুরোমাত্রায় অবগত আছে যে, তারা যে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলি গঠনের বিরোধিতা করেছে তার জন্যে তারা কিভাবে নিজেদের ফাঁদে নিজেরা জড়িয়ে পড়বে।

হিন্দুরাজ এড়ানোর এই পদ্ধতিটির কথা মুসলমানরা ভেবেছে কী। তারা কী এটা বিবেচনা করে দেখেছে এটা এড়ানো কত সহজ? তারা কি এটা বিবেচনা করে দেখেছে যে লীগের বর্তমান নীতি কতটা নিরর্থক এবং ক্ষতিকারক? হিন্দু মহাসভার এবং তার হিন্দুরাজ্য এবং হিন্দুরাজের দলগত জিগিরের (Slogan) বিরুদ্ধে মুসলমানরা গর্জন করছে। কিন্তু এর জন্য কারা দায়ী? মুসলীম লীগ গঠন করে মুসলমানেরা নিজেদের ওপর যে অপরিহার্য অন্যায়ের সমুচিত প্রতিফলকে টেনে এনছে তার জন্যই হিন্দু মহাসভা ও হিন্দুরাজের সৃষ্টি। এটা হল তারই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া। একটি অন্যটির উদ্ভবের কারণ। বিভাজন নয়, বরং মুসলীম লীগের বিলুপ্তি সাধন ও হিন্দু ও মুসলমানদের মিশ্র দল-ই হিন্দু রাজের প্রেতাত্মাকে কবরস্থ করতে একমাত্র ফলপ্রদ উপায়। যতদিন পর্যন্ত সাংবিধানিক রক্ষাকবচের প্রশ্নটি সম্বন্ধে মতানৈক্য অব্যাহত থাকতে ততদিন পর্যন্ত অবশ্য মুসলমান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের পক্ষে কংগ্রেস অথবা হিন্দু মহাসভার যোগদান করা সম্ভব হবে না। কিন্তু এই সমস্যাটির সমাধান হবে, সমাধান হতে বাধ্য এবং অবশ্য আছেই যে মীমাংসার ফলে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুরা তাদের প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচ পাবে। একবার এই পারস্পরিক মিলন, যা আমরা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে চাইছি, হয়ে গেলে দলদের পুনরায় দলবদ্ধ হওয়ার কংগ্রেস এবং হিন্দুমহাসভা ভেঙে যাওয়ার

এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনরভ্যুত্থানের স্বীকৃত কর্মসূচির ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমানরা মিলে মিশ্র রাজনৈতিক দল গঠনের পথে কোনও কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না, এবং তার ফলে হিন্দুরাজ অথবা মুসলিম রাজ কোনোটিরও বাস্তবায়িত হওয়ার বিপদটা এড়ানো যাবে। ভারতে হিন্দু ও মুসলমানদের মিশ্রদল গঠন করা কঠিন কাজও হবে না। হিন্দু সমাজে এমন বহু নিম্নশ্রেণীর সম্প্রদায় আছে যাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক চাহিদা গুলি অধিকাংশ মুসলমানদের চাহিদার সমান এবং শত শত বৎসর ধরে তাদের সাধারণমানবিক অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত করেছে যে উচ্চবর্গের হিন্দুরা তাদের চেয়ে উভয়ের কাম্য বিষয়গুলি লাভ করার জন্য তারা মুসলমানদের সঙ্গে যৌথ উদ্দেশ্যে মিলিত হতে অনেক বেশি পরিমাণে আগ্রহী হবে। এই জাতীয় পন্থা অবলম্বন করাকে দুঃসাহসিকতা বলা যাবে না। এই নীতির অর্থ একটি বহু ব্যবহৃত পথে হাঁটা। এটা কি সত্য নয় যে, সব কটি প্রদেশে না হলেও অধিকাংশ প্রদেশে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের অধীনে মুসলমান, অ-ব্রাহ্মণ এবং অনুন্নত শ্রেণীরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং একটি কর্মরত দলের সদস্য হিসাবে সংস্কার সাধন করে বলেছিল ১৯২০ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত? হিন্দুরাজের আশঙ্কাকে নির্মূল করার এবং হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মতৈক্য লাভে সাফল্য পাবার সবচেয়ে ফলপ্রদ পদ্ধতিটি এর মধ্যেই আছে। মিঃ জিন্নাহ্ সহজেই এই পন্থা অবলম্বন করতে পারতেন। এবং এতে সাফল্য অর্জন করতে মিঃ জিন্নার অসুবিধাও হত না। এ কথা ঠিক যে, মিঃ জিন্নাই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর পক্ষে সাফল্য অর্জন করার সব সুযোগ ছিল, যদি তিনি ওই ধরনের সম্মিলিত অ-সাম্প্রদায়িক দল গঠন করার চেষ্টা করতেন। সংগঠিত করার সামর্থও তার ছিল। জাতীয়তাবাদী বলে সুখ্যাতিও তাঁর ছিল। এমন কি কংগ্রেসের বিরোধীতাকারী বহু হিন্দু তাঁর দলে চলে আসতে পারত যদি তিনি শুধু জন-মনস্ক হিন্দু ও মুসলমানদের একটি ঐক্যবদ্ধ দল গড়ার আহ্বান জানাতেন। কিন্তু মিঃ জিন্নাহ্ কী করলেন? ১৯৩৭ সালে মুসলমান রাজনীতিতে ঢুকলেন এবং কী আশ্চর্য তিনি সেই মুসলীম লীগকে নবজীবন দান করলেন, যা হয়ে উঠেছিল মুমূর্ষু এবং ক্ষয়িষ্ণু, এবং মাত্র কয়েক বৎসর আগে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখতে পেলে তিনি খুশি হতেন। ওই ধরনের সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল চালু করাটা যতই দুঃখজনক হোক না কেন, তাতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার একটা লক্ষ্মণ ছিল। আর সেটা হল মিঃ জিন্নার নেতৃত্ব। সকলে মনে করেছিল যে মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে লীগ কখনোই একটি নিছক সাম্প্রদায়িক দল হয়ে উঠতে পারবে না। তার

নবজীবনের অধ্যায়ের প্রথমে দুই বৎসরের মধ্যে লীগের গ্রহণ করা প্রস্তাব গুলি নির্দেশিত করছিল যে তা হিন্দু ও মুসলমানদের একটি মিশ্র রাজনৈতিক দল হিসাবে গড়ে উঠবে। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে লখনউতে অনুষ্ঠিত মুসলীম লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে মোট ১৫টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত দুটি বিশেষ কৌতূহলপ্রদ।

প্রস্তাব * নং ৭ ঃ

''ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ এবং নির্দেশাবলীর দলিলের আক্ষরিক অর্থ এবং তৎপর্বের ঘোরতর উল্লঙ্ঘন করে কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রমণ্ডলী গঠনের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় মুসলীম লীগের এইসভা নিন্দা করছে ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে, এবং মুসলমান এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য লাট সাহেবদের ওপর দোযারোপ করছে, তাঁদের ওপর যে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল তা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য।'

প্রস্তাব * নং ৮ ঃ

'প্রস্তাব গৃহীত হল যে, সর্বভারতীয় মুসলীম লীগের লক্ষ্য হবে, ভারত স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্রের আকারে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে মুসলমান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুরা অধিকার ও স্বার্থগুলি সংবিধানে পর্যাপ্তভাবে ও ফলপ্রদভাবে সুরক্ষিত হবে।'

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পাটনাতে অনুষ্ঠিত লীগের পরবর্তী বাৎসরিক অধিবেশনে সম-সংখ্যক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। ১০ নং প্রস্তাবটি * উল্লেখযোগ্য। তা ছিল নিম্নরূপ ঃ—

'সর্বভারতীয় মুসলীম লীগ তার অভিমতটির পুনরাবৃত্তি করে বলছে যে, ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ এ অন্তর্ভুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রসঙ্গটি গ্রহণ যোগ্য নয়, কিন্তু আরও যেসব ঘটনা ঘটেছে অথবা কালক্রমে যা ঘটতে পারে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রস্তাব সর্বভারতীয় মুসলীম লীগের সভাপতিকে প্রাধিকার দিচ্ছে, প্রয়োজন অনুসারে সেই পন্থা গ্রহণ করতে একটি উপযুক্ত বিকল্পের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে যা মুসলমানদের এবং ভারতের অন্যান্য সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সুরক্ষিত করবে।'

এই প্রস্তাবগুলির ধারণা মিঃ জিন্নাহ্ দেখিয়েছেন যে তিনি মুসলমান এবং অন্যান্য অ-মুসলমান সংখ্যালঘুদের মধ্যে একটি সাধারণ মোর্চা খোলার পক্ষে আছেন।

দুর্ভাগ্যবশত এই প্রস্তাবগুলির মূলে যে সর্বজনীনত্ব ও রাজনীতি ছিল তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৩৯ সালে মিঃ জিন্নাহ্ ডিগবাজি খেলেন এবং পাকিস্তানের অনুকূলে উক্ত কুখ্যাত প্রস্তাব গ্রহণ করে মুসলমানদের পৃথক করার বিপজ্জনক ও দুর্ভাগ্যজনক নীতির রূপারেখা তৈরি করলেন। এই পৃথকীকরণের কারণ কী? মুসলমানরা একটি জাতি, কোনও সম্প্রদায় নয় এই মত পরিবর্তন করা ছাড়া আর কিছু নয়। মুসলমানরা জাতি, না, সম্প্রদায় এই প্রশ্ন কলহের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটা বুঝতে খুবই অসুবিধা হয় যে মুসলমানরা যে একটি জাতি এই ঘটনাটি কিভাবে রাজনৈতিক পৃথকীকরণকে একটি নিরাপদ ও বলিষ্ঠ নীতি হয়ে ওঠে? দুর্ভাগ্যবশত এই নীতির দ্বারা মিঃ জিন্না তাদের যে কি অনিষ্ট করেছেন সেটা মুসলমানরা বুঝতে পারে না। মুসলীম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র সংগঠন করে মিঃ জিন্না কি সাফল্য লাভ করলেন তা মুসলমানরাই বিচার করুক। এটা হতে পারে যে এটা তাঁকে গোঁ-ধরার সম্ভাবনা থেকে বাঁচতে সাহায্য করেছে। কারণ মুসলিম শিবিরে তিনি নিজেকে (সবসময়ে প্রথম হয়ে থাকার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারবেন। কিন্তু এই পৃথকীকরণের সার কল্পনার দ্বারা মুসলমানদের কিভাবে হিন্দু রাজের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখবে বলে আশা করে লীগ? যে সব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সেখানে হিন্দু রাজের প্রতিষ্ঠাতে পাকিস্তানকে বাধা দিতে পারবে? এটা সুস্পষ্ট যে সেটা করা যাবে না। যদি পাকিস্তান হয় তবে মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশগুলিতেও তাই হবে। সর্বভারতীয় দৃষ্টিতে দেখা যাক। হিন্দুস্থানে থেকে যাওয়া মুসলমান সংখ্যালঘুদের ওপর কেন্দ্রে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠাকে পাকিস্তান বাধা দিতে পারবে? এটা সহজবোধ্য যে তা হতে পারে না। তাহলে পাকিস্তান হলে কী ভালটা হবে? যেখানে কখনই হিন্দু রাজ হতে পারে না সেখানে এবং যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সব প্রদেশে হিন্দুরাজ হতে শুধু বাধা দিতে। অন্যভাবে বললে বলা যায় যে, যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে পাকিস্তানের কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ সেখানে হিন্দুরাজ হওয়ার আশঙ্কা নেই। আর যেখানে তারা সংখ্যালঘু সেখানে তা মুসলমানদের কাছে অনাবশ্যকের চেয়েও অনেক বেশি খারাপ হবে, কারণ পাকিস্তান থেকে বা না হোক তাদের হিন্দু রাজের সম্মুখীন হতেই হবে। রাজনীতি কি মুসলীম লীগের রাজনীতির চেয়ে আরও অধিক অর্থ নিরর্থক হবে? সংখ্যালঘু মুসলমানদের সাহায্য করা দিয়ে কাজ শুরু করেছিল মুসলীম লীগ এবং শেষ করেছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের বিষয়টিকে সমর্থন করে। মুসলীম লীগের মূল লক্ষ্যের একি বিকৃতি। ধর্মসমন্বিত অবস্থা থেকে হাস্যকর অবস্থায় এ কী

অধঃপতন। হিন্দুরাজের প্রতিবিধান হিসাবে বিভাজন অকিঞ্চিৎকর থেকেও আরও খারাপ কিছু।

৬

পাকিস্তানের জন্য মুসলমানদের যৌক্তিকতার কয়েকটি দুর্বলতা আমার দৃষ্টি গোচর হয়েছে। অন্যান্য আরও থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলি আমার মনে উদিত হয়নি। কিন্তু তালিকাটি যেভাবে আছে, সেটাও যথেষ্ট ভয়ানক। মুসলমানরা কিভাবে তার মোকাবিলা করবে? এ সমস্যাটা মুসলমানদের , আমার নয়। এই বিষয়ের পাঠক হিসাবে আমার কর্তব্য হল, এই দুর্বলতাগুলিকে পরিবেশন করা। আর সেটাই আমি করেছি। এর বেশি জবাবদিহি করার আমার কিছু নেই। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এমন আরও দুটি প্রশ্ন অবশ্য আছে যার আলোচনা তাদের উল্লেখ না করে এই আলোচনা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে ধরে নিয়ে বন্ধ করা যাবে না। এই প্রশ্নগুলির উদ্দেশ্য হল আমার সমালোচনাকে এবং আমার মধ্যে বিষয়টির স্পষ্টীকরণ। এই প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি প্রশ্ন আমি আমার সমালোচকদের করার অধিকার; অন্যটি সমলোচকরা আমার করার অধিকারী।

প্রথম প্রশ্নটির সূত্রপাত করে যে, প্রশ্নটি আমি সমালোচকদের করতে ইচ্ছুক তা হল এই দুর্বলতাগুলি সম্পর্কে প্রদত্ত একটি বিবৃতি থেকে কি সুফল তাঁরা আশা করছেন? পাকিস্তানের গুণাবলী সম্পর্কে বিতর্কে পরাজিত বলে মুসলমানরা পাকিস্তানের দাবি কি ছেড়ে দেবে বলে তাঁরা আশা করেন? সেটা অবশ্য নির্ভর করে এই বিতর্কটির কিভাবে সমাধান করতে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে তার উপর। হিন্দুদের মধ্যে থেকে ধর্মান্তরিতদের আয়ত্তে আনার জন্য প্রথম দিকে খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকরা যে পদ্ধতি গড়ে তুলেছিল হিন্দু ও মুসলমানরাও তা অনুসরণ করতে পারে। এই পদ্ধতি অনুসারে একজন খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক এবং একজন ব্রাহ্মণের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের জন্য একটি দিন স্থির করা হতো, যা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকত, পূর্বোক্ত জন খ্রিষ্টধর্মের প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং শেষোক্ত জন হিন্দুধর্মের অধিবক্তা হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতেন, এই শর্তে যে, যেজন তাঁর ধর্মের বিরুদ্ধে বক্তব্যের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হবেন, তিনি অপরজনের ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবেন। যদি পাকিস্তান সম্পর্কে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা ঐরূপ পদ্ধতিতে সমাধান স্বীকৃতি পায় তবেই এই সারিবদ্ধ দুর্বলতাগুলির উপস্থাপনা কিছুটা কাজে লাগতে পারে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে কোনও বিতর্কের

অবসান ঘটানোর আর একটি পদ্ধতি আছে, যাকে জনসনীয় (পদ্ধতি) বলা যেতে পারে, বিশপ বার্কলের যুক্তিতর্কের আলোচনায় ডঃ জনসন যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন সেই প্রণালী অনুসারে এই নামকরণ। বসওয়েল লিপিবদ্ধ করে গেছেন যে, যখন তিনি পদার্থ অস্তিত্বহীন এবং বিশ্বের সবকিছুই নিছক আদর্শ কল্পনা বিশপ বার্কলের এই মতবাদের কথা ডঃ জনসনকে জানিয়ে বলেন যে ওই মতবাদটি এক সুচতুর কু-তর্ক, অথচ তা খণ্ডন করা যায় না, তখন ডঃ জনসন অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে একটা বড় পাথরে জোরে পদাঘাত করেন এবং প্রতিঘাত না পাওয়া পর্যন্ত বলতে থাকেন, "আমি এইভাবে এটা খণ্ডন করি।" এমন হতে পারে যে, মুসলমানরা বেশির ভাগ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মত, রাজি হবে তাদের পাকিস্তান দাবি করার বিষয়টিকে যুক্তি ও তর্কের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে। কিন্তু মুসলমানরা যদি ডঃ জনসনের পদ্ধতি গ্রহণ করে যদি বলে "গোল্লায় যাক তোমাদের যুক্তিতর্ক। আমরা পাকিস্তান চাই।" তবে আমি আশ্চর্য হব না। সেক্ষেত্রে সমালোচককে এটা বুঝতেই হবে যে পাকিস্তানের দাবির বিষয়টির বিনাশ করতে হলে সীমাবদ্ধতার উপর আস্থা স্থাপন করলে কোনও ফল হবে না। অতএব পাকিস্তান সম্পর্কে এইসব আপত্তির যুক্তি সম্বন্ধে অতি উৎফুল্ল হয়ে কোনও লাভ নেই।

এবার আমি অন্য প্রশ্নটিতে আসতে চাই যেটা আমি যা বলেছি, সমালোচকরা আমাকে প্রশ্ন করার অধিকারী। আমি যে আপত্তিগুলির কথা উত্থাপন করেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের বিষয় সম্বন্ধে আমার দৃষ্টিভঙ্গি কী? আমার দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। আমি সুন্দরভাবে যা বিশ্বাস করি কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে, তা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে, যদি মুসলমানরা পাকিস্তান পাবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে থাকে, তবে তা তাদের দিতেই হবে। আমি জানি সঙ্গে সঙ্গে আমার সমালোচকরা আমার বিরুদ্ধে অসঙ্গতির অভিযোগ আনবেন এবং এই অসাধারণ সিদ্ধান্তের জন্য কারণ জানতে চাইবেন—অসাধারণ এই জন্য যে এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অংশে আমি আমার অভিমত প্রকাশ করে বলেছি পাকিস্তানের জন্য মুসলমানদের বক্তব্যে এমন কিছু নেই যার মধ্যে বাধ্যতামূলক ক্ষমতা আছে বলা যাবে না যা নিষ্ঠুর নিয়তির বিধানে আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। পাকিস্তানের জন্য মুসলমানদের বক্তব্যের দুর্বলতাগুলি সম্বন্ধে আমি যা বলেছি তার একটুও আমি প্রত্যাহার করছি না। তৎসত্ত্বেও আমি মনে করি যে মুসলমানরা যদি পাকিস্তান পেতেই চায়, তবে তাতে রাজি না হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। যে কারণগুলির জন্য আমি ওই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি সে সম্বন্ধে আমি একথা বলতে দ্বিধা

করব না যে পাকিস্তানের যৌক্তিকতার শক্তি অথবা দুর্বলতা যেগুলির একটাও নয়। আমার বিচারে দুটি নিয়ন্ত্রক বিষয় আছে যা বিচার্যবিষয়টির নিষ্পত্তি করতে পারে। প্রথমটি হল ভারতের প্রতিরোধ এবং দ্বিতীয়টি মুসলমানদের অনুভূতি। সেগুলিকে কেন আমি চূড়ান্ত মনে করি এবং আমার মতে কিভাবে সেগুলি পাকিস্তানের অনুকূলে কার্যকর হয় আমি তা বলব।

প্রথমটি দিয়ে শুরু করা যাক। স্বাধীনতা অর্জন করা নয় বরং তা টিকিয়ে রাখার জন্য সুনিশ্চিত উপায়গুলিকে লাভ করাটাই যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার একথা উপেক্ষা করা যায় না। কোনও এক দেশের স্বাধীনতার চূড়ান্ত প্রতিভূটি (Guarantee) হল একটি নিরাপদ সেনাবাহিনী—এমন একটি সেনাবাহিনী যার ওপর আস্থা রাখা যাবে যে তা সব সময়ে এবং যে কোনও পরিস্থিতিতে দেশের জন্য যুদ্ধ করতে পারে। ভারতের সেনাবাহিনীকে অতি অবশ্যই হিন্দু ও মুসলমানদের নিয়ে গঠিত মিশ্র সেনাবাহিনী হতে হবে। যদি বিদেশী শক্তি ভারতকে আক্রমণ করে, তবে ভারতের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সেনাবাহিনীর মুসলমানদের উপর আস্থা রাখা যাবে কি? ধরা যাক যে আক্রমণকারীরা তাদের সহ-ধর্মাবলম্বী, তবে কি মুসলমানরা আক্রমণকারীদের পক্ষ নেবে, না, তারা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং ভারতকে রক্ষা করবে? প্রশ্নটি অত্যন্ত কঠিন। স্পষ্টত এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই নির্ভর করবে সেনাবাহিনীর মুসলমানরা কী পরিমাণে দ্বি-জাতি তত্ত্বের দ্বারা সংক্রামিত, যে তত্ত্বটি পাকিস্তানের ভিত্তিভূমি। যদি তারা সংক্রামিত হয়ে থাকে, তবে ভারতের সেনাবাহিনী নিরাপদ হতে পারবে না, এবং ভারতের স্বাধীনতার রক্ষকের পরিবর্তে, ওই সেনাবাহিনী দেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে এক ভীতি এবং ভয়ঙ্কর বিপদের কারণ হয়ে থাকবে। আমি স্বীকার করছি যে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠি যখন কোনও ব্রিটিশদের এই যুক্তি দেখাতে শুনি যে ভারতের প্রতিরক্ষার জন্যই তাদের উচিত পাকিস্তানের দাবী নাকচ করা। কিছু হিন্দু ওই একই সুরে কথা বলেন। আমি নিশ্চিন্তভাবে বুঝতে পারি যে, হয় তাঁরা ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে নির্ধারিক কারণটি সম্বন্ধে তাঁরা ওয়াকিবহাল নন, অথবা তাঁরা ভারতের প্রতিরক্ষার কথা বলছেন এটা ধরে নিয়ে যে ভারত একটি স্বাধীন দেশ নয়, যে নিজের প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে দায়িত্বশীল, কিংবা এটা ধরে নিয়ে যে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত ভারতকে আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে তারা প্রতিরোধ করবে। এটি একটি নৈরাশ্যজনক দৃষ্টিভঙ্গি। প্রশ্নটা এই নয় যে ভারতের বিভাজন যদি না হয় তবে কি ব্রিটিশরা আরও ভালভাবে ভারতের প্রতিরক্ষা করতে সমর্থ হবে। প্রশ্নটি এই যে ভারতীয়রা স্বাধীন ভারতের প্রতিরক্ষায় সমর্থ কিনা। এবিষয়ে

আমি আবার বলছি, একমাত্র উত্তর হল যে, এক এবং একটিমাত্র শর্তে ভারতীয়রা স্বাধীন ভারতের প্রতিরক্ষা করতে পারবে—এবং সেই শর্তটি হল, যদি ভারতের সেনাবাহিনী অ-রাজনৈতিক হয় এবং পাকিস্তানের বিষদুষ্ট না হয়। সেনাবাহিনীর প্রশ্নটি উল্লেখ না করে স্বরাজের প্রশ্নটি আলোচনা করার যে অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত অভ্যাস দেশে গড়ে উঠেছে সে সম্বন্ধে আমি ভারতীয়দের সাবধান করে দিতে চাই। রাজনৈতিক সেনাবাহিনীই যে ভারতের মুক্তি লাভের সবচেয়ে বড় বিপদ এটা বুঝতে ব্যর্থ হওয়ার চেয়ে বিপজ্জনক আর কিছু নেই। এটা কোনও সেনাবাহিনী না থাকার চেয়েও খারাপ।

যখন কোনও দেশের অভ্যন্তরে কোনও বিদ্রোহী বা অবাধ্য অংশ দেশের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানায় তখন যে সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য সেনাবাহিনীই যে চূড়ান্ত ক্ষমতা নেয়, এই সত্যটিও সমপরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ। ধরা যাক তৎকালীন সরকার একটা নীতি ঘোষণা করে যার বিরুদ্ধে মুসলমানদের একটা অংশ প্রবল ভাবে বিরোধীতা করে। ধরা যাক যে তৎকালীন সরকার তার নীতিটিকে বলবৎ করার জন্য সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করার প্রয়োজন মনে করে, তখন কি তৎকালীন সরকার সেনাবাহিনীর মুসলমানদের ওপর নির্ভর করতে পারে তার আদেশ পালন করতে এবং বিদ্রোহী মুসলমানদের ওপর গুলি চালাতে? আবার এটাও নির্ভর করছে কী পরিমানে সেনাবাহিনীস্থ মুসলমানরা দ্বি-জাতি তত্ত্বের দ্বারা সংক্রামিত তার উপর। যদি তারা সংক্রামিত হয়ে থাকে, তবে ভারত এক নিরাপদ এবং দৃঢ়নিবদ্ধ সরকার পেতে পারে।

দ্বিতীয় নিয়ন্ত্রক বিষয়টির দিকে ফের তাকানো যাক। হিন্দুরা রাজনীতিতে অনুভূতি-আশ্রিত মতকে একটি শক্তি হিসাবে কোনও মূল্য দিতে চায় বলে মনে হয় না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য মনে হয় হিন্দুরা দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করতে চায়। প্রথমটি হল, হিন্দু ও মুসলমানরা যদি দুটি (আলাদা) জাতিও হয়, তাহলেও তারা একটি রাষ্ট্রে একসাথে বসবাস করতে পারে। অপরটি হল এই যে পাকিস্তানের জন্য মুসলমানদের যৌক্তিকতাটা সুস্পষ্ট যুক্তির চেয়ে তীব্র অনুভূতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জানি না আর কতকাল হিন্দুরা ঐরূপ যুক্তিতর্ক দিয়ে আত্ম-প্রতারণা করবে। একথা সত্য যে, প্রথম যুক্তিটি নজীরবিহীন নয়। সেই সঙ্গে এর মূল্য যে অত্যন্ত সীমিত এটা লক্ষ্য করার জন্য খুব বেশি একটা জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। দুটি জাতি এবং একটি রাষ্ট্র এক চমৎকার অজুহাত। ধর্মোপদেশের মতই এর আকর্ষণ আছে। এবং পরিণামে মুসলমান নেতৃবৃন্দের রূপান্তর হতে

পারে। কিন্তু ধর্মোপদেশের মত উচ্চারিত হওয়ার পরিবর্তে যদি এর অভিপ্রায় হয় একটি অধ্যাদেশ হিসাবে জারি করে মুসলমানদের মান্য করতে বলা তবে তা হবে একটি হঠকারী প্রকল্প যা কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ স্বীকার করবে না। এবং আমি নিশ্চিত যে তা স্বরাজের মূল উদ্দেশ্যটিকেই ব্যাহত করবে। দ্বিতীয় যুক্তিটিও সমপরিমানে অর্থহীন। পাকিস্তানের জন্য মুসলমানদের যৌক্তিকতা যে ভাবলুতার উপর প্রতিষ্ঠিত সেটা আদৌ দুর্বলতার ব্যাপার নয়, প্রকৃতপক্ষে এটাই এর সুদৃঢ় বিচার বিষয়ীভূত অঙ্গ। কোনও সংবিধানের কার্যসাধনোপযোগিতা যে তত্ত্বের বিষয় নয় এটা জানার জন্য রাজনীতির গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। এটা অনুভূতির ব্যাপার। সংবিধান পোশাকের মত মানানসই হবে, সেই সঙ্গে আনন্দবিধানও করবে। যদি কোনও সংবিধান আনন্দ দিতে না পারে, তবে, সেটা যতই নিখুঁত হোক না কেন, কার্যকর হবে না। সংবিধানে কোনও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সম্প্রদায়ের তীব্র অনুভূতির বিরুদ্ধাচারণকারী হওয়ার অর্থ বিপর্যয়কে বরণ করা, যদি না তা বিদ্রোহকে আমন্ত্রণ জানায়।

ধরে নেওয়া যাক, যে নিরাপদ সেনাবাহিনী আছে, তৎসত্ত্বেও হিন্দুরা এটা বুঝতে পারে না যে সশস্ত্রবাহিনীর দ্বারা শাসিত হওয়া কোনও জাতিকে শাসন করার স্বাভাবিক পদ্ধতি নয়। একথা অস্বীকার করা যায় না যে রাষ্ট্রের প্রতিষেধক ওষুধ হল (সামরিক) শক্তি এবং রাষ্ট্র যখন অসুস্থ হবে তখন সেই ওষুধ প্রয়োগ অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু যেহেতু (সামরিক) শক্তি রাষ্ট্রের ওষুধ একমাত্র সেই কারণেই সেটাকে দৈনন্দিন খাদ্য হতে দেওয়া যায় না। রাষ্ট্র কর্মপ্রবাহের স্বভাবসিদ্ধ ঘটনা হিসাবে কাজ করবে, যেটা স্বাভাবিক। এটা একমাত্র তখনই ঘটতে পারে যখন বিধিভঙ্গ উপাদানে গঠিত রাষ্ট্র একযোগে কাজ করতে এবং আইন সম্মত ভাবে গঠিত কর্তৃত্ব কর্তৃক অনুমোদিত বিধিসমূহ ও নির্দেশাবলী মেনে চলতে ইচ্ছুক। ধরা যাক যে ঐক্যবদ্ধ ভারতের নতুন সংবিধানে মুসলমানদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই আছে। আবার ধরা যাক যে, মুসলমানরা বলছে, "তোমাদের রক্ষাকবচের জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু আমরা তোমাদের দ্বারা শাসিত হতে চাই না।" এবং ধরা যাক যে, তারা বিধানমণ্ডলগুলিকে বর্জন করে, বিধিসমূহ মান্য করতে অস্বীকার করে, কর দেওয়ার বিরোধিতা করে, তাহলে কী হবে? হিন্দুদের বন্দুকের সঙ্গিন ব্যবহার করে কি হিন্দুরা মুসলমানদের আনুগত্য আদায় করতে প্রস্তুত? স্বরাজ কি জনগণকে সেবা করার একটি সুযোগ হবে, অথবা হিন্দুদের দ্বারা মুসলমানদের জয় করার এবং মুসলমানদের দ্বারা হিন্দুদের জয় করার সুযোগ

হবে? স্বরাজকে অবশ্যই হতে হবে জনগণের জন্য, জনগণ কর্তৃক জনগণের সরকার। এটাই স্বরাজের অস্তিত্বের কারণ এবং স্বরাজের সমর্থন করার একমাত্র কারণ। স্বরাজ যদি এমন একটা যুগকে হাত ধরে এগিয়ে আনতে চায় যেখানে হিন্দু ও মুসলমানরা একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে, একজন তার প্রতিবন্ধীকে জয় করতে পরিকল্পনা করবে, তবে কেন আমরা স্বরাজ পাব এবং তবে কেন গণতান্ত্রিক দেশগুলি ওই ধরণের স্বরাজকে রূপপরিগ্রহ করতে দেবে? করতে দিলে তা হবে এক ফাঁদ, এক বিপর্যয় এবং সত্যপথ ভ্রষ্টতা।

অ-মুসলমানরা বোধ হয় এবিষয়ে ওয়াকিবহাল নয় যে তাদের এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন করা হয়েছে যেখানে তারা নানাবিধ বিকল্পগুলির মধ্যে একটাকে বেছে নিতে বাধ্য হবে। আমি সেই বিকল্পগুলিকে বিবৃত করতে চাই। প্রথমক্ষেত্রে তাদের বেছে নিতে হবে ভারতের স্বাধীনতা এবং ভারতের ঐক্যের মধ্যে যে কোনও একটাকে। যদি অ-মুসলমানরা ভারতের ঐক্যের উপর জোর দেয় তবে ভারতের স্বাধীনতার দ্রুত বাস্তবায়িত করণের বিষয়টিকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেবে। দ্বিতীয় বাছাইয়ের ব্যাপারটা ভারতকে রক্ষা করার নির্ভুলতম পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং তা হল তারা স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভারতে অ-মুসলমানদের সঙ্গে একসাথে উভয়পক্ষের সাধারণ স্বাধীনতাগুলি সুরক্ষিত করার দৃঢ় ইচ্ছাটিকে বিকশিত করতে ও মেনে নেওয়ার জন্য মুসলমানদের উপর নির্ভর করতে পারবে কি না অথবা ভারতকে বিভাজিত করা অধিকতর শ্রেয় হবে কিনা যার দ্বারা দেশের প্রতিরক্ষার ব্যাপারটি মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদের নিরাপত্তা ও অ-মুসলমানদের হাতে প্রতিরক্ষার ব্যাপারটি ছেড়ে দিয়ে অ-মুসলমানদের নিরাপত্তা সুরক্ষিত হবে।

প্রথমোক্তটির ক্ষেত্রে, ভারতের ঐক্যের চেয়ে আমি বেশি পছন্দ করব ভারতের স্বাধীনতা। বিংশ শতাব্দীতে আয়ারল্যান্ডর স্বাধীনতা আন্দোলনকারীরা ছিল পৃথিবীতে যেসব জাতীয়তাবাদীদের দেখা যায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গোঁড়াপন্থী, এবং যারা ভারতীয়দের মতই অনুরূপ বিকল্পের সম্মুখীন হয়েছিল, তারাও আয়ারল্যান্ডের ঐক্যের পরিবর্তে আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতাকে বেছে নিয়েছিল। বিভাজনের বিরোধিতাকারীরা অ-মুসলমানরা ফিনদের একদা উপ-সভাপতি রেভারেন্ড মাইকেল ও ফ্লানাগানের (Rev. Michael O' Flauagan) প্রস্তাবিত উপদেশ থেকে লাভবান হতে পারে, যা তিনি আয়ারল্যান্ডের বিভাজনের প্রশ্নে* আইরিশ জাতীয়তাবাদীদের দিয়েছিলেন। রেভারেন্ড ফাদার বলেছিলেন।—

* হিস্ট্রি অব্ আয়ারল্যান্ড', স্যার জেমস্ ও' কোনার, খণ্ড II, পৃঃ ২৫৭

'আলস্টারের সঙ্ঘপন্থী এলাকাগুলি বহিষ্করণে রাজি হওয়ার পরিবর্তে আমরা যদি স্বায়ত্তশাসন প্রত্যাখ্যান করি তাহলে পৃথিবীর সামনে আমরা যুক্তি তুলে ধরতে পারব? আমরা দেখতে পারি যে, একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক চৌহদ্দি বিশিষ্ট আয়ারল্যান্ড একটি দ্বীপ মাত্র। নিজেদের জন্য একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক চৌহদ্দী ছিল এখন কিছু সংখ্যক দ্বীপবাসী জাতীয়তাবাদীদের কাছে যদি আবেদন করার ব্যাপার হয় তাহলে এই যুক্তিটি হয়ত ঠিক হতে পারে। পরিবর্তনশীল চৌহদ্দী বিশিষ্ট মহাদেশীয় জাতিগুলির কাছে আবেদন জানাতে গেলে আমরা যা করছি ওই যুক্তির কোনও রকম বলবত্তা থাকবে না। জাতীয় এবং ভৌগোলিক চৌহদ্দিগুলি কদাচিৎ অনুরূপ হয়। ভূগোল স্পেন ও পর্তুগালকে একটা জাতি করতে পারে; কিন্তু ইতিহাস তাদের দুটি করে দিয়েছে। ভূগোল আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল নরওয়ে এবং সুইডেনকে এক জাতিতে ধরে রাখতে, ইতিহাস তাদের দুটিতে বিভক্ত করতে সফল হয়েছে। উত্তর আমেরিকা মহাদেশে জাতিগুলির সংখ্যা সম্বন্ধে ভূগোলের আদৌ কিছু বলার থাকতে পারে বলে মনে হয় না; পুরো ব্যাপারটাই সংঘটিত করেছে ইতিহাস। যদি কেউ ইউরোপের প্রাকৃতিক মানচিত্র থেকে রাজনৈতিক মানচিত্র আঁকতে চায়, তবে তাকে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে হবে। ভূগোল কঠোর পরিশ্রম করেছে আয়ারল্যান্ডকে একটি জাতিতে রূপান্তরিত করতে; ইতিহাস তার বিপরীত কাজটি করেছে। আয়ারল্যান্ড দ্বীপ এবং আয়ারল্যান্ডের জাতীয় এককটি আদৌ অনুরূপ হতে পারে না। সর্বশেষ বিশ্লেষণে জাতীয়তাবাদের অভীক্ষণ হচ্ছে জনগণের আকাঙ্ক্ষা

গভীর বাস্তববোধ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে এই কথাগুলি, ভারতে আমাদের কাছে যার অভাব দুঃখজনক।

দ্বিতীয় বিচারবিষয়ে আমি মুসলমান ভারত এবং অ-মুসলমান ভারতের মধ্যে বিভাজনকে বেশি পছন্দ করে উভয়ের প্রতিরক্ষার জন্য সুনিশ্চিত এবং অত্যন্ত নিরাপদ পদ্ধতির ব্যবস্থা করার ব্যাপারে। দুটি বিকল্পের মধ্যে এটাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। আমি জানি যে একথা বলা হবে যে স্বাধীন এবং ঐক্যবদ্ধ ভারতের সেনাবাহিনীতে মুসলমানদের আনুগত্য সম্বন্ধে দ্বি-জাতি তত্ত্বের সংক্রামণ থেকে উদ্ভুত আমার ভীতি নিছকই এক কাল্পনিক ভীতি। একথা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু তা আমার পছন্দের অকাট্যতা বাতিল করতে পারে না। ভুল আমি করতেই পারি। কোনও প্রকারের প্রতিবাদের ভয়ে ভীত না হয়ে আমি জোর দিয়ে, বার্কের কথা প্রয়োগ করে বলতে পারি যে নিরাপত্তা বোধের ব্যাপারে অতিমাত্রায় অবস্থা স্থাপন করে বিনষ্ট হওয়ার চেয়ে অতিমাত্রায় বিশ্বাস প্রবণ হওয়ার জন্য উপস্থাপন হওয়া

অনেক ভাল। আমি কোনও কিছু ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিতে চাই না। ভারতের প্রতিরক্ষার মতো এত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপারকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়াটা হবে অমার্জিত অপরাধের দোষে দোষী হওয়া।

বাধ্য না হলে কেউ পাকিস্তানের ব্যাপারে মুসলমানদের দাবিতে সম্মতি দেবে না। সেই সঙ্গে যেটা অনিবার্য তার সম্মুখীন না হওয়াটাও নির্বুদ্ধিতা এবং সেটা সাধারণ জ্ঞান ও সাহসের সঙ্গেই তার সম্মুখীন হওয়া উচিত। সমগ্রকে সংরক্ষিত করার ব্যর্থ চেষ্টায় একটি অংশকে হারানোও সমপরিমাণে নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

এইসব কারণেই আমি মনে করি, পাকিস্তানের প্রশ্নে মুসলমানরা যদি জেদ না ছাড়ে তাহলে পাকিস্তান হবেই। আমি যে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সেখানে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হল; মুসলমানরা কি পাকিস্তান পেতে দৃঢ়সঙ্কল্প? অথবা পাকিস্তান কেবল এক জিগির মাত্র? এটা কি একটা ক্ষণস্থায়ী মনোভাব? কিংবা এটা কি তাদের একটা স্থায়ী উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

এ-ব্যাপারে মতপার্থক্য হতে পারে। একবার যদি এটা সুনিশ্চিত হয়ে যায় যে মুসলমানরা পাকিস্তান চায়, তবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না যে বিজ্ঞজনোচিত পন্থা হবে এর মূল নীতিটিকে মেনে নেওয়া।

অধ্যায় ১৪

পাকিস্তানের সমস্যাবলী

১

ভারতকে পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থানে বিভাজিত করলে যেসব বহুসংখ্যক সমস্যার উদ্ভব হবেই তার মধ্যে থাকবে নিম্নলিখিত তিনটি সমস্যা ঃ—

(১) বর্তমান ভারত সরকারের আর্থিক পরিসম্পদ ও দায়িত্বভার বন্টনের সমস্যা।

(২) এলাকাগুলির সীমা নির্দেশ করণের সমস্যা।

(৩) পাকিস্তান থেকে এবং বিপরীতক্রমে অধিবাসীদের স্থানান্তরিতকরার সমস্যা।

এই সমস্যাগুলির মধ্যে প্রথমটি আনুষঙ্গিক এই অর্থে যে, কারণ তা বিবেচ্য হবে তখনই যখন সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ ভারত বিভাজনে রাজি হবে। অন্য দুটি সমস্যা ভিন্নতর সম্বন্ধের ওপর নির্ভরশীল। পাকিস্তানের কাছে সেগুলি পূর্বশর্ত এই অর্থে যে, এমন বহু মানুষ আছেন যাঁরা পাকিস্তান সম্পর্কে মনস্থির করবেন না যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁরা সন্তুষ্ট হচ্ছেন, যে ওই সমস্যাগুলির কিছু যুক্তিযুক্ত ও ন্যায্য সমাধানসম্ভব। অতএব আমি পাকিস্তান সম্পর্কিত সমস্যাবলীর কেবলমাত্র দুটি সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবো।

২

পাকিস্তানের চৌহদ্দির প্রশ্নে আমরা এখনও পর্যন্ত মুসলিম লীগের কাছ থেকে কোনও সুস্পষ্ট ও প্রামাণিক বিবৃতি পাইনি। বস্তুত এটা হিন্দুদের অভিযোগগুলির অন্যতম যে মিঃ জিন্নাহ্ যখন পাকিস্তানের হয়ে ঘূর্ণাবর্তের মতো অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন, যার ফলে দেশের রাজনৈতিক বাতাবরণ দূষিত হয়ে উঠছে, তখনও পর্যন্ত তিনি তার প্রস্তাবিত পাকিস্তানের চৌহদ্দি সম্বন্ধে তার সমালোচকদের বিস্তারিত কিছু জানানো উপযুক্ত মনে করছেন না। মিঃ জিন্নাহ্ বরাবর এক-ই যুক্তি দেখিয়ে আসছেন যে, পাকিস্তানের চৌহদ্দি সম্বন্ধে আলোচনার সময় এখনও উপযুক্ত হয় নি এবং পাকিস্তানের মূলনীতি যখন স্বীকৃতি পাবে তখন পাকিস্তানের চৌহদ্দি কী হবে তা আলোচনার বিষয়বস্তু হবে। এটা একটা ভাল আলঙ্কারিক উত্তর হতে পারে, কিন্তু

তাদের নিশ্চয়ই কোনও সাহায্য করে না যারা এই সমস্যাটির শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে চায় এবং তার জন্য কোনও পথ অবলম্বন না করে যেটুকু সাহায্য করতে পারে যে ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। মিঃ জিন্নাহ্ এই ধারণার বশবর্তী যে, যদি কোনও ব্যক্তি পাকিস্তানের মূল নীতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় তবে সে পাকিস্তান সম্পর্কে মিঃ জিন্নার পরিকল্পনা মেনে নিয়ে বাধ্য হবে। এর চেয়ে বড় ভুল আর হতে পারে না। মানুষ পাকিস্তান সম্পর্কিত মূল নীতিটি মেনে নিতে পারে, যার একমাত্র অর্থ হল ভারতের বিভাজন। কিন্তু মূলনীতিটিকে মেনে নেওয়া কীভাবে মানুষটিকে মিঃ জিন্নার পরিকল্পনার কাছে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ তা বুঝা কঠিন। এটা অবশ্যই ঠিক যে, কোনও ব্যক্তির কাছে পাকিস্তানের পরিকল্পনা যদি সন্তোষজনক না হয়, তবে সে পাকিস্তানের মূলনীতিটির পক্ষে থাকলেও যে কোনও আকারের পাকিস্তানের বিরোধিতা করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তার থাকবে। অতএব পাকিস্তানের পরিকল্পনা এবং পাকিস্তানের মূলনীতি দুটি সম্পূর্ণ আলাদা প্রস্তাব। এই ধারণায় কোনও ভুলভ্রান্তি নেই। দৃষ্টান্ত হিসাবে এটা বলা যেতে পারে যে স্বায়ত্তশাসনের নীতিটি একটি বিস্ফোরক পদার্থের মতো। উপযুক্ত সময়ের আবশ্যকতা ও প্রয়োজন জরুরি প্রমাণিত হলে মানুষ নীতিগতভাবে এর প্রয়োগ সম্মত হতে পারে যে, এলাকাটি ধ্বংস করতে হবে। সেটা আগে না জানা পর্যন্ত কেউ-ই ডিনামাইটের ব্যবহারের সম্মতি দিতে পারে না। ডিনামাইট যদি পুরো কাঠামোটাকেই ধ্বংস করতে যায় অথবা যদি কোনও বিশেষ অংশ এর প্রয়োগ কোনও অঞ্চলে সীমাবদ্ধ করে রাখা সম্ভব না হয় তবে সে ডিনামাইট ব্যবহার করতে অসম্মত হতে পারে এবং সমস্যাটি সমাধান করার জন্য অন্য কোনও উপায় অবলম্বন করা অধিক পছন্দ করতে পারে। পাকিস্তানের মূলনীতির বাস্তবসম্মত রূপ রচনা করার জন্য অতএব চৌহদ্দীর সীমারেখার সুনির্দিষ্টকরণ এক প্রয়োজনীয় প্রাথমিক সূচনা হতে পারে। সমপরিমাণে পাকিস্তানের প্রকৃত অর্থে আন্তরিক অধিবক্তার পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়ে পাকিস্তানের পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় বিশদ বিবরণগুলি জনগণের কাছে লুকিয়ে না রাখা। তার পাকিস্তানের সীমারেখাগুলি ঘোষণা করতে অস্বীকার করে মিঃ জিন্নাহ্ যে অবাধ্যতা ও একগুঁয়েমিতা দেখিয়েছেন তা একজন কূটনীতিজ্ঞের ক্ষেত্রে ক্ষমার অযোগ্য। তৎসত্ত্বেও যারা পাকিস্তানের সমস্যাটির সমাধানে আগ্রহী তাদের মিঃ জিন্নাহ্ পূর্ণ বিবরণ দেওয়ার সৌজন্য প্রকাশ না করা পর্যন্ত পাকিস্তানের সমস্যা সমাধানের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অনুমানগুলির ভিত্তিতে কেবল যুক্তিটিকে কার্যকর করা দরকার। এই আলোচনায় আমি ধরে নেবো যে, মুসলিম

লীগ যা চায় তা হল এই যে পশ্চিম পাকিস্তানের সীমারেখা হওয়া উচিত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পঞ্জাব, সিন্ধু এবং বালুচিস্তানের প্রদেশগুলির বর্তমান সীমারেখা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সীমারেখা হওয়া উচিত, অসমের কয়েকটি জেলা অন্তর্ভুক্ত করে বর্তমান বঙ্গ প্রদেশের সীমারেখাগুলি।

৩

অতএব বিবেচ্য প্রশ্নটি হল; এই দাবিটা কি ন্যায়সঙ্গত? বলা হচ্ছে যে এই দাবিটি স্বায়ত্তশাসনের নীতির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই দাবি ন্যায্যতার বিষয়টি নিরূপণ করতে সক্ষম হবার জন্য স্বায়ত্তশাসনের নীতির কার্যপরিধি এবং সীমাবদ্ধতারগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশত এই ধরনের জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব আছে বলে মনে হয়। অতএব এই প্রশ্নটি দিয়েই শুরু করা প্রয়োজন মনে করি; স্বায়ত্তশাসনের এই নীতির **বাস্তবিক** এবং **আইনগত** অন্তর্নিহিত অর্থ কী? গত কয়েক বৎসর থেকে স্বায়ত্তশাসন শব্দটির প্রচলন হচ্ছে। কিন্তু শব্দটি এমন এক চিত্র অঙ্কিত করে যা আরও প্রাচীন। স্বায়ত্তশাসনের অন্তর্নিহিত ধারণাটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে দুটি পৃথক চিন্তাধারায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্বায়ত্তশাসন বলতে বুঝাতো জনগণের ইচ্ছানুসারে এক ধরনের সরকার গঠনের অধিকার। দ্বিতীয়ত স্বায়ত্তশাসনের অর্থ হচ্ছে বিদেশি জাতির কাছ থেকে জাতীয় স্বাধীনতা লাভের অধিকার, তা সরকারের রূপ যাই হোক না কেন। পাকিস্তানের জন্য আন্দোলনের স্বায়ত্তশাসনের সম্পর্কে আছ ওই দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণের বিচার।

পাকিস্তানের এই দিকটির আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রেখে আমার কাছে এটা জরুরি মনে হয় যে, স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রসঙ্গগুলিকে স্মরণে রাখা উচিত।

প্রথমত স্বায়ত্তশাসন অবশ্যই জনগণের দ্বারা হতে হবে। এই প্রসঙ্গটি এমন-ই সরল যে উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এর উপর জোর দেবার দরকার পড়েছে। স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্বন্ধে মুসলিম লীগ এবং হিন্দুমহাসভা উভয়েই দায়িত্বহীন ভাবে কাজ করছে মনে হয়। একটি এলাকাকে মুসলমানরা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছে কারণ ওই এলাকার অধিবাসীরা মুসলমান। এবং এমন এক এলাকাকেও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানাচ্ছে, কারণ ওই এলাকার শাসক একজন মুসলমান যদিও উক্ত এলাকার বেশির ভাগ মানুষ অ-মুসলমান। মুসলিম লীগ ভারতে স্বায়ত্তশাসনের সুবিধাটি দাবি করছে, সেই সঙ্গে প্যালেস্টাইনের ক্ষেত্রে

স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োগ করতে বিরোধিতা করছে। লীগ কাশ্মিরকে মুসলমানরাজ্য হিসাবে দাবি করছে, কারণ সেখানকার বেশির ভাগ মানুষ মুসলমান এবং হায়দরাবাদও দাবি করছে কারণ সেখানকার শাসক মুসলমান। অনুরূপভাবে হিন্দু মহাসভা একটি এলাকাকে হিন্দুস্থানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছে কারণ ওই এলাকার অধিবাসীরা অ-মুসলমান। এরা আরও একটি এলাকাকে হিন্দুস্থানের অংশ হিসাবে দাবি করতে এগিয়ে আসছে কারণ বেশির ভাগ অধিবাসী মুসলমান হলেও তার শাসক একজন হিন্দু। এই ধরনের বিচিত্র এবং পরস্পরবিরোধী দাবিগুলির মূলে সম্পূর্ণভাবে এই ঘটনাটিই আছে যে, পাকিস্তান সম্পর্কিত পক্ষগুলি, যথা, হিন্দু এবং মুসলমানরা হয় বুঝতে পারে না স্বায়ত্তশাসনের অর্থ অথবা স্বায়ত্তশাসনের নীতিটিকে বিকৃত করতে ব্যস্ত যাতে সুসংগঠিতভাবে অঞ্চলগুলিকে লুটের কাজ, বর্তমানে যে কাজে তারা লিপ্ত আছে বলে মনে হয়, চালিয়ে যাবার জন্য আত্মপক্ষ সমর্থন করতে সমর্থ হয়। স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে কি জড়িত আছে এবং সঠিক ধারণা যদি জনগণের না থাকে এবং নীতি মেনে চলার মত সততা যদি না থাকে এবং যে পরিণামই হোক না কেন তা যদি গ্রহণ করতে না পারে, তবে যখনই তার অঞ্চলগুলির পুনর্গঠনের প্রশ্নটি বিবেচ্য হয়ে উঠবে তখন ভারত এক চরম বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে পতিত হবে। অতএব যেটা এতই সরল যে উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়বে বলে মনে হবে না তার উপর জোর দেওয়াটা ভাল, এবং সেটা হল স্বায়ত্তশাসন হবে জনগণের নিজস্ব সিদ্ধান্ত, অন্য কারুর নয়।

দ্বিতীয় লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হল অনুজ্ঞাসূচক বৈশিষ্ট্যের মাত্রা যার দ্বারা স্বায়ত্তশাসনের নীতিটিকে ভূষিত করা যায় বলে কথিত আছে। মিঃ . ও'কোনার* যা বলেছেন

'স্বায়ত্তশাসনের মতবাদটি আদৌ কোনও সর্বজনীন নীতি নয়। এর সম্বন্ধে বড় জোর এ কথা বলা যেতে পারে যে, সাধারণ অর্থে, ঐক্য ও শান্তি সৃষ্টিতে ন্যায়বিচারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সুদৃঢ় কর্মপদ্ধতির নিয়ম এবং তার উদ্দেশ্য জনগণের উন্নতিবিধান তাদের নিজস্ব রীতিতে, যা সাধারণ অর্থে সর্বশ্রেষ্ঠ রীতি। কিন্তু তাকে আর স্থিতিগুলির বশ্যতা স্বীকার করতেই হবে, যার মধ্যে আকার ও ভৌগোলিক পরিস্থিতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে নিয়মটির প্রাধান্য পাওয়া উচিত কিনা অথবা নিয়মের বিরুদ্ধে পরিস্থিতির প্রাধান্য পাওয়া উচিত সেটা

* আয়ারল্যান্ডের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড।

নির্ধারিত হতে পারে কেবলমাত্র নিজের সাধারণ বুদ্ধি অথবা ন্যায় বোধের প্রয়োগের দ্বারা অথবা বেন্থামপন্থীরা যেভাবে বলতে পছন্দ করবে, সর্বাধিক সংখ্যার জন্য সর্বাধিক মঙ্গলের পরিপ্রেক্ষিতের দ্বারা—এই তিনটিই, যদি ঠিকমত বোঝা যায় প্রকৃত অর্থে একই বস্তুকে প্রকাশ করার বিভিন্ন পদ্ধতি কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের সমাধানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অসুবিধা দেখা দিতে পারে। কিছু তথ্য আছে যা একদিকে যায়, কিছু তথ্য ভিন্নমুখী। একশ্রেণীর তথ্য কিছু মানুষের মনে বিশেষ আবেদন পৌঁছে দিতে পারে, অন্যদের ক্ষেত্রে সামান্য বা কণামাত্রও দিতে পারে না। সমস্যাটি সেই জাতীয় হতে পারে যাকে বলা হয় লঘুভার সমস্যা, অর্থাৎ এমন কোনও সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া সম্ভব হয় না, যা মানবজাতির অধিকাংশের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে এটা ভুল তা বলার চেয়ে অন্যজাতির স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার দাবি অন্য জাতির পক্ষে সঙ্গত এটা বলা আর সম্ভব নয়। এটা ব্যক্তিগত মতামতের ব্যাপার, যেখানে সৎ এবং নিরপেক্ষ ধীশক্তি সম্পন্ন মানুষদের ভিন্নমত পোষণ করতে পারে।'

এই রকম কেন যে ঘটে তার দুটি কারণ আছে। প্রথমত জাতীয়তাবাদ এমন এক অলঙ্ঘ্য ও চূড়ান্ত নীতি নয় যা, অন্যসব কারণগুলিকে অতিক্রম করে এনে এক সুনিশ্চিত আবশ্যকীয় চরিত্র দিতে পারে। দ্বিতীয়ত কোনও বিশিষ্ট জাতির সত্তার রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের জন্য পৃথককরণ ততটা অপরিহার্য নয়।

তৃতীয় বিষয়টি স্মরণে রাখতে হবে স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারটি সম্পর্কে। কোনও এক জাতি সত্তার জন্য স্বায়ত্তশাসন সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার রূপ নিতে পারে। এটা কোন ধরনের রূপ নেবে তাকে নির্ভর করতেই হবে অধিবাসীদের আঞ্চলিক বিন্যাসের উপর। যদি কোনও জাতিসত্তা সহজে বিভাজন যোগ ও সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করে, তাহলে বাকি ব্যাপারগুলি অপরিবর্তিত থাকলে আঞ্চলিক স্বাধীনতার জন্য যুক্তি খাড়া করা যেতে পারে। জটছাড়ানো যায় না এভাবে পরস্পরের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে মিশে থাকার কারণে জাতিসত্তাগুলি এত বেশি পরিমাণে মিলে-মিশে গেছে যে যেসব এলাকা তারা দখল করে রেখেছে তা সহজে পৃথক করা যায় না এবং এই কারণে তারা সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা পাবার অধিকারী। এরূপ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বিভাজন এক অসম্ভব কাজ। তারা একসঙ্গে থাকতে বাধ্য। একমাত্র যে বিকল্পটি তাদের আছে, তা হল দেশান্তর গমন।

৪

স্বায়ত্তশাসনের কার্যক্ষেত্রের পরিধি ও সীমাবদ্ধতাগুলি ব্যাখ্যা করার পর এবং

আমরা পাকিস্তানের সীমারেখার প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করতে অগ্রসর হতে পারি। এইসব বিচার বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সীমারেখাটাই পাকিস্তানের সীমারেখা হয়ে থেকে 'যাক মুসলিম লীগে'র এই দাবি কতটা টেঁকসই? এই প্রশ্নের উত্তরটি আমার কাছে সম্পূর্ণ স্পষ্ট বলে প্রতীয়মান হয়। ভৌগোলিক বিন্যাস-ই বিচার্যবিষয়ের সমাধান করতে পারে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বালুচিস্তান ও সিন্ধুপ্রদেশের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানেরা একত্রে মিশে আছে। এই প্রদেশগুলিতে হিন্দুদের জন্য আঞ্চলিক পৃথকীকরণের ব্যাপারটি অসম্ভব হবে বলে মনে হয়। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য যে-ধরনের রাজনৈতিক রক্ষাকবচের উদ্ভাবন করা হতে পারে তাই নিয়েই হিন্দুদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। পঞ্জাব ও বাংলার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। মানচিত্রের দিকে এক নজর থাকলে দেখা যাবে যে এই দুই প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের বিন্যাসটি অন্য তিনটি প্রদেশে যেমন দেখা যায় তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। পঞ্জাব ও বাংলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বালুচিস্তান ও সিন্ধুর মত সমগ্র ভূতল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিশাল মুসলমান অধিবাসীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এবং তাদের মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপে বাস করতে দেখা যায় অ-মুসলিমদের। বঙ্গের এবং পঞ্জাবে হিন্দুরা দখল করে আছে দুটি স্বতন্ত্র এলাকা, যা সংলগ্ন এবং পৃথককরণযোগ্য। এই পরিস্থিতিতে মুসলমানরা যা দাবি করছে তা মেনে না নেওয়ার কোনও কারণ নেই, যে দাবিটি হল পঞ্জাব ও বঙ্গদেশের বর্তমান সীমারেখাগুলি পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের সীমারেখা হয়েই থাকবে।

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে অপরিহার্য ভাবে দুটি সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয়। একটি হল এই যে, পঞ্জাব ও বঙ্গদেশের অ-মুসলমানদের যথেষ্ট যুক্তি আছে যে-সব এলাকা তাদের দখলে আছে তার আঞ্চলিক পৃথককরণের দ্বারা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার। অপরটি হল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বালুচিস্তান এবং সিন্ধুদেশের অ-মুসলমানদের কোনও দাবি নেই পৃথককরণ করার এবং তারা শুধু সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক রক্ষাকবচের অধিকারী। ওই একই বক্তব্যকে অন্যভাবে বলতে হলে বলা যাবে যে, সিন্ধুদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বালুচিস্তানের সীমারেখাগুলি যেমন আছে তেমন রাখার দাবি করার জন্য মুসলিম লীগের দাবির বিরোধিতা করা যায় না। কিন্তু পঞ্জাব ও বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে ওই ধরনের দাবি সমর্থনযোগ্য নয় এবং এই প্রদেশগুলির অ-মুসলমানরা যদি তারা চায় তবে এই দুটি প্রদেশের সীমারেখাগুলি নতুন করে অঙ্কন করার দ্বারা তাদের অধিকৃত অঞ্চল পৃথক করার দাবি করতে পারে।

৫

একথা ভাবা উচিত ছিল যে সীমারেখাগুলি নতুন করে অঙ্কন করার জন্য পঞ্জাবের অ-মুসলমান সংখ্যালঘুদের ওইরূপ দাবিকে মুসলিম লীগ ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত দাবি মনে করতে পারে। সীমারেখাগুলি নতুন করে অঙ্কন করার সম্ভাবনাটিকে ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে মুসলিম লীগের অনুমোদিত লাহোর প্রস্তাব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। প্রস্তাবে* বলা হয়েছে ঃ—

'ভৌগোলিকভাবে সংলগ্ন এলাকাগুলিকে ভূখণ্ডহিসাবে চিহ্নিত করার দ্বারা সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠা যা ওইভাবে গঠিত হবে, প্রয়োজনানুসারে অনুরূপ আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাস সহ যার ফলে যে সব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যায় গরিষ্ঠ। যেমন ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ণ বলয়গুলিতে আছে, তাদের দলগতভাবেঐক্যবদ্ধ করা হবে স্বাধীন রাজ্যগুলি গঠিত করার জন্য মুসলমানদের স্বাধীন জাতীয় স্বদেশ হিসাবে যেখানে অনুষঙ্গী এলাকাগুলি হবে স্বশাসিত এবং সার্বভৌম।'

মুসলিম লীগের এই অবস্থাটাই যে অব্যাহত ছিল তা সুস্পষ্ট হয় 'ক্রিপস প্রস্তাব' সম্পর্কে মুসলিম লীগের অনুমোদিত প্রস্তাবে যা যে কেউ সেটা গড়ার চেষ্টা করলেই জানতে পারবে। ১৯৪২ সালের ১৬ই নভেম্বর জলন্ধরে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য সভায় মিঃ জিন্নাহ্ তাঁর মনোভাব নিম্নলিখিত ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন বলে প্রতিবেদিত আছে।—

'সর্বশেষ কৌশল—আমি এটাকে কৌশল ছাড়া অন্য কিছু বলি না—যা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে অজ্ঞ জনসাধারণকে হতবুদ্ধি করে ও ভুলপথে চালিত করে এবং যারা এই খেলাটা খেলছে তারা সেটা বুঝতেও পারে, এবং সেই কৌশলটি হল এই যে, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কেন কেবল মাত্র মুসলিমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়কে তা দিতে চাওয়া হবে না? সকলের-ই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আছে এ কথা বলার আরও তারা বলছে যে পঞ্জাবকে অনেকগুলি খণ্ডে অবশ্যই ভাগ করতে হবে; উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুদেশের মতো। ফলে শতশত পাকিস্তান হয়ে যাবে।

উপ-জাতীয় গোষ্ঠীগুলি

'সমগ্র ভারতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আছে এই নতুন সূত্রটির স্রষ্টা কে? হয় এটা পর্বত-প্রমাণ অজ্ঞতা অথবা অপকারেচ্ছা এবং কৌশল।

আমি তাদের একটা উত্তর দিতে চাই, মুসলমানরা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দাবি করছে কারণ একটি প্রস্তাবিত অঞ্চলে যা তাদের স্বদেশ এবং সেই বলয়ে, যেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, জাতীয় গোষ্ঠী। সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা জাতীয় গোষ্ঠীগুলিকে একটি রাজ্য দেওয়া হয়েছে ইতিহাসে এমন কোনও ঘটনা কি জানা আছে আপনাদের? তাদের জন্যে কোথায় আপনি রাজ্য দিতে যাচ্ছে? সেক্ষেত্রে যুক্তপ্রদেশে ১৪ শতাংশ মুসলমান আছে, তাহলে কেন তাদের জন্য একটা রাজ্য দেওয়া হবে না? যুক্তপ্রদেশে মুসলমানরা জাতীয় গোষ্ঠী নয়, তারা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। অতএব সাংবিধানিক ভাষায় তাদের বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে উপ-জাতীয় গোষ্ঠী হিসাবে যে কোনও সভ্য সরকারের কাছ থেকে যেটা সংখ্যালঘুদের ন্যায্য পাওনা তার চেয়ে বেশি কিছু তারা আশা করতে পারে না। আশা করি আমি অবস্থাটি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলেছি। মুসলমানরা উপ-জাতীয় গোষ্ঠী নয়; স্বায়ত্তশাসন দাবি করা ও তার অধিকার প্রয়োগ করার জন্মগত অধিকার তাদের আছে।'

এইমূল বিষয়টি মিঃ জিন্নাহ্ একেবারেই ধরতে পারেননি। তাঁর সমালোচকরা যে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন সাধারণভাবে অ-মুসলিম সংখ্যালঘুদের সম্পর্কিত নয়। এর সম্পর্ক ছিল পঞ্জাব ও বঙ্গদেশের অ-মুসলমান সংখ্যালঘুদের সঙ্গে। মিঃ জিন্নাহ্ কি তাঁর উপ-জাতির তত্ত্বের দ্বারা সেই সব অ-মুসলমান সংখ্যালঘুদের যারা একটি সুদৃঢ়ভাবে সংযুক্ত এবং সহজে পৃথককরণযোগ্য অঞ্চল দখল করে আছে, তাদের বক্তব্যের নিষ্পত্তি করতে চান? যদি তাই হয়, তবে মানুষ একথা বলতে বাধ্য হবে যে তাঁর চেয়ে অপরিণত প্রস্তাব যে কোনও রাজনৈতিক মুদ্রিত রচনাতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কার উপজাতির বিষয়টি অশ্রুতপূর্ব। এটা শুধু যে একটা চাতুর্যপূর্ণ বিষয় তাই নয়, সেই সঙ্গে অসঙ্গতও বটে। উপজাতির তত্ত্ব বলতে কী বুঝায়? আমি যদি এর ভাবার্থটি বুঝে থাকি ঠিকমত, তবে তার অর্থ এই যে পৃথককরণ সম্ভব হলেও উপজাতিকে সেই জাতি থেকে পৃথক করা যাবে না, যার সঙ্গে সে যুক্ত এর অর্থ এই যে জাতি ও উপজাতির মধ্যস্থিত সম্বন্ধটি সেই সম্পর্কের চেয়ে উন্নততর নয়, যা মানুষ ও তার আস্থার সম্পত্তির মধ্যে অথবা সম্পত্তি ও তার অনুষঙ্গের মধ্যে বর্তমান থাকে। অস্থাবর সম্পত্তি এর মালিকদের সঙ্গে থাকে, অনুষঙ্গগুলি সম্পত্তির সঙ্গে, তাই উপজাতিও থাকে জাতির সঙ্গে মিঃ জিন্নার সওয়াল জবাব এই ধরনেই যুক্তিশৃঙ্খল ছিল। কিন্তু মিঃ জিন্নাহ্ কি গুরুগম্ভীর ভাবে এই যুক্তি দেখাতে চান যে পঞ্জাব ও বঙ্গদেশের হিন্দুরা অস্থাবর সম্পত্তি মাত্র যার ফলে পঞ্জাবের মুসলমানরা এবং বঙ্গদেশের মুসলমানরা যেখানে তাদের চেলে পাঠাতে

ইচ্ছা করবে সেখানেই তাদের যেতে হবে? এই ধরনের যুক্তি তর্ক কোনও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে আদৌ গ্রহণ যোগ্য হবে না। এটা অত্যন্ত অযৌক্তিক যুক্তিতর্ক এবং মিঃ জিন্নার মত এত অভিজ্ঞ একজন ব্যবহারজীবীর পক্ষে এটা যে অযৌক্তিক সেটা বুঝতে অসুবিধা হওয়া উচিত নয়। যদি সংখ্যাগতভাবে ক্ষুদ্রতর জাতি সংখ্যাগতভাবে বৃহত্তর জাতির পরিপ্রেক্ষিতে একটি উপজাতি বলে গণ্য হয় এবং আঞ্চলিক বিভাজনের কোনও অধিকার যদি তাদের না থাকে, তবে একথা কেন বলা যাবে না যে সমগ্র ভারতকে ধরলে হিন্দুরা একটি জাতি এবং মুসলমানরা উপজাতি এবং উপজাতি হিসাবে আঞ্চলিক বিভাজনের বা স্বায়ত্তশাসনের কোনও অধিকার তাদের নেই?

পাকিস্তানের বৈধতা সম্পর্কে বেশ কিছুটা পরিমাণে সন্দেহের অবকাশ আগের থেকেই বর্তমান। ভুল হোক, অথবা ঠিক, অধিকাংশ মানুষের ধারণা দোষ দুষ্টতায় ভরা। তারা মনে করে যে, এটার দুটি উদ্দেশ্য আছে, একটি প্রত্যক্ষ, অপরটি চরম। কথিত হচ্ছে যে প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যটি হল প্রতিবেশী মুসলমান দেশগুলির সঙ্গে যোগ দেওয়া এবং একটি মুসলমান যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা। এবং মুসলমান যুক্তরাষ্ট্র চরম উদ্দেশ্যটি হল হিন্দুস্থানে আক্রমণ করা এবং হিন্দুদের জয় করা অথবা পুনর্বশীভূত করা ও ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা অন্যেরা মনে করে যে, পাকিস্তান হচ্ছে পণবন্দী করার প্রকল্পের শেষ পর্যায়, দাবির পিছনেই সার অবস্থান, যা মিঃ জিন্না তার চৌদ্দ দফায় সন্নিবেশিত করেছেন পৃথক মুসলমান প্রদেশ সৃষ্টি করার জন্য। মুসলিমদের মনের কথা কেউই যাচাই করতে পারে না। এবং পাকিস্তানের দাবির পিছনে প্রকৃত উদ্দেশ্যটির নাগাল পায় না। পাকিস্তানের হিন্দু প্রতিপক্ষরা যদি সন্দেহ করে যে মুসলমানদের প্রকৃত উদ্দেশ্যগুলি আপাত প্রতীয়মান উদ্দেশ্যগুলি থেকে ভিন্নতর, তবে তারা সেগুলির উপর লক্ষ্য রাখতে পারে এবং সেই অনুসারে পরিকল্পনা করতে পারে। পাকিস্তান গঠনের উদ্দেশ্যগুলির পিছনে যে খারাপ অভিসন্ধি তার জন্য তারা এর বিরোধিতা করতে পারে না। কিন্তু তারা মিঃ জিন্নাকে এ প্রশ্নটি করার অধিকারী, কেন তিনি পাকিস্তানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সৃষ্টি করতে চাইছেন? পাকিস্তানের পিছনে উদ্দেশ্যগুলি যতই মন্দ হোক না কেন, তার মধ্যে অন্তত একটা সদগুণ থাকা উচিত। তার মধ্যে অন্তত একটা সদগুণ থাকা উচিত। পাকিস্তানের ভিতরে সাম্প্রদায়িক সমস্যা থাকতে না দেওয়াটাই হওয়া উচিত পাকিস্তানের আদর্শ। এটাই হচ্ছে ন্যূনতম নৈতিক উৎকর্ষতা যা পাকিস্তানের কাছ থেকে আশা করা যায়। পাকিস্তান যদি সাম্প্রদায়িক সমস্যা

দ্বারা জর্জরিত হতে চায়, যেমন ভারতের হয়েছে, তবে পাকিস্তানের দরকারই বা কী? যদি তা সাম্প্রদায়িক সমস্যার হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে, তবে তাকে স্বাগত জানানো যেতে পারে। এটা এড়ানোর পন্থা হল সীমারেখাগুলিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা যাতে তা হয়ে উঠবে একটি মানবজাতির রাজ্য, যেখানে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে শত্রুতা থাকবে না। সৌভাগ্যবশত এটাকে একটি মানবজাতির রাজ্য করা যায় যদি শুধু মিঃ জিন্নাহ্ তা হতে দেন। দুর্ভাগ্যবশত মিঃ জিন্না এর বিরোধিতা করছেন। এরই মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে সন্দেহের প্রধান কারণটি, এবং মিঃ জিন্নাহ্ সেই সন্দেহ নিরসন করার পরিবর্তে সেটা আরও বাড়িয়ে তুলছেন জাতি ও উপজাতি হিসাবে অসম্ভব, অযৌক্তিক এবং কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টির দ্বারা।

এই জাতীয় অসম্ভব এবং অযৌক্তিক প্রস্তাবগুলির আশ্রয় নেওয়ার পরিবর্তে এবং যা অসমর্থনীয় তাকে সমর্থন করে ও যা ন্যায্য তার বিরোধিতা করে এটা কি ভাল হয় না যে মিঃ জিন্নাহ্ তাই করুন যা স্যার এডওয়ার্ড কারসন করেছিলেন আলস্টারের সীমারেখা পুনর্নির্ধারণ করার ব্যাপারে? আয়ারল্যান্ডের স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টিকে যে উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল সেটা যারা জানেন তাঁরা জানেন যে ১৯১১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত কারিগভান বৈঠকে স্যার এডওয়ার্ড কারসন তাঁর নীতি সূত্রবদ্ধ করেছিলেন যাতে বলা হয়েছিল আলস্টারে রাজতান্ত্রিক সংঘদের সরকার গঠিত হবে অথবা আলস্টার সরকার গঠিত হবে, কিন্তু স্বায়ত্তশাসন সরকার কখনই হবে না। রাজতান্ত্রিক সংসদ যখন তার সরকার প্রত্যাহারের কথা বলছিল, তখন এই নীতির অর্থ হল আলস্টারে একটি সামরিক সরকারের গঠন। ১৯১১ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বেলফাস্টে অনুষ্ঠিত আলস্টার ইউনিয়নপন্থী কাউন্সিল, কাউন্টিগ্রান্ড অরেঞ্জ লজেস এবং ইউনিয়ানিস্ট ক্লাবগুলির প্রতিনিধিত্ব করে প্রেরিত প্রতিনিধিদের যৌথ বৈঠকে অনুমোদিত প্রস্তাব এই নীতিটি সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। আলস্টারের সামরিক সরকার স্বায়ত্তশাসন বিধেয়ক পাস হবার দিন থেকে বলবৎ হবার কথা ছিল। এই নীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল সামরিক সরকারকে সেই সব জেলাগুলির উপর যা তারা আলস্টারপন্থী নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সামগ্রিক ক্ষেত্রাধিকার দিয়েছিল।

'সেই সব জেলাগুলি যা তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে শব্দগুচ্ছ নিঃসন্দেহে আলস্টারের সমগ্র প্রশাসনিক বিভাগগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলতে চেয়েছিল বর্তমানে আলস্টারের এই প্রশাসনিক বিভাগ নয়টি জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এগুলির মধ্যে তিনটি ছিল মাত্রাতিরিক্তভাবে ক্যাথলিক। এর অর্থ হল তাদের

ইচ্ছার বিরুদ্ধে আলস্টারের অধীনে তিনটি ক্যাথলিক জেলাকে রাখতে বাধ্য হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্যার এডওয়ার্ড কারসন কী করলেন? মাত্রাতিরিক্তভাবে তিনটি ক্যাথলিক জেলাসহ আলস্টার যে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে একথা বুঝতে বেশি সময় লাগেনি স্যার এডওয়ার্ড কারসনের প্রকৃত সাহসী নেতার মত ঘোষণা করলেন যে, তিনি প্রস্তাব দিচ্ছেন নিজের ক্ষতি কমিয়ে আনছেন এবং আলস্টারকে নিরাপদ করতে চাইছেন। ১৯২০ সালের ১৮ মে হাউস অফ কমন্সে তিনি তার ভাষণের মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে তিনি মাত্র ৬টি জেলা নিয়েই খুশি হবেন। কেন তিনি মাত্র ৬টি জেলা নিয়ে খুশি হচ্ছেন তার কারণ দর্শাতে গিয়ে তিনি যে ভাষণটি দিয়েছিলেন সেটা উদ্ধৃত করার যোগ্য। তিনি যা বলেছিলেন* ঃ—

'প্রকৃত সত্যটি এই যে, পর পর বিভাগগুলিতে এবং শহরস্থলীর পর শহরস্থলীতে সন্ধান চালিয়ে এবং পুরো বিষয়টি সম্বন্ধে জানার জন্য বহু উদ্বেগপূর্ণ ঘন্টা এবং উদ্বেগপূর্ণ দিন কাউন্সিলের পর আমরা এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছিলাম, যে ডোনেগালে, কাভেন এবং মানাঘনে এর সরকারের দায়িত্বশীল হতে পারে বেলফাস্টে এমন একটি সংবাদ সাফল্যের সঙ্গে চালু করার কোনও সম্ভাবনাই আমাদের নেই। অতএব এটা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরর্থক এখানে আমরা এবং ভান করা যে আমরা যে কাজটা করতে পারব। স্বাভাবিকভাবেই যতটা সম্ভব বড় এলাকা আমরা পেতে পছন্দ করব। জানি জোর করে হাটিয়ে নেওয়ার এইপদ্ধতি সব দেশেই বর্তমান, যে সরকার গঠিত হয়েছে তার অধিক্ষেত্র বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য, কিন্তু এই তিনটি জেলার ভার যদি আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তবে আমরা জানি যে সরকার ব্যর্থ হবে, তাই ওই ধরনের সরকার গঠনের দায়িত্ব নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।'

এই কথাগুলি সুবিবেচিত, বিচক্ষণ ও অত্যন্ত নির্ভীক। যে পরিস্থিতিতে কথাগুলি উচ্চারিত হয়েছিল তার সঙ্গে সেই পরিস্থিতির খুব মিল আছে যা পাকিস্তান নীতির প্রয়োগের দ্বারা পঞ্জাব ও বঙ্গদেশে সৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যদি মুসলিম লীগ ও মিঃ জিন্না এক শান্তিপূর্ণ পাকিস্তান চান তবে ওই কথাগুলি ভাল করে লক্ষ্য করার বিষয়টি তাঁরা যেন ভুলে না যান। পঞ্জাব ও বঙ্গদেশের অ-মুসলমান সংখ্যালঘুদের রক্ষাকবচের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে থাকার কথা বলার কোনও মানে হয় না। মুসলমানরা যদি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে প্রস্তুত না থাকে, তবে কেন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিন্দু সংখ্যালঘুদের সন্তুষ্ট থাকতে বলা হবে? মুসলমানরা যদি

হিন্দুদের বলতে পারে, গোল্লায় যাক তোমাদের রক্ষাকবচ, আমরা তোমাদের দ্বারা শাসিত হতে চাইনা"—তবে যে যুক্তি কারসন ব্যবহার করেছিলেন রেডমণ্ডের বিরুদ্ধে—সেই একই যুক্তি ফিরিয়ে দিতে পারে পঞ্জাব ও বঙ্গদেশের হিন্দুরা রক্ষাকবচের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকবার যে প্রস্তাব মুসলমানরা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে। মূল বক্তব্যটি হল এই যে, পাকিস্তানের সমস্যাটির শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছবার জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচিত হয়নি। অসির ঝনঝনানি বা শক্তি প্রদর্শনে কাজ হবেনা। প্রথমত এটা এমন এটা খেলা যা দুজনে খেলতে হবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, অস্ত্রশস্ত্র ক্ষমতার একটা অঙ্গ হতে পারে, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র থাকাটাই যথেষ্ট নয়। রুশোর ভাষায় ঃ 'সব সময়ে প্রভুত্ব করার জন্য সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কথাই পর্যাপ্ত শক্তিশালী হবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত সে তার ক্ষমতাকে অধিকার এবং আনুগত্যকে কর্তব্যে রূপান্তরিত করছে। একমাত্র নীতিজ্ঞান-ই পারে ক্ষমতাকে অধিকার এবং আনুগত্যকে কর্তব্যে রূপান্তরিত করতে। লীগের এটা দেখা অবশ্য কর্তব্য যে পাকিস্তানের জন্য তার দাবি নীতিজ্ঞানের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৬

সীমারেখার সমস্যাবলী সম্পর্কে এ হল পর্যাপ্ত। এবং আমি সংখ্যালঘুদের সমস্যার নিয়ে আলোচনা করব, যারা সীমারেখাগুলি নতুন করে অঙ্কিত হবার পরেও পাকিস্তানের মধ্যে থাকতে বাধ্য হবে। তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য দুটি পদ্ধতি আছে।

প্রথমটি হল, সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতির অধিকারগুলির সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাখা। ভারতীয়দের কাছে এটা একটা অত্যন্ত পরিচিত ব্যাপার এবং এটা নিয়ে বিশদ আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয়টি হল সংখ্যালঘুদের পাকিস্তান থেকে হিন্দুস্থানে স্থানান্তর করা। বহু মানুষ এই সমাধানটিকে বেশি পছন্দ করে এবং পাকিস্তানের ব্যাপারে রাজি ও ইচ্ছুক হবে যদি এটা দেখানো যেতে পারে যে জনসংখ্যার বিনিময় সম্ভব। কিন্তু তারা এটাকে নড়বড়ে ও বিভ্রান্তিকর সমস্যা বলে মনে করে। এটা নিঃসন্দেহে এক আতঙ্ক-পীড়িত মনের লক্ষণ। যদি ঠাণ্ডা মাথায় ও শান্তভাবে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা যায় তবে দেখা যাবে যে সমস্যাটি নড়বড়েও নয়, বিভ্রান্তিকরও নয়।

সমস্যাটির পরিমাণ নিয়ে আলোচনা দিয়েই শুরু করা যাক। এই স্থানান্তর কোন অনুপাতের ভিত্তিতে হবে? এই অনুপাতটি নির্ধারণ করার জন্য তিনটি বিষয়ে

মনোযোগ দিতে হবে। প্রথম ক্ষেত্রে যদি পঞ্জাব ও বঙ্গদেশের সীমারেখা নতুন করে অঙ্কিত হয়, তবে এই দুটি প্রদেশের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার স্থানান্তরের প্রশ্নই থাকবে না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানে বসবাসকারী মুসলমানরা পাকিস্তানে অভিপ্রয়াণ করার কথা বলছে না, কিংবা লীগও তাদের স্থানান্তরকরণ চায় না। তৃতীয় ক্ষেত্রে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং বালুচিস্তানের হিন্দুরা প্রব্রজন (Migrate) করতে চায় না। যদি এই অনুমানগুলি সত্য হয় তবে জনগণের স্থানান্তরকরণের সমস্যাটি আদৌ কোনও নড়বড়ে সমস্যা হবে না। বস্তুত এটা এতই সামান্য যে এটাকে আদৌ সমস্যা বলে গণ্য করার প্রয়োজন নেই।

ধরে নেওয়া যাক যে, এটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এটা কি তবে বিভ্রান্তিকর সমস্যা হবে? অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে এটা আদৌ তেমন সমস্যা নয়, যার সমাধান করা অসম্ভব। এই ধরনের সমস্যার সমাধান আবিষ্কার করতে হলে এটা এভাবে স্থির করা যেতে পারে এই প্রশ্ন করে যে, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে মানুষকে যদি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অভিপ্রয়ান করতে হয় তবে সম্ভাব্য কী কী অসুবিধা হবে। নিম্নোক্তগুলি যথেষ্ট সুস্পষ্ট ঃ (১) অধিবাসীদের স্থানান্তরকরণের বিষয়টিকে কার্যকর ও সুসাধ্য করার প্রশাসনিক ব্যবস্থা। (২) প্রতিষেধের (Prohibition) ব্যাপারে সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ করণ। (৩) প্রব্রজনকারী পরিবার কর্তৃক মালপত্র হস্তান্তর করার ওপর সরকার কর্তৃক গুরুভার কর ধার্য করা। (৪) প্রব্রজনকারী পরিবারের পক্ষে তার নতুন আবাসস্থলে স্থাবর সম্পত্তি নিয়ে যাওয়ার অসাধ্যতা। (৫) প্রব্রজনকারী পরিবারের সম্পত্তির মূল্য অন্যায়ভাবে কমিয়ে দেওয়ার জন্য অবৈধ উপায় অবলম্বনের আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারে বাধাদানের অসুবিধা। (৬) বাজারে বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পত্তির পূর্ণমূল্য আদায়ে অসমর্থ হলে ক্ষতিপূরণদানের ভীতি। (৭) যে দেশ ছেড়ে চলে আসা হচ্ছে, সেখান থেকে প্রব্রজনকারী পরিবারের পক্ষে উত্তর-বেতনের (Pension) বিনিময়ে যে ব্যক্তির মালিকানা বা অংশীদারিত্ব কিনে নেওয়া হয়েছে, তার প্রাপ্য এবং অন্যান্য ব্যয় ভার আদায় করার অসুবিধা। (৮) কোন মুদ্রায় অর্থ এরূপ করা হবে তা নির্ধারন করার অসুবিধা। যদি এই সব অসুবিধাগুলি দূর করা হয়, তবে অধিবাসীদের স্থানান্তরকরণের পথটি সুস্পষ্ট হয়।

প্রথম তিনটি অসুবিধা সহজেই অপসারিত হতে পারে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান এই দুই রাজ্যের দ্বারা যদি তারা একটি সন্ধিচুক্তি করতে রাজি হয় যাতে একটি অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত থাকবে, যার ভাষা নিম্নবর্ণিতের মত হতে পারে।—

'পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের সরকার একটি আয়োগ নিযুক্ত করতে রাজি হবে, যাতে সমসংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে এবং তার সভাপতিত্ব করবেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি উভয়ের দ্বারা মনোনীত হবেন এবং যিনি এই দুটি সরকারের কোনওটিরও অধিবাসী হবেন না।

'আয়োগ এবং তার সমিতিগুলি উভয়ের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার ক্রিয়াকর্ম বাবদ খরচ পত্রাদি দুই সরকার সমান অনুপাতে বহন করবে।

''পাকিস্তান সরকার এবং হিন্দুস্থান সরকার এতদ্দ্বারা তাদের রাজ্যস্থিত তাদের সকল জাতিগুলিকে, যারা সংখ্যালঘু মানবজাতি, তাদের দেশান্তরী হওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করতে অনুমতি দিতে সম্মত।

''উপযুক্তরাজ্যগুলির সরকার এই অধিকার প্রয়োগ করত এবং প্রব্রজন করার স্বাধীনতায়, প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে, কোনও প্রকারের বাধা দেবার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করার কাজে সর্বতোভাবে সুব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। অভিপ্রয়ান করার স্বাধীনতার ব্যাপারে বিরোধিতাকারী সকল প্রকারের বিধি ও প্রবিধানকে বাতিল বলে বিবেচিত হবে।'

সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত চতুর্থ ও পঞ্চম অসুবিধাগুলির কার্যকরভাবে সমাধান করা যাবে সন্ধি-অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত শর্তগুলি অন্তর্ভুক্ত করে ঃ

'যারা এই অনুচ্ছেদগুলি অনুসারে প্রব্রজন করার অধিকারের সুবিধা নিতে বদ্ধপরিকর, তাদের অধিকার থাকবে তাদের যে-কোনও ধরনের অস্থাবর সম্পত্তি সঙ্গে নেওয়ার বা পরিবহন করে নিয়ে যাওয়ার অধিকার থাকবে ও তারজন্য এই বাবদ কোনও শুল্ক আরোপ করা যাবে না।

'স্থাবর সম্পত্তির ব্যাপারে হিসাব-নিষ্পত্তি করতে আয়োগ নিম্নলিখিত শর্তাদি অনুসারে ঃ—

(১) প্রব্রজনকারীর স্থাবর সম্পত্তির মূল্যের পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য আয়োগ নিয়োগ করবে একটি বিশেষজ্ঞ সমিতি। সংশ্লিষ্ট অভিপ্রয়ানকারী ওই সমিতিতে তাঁর নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি রাখতে পারবেন।

(২) প্রব্রজনকারীর স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য আয়োগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।'

ক্ষতি পরিশোধ করা, উত্তর-বেতনের বিনিময়ে যে ব্যক্তির মালিকানা বা অংশীদারিত্ব কিনে নেওয়া হয়েছে তার প্রাপ্য ও অপাপ্য ব্যয়ভার প্রদানের জন্য কোন মুদ্রায় তা প্রদান করা হবে তা সুনির্দিষ্ট করা এবং সমস্ত বাকি অসুবিধাগুলির ব্যাপারে সন্ধির নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলি পর্যাপ্ত হবে তা পূরণ করার জন্য ঃ

'(১) প্রব্রজনকারীর স্থাবর সম্পত্তির নিরুপিত মূল্য এবং বিক্রয়মূল্যের পার্থক্যটি যে দেশ থেকে প্রস্থান করা হচ্ছে তার সরকার কর্তৃক আয়োগকে হাতে তুলে দিতে হবে যে মুহূর্তে আয়োগ ওই উদ্ভূত ঘাটতির কথা জ্ঞাপন করবে। এই অর্থ প্রদানের এক চতুর্থাংশ যে দেশ থেকে প্রস্থান করা হচ্ছে তার মুদ্রায় এবং তিন-চতুর্থাংশ স্বর্ণে বা স্বল্পমেয়াদী স্বর্ণ তমসুকে প্রদান করা যেতে পারে।

'(২) আয়োগ প্রবসিতকারীদের (emigrants) উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে নির্ধারিত স্থাবর সম্পত্তির মূল্যের পরিমাণ অগ্রিম প্রদান করবে।

'(৩) বর্তমান সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হবার তারিখে প্রবসিতকারী কর্তৃক অর্জিত সকল অসামরিক ও সামরিক উত্তর-বেতন অধমর্ণ সরকারের খরচে মূলধনরূপে প্রয়োগ করা হবে, যা অবশ্যই আয়োগকে দিতে হবে ওইগুলির প্রাপকদের খাতে।

'(৪) প্রবসনকে সাহায্য করার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল আয়োগে আগ্রহী রাজ্যগুলিকে অগ্রিম প্রদান করতে হবে।''

জনসংখ্যার স্থানান্তরকরণ সম্পর্কিত অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য এই ব্যবস্থাগুলি পর্যাপ্ত নয়? অবশ্য আরও অসুবিধা আছে। কিন্তু সেগুলিও অনতিক্রম্য নয়। সেগুলির সঙ্গে নীতির প্রশ্নগুলি জড়িত। প্রথম প্রশ্নটি হল, জনসংখ্যার এই স্থানান্তরকরণ বাধ্যতামূলক, অথবা তা ঐচ্ছিক হবে? দ্বিতীয়টি হল ঃ সরকার মদতপুষ্ট এই স্থানান্তরকরণের অধিকার সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে, অথবা কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে? তৃতীয়টি হল, এই সব ব্যবস্থাগুলি বিশেষ করে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের ব্যাপারে ক্ষতি-পূরণ করার ব্যবস্থাদির দ্বারা সরকার কত কাল বাধ্য থাকবে উত্তরদায়ী থাকতে? ব্যবস্থাগুলি এক সীমিত সময় সীমার শর্তাধীন থাকবে অথবা উত্তরদায়িত্ব অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে?

প্রথম বিষয়টি সম্বন্ধে বলা যায় যে, দুটিই করা সম্ভব এবং এরকম দৃষ্টান্ত আছে যে দুটিকেই কার্যকর রাখা হয়েছে। গ্রিস এবং বালগেরিয়ার মধ্যে জনসংখ্যার স্থানান্তরকরণ যখন ছিল ঐচ্ছিক ভিত্তিতে তখন গ্রিস ও তুরস্কের মধ্যে তা ছিল

বাধ্যতামূলক। বাধ্যতামূলক স্থানান্তরকরণ আপাতদৃষ্টিতে ভুল বলে অনুভূত হয়। যদি কোনও ব্যক্তি ইচ্ছুক না হয় তার পূর্বপুরুষের বাসস্থান পরিবর্তন করতে, যদি না সে যেখানে আছে সেখানে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করতে চাওয়ার ফলে রাজ্যটি শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, অথবা ঐরূপ স্থানান্তরকরণ তার স্বার্থে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে তবে তাকে চলে যেতে বাধ্য করা সঙ্গত হবে না। যেটা প্রয়োজন তা হল এই যে, যারা স্থানান্তরে যেতে ইচ্ছুক তারা তা বিনা প্রতিবন্ধকতায় এবং ক্ষতিস্বীকার না করে তা করতে সক্ষম হবে। অতএব আমার অভিমত এই যে স্থানান্তরকরণে জোর করা ঠিক হবে না, বরং যারা স্থানান্তরে যাওয়ার জন্য তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে তাদের জন্য দরজা খুলে রাখা উচিত।

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে বলা যায় যে, এটা সুস্পষ্ট যে, সরকার মদতপুষ্ট স্থানান্তরকরণের পরিকল্পনাটির সুযোগ-সুবিধা নিতে শুধু দেওয়া হবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের। কিন্তু এই বিধি-নিষেধটিও পর্যাপ্ত না হতে পারে তাদের বাদ দেওয়ার জন্য যাদের এই পরিকল্পনার সুযোগ-সুবিধা পাওয়া উচিত নয়। এটা সেইসব সুনির্দিষ্ট সংখ্যালঘুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা অবশ্যই উচিত, যারা জন্মগত অথবা ধর্মীয় পার্থক্যগুলির জন্য নিশ্চিত ভাবে বৈষম্যের অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার শিকার হতে পারে।

তৃতীয় বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রচণ্ড মতপার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে। বিষয়টিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে এটা বলা যেতে পারে যে, সরকারি খরচে প্রব্রজন করবার স্বেচ্ছা-নির্বাচন ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য অনির্দিষ্টকালের সময়সীমা অবাধ রাখতে কোনও সরকারকে বাধ্য করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কোনও ব্যক্তিকে এটা বলা আদৌ অন্যায্য নয় যে, যদি সে পূর্বোল্লিখিত অনুচ্ছেদগুলিতে সন্নিবেশিত রাজ্য মদতপুষ্ট অভিপ্রয়ান প্রকল্পের ব্যবস্থাগুলির সুযোগসুবিধা নিতে চায় তবে একটি উল্লেখিত সময়কালের মধ্যে অভিপ্রয়ান করার স্বেচ্ছা-নির্বাচন ক্ষমতা তাকে প্রয়োগ করতেই হবে, এবং যদি সে সময়সীমাটি উত্তীর্ণ হবার পর অভিপ্রয়ান করতে চায়, তবে তা করার স্বাধীনতা তার থাকবে, কিন্তু তা তাকে করতে হবে নিজের খরচে এবং রাজ্যের সহায়তা ছাড়াই। রাজ্য থেকে সহায়তা পাবারও অধিকারকে এইভাবে সীমাবদ্ধ করে রাখার মধ্যে কোনও অবিচার করা হচ্ছে না, কারণ অভিপ্রয়ান্ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের এক লব্ধ পরিণাম ফলশ্রুতি যার ওপর নাগরিকদের ব্যক্তিগত কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কিন্তু অভিপ্রয়ান রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফল নয়। এটা অন্যান্য কারণেও হতে পারে এবং যখন সেটা অন্য কোনও কারণগুলির জন্য হয়,

তখন প্রব্রজনকারীকে সাহায্য দেওয়াটা সরকারের পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। প্রব্রজন রাজনৈতিক কারণে হচ্ছে, না বেসরকারি কারণে হচ্ছে তা নির্ধারণ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে বিষয়টিকে সময়সীমার সঙ্গে যুক্ত করে দেখা। যখন তা রাজনৈতিক পটপরিবর্তিত হবার সময় থেকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘটে তখন সেটাকে রাজনৈতিক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। যখন তা সময়কালের পরে ঘটে তখন সেটাকে বেসরকারি করণ হিসাবে ধরা যেতে পারে। এতে অন্যায় কিছু নেই। অনুমান করে নেওয়ার এই নিয়মটি জনপালন কৃত্যকের কর্মচারিদের বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, যারা যখন কোনও রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন হয়, তখন যদি তারা একটি প্রদত্ত সময়কালের মধ্যে অবসর নেয়, তবে তাদের আনুপাতিক উত্তর-বেতন নিয়ে অবসর নিতে অনুমতি দেওয়া হয়, কিন্তু ওই সময়কাল অতিক্রান্ত হবার পর যদি তারা অবসর নেয় তাহলে তা পাবে না।

এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে নীতিটি, যা আমার প্রস্তাব অনুযায়ী হওয়া উচিত, তাই হয়, তবে তা কার্যকর করা যেতে পারে সন্ধিপত্রে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে ঃ

"স্বেচ্ছায় প্রবসন (emigration) করার অধিকার এই সন্ধিচুক্তি অনুসারে প্রয়োগ করতে পারে জন্মগতভাবে সংখ্যালঘুদের যে কোনও ব্যক্তি, যার বয়স ১৮ বৎসরের বেশি।

'আয়োগের সমক্ষে শপথপূর্বক ঘোষণা করলেই তা এই অধিকার প্রয়োগ করার অভিপ্রায়ের যথোচিত সাক্ষ্য-প্রমাণ হয়ে থাকবে।

'স্বামী যেটা বেছে নেবেন সেটা তার স্ত্রীর ওপরেও প্রযোজ্য হবে, পিতা-মাতা বা অভিভাবকেরটা প্রযোজ্য হবে তাদের সন্তান বা রক্ষণাধীনদের, যাদের বয়স ১৮ বছরের কম।

'সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করার তারিখ থেকে পাঁচ বৎসর সময় কাল অতিক্রান্ত হবার পর ছয় মাসের মধ্যে আয়োগের পালনীয় কর্তব্যগুলি খারিজ করা হবে।

'আয়োগ যে তারিখ থেকে কাজ করা শুরু করবে, তা থেকে পাঁচ বৎসর সময়কাল অতিক্রান্ত হবার পর ছয় মাসের মধ্যে আয়োগের পালনীয় কর্তব্যগুলির খারিজ করা হবে।'

খরচপত্রের কী হবে? খরচপত্রের প্রশ্নটি তখন-ই গুরুত্বপূর্ণ হবে যখন কিনা

স্থানান্তরকরণের ব্যাপারটি বাধ্যতামূলক হবে। ঐচ্ছিক স্থানান্তরকরণের প্রকল্পটি সরকারের ওপর অত্যন্ত গুরুভার আর্থিক দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে পারে না। মানুষ স্বাধীনতার চেয়ে সম্পত্তিকে বেশি ভালবাসে। অনেকে তাদের স্বাভাবিক বাসস্থান যেখানে, তারা সুদৃঢ় ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত আছে তা পরিবর্তন করা অপেক্ষা তাদের রাজনৈতিক প্রভুদের হাতে অত্যাচার সহ্য করতে বেশি পছন্দ করবে। অ্যাডাম স্মিথ যা বলেছেন, সকল বস্তুর মধ্যে মানুষ-ই পরিবহনের পক্ষে সবচেয়ে অসুবিধাজনক পণ্যদ্রব্য। এর কার্যসাধনোপযোগিতার কী হবে? প্রকল্পটি নতুন নয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এটা সাধনযোগ্য। শেষ ইউরোপীয় যুদ্ধের পর গ্রিস ও বালগেরিয়া এবং তুরস্ক ও গ্রিসের মধ্যে জনসংখ্যার স্থানান্তরকরণ* ঘটনানোর জন্য এটাকে কার্যকর করা হয়েছিল। এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না যে, প্রকল্পটি কার্যকর হয়েছিল পরীক্ষিত হবার পর দেখা গিয়েছিল সেটা সাধনযোগ্যও বটে। আমি যে প্রকল্পটির রূপরেখা দিয়েছি তা ওই প্রকল্পের-ই প্রতিলিপি। এটা গ্রিস ও বালগেরিয়া এবং তুরস্ক ও গ্রিসের মধ্যে জনসংখ্যার স্থানান্তকরণকে* ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। কেউ একথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, এটাকে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর করা হয়েছিল। যেটা অন্যত্র সফল হয়েছে সেটা ভারতেও সফল হবে বলে আশা করা যায়।

পাকিস্তানের বিষয়টি আদৌ সহজ সরল নয়। কিন্তু এটাকে যত অসুবিধাজনক দেখানো হচ্ছে ততটা নয়, যদি হবে নীতি ও নৈতিকতার ব্যাপারে সহমত থাকে। এটা যদি অসুবিধাজনক হয় তবে একমাত্র এই কারণে হবে। এটা হৃদয়-বিদায়ক এবং কেউ-ই এর সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে চায় না, যেহেতু এর ধারণাটাই বেশ কষ্টদায়ক।

□ □ □

---

* যারা জনসংখ্যার বিনিময়করণ সম্পর্কে আরও বেশি তথ্য পেতে চান, তাঁরা স্টিফেন পি. লাডাস লিখিত 'সংখ্যালঘুদের বিনিময়করণে বালগেরিয়া, গ্রিস এবং তুরস্ক' পড়তে পারেন, যাতে গ্রিস ও বালগেরিয়া ১৯৩২ এবং গ্রিস ও তুরস্কর মধ্যে জনসংখ্যার বিনিময়করণে প্রকল্পটি বিশদ বর্ণিত আছে।

অধ্যায় ১৫

কে নিষ্পত্তি করতে পারে?

পাকিস্তান প্রশ্নটির দুটি দিক আছে, হিন্দু দিক এবং মুসলমান দিক, এবং এটা এড়ানো যাবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত উভয়ের-ই মনোভাব আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। উভয়পক্ষই গভীরভাবে ভাবালুতায় নিমগ্ন। এই ভাবালুতার স্তরটি এতই ঘন যে বর্তমানে যুক্তির পথে তা ভেদ করা অত্যন্ত কষ্টকর। এই বিরোধী ভাবালুতাগুলি বিলীন হয়ে যাবে না, সেগুলি আরও ঘনীভূত হবে। যেটা বলতে পারে একমাত্র কাল এবং পরিস্থিতি। কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না, বরফ গলার জন্য ভারতীয়দের কতকাল অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু একটা কথা নিশ্চিত যে, যতদিন না পর্যন্ত এই বরফ গলছে ততদিন স্বাধীনতাকে হিমঘরে পুরে রাখতে হবে। আমি নিশ্চিত যে, যতদিন না পর্যন্ত পাকিস্তানের একটি আদর্শ ও স্থায়ী সমাধান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন ভারতের স্বাধীনতার এই অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার বিষয়টি সম্বন্ধে চিন্তাশীল লক্ষ লক্ষ ভারতীয় বিরোধিতা করবেই। আমিও তাদের একজন। আমি সেইসব মানুষদেরই একজন যে মনে করে যে পাকিস্তান যদি একটি সমস্যা হয় ও সমস্যা সৃষ্টি করে মানুষকে হতবুদ্ধি করার ব্যাপার না হয় তবে কোনও নিষ্কৃতি নেই এবং সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করতে হবেই। আমি তাদেরই একজন যারা বিশ্বাস করে যে যা অপরিহার্য তার সম্মুখীন হতেই হবে। বালিতে মুখ গুঁজে থাকার এবং চারদিকে যা ঘটে চলেছে সেটাকে লক্ষ্য করতে অস্বীকার করার, যেহেতু তার কোলাহল মানুষের অনুভূতিকে আহত করে, কোনও অর্থ হয় না। আমি তাদের-ই একজন যারা বিশ্বাস করে, যে তাকে, অবশ্য যদি সে পারে, সিদ্ধান্ত নেবার সময় অনেক আগে একটি সমাধান নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে। একটা সেতু নির্মাণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ যদি সে জানে যে তাকে নদী পার করতে বাধ্য করা হবে।

পাকিস্তানের প্রধান সমস্যাটি হল; পাকিস্তান হবে কি হবে না এটা কে স্থির করবে? গত তিন বৎসর ধরে আমি এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেছি, আমি এই প্রশ্নের যথোচিত উত্তর সম্পর্কে কিছু একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। যারা এই সমস্যাটির সমাধানের ব্যাপারে আগ্রহী এই সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে আমি তাদের

অংশভাগী করে নিতে চাই, যাতে সেগুলি যত্নসহকারে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায়। আমার সিদ্ধান্তগুলি সুস্পষ্ট করার জন্য আমি ভেবে দেখেছি যে, আমি যদি সেগুলিকে সংসারের একটি আইনের রূপ দিতে পারি তবে উদ্দেশ্যটি আরও ভালভাবে সাধিত হবে। নিম্নে আইনটির খসড়া দেওয়া হল, যার মধ্যে আমার সিদ্ধান্তগুলি সন্নিবেশিত আছে ঃ—

ভারত সরকার (প্রাথমিক বিধি আইন)

আর্চ বিশপ ও বিশপগণ এবং অযাজকীয়দের ও জনসাধারণের উপদেশসহ ও সম্মতির দ্বারা, বর্তমান সংসদে সমক্ষে, এবং তাদের কর্তৃত্বাধীনে সম্রাটের অপূর্ব মহিমার দ্বারা নিম্নলিখিতভাবে এটা বিধিবদ্ধ হোক যে ঃ—

প্রথম—(১) এই উপলক্ষে নির্দিষ্ট তারিখ থেকে যদি ছয় মাসের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, পঞ্জাব, সিন্ধু এবং বঙ্গদেশেতে প্রদেশগুলির বিধানমণ্ডলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সদস্যরা একটি প্রস্তাব অনুমোদন করে যে সংখ্যায় প্রাধান্য বিশিষ্ট মুসলমান এলাকাগুলি ব্রিটিশ ভারত থেকে পৃথক করা হোক, তবে এই আইনের অসুবিধাগুলির ভিত্তিতে এই প্রদেশগুলির এবং বালুচিস্তানের মুসলমান ও অ-মুসলমান নির্বাচকদের উক্ত প্রশ্নটি সম্পর্কে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন মহামান্য সম্রাট।

(২) এই প্রদেশগুলির নির্বাচকদের নিম্নলিখিত আকারে প্রশ্নগুলি দেওয়া হবে

(এক) আপনারা কি ব্রিটিশ-ভারত থেকে স্বতন্ত্র হবার পক্ষে?

(দুই) আপনারা কি স্বতন্ত্র হবার বিপক্ষে?

(৩) মুসলমান ও অ-মুসলমান নির্বাচকদের ভোট আলাদা ভাবে নেওয়া হবে।

দ্বিতীয়—(১) যদি ভোটের ভিত্তিতে মুসলমান নির্বাচকদের মধ্যে অধিকাংশকে পৃথককরণের পক্ষে দেখা যায় এবং অ-মুসলমান নির্বাচকদের মধ্যে অধিকাংশকে পৃথককরণের বিপক্ষে দেখা যায়, তবে সম্রাট উদ্‌ঘোষণার দ্বারা এই প্রদেশগুলির সেইসব জেলা ও এলাকার যেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান, সেগুলির একটা তালিকা তৈরি করার জন্য সীমানা নির্দেশক আয়োগ নিয়োগ করবেন।

(২) অনুসূচিভুক্ত জেলাগুলিকে যৌথভাবে বর্ণনা করা হবে পাকিস্তান নামে এবং ব্রিটিশ ভারতের বাকি অংশকে হিন্দুস্থান নামে। উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত অনুসূচিভুক্ত জেলাগুলিকে বলা হবে পশ্চিম পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং যেগুলি উত্তর-পূর্ব অবস্থিত

সেগুলিকে বলা হবে পূর্ব পাকিস্তান।

তৃতীয়—(১) 'সীমানা নির্দেশক আয়োগে'র বিনির্ণয়গুলি ঐকমত্য অথবা মধ্যস্থ প্রদত্ত রোয়েদাদের দ্বারা চূড়ান্ত হবার পর, মহামান্য সম্রাট অনুসূচিভুক্ত জেলাগুলির নির্বাচকদের কাছ থেকে আবার ভোট নেবেন।

(২) নির্বাচকদের কাছে নিম্নবর্ণিতগুলি প্রশ্ন কারে পেশ করা হবে ঃ—

(এক) আপনি কি এখনই পৃথক করার পক্ষে?

(দুই) আপনি কি এখনই পৃথক করার বিপক্ষে?

চতুর্থ—(১) যদি অধিকাংশ-ই এখনি পৃথক করার পক্ষে থাকে তবে মহামান্য সম্রাটের পক্ষে বৈধ হবে দুই পৃথক সংবিধান, একটি পাকিস্তানের জন্য অন্যটি হিন্দুস্থানের জন্য, রূপদান করার ব্যবস্থা করা।

(২) পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের নতুন রাজ্যগুলি পৃথক রাজ্য হিসাবে কাজ করতে শুরু করবে এ বিষয়ে মহামান্য সম্রাট কর্তৃক উদ্‌ঘোষণার দ্বারা স্থিরীকৃত দিন থেকে।

(৩) যদি অধিকাংশ-ই এখনি পৃথক করার বিরুদ্ধে থাকে তবে মহামান্য সম্রাটের পক্ষে এটা বৈধ হবে সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ ভারতের জন্য একটি একক সংবিধানের রূপদানের ব্যবস্থা করা।

পঞ্চম—যদি শেষ পূর্ববর্তী ধারা অনুসারে প্রদত্ত ভোট এখনি পৃথক করার বিরুদ্ধে যায় তাহলে পাকিস্তান পৃথকক্কীরণের জন্য কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে না, এবং যদি শেষ পূর্ববর্তী ধারা অনুসারে প্রদত্ত ভোট এখনি পৃথকীকরণের পক্ষে যায় তবে হিন্দুস্থানের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্মিলনের জন্য কোনও প্রস্তাব ব্রিটিশ ভারতের জন্য নতুন সংবিধান অথবা পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের জন্য দুটি পৃথক সংবিধানকে কার্যকর করার জন্য মহামান্য সম্রাট কর্তৃক নির্দিষ্ট করে দেওয়া তারিখ থেকে দশ বৎসর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত গৃহীত হবে না।

ছয়—(১) চার নম্বর ধারা অনুসারে যদি দুটি পৃথক সংবিধান অস্তিত্ব লাভ করতে চলে, সে ক্ষেত্রে মহামান্য সম্রাটের পক্ষে বৈধ হবে নির্ধারিত দিনের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতের জন্য একটি পরিষদ গঠন করা এই উদ্দেশ্যে যে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের জন্য যেন এক সংবিধানের আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠা হতে পারে এবং পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের বিধানমণ্ডলীগুলির মধ্যে সুসঙ্গতিপূর্ণ কার্যসম্পাদন

করা যায় এবং সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের প্রভাবিতকারী বিষয়গুলি সম্পর্কে পারস্পরিক আদান-প্রদান ও ঐক্যের উন্নতি হয় এবং কৃত্যকগুলির প্রশাসনের জন্য ব্যবস্থা করা যে ব্যাপারে দুটি সংসদ পরস্পরের সঙ্গে ঐকমত্য হবে, এবং তা সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে সমানভাবে পরিচালিত হবে অথবা যা এই আইনের প্রসঙ্গে ওইভাবে পরিচালিত হবে।

(২) যে বিষয়টির অতঃপর ব্যবস্থা করা হয়েছে, ভারতীয় পরিচ্ছেদে গঠিত হবে মহামান্য সম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী মনোনীত একজন সভাপতি ও অন্যান্য চল্লিশজন ব্যক্তিকে নিয়ে, যাদের মধ্যে কুড়িজন সদস্য প্রতিনিধিত্ব করবে পাকিস্তানের এবং কুড়িজন সদস্য প্রতিনিধিত্ব করবে হিন্দুস্থানের।

(৩) ভারতীয় পরিষদের সদস্যগণ প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্বাচিত হবে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের সংসদের নিম্নকক্ষের সদস্যদের দ্বারা।

(৪) ভারতীয় পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন হবে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের বিধানমণ্ডলীগুলির প্রথম কাজ।

(৫) পরিষদের সদস্য, পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের বিধানমণ্ডলের কর্তৃকপরিষদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন যদি সেই কক্ষের সদস্য আর না থাকেন তবে তিনি আর পরিষদের সদস্যও থাকতে পারবেন না; অবশ্য পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের বিধানমণ্ডল ভেঙে গেলে যেসব ব্যক্তি পরিষদের সদস্য আছেন, তারা নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের সদস্য হিসাবে নিজেদের কাজ চালিয়ে যাবেন এবং পুনর্নির্বাচিত না হলে তখন অবসর নেবেন।

(৬) পরিষদের সভাপতি পরিষদের প্রতিটি সভায়, উপস্থিত থাকলে, সভাপতিত্ব করবেন এবং ভোট সমান হলে নিজে ভোট দিতে পারবেন, কিন্তু অন্যথায় নয়।

(৭) পরিষদের প্রথম বৈঠক সভাপতির নির্দেশিত সময় এবং স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।

(৮) সদস্যদের সংখ্যায় ঘাটতি থাকলেই পরিষদ কাজ করতে পারে এবং পরিষদের গণপূর্তির সংখ্যা পনের।

(৯) পূর্বোক্ত শর্তে, পরিষদ তার নিজস্ব পদ্ধতিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, যার মধ্যে কমিটিগুলিকে ক্ষমতা অর্পণের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত।

(১০) ভারতীয় পরিষদের সংবিধান মাঝে মাঝে পরিবর্তিত করা যেতে পারে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের বিধানমণ্ডল কর্তৃক অনুরূপ আইন সমূহ পাস করিয়ে এবং আইনগুলিতে ব্যবস্থা নির্দেশিত হতে পারে ভারতীয় পরিষদের সকল অথবা যে কোনও সংখ্যক সদস্য সংসদের নির্বাচকদের দ্বারা নির্বাচিত হবে এবং নির্বাচনের পদ্ধতি ও কতগুলি নির্বাচনক্ষেত্র থেকে সদস্যরা নির্বাচিত হবেন তার সংখ্যা এবং কতগুলি নির্বাচন যোগ্য সদস্যকে যে-সব নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত করে আনতে হবে তার সংখ্যা নির্ধারণ করবে।

সপ্তম—(১) পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের বিধানমণ্ডলগুলি অনুরূপ আইনগুলির দ্বারা, পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের সরকার ও বিধানমণ্ডলের যে-কোনও ক্ষমতা ভারতীয় পরিষদকে অর্পণ করতে পারে এবং ওইরূপ আইন সমূহ এভাবে ন্যস্ত ক্ষমতাগুলি পরিষদ কর্তৃক কীভাবে ব্যবহৃত হবে তার প্রণালী নির্ধারণ করতে পারে।

(২) নতুন সংবিধান কার্যকর করার নির্ধারিত দিন থেকে রেলপথে ও জলপথে সম্পর্কে বিধিসমূহ প্রণয়ন করার ক্ষমতাগুলি ভারতীয় পরিষদের ক্ষমতা হয়ে উঠবে, পাকিস্তান বা হিন্দুস্থানের নয়, এই শর্তে যে উপ-ধারার কোনও কিছুই পাকিস্তান অথবা হিন্দুস্থানের বিধানমণ্ডলকে বাধা দেবে না বিধি প্রণয়ন করতে যা রেলপথ ও জলপথের নির্মাণকার্য, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রাধিকার দেয় যেখানে ক্ষেত্রানুসারে নির্মাণকার্যের স্থানটি সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তান বা হিন্দুস্থানে অবস্থিত।

(৩) যে কোনও প্রশ্ন পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের কল্যাণের সঙ্গে যে কোনওভাবে যুক্ত বলে মনে হবে পরিষদ তা বিবেচনা করবে এবং প্রস্তাব গ্রহণ করে তারা যেমন উচিত মনে করবে সেইভাবে তার সম্পর্কের ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারে, কিন্তু ওইভাবে প্রদত্ত পরামর্শের কোনও বিধানিক প্রভাব থাকবে না।

(৪) পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানে অনুরূপ আইনগুলি পৃথকভাবে প্রয়োগ করার প্রয়োজনকে পরিহার করার উদ্দেশ্যে যে কোনও সর্বভারতীয় বিষয়ের প্রশাসনিক ক্রিয়া করার দায়িত্ব পরিষদকে অর্পিত করার সেইসব অনুরূপ আইনসমূহ অনুমোদন করার যুক্তিযুক্ত তা সম্পর্কে সুপারিশ করা ভারতীয় পরিষদের পক্ষে আইনসম্মত হবে।

(৫) অন্যতর বিধানমণ্ডলের পক্ষে যে কোনও সময়ে আইনের দ্বারা ভারতীয় পরিষদকে প্রদত্ত যে কোনও ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করাটা আইন সম্মত হবে, যে

ক্ষমতাগুলি উপরোক্ত ওইরূপ অভিন্ন আইনগুলি অনুসারে সাময়িক ভাবে অর্পিত হয়েছিল পরিষদকে এবং তার ফলে সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাগুলি ভারতীয় পরিষদ কর্তৃক আর প্রয়োগযোগ্য থাকবে না এবং ব্রিটিশ ভারতের অংশ বিশেষে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের বিধানমণ্ডল ও সরকার কর্তৃক তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে প্রয়োগযোগ্য হবে এবং তাদের স্বহস্তে থাকা বা তাদের সম্পূর্ণ অধিকার থাকা যে কোনও তহবিলের সমন্বয় সাধন করা সহ হস্তান্তরকরণের কাজটি করার জন্য পরিষদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অষ্টম—(১) ধারা চতুর্থ—(৩) কর্তৃক নির্দেশিত ব্রিটিশ-ভারতের সংবিধান কার্যকর হতে শুরু করার দশ বৎসর পরে যদি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলগুলির অনুসূচিভুক্ত জেলাগুলির প্রতিনিধিত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সদস্যরা মহামান্য সম্রাট সমক্ষে একটি আবেদনপত্র পেশ করে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের পৃথক করার ব্যাপারে ভোট নেবার দাবি করে, তবে মহামান্য সম্রাট ভোট নেবার ব্যবস্থা করবেন।

(২) নির্বাচকদের কাছে যে আকারে প্রশ্নগুলি করা হবে তা নিম্নরূপ ঃ—

(এক) আপনি কি হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের পৃথক করার পক্ষে?

(দুই) আপনি কি হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের পৃথক করার বিপক্ষে?

নবম—যদি ভোটের ফল পৃথক করার পক্ষে যায় তবে পরিষদীয় আদেশের দ্বারা মহামান্য সম্রাটের পক্ষে এটা ঘোষণা করা আইন সম্মত হবে যে, এই বিষয়ে নির্দিষ্ট করা দিন থেকে পাকিস্তান আর ব্রিটিশ ভারতের অংশ হিসাবে থাকবে না এবং ভারতীয় পরিষদকে ভেঙে দেওয়া হবে।

দশম—(১) চার নং ধারায় উল্লিখিত পরিস্থিতিতে যে ক্ষেত্রে দুটি সংবিধানের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে মহামান্য সরকারের পক্ষে পরিষদীয় আদেশের দ্বারা এটা ঘোষণা করা আইন সম্মত হবে যে পাকিস্তান আর পৃথকরাজ্য হিসাবে থাকবে না এবং হিন্দুস্থানের একটি অঙ্গ হয়ে যাবে। তবে তা হবে এই শর্তে যে, পাকিস্তানের জন্য পৃথক সংবিধানের প্রারম্ভ থেকে দশ বৎসর সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত ওইরূপ আদেশ জারি করা যাবে না।

অবশ্য এই শর্তেও যে, ধারা X—(২) এর অধীনে সূচিত মতে যতক্ষণ না পর্যন্ত পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের লোকায়ত বিধানমণ্ডল কর্তৃক সাংবিধানিক আইনগুলি, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ঐক্যমত্যানুসারে অভিন্ন আইনগুলির দ্বারা তৃতীয়

খসড়া পাঠের সময় অতঃপর সাংবিধানিক আইন সমূহ বলে উল্লেখিত, ভারতীয় পরিষদের পরিবর্তে সংযুক্ত ভারতের জন্য একটি বিধানমণ্ডল স্থাপন করবে এবং তার সদস্য সংখ্যা, এবং কোনও প্রণালীতে সদস্যরা নিযুক্ত বা নির্ধারিত হবে এবং নির্বাচন ক্ষেত্রগুলি যেখানে থেকে কিছু সংখ্যক নির্বাচনযোগ্য সদস্যরা নির্বাচিত হবে এবং কিছু সংখ্যক নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে কত সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হবে এবং নিযুক্তি বা নির্বাচনের পদ্ধতি এবং যদি তারা একে অপরের উপর নির্ভরশীল হয় তবে কক্ষ দুটির সম্পর্কগুলি নির্ধারিত করবে।

একাদশ—(১) যে তারিখে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের মিলন হবে, সেই দিন থেকে ভারতীয় পরিষদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে এবং তৎকালে ভারতীয় পরিষদের প্রয়োগযোগ্য সকল ক্ষমতা বিধানমণ্ডল ও ভারত সরকারের হাতে চলে যাবে।

(২) কর আরোপ সংক্রান্ত সকল ক্ষমতাসহ বিধানমণ্ডলীগুলিও পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের সরকারের সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তব্যগুলিও হস্তান্তরিত হবে ব্রিটিশ ভারতের বিধানমণ্ডল ও সরকারের হাতে।

দ্বাদশ—(১) বিধানমণ্ডলের পরিষেবা করার জন্য সদস্যের নির্বাচনের জন্য নির্বাচকদের ভোট যেভাবে নেওয়া হয় এই আইন অনুসারে যতদূর সম্ভব সেই পদ্ধতি ব্যালটের দ্বারা ভোট নেওয়া হবে এবং ভোট নেবার জন্য নির্বাচন বিধিসমূহ গ্রহণ করে মহামান্য সম্রাট নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে পারেন।

(২) একাধিক স্থানে তালিকাভুক্ত হলেও ভোট নেওয়ার সময় একজন নির্বাচক একবারের বেশি ভোট দিতে পারবেন না।

(৩) নির্বাচক বলতে বুঝাবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ ও বঙ্গদেশ এবং বালুচিস্তান প্রদেশগুলিতে বসবাসকারী প্রতিটি সাবালক নর ও নারী।

ত্রয়োদশ—এই আইনটিকে ভারতীয় সংবিধান (প্রাথমিক বিধি) আইন, ১৯৪।

এই পরিলেখ আইনে আমি যে সিদ্ধান্তগুলি রূপায়িত করার চেষ্টা করেছি সেটার অর্থ ও তাৎপর্য বুঝার জন্য পাঠকের আর কোনও বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না বলে মনে করি। হয়ত এটা সুফলদায়ক হবে যদি আমি এই প্রস্তাবগুলির প্রধান অংশগুলি প্রকাশ করি যার সঙ্গে 'ক্রিপস প্রস্তাব'গুলির তুলনা করার দ্বারা দেখাতে চাই যে প্রস্তাবগুলি সংসদের প্রস্তাবিত সংবিধি কার্যকর করতে ইচ্ছুক।

আমার মতে পাকিস্তান সমস্যাটি প্রথমে সমাধান না করে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতা প্রদানকারী কোনও আইন অবিলম্বে অনুমোদন করার ব্যাপারে অগ্রসর হওয়ার জন্য ভারতীয়দের দাবি করা এবং ব্রিটিশ সংসদের রাজি হওয়ার কোনও অর্থই হয় না। পাকিস্তানের বিষয়টিকে প্রারম্ভিক বিষয় হিসাবে গণ্য করা উচিত এবং কোনও না কোনও ভাবে সেটার নিষ্পত্তি করা অবশ্যই দরকার। এই কারণেই আমি প্রস্তাবিত আইনটিকে নাম দিয়েছি "ভারত শাসন প্রাথমিক বিধি আইন"। যেহেতু পাকিস্তান সম্পর্কে বিচার্য বিষয়গুলির অন্যতমটি হল রাজনীতিক নীতি নির্ধারণে জাতির স্বাধীনতার বিষয়, তাই তা অবশ্যই নিষ্পত্তি করতে হবে জনগণের ইচ্ছানুসারে। আর এই কারণেই আমি প্রাধান্যবিশিষ্ট মুসলমান প্রদেশগুলিতে মুসলমান ও অ-মুসলমানদের ভোট নেবার প্রস্তাব করেছি। যদি অধিকাংশ মুসলমান পৃথকীকরণের পক্ষে থাকে এবং অধিকাংশ অ-মুসলমান পৃথকীকরণের বিপক্ষে থাকে তবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলিকে সেইসব জেলাগুলি যেখানে অ-মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, থেকে পৃথক করে নৃজাতিগত ও সাংস্কৃতিক পরম্পরার ভিত্তিতে প্রদেশের সীমারেখাগুলি যেখানে সম্ভব সেখানে নতুন করে অঞ্চল করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। এই উদ্দেশ্যে তাই একটি সীমানা নির্দেশক আয়োগের ব্যবস্থা করা দরকার। ভাল হয় যদি সীমানা নির্দেশক আয়োগটি তার গঠন বিন্যাসে আন্তর্জাতিক হয়।

মুসলমান ও অ-মুসলমানদের পৃথক গণভোটের প্রকল্পটি দুটি নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যেগুলিকে আমি মৌলিক বলে মনে করি। প্রথমটি এই যে, সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য রক্ষাকবচের দাবি করতে পারে। এবং এটাকে তারা পূর্বশর্ত হিসাবে জারি করতে পারে। কিন্তু চূড়ান্ত পরিণতির প্রশ্নগুলি সম্পর্কে নিষ্পত্তি করার ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠদের অধিকারে প্রতিষেধক (Veto) প্রয়োগ করার অধিকার সংখ্যালঘুদের নেই। এটাই কারণ যে কেন আমি পাকিস্তান স্থাপনের ব্যাপারে গণভোটের ব্যাপারটি শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছি দ্বিতীয় নীতিটি হল এই যে, কোনও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তার কতৃত্বের কাছে নতিস্বীকার করা দাবি করতে পারে না। কেবলমাত্র রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠদেরই রাজনৈতিক সংখ্যালঘুদের ওপর প্রভুত্ব করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে ভারতে এই নীতিটি সংশোধিত হয়েছে, যেমন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে কিছু কিছু রক্ষাকবচের শর্ত সাপেক্ষে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অধীনস্থ করে রাখা হয়েছে। কিন্তু এগুলি হল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বের

মামুলি প্রশ্ন সংক্রান্ত। সাংবিধানিক চরিত্রবিশিষ্ট কোনও বিষয় সম্পর্কে কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আদেশ দেবার অধিকার যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আছে একথা কখনও সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়নি এবং কখনো মেনে নেওয়া হবেও না। এই কারণেই আমি কেবলমাত্র অ-মুসলমানদের পৃথক গণভোটের ব্যবস্থা নির্দেশিত করেছি যাতে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে তারা পাকিস্তানে যাওয়া অথবা হিন্দুস্থানে আসা কোনটা বেশি পছন্দ করবে।

এলাকাগুলির সীমানির্দেশ করণের কাজটি 'সীমানা নির্দেশক আয়োগ' শেষ করার পর নানা রকম সম্ভাবনার উদয় হবে। পাকিস্তানের সীমারেখাগুলির সীমানা নির্দেশিত হবার পর মুসলমানরা নিবৃত্ত হতে পারে। পাকিস্তানের খবরটি নীতি স্বীকৃতি পাবার পর যার আসল অর্থ সীমানা নির্দেশকরণ—তারা সন্তুষ্ট হতে পারে, ধরা যাক যে কেবলমাত্র সীমানা নির্দেশকরণের দ্বারা মুসলমানরা সন্তুষ্ট হল না এবং পাকিস্তানের স্থাপনা করার ব্যাপারে অগ্রসর হতে চায় সেক্ষেত্রে তাদের সামনে দুটি পথ খোলা থাকবে। তারা কালবিলম্ব না করে পাকিস্তান স্থাপন করতে চাইতে পারে অথবা দশ বৎসর সময়কালের জন্য একটি সাধারণ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বাস করতে রাজি হয়ে যেতে পারে এবং হিন্দুদের কঠোর পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দেবে। হিন্দুরাও সুযোগ পাবে এটা দেখাতে যে সংখ্যালঘুরা তাদের ওপর আস্থা রাখতে পারে। মুসলমানরা অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারবে যে হিন্দুরাজ সম্বন্ধে তাদের ভীতি কতটা যুক্তিযুক্ত। আরও একটি সম্ভাবনা আছে। পাকিস্তানের মুসলমানরা অবিলম্বে পৃথক হবার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর একটা সময়ের পর পাকিস্তান নিয়ে এতই বিরক্ত হয়ে উঠতে পারে যে তারা ফিরে আসতে ইচ্ছুক হবে এবং হিন্দুস্থানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং একটি একক সংবিধানের অধীনে একটি জাতি হয়ে থাকতে চাইবে।

এগুলি সেইসব কিছু কিছু সম্ভাবনা যা আমি প্রত্যক্ষ করি। আমার বিচারে এই সম্ভাবনাগুলিকে তাদের ফলদান করার জন্য সময় ও পরিস্থিতির জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। এটা মুসলমানদের বলা ভুল বলেই আমার মনে হয় যে, যদি তোমরা ভারতের একটি অংশ হয়ে থাকতে চাও, তাহলে তোমরা কখনও বেরিয়ে যেতে পারবে না বা যদি তোমরা যেতে চাও তাহলে কখনো ফিরে আসতে পারবে না। আমার কর্ম-পরিকল্পনায় আমি দ্বার উন্মুক্ত রেখেছি এবং আইনে দুটি সম্ভাবনারই ব্যবস্থা রেখেছি (১) দশ বৎসর পৃথক থাকার পর মিলন, (২) দশ বৎসরের জন্য পৃথক থাকা এবং তারপর মিলন। আমি ব্যক্তিগত ভাবে দ্বিতীয় বিকল্পটি পছন্দ

করি, যদি দুটির কোনওটির সম্বন্ধেই আমার দৃঢ়নিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি নেই। খুবই ভাল হয় যদি মুসলমানরা পাকিস্তান হলে কী হবে তার অভিজ্ঞতাটা উপলব্ধি করে। পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা উপলব্ধির পর যে মিলন হবে সেটা সুদৃঢ় ও স্থায়ী হতে বাধ্য। যদি অবিলম্বে পাকিস্তান গড়ে ওঠে, এটা আমার কাছে প্রয়োজন মনে হবে যে পৃথকীকরণ যেন পুরোপুরিভাবে বিচ্ছিন্নকরণ, স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ না হয়। পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের মধ্যে সক্রিয় যোগাযোগ রাখা দরকার, যাতে কোনও প্রকারের বিচ্ছিন্নবোধ বেড়ে না ওঠে যা পুনর্মিলনের সম্ভাবনাকে বাধা দিতে পারে। তাই সেই অনুসারে আইনে ভারতীয় পরিষদের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এটাকে যেন যুক্তরাষ্ট্র বলে ভুল করা না হয়। এমন কী এটা সঙ্গত নয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান একটি একক সংবিধানের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই দুটির সংযোগ রক্ষা করার কাজ ছাড়া আর বেশি কিছু করা এর উদ্দেশ্য নয়।

আমার কর্ম-পরিকল্পনাটা এই রকমেরই। এটি সম্প্রদায়-ভিত্তিক গণভোটের ভিত্তিতে রচিত। পরিকল্পনাটি নমনীয়। এটা সেই সত্যটিকে বিবেচনা করে যে হিন্দুদের মনোভাব এর বিরুদ্ধে। এটা সেই সত্যকেও স্বীকৃতি দেয় যে পাকিস্তানের জন্য মুসলমানদের দাবি নিছক এক ক্ষণস্থায়ী মনোভাব। পরিকল্পনাটি (বিবাহ) বিচ্ছেদ নয়, আদালতের আদেশে দাম্পত্য বিচ্ছেদ মাত্র। এটা হিন্দুদের দেয় একটা পরিভাষা, এবং তারা সেটা ব্যবহার করতে পারে এটা দেখতে যে ন্যায়সঙ্গতভাবে শাসন করার জন্য তাদের কর্তৃত্বে আস্থা রাখা যায়। এটা মুসলমানদের একটা পরিভাষা দেয় পাকিস্তানের বিষয়টিতে পরীক্ষা করে দেখে নেবার জন্য।

আমার প্রস্তাবগুলিকে স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপসের প্রস্তাবগুলির সঙ্গে তুলনা করা বাঞ্ছনীয় হতে পারে। প্রস্তাবগুলি দেওয়া হয়েছিল খণ্ড খণ্ড করে প্রকাশ করা ধারাবাহিক গল্পের মতো। ১৯৪৩ সালের ২৯ মার্চ প্রচারিত খসড়া ঘোষণায় কেবলমাত্র ছিল নিম্নলিখিত বক্তব্য ঃ—

'মহামান্য সম্রাটের সরকার অতএব নিম্নলিখিত শর্তগুলি আরোপ করছে ঃ—

(ক) শত্রুতার অবসানের অব্যবহিত কালপরেই অতঃপর বর্ণিত প্রণালীতে ভারতে একটি নির্বাচিত সংস্থা গড়ে তোলার ব্যবস্থা নিতে হবে, যার দায়িত্বভার ভারতের জন্য একটি নতুন সংবিধানের রূপরেখা রচনা করা।

(খ) সংবিধান রচনাকারী বিষয়ে (body) ভারতীয় রাজ্যগুলির অংশগ্রহণের জন্য নিম্নবর্ণিত রূপে, বিধি রচনা করতে হবে।

(গ) মহামান্য সম্রাটের সরকার ওইভাবে রূপরেখিত সংবিধান অবিলম্বে স্বীকার ও প্রয়োগ করার দায়িত্ব নিচ্ছে কেবলমাত্র এই শর্তে যে ঃ

(এক) নতুন সংবিধান মেনে নিতে প্রস্তুত নয় এমন যে কোনও ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশের তার নিজস্ব সংবিধানিক অবস্থান সুস্থিত রাখার জন্য, যদি কোনও প্রদেশ সিদ্ধান্ত নেয় তবে পরবর্তীকালে যোগ দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ওইরূপ যোগ দিতে অনিচ্ছুক প্রদেশগুলি যদি তারা চায়, তবে মহামান্য সম্রাটের সরকার একটি নতুন সংবিধানের ব্যাপারে সহমত হতে প্রস্তুত থাকবে, তাদের ভারতীয় সংঘের মত একই ধরনের পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে, এবং এখানে যা লিপিবদ্ধ আছে, সেই অনুসারে অনুরূপ পদ্ধতির দ্বারা উপনীত হওয়া যাবে।

যোগদান করা এবং পৃথক হয়ে যাওয়ার বিস্তৃত বিবরণ তার বেতার বার্তায় প্রদত্ত হয়েছিল। সেগুলি নিম্নলিখিত ভাষায় উক্ত হয়েছিল।—

'উক্ত সংবিধান রচনাকারী নিকায়ের উদ্দেশ্য হবে সমগ্র ভারতের জন্য একটি একক সংবিধানের রূপরেখা রচনা করা—অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারত, তৎসহ সেইসব ভারতীয় রাজ্য যার যোগদান করার সিদ্ধান্ত নেবে তাদের জন্য।

'কিন্তু এই বিশেষ সহজ সত্যটি আমরা উপলব্ধি করতে পারি। যদি কিছু সংখ্যক মানুষ যারা বিরুদ্ধাচারণ করতে ইচ্ছুক তাদের যদি একই ঘরে প্রবেশ করতে প্ররোচিত করতে চান, তবে তাদের একথা বলা অত্যন্ত অবিবেচিত হবে যে একবার তারা যদি ভিতরে প্রবেশ করে তবে বেরিয়ে আসার পথ পাবে না, সকলকে চিরকালের মত ওর মধ্যে আটকে থাকতে হবে।

'তাদের এটা বলা বেশি বুদ্ধিমানের কাজ হবে যে, যদি তারা দেখতে পায় যে তারা কোনও এক ঐকমত্য সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না, তাহলে যারা চাইবে তাদের আবার অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার ব্যাপারে কোনও কিছুই বাধা দিতে পারবে না। যদি তাদের জানা থাকে যে যদি তারা ঐকমত্য না হয় তবে আবার বেরিয়ে যাবার স্বাধীন ইচ্ছা তাদের থাকবে তাহলে সম্ভবত তাদের সকলের চলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

'দেখুন, এই কথাগুলিই আমরা বলেছি ভারতের প্রদেশগুলিকে। উভয়ের কাছে গ্রহণীয় একটি সংবিধানের গঠন করার জন্য একযোগে আসুন—আপনাদের সমস্ত আলোচনার এবং সংবিধান রচনাকারী মণ্ডলীর সব রকমের দেওয়া-নেওয়ার পরও

যদি আপনারা নিজেদের মতপার্থক্য দূর করতে না পারেন এবং যদি কিছু প্রদেশ সংবিধানের ব্যাপারে সন্তুষ্ট না হয়, তবে ওই ধরনের প্রদেশগুলি বেরিয়ে যেতে পারে এবং বাইরে থাকতে পারে যদি তারা চায় এবং সংঘ নিজে যা পায় ঠিক সমপরিমাণ স্ব-শাসিত সরকার ও স্বাধীনতা তাঁরা পাবেন, অর্থাৎ পূর্ণ স্বশাসিত সরকার।'

চিত্রটি সম্পূর্ণ করার জন্য সাংবাদিক সম্মেলনে আরও বিশদ বিবরণ যুক্ত করা হয়। প্রদেশগুলির যোগদান অথবা পৃথক হয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস বলেছিলেন।—

'ব্যবস্থাপক সভার কার্যবিবরণী শেষ হবার পর যদি কোনও প্রদেশ বা প্রদেশসমূহ নতুন সংবিধান স্বীকার করে নিতে বা সঙ্গে যোগ দিতে না চায়, তবে বাইরে থাকার স্বাধীনতা তাদের থাকবে—তবে এইশর্তে যে ওই প্রদেশের প্রাদেশিক বিধানসভা, পর্যাপ্ত ভোটের দ্বারা ধরা যাক ৬০ শতাংশের কম নয়, যোগদানের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদি তা ৬০ শতাংশের কম হয় তবে সংখ্যালঘুরা জনগণের মনোবাঞ্ছা জানার জন্য সমগ্র প্রদেশে গণভোট দাবি করতে পারে। গণভোটের ক্ষেত্রে, সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা হলেও তা পর্যাপ্ত হবে। স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে, যোগদানের বিষয়টি সম্পূর্ণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রদেশ থেকে ইতিবাচক ভোট আসা দরকার। যোগদানে অনিচ্ছুক প্রদেশ, যদি তারা চায়, তবে একটি পৃথক সংঘের এক পৃথক গণপরিষদের মাধ্যমে সংযুক্ত হতে পারে, কিন্তু ওই ধরনের সংঘ গড়ার বিষয়টি বাস্তসম্মত করার জন্য তাদের ভৌগোলিকভাবে সংলগ্ন হতে হবে। আমার এবং স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপসের পরিকল্পনার মধ্যে যে প্রধান পার্থক্য আছে সেটা সুস্পষ্ট। যোগদান অথবা বিচ্ছিন্ন থাকার বিষয়টি সম্বন্ধে নিষ্পত্তি করা, যেটা নিছক অন্য ভাবে বলা যে পাকিস্তান হবে, কী হবে না। স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস প্রদেশকেই নিষ্পত্তিকর একক হিসাবে ধরে ছিলেন, আমি একক হিসাবে নিয়েছি লোকসমাজকে। স্যার স্টাফোর্ড যে ভুল ভিত্তি গ্রহণ করেছিলেন তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। যদি বিবাদের বিষয়গুলি আন্ত-প্রাদেশিক হয় তবে প্রদেশ একটি উপযুক্ত একক হতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি বিবাদের বিষয়গুলি কর জল ইত্যাদির বন্টনের মত প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত হয়, তবে প্রদেশটি সামগ্রিকভাবে অথবা ওই প্রদেশের বিশেষ একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের যে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার থাকবে এটা বুঝা যায়। কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে বিবাদটি আন্ত-সাম্প্রদায়িক সমস্যার সংক্রান্ত যা একই প্রদেশে দুটি সাম্প্রদায়কে বিজড়িত করেছে। তাছাড়া বিবাদের

বিষয়টি এ নয় যে কোন কোন শর্তে দুটি সম্প্রদায় একটি যৌথ রাজনৈতিক জীবনে মেলামেশা করতে রাজি হবে। বিবাদটি আরও গভীরে প্রবেশ করে এবং যে প্রশ্নটি উত্থাপন করে তা হল এই যে সম্প্রদায়গুলি কি একটি যৌথ রাজনৈতিক জীবনে মেলামেশা করতে আদৌ প্রস্তুত। এটা মুলত একটি সম্প্রদায়গত প্রভেদ এবং তা একমাত্র সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে গণভোটের মাধ্যমেই নিষ্পত্তি করা যাবে।

৪

আমার প্রস্তাবিত সমাধানে কোনও মৌলিকত্ব আমি দাবি করছি না। এর অন্তর্নিহিত ভাবধারাগুলি তিনটি উৎস থেকে সংগৃহীত, হোরেস প্লাঙ্কেটের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'আইরিশ ইউনিটি কনফারেন্স' থেকে গৃহীত, মিঃ অ্যাসকুইথ আনীত 'হোমরুল পরিবর্তন বিধেয়ক' থেকে গৃহীত এবং 'আয়ারল্যান্ড শাসন আইন, ১৯২০' থেকে গৃহীত। দেখা যাবে যে পাকিস্তান সমস্যার যে সমাধান আমি করেছি তা একত্রীভূত জ্ঞানের ফসল। এটা কি স্বীকৃতি পাবে? পাকিস্তানের প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে যে মতবিরোধ প্রবলভাবে তরঙ্গায়িত হচ্ছে সেটা সমাধান করার চারটি পন্থা আছে। প্রথম হল এই যে নিষ্পত্তিকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে ব্রিটিশ সরকারের উচিত সক্রিয় হওয়া। দ্বিতীয়ত হিন্দু ও মুসলমানদের রাজি হতে হবে। তৃতীয় বিচার্য বিষয়টিকে এক আন্তর্জাতিক সালিশি পর্ষদের কাছে পেশ করা উচিত, এবং চতুর্থত গৃহযুদ্ধের দ্বারা লড়াই করে তা আদায় করা।

যদিও বর্তমানে ভারত এক রাজনৈতিক পাগলখানা, তবুও আমি আশা করি দেশে যথেষ্ট সুস্থমস্তিষ্কের মানুষ আছে, যারা বিষয়টি গৃহযুদ্ধের স্তরে নিয়ে যেতে দেবেন না। অদূর ভবিষ্যতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐকমত্যের কোনও সম্ভাবনা নেই। ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বৈঠকে মিঃ জগৎ নারায়ণ লালের আনিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে এ.আই.সি.সি. প্রস্তাবগ্রহণ করেছিল* পাকিস্তানের স্থাপনের প্রস্তাবটিকে আমল না দিতে। সমস্যাটি সমাধানের জন্য দুটি অপর পন্থা থেকে গেছে। একটি হল সংশ্লিষ্ট জনগণের দ্বারা এবং অপরটি হল আন্তর্জাতিক সালিশির দ্বারা। আমি এই পন্থার কথাই উল্লেখ করেছি।

* গৃহীত প্রস্তাবটির মূল বয়ান এইরূপ ঃ—

'এ.আই.সি.সি.-র অভিমত এই যে, ভারতীয় সংঘ অথবা যুক্তরাষ্ট্র থেকে অপসৃত হওয়ার ব্যাপারে কোনও অঙ্গীভূত রাজ্য অথবা আঞ্চলিক একককে স্বাধীনতা দিয়ে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার কোনও প্রস্তাব রাজ্যগুলিও প্রদেশের এবং সমগ্রভাবে দেশের জনগণের সর্বোৎকৃষ্ট স্বার্থের পক্ষে প্রচণ্ড ক্ষতিকারক হবে এবং তাই কংগ্রেস ওইরূপ কোনও প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারে না।'

আমি অবশ্য পছন্দ করি প্রথমোক্তটিকে। বহুবিধ কারণে এটাই আমার কাছে একমাত্র পন্থা বলে প্রতীয়মান হয়। নেতৃবৃন্দ এই বিবাদের সমাধান অসমর্থ হওয়ায় এখন সময় হয়েছে এটাকে নিষ্পত্তির জন্য জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়া। এ কথা ঠিক যে, অঞ্চলের বিভাজন এবং এক সরকার থেকে অন্যটির উপর জনগণের আনুগত্য স্থানান্তর করার বিষয়টি কিভাবে রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা করা হবে তা অকল্পনীয়। এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে এরূপ কাজ নিজে তারাই করতে পারে, যাদের কাছে যুদ্ধে জয়লাভ বিজিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে যা খুশি করার পর্যাপ্ত কর্তৃত্বাধিকার দেয়। কিন্তু এই রকম বিধি বিহীন কোনও পরিবেশের অধীনে আমরা কাজ করছি না। স্বাভাবিক সময়ে যখন সাংবিধানিক পদ্ধতিগুলি সাময়িকভাবে স্থগিত নেই তখন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অভিমতগুলির এক নায়কদের হুকুমের মত প্রভাব থাকতে পারে না। তাহলে সেটা হবে গণতন্ত্রের নীতি নিয়ম বিরোধী। নেতৃবৃন্দের অভিমতগুলিকে যে সর্বোচ্চমূল্য দেওয়া যেতে পারে তা হল সেগুলিকে আলোচ্য বিষয়সূচিতে স্থান দেবার যোগ্য মনে করা। তারা জনগণের দ্বারা বিষয়টির নিষ্পত্তিকরণের প্রয়োজনীয়তাকে না পারে প্রতি স্থাপন করতে না পারে পরিহার করতে। স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস এই দৃষ্টিভঙ্গিটিই গ্রহণ করেছিলেন। মুসলিম লীগ যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল তা হল এই যে পাকিস্তান হোক, কারণ মুসলীম লীগ স্থির করে নিয়েছে যে এটা তাদের চাই। ক্রিপসের প্রস্তাব এই মনোভাবটিকে নাকচ করে দিয়েছে এবং সম্পূর্ণ সঙ্গত কারণেই। পাকিস্তানকে একটি প্রস্তাব বিবেচনা করা হোক এটা বিবেচনা করার অধিকার মাত্র দিয়ে ক্রিপসের ওইটুকু মাত্রায় প্রস্তাবগুলি মুসলীম লীগকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নিষ্পত্তি করার অধিকার তাদের দেওয়া হয়নি। আবার এটাও ঠিক মতো উপলব্ধি করা হয়েছে বলে মনে হয় না যে, অধিকাংশ জনগণের সক্রিয় সম্মতি না পাওয়া কংগ্রেসের মত সর্বভারতীয় সংস্থার সিদ্ধান্ত, পাকিস্তানের বিষয়টি দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত যারা, বিষয়টির সমাধানে সাহায্য করতে পারে না। পাকিস্তানের স্বীকার করে নেওয়ার ব্যাপারে মিঃ গান্ধী বা মিঃ রাজা গোপালাচারি যদি সম্মত হন বা সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি যদি প্রস্তাবও গ্রহণ করে থাকে তাতে কী সুফল হবে, যদি পঞ্জাব অথবা বঙ্গদেশের হিন্দুরা আপত্তি জানায়। সত্য কথা বলতে কী বোম্বাই বা মাদ্রাজের অধিবাসীদের পাকিস্তান হোক একথা বলার কোনও প্রয়োজন নেই। সিদ্ধান্ত নেবার পর অবশ্যই ছেড়ে দিতে হবে সেই সব জনগণের ওপর যারা ওই সব এলাকায় বসবাস করে এবং বহু বৎসর ধরে যাদের জীবন ও ভাগ্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতির সঙ্গে

ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তাতে এত প্রচণ্ড এত বৈপ্লবিক ও এত মৌলিক পরিবর্তনের যে পরিণামগুলি দেখা দেবে তার ভার যাদের বহন করতে হবে। পাকিস্তান প্রদেশগুলিতে জনগণের গণভোটই পাকিস্তান সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে নিরাপদ ও সবচেয়ে সাংবিধানিক পদ্ধতি হবে বলে আমার মনে হয়।

কিন্তু আমার আশঙ্কা যে জনগণের গণভোটের দ্বারা পাকিস্তানের প্রশ্নটি সমাধান করার চেষ্টা যতটা আকর্ষণীয় মনে হোক না কেন যারা এর উপর নির্ভরশীল তাদের কাছ থেকে আনুকূল্য নাও পেতে পারে। এমন কী মুসলীম লীগও এ ব্যাপারে অতি উৎসাহী না হতে পারে। তবে এটা এজন্য নয় যে প্রস্তাবটি নিখুঁত নয়, বরং সম্পূর্ণ বিপরীত, আসল কথা এই যে আর একটি সমাধান আছে, যার নিজস্ব আকর্যণ আছে। এবং সেটা ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন জন্মায় নিজস্ব সার্বভৌম কর্তৃত্বাধিকার প্রয়োগ করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা দিতে জনগণের সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল সমাধানের চেয়ে এই সমাধানটিকে অধিকতর পছন্দ করার কারণ এই যে এটা খুবই সহজ-সরল এবং জনগণের গণভোটের মত শ্রমসাধ্য পদ্ধতি এর সঙ্গে বিজড়িত নয়, এবং গণভোটের সঙ্গে জড়িত অনিশ্চিয়তাগুলির কোনও একটাও এর মধ্যে নেই। এটা অধিকতর পছন্দ করার আর একটা কারণ আছে, যথা এর একটা নজির আছে আর সেটা হল আয়ারল্যান্ডের নজির এবং যুক্তিটি হল এই যে ব্রিটিশ সরকার যদি তার সার্বভৌম কর্তৃত্বাধিকার প্রয়োগ করে আয়ারল্যান্ডকে বিভক্ত করে আলস্টার সৃষ্টি করতে পারে তবে কেন ব্রিটিশ সরকার ভারতকে ভাগ করতে ও পাকিস্তান সৃষ্টি করতে পারবে না?

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সার্বভৌম বিধানিক সংস্থা হল ব্রিটিশ সংসদ। ইংরেজদের সংবিধান সম্পর্কে এক ফরাসি লেখক ডিল' হোম মন্তব্য করেছেন যে, নারীকে পুরুষ করা এবং পুরুষকে নারী করা ছাড়া আর এমন কিছু নেই যা ব্রিটিশ সংসদ করতে পারে না। অধিরাজ্যগুলির কাজকর্মের ব্যাপারে ব্রিটিশ সংসদের সার্বভৌমত্ব যদিও ওয়েস্ট মিনিস্টার সংবিধির দ্বারা সীমিত করা আছে, তৎসত্ত্বেও ভারত সম্পর্কে তা এখনও সীমাহীন। আয়ারল্যান্ডের ক্ষেত্রে যা করেছিল সেইভাবে ভারতকে বিভক্ত করতে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে ব্রিটিশ সংসদকে বাধা দিতে পারে আইনে এমন কিছু নেই। করতে পারে কিন্তু করবে কি? প্রশ্নটা ক্ষমতার নয়, ইচ্ছার।

যাঁরা ব্রিটিশ সরকারকে আয়ারল্যান্ডের নজির অনুকরণ করার স্বনির্বন্ধ অনুরোধ করেন, তাঁদের উচিত এই প্রশ্নটি করা সেটা কী যা ব্রিটিশ সরকারকে চালিত করে

ছিল আয়ারল্যান্ডকে বিভাজিত করতে। এটা কী ব্রিটিশ সরকারের বিবেক-বুদ্ধি যা তাদের চালিত করেছিল যে পন্থা তারা অবলম্বন করেছিল তা অনুমোদন করতে অথবা পরিস্থিতি তাদের উপর যেটা জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিল যেখানে তাদের নতিস্বীকার করতে হয়েছিল? আয়ারল্যান্ডের স্বায়ত্তশাসনের ইতিহাসের ছাত্রকে এটা স্বীকার করতেই হবে যে আয়ারল্যান্ডের বিভাজন বিবেকবুদ্ধির দ্বারা নয় অনুমোদিত হয়েছিল পরিস্থিতির চাপে। এটা খুবই কম সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়েছিল যে আয়ারল্যান্ড সম্পর্কিত বিতর্কে কোনও দলই আয়ারল্যান্ডের বিভাজন চায়নি। এমন কী আলস্টারের নেতা কারসনও চাননি। কারসন স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী ছিলেন আবার বিভাজনের পক্ষেও ছিলেন না। তাঁর প্রাথমিক অবস্থান ছিল স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করা ও আয়ারল্যান্ডের অখণ্ডতা রক্ষা করা। শুধুমাত্র স্বায়ত্তশাসন চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে আত্মসমর্থণের বিকল্প পন্থা হিসাবে তিনি বিভাজনের উপর জোর দিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের লোকসভার ভিতরে এবং বাইরে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতা থেকে এটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হবে। অন্যদিকে অ্যাসকুইথ সরকার সমপরিমাণে বিভাজনের বিপক্ষে ছিল। এটা বুঝা যাবে ১৯১২ সালের আইরিশ স্বায়ত্তশাসন বিধেয়ক সম্পর্কিত ব্রিটিশ লোকসভার কার্যবাহ থেকে। বিধেয়কের অনুবিধি থেকে আলস্টারকে বাইরে রাখার জন্য দুবার সংশোধনী পেশ করা হয়, একবার যখন সেটা কমিটি পর্যায়েছিল তখন মিঃ আগার রবার্টস কর্তৃত্ব এবং আবার তৃতীয়পাঠের সময় স্বয়ং কারসন কর্তৃক। উভয় ক্ষেত্রেই সরকার আপত্তি জানায় এবং সংশোধনীয়গুলি নাকচ হয়ে যায়।

মিঃ লয়েড জর্জ তাঁর আয়ারল্যান্ড শাসন আইনের বলে আয়ারল্যান্ডের স্থায়ী বিভাজন কার্যকর করেন ১৯২০ সালে। অনেকে মনে করেন যে সেবারই প্রথম আয়ারল্যান্ডের বিভাজনের কথা চিন্তা করা হয়েছিল এবং তা হয়েছিল কলকব্জার ভেটিভদের যথেচ্ছ আক্রোশে এই কলকব্জার ভেটিভরা ছিল, সম্মিলিত সরকারের ইউনিয়ানপন্থীদের দ্বারা যার তথাকথিত নেতা ছিলেন মিঃ লয়েড জর্জ। তাঁর সম্মিলিত সরকারের প্রভাবশালী দলের প্রভাব মিঃ লয়েড জর্জকে যে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল এটা সত্য হতেও পারে। কিন্তু বিভাজনের কথা প্রথম চিন্তা করা হয়েছিল ১৯২০ সালে একথা ঠিক না। এবং এটাও সত্য নয় যে 'লিবারেল পার্টি'র মধ্যে পরিবর্তন এসেছিল এবং সম্ভাব্য সমাধান হিসাবে বিভাজনের অনুকূলে নিজেদের আগ্রহ দেখিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সমাধান হিসাবে বিভাজনের প্রসঙ্গটি উঠেছিল ১৯১৪ সালে, মিঃ লয়েড জর্জের আইনের ছয় বৎসর আগে, যখন অ্যাসকুইথ, সরকার,

একটি খাঁটি উদারপন্থী সরকারের ক্ষমতাসীন থাকাকালে। আয়ারল্যান্ডের বিভাজন সম্ভব হওয়ার মূলে যে প্রকৃত কারণটি ছিল সেটাকে বোঝা যাবে কেবলমাত্র সেইসব বিষয়গুলিকে পরীক্ষা করে দেখলে, যা মিঃ অ্যাসকুইবের উদারপন্থী সরকারের মত পরিবর্তন করিয়েছিল। আমি নিশ্চিত জানি যে উদারপন্থী সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন এনেছিল যে বিষয়টি তা হল সামরিক সঙ্কট, যা ঘটেছিল ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে, এবং যেটিকে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয় "কুরাঘ ঘটনা" (Curragh Incident) নামে। কুরাঘ ঘটনা কী এবং অ্যাসকুইথ সরকারের নীতিতে পরিবর্তন আনয়নে কতটা চূড়ান্ত ছিল সেটা বুঝাবার জন্য কয়েকটি ঘটনাই যথেষ্ট হবে।

সঠিক জায়গা থেকে শুরু করতে হলে আইরিশ স্বায়ত্তশাসন বিধেয়ক তার সবকটি অধ্যায় পার হয়ে এসেছিল ১৯১৩ সালের শেষ ভাগ পর্যন্ত। নির্বাচন মণ্ডলীর জনাদেশ না পেয়েই অগ্রসর হচ্ছেন বলে মিঃ অ্যাসকুইথের বিরুদ্ধে যে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল তার ফলে অবশ্য তাঁকে একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল যে, তার একটি সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত আইনটিকে কার্যকর করা হবে না। সাধারণ নিয়মে সাধারণ নির্বাচন হতে পারত ১৯১৫ সালে, যদি না বাধা হিসাবে যুদ্ধ উপস্থিত হত। কিন্তু আলস্টারবাসীরা সাধারণ নির্বাচনের উপর নির্ভর করে ঝুঁকি নেবার জন্য প্রস্তুত ছিল না এবং স্বায়ত্তশাসনের বিরোধীতা করার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছিল। তাদের কার্যসাধনোপায় এবং তাদের পদ্ধতিগুলি নির্বাচনের ব্যাপারে তারা সবসময়ে খুব একটা অতি যত্নশীল ছিল না এবং সম্রাটের বিশ্বস্ত প্রজা হয়ে তাদের থাকতে বাধাদান করা সরকারের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম করছে এমন একটা ভ্রান্তধারণা সৃষ্টিকারী হাবভাবের আড়ালে তারা যে উপায়ের আশ্রয় নিয়েছিল তাকে কেউ নিলর্জ্জ ও দুরাভিসন্ধি বলতে দ্বিধা করবে না। একটি ম্যাজিনো লাইন বিভাজন রেখা ছিল যার উপর আলস্টারবাসীরা সব সময় নির্ভর করত স্বায়ত্তশাসনের পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিতে। আর সেটা ছিল ইংল্যান্ডের সংসদের উচ্চতর পরিষদের সভা (হাউস অফ লর্ডস)। কিন্তু সংসদীয় আইন, ১৯১১-র দ্বারা হাউস অফ লর্ডস বিলাপের প্রাচীর, এবং সেটা না ছিল সুদৃঢ়, না ছিল উঁচু। এটা আর আত্মরক্ষার পন্থা হিসাবে কাজ করছিল না, যার উপর ভরসা করা যায়। হাউস অফ লর্ডস কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও বিধেয়কটি যে অনুমোদিত হতে পারে এটা জেনে, পরবর্তী নির্বাচনে অ্যাসকুইথ জিততে পারবেন এটা বুঝে আলস্টারবাসীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল এবং আত্মরক্ষার অপর পন্থা খুঁজতে শুরু করেছিল এবং সেটা তারা খুঁজে পায় সেনাবাহিনীর মধ্যে। পরিকল্পনাটি

ছিল দ্বিধা বিভক্ত। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল বাৎসরিক সেনাবাহিনী আইন হাউস অফ লর্ডস কর্তৃক আটকে দেবার কর্মপরিকল্পনা যাতে এটা সুনিশ্চিত করা যায় যে আলস্টারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য যেন সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব না থাকে। দ্বিতীয় কর্মপরিকল্পনাটি ছিল তাদের প্রচার অভিযানকে সেনাবাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া—যে স্বায়ত্তশাসন হবে স্বায়ত্ত শাসন—যাতে আয়ারল্যান্ডের ওপর জোর করে স্বায়ত্তশাসন চাপাবার জন্য সরকার যদি সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয় তবে সরকারকে অমান্য করার জন্য সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত রাখা যায়। দ্বিতীয় কর্মপরিকল্পনাটিকে সহজেই কার্যকর করতে সফল হওয়ায় দ্বিতীয়টি অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৯১৪ সালের মার্চ মাসে, যখন কুরাঘ ঘটনাটি ঘটেছিল। আয়ারল্যান্ডের কয়েকটি সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর ইউনিয়ন-পন্থী স্বেচ্ছাসেবীদের আক্রান্ত হতে পারে এব্যাপারে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ ছির সরকারের। মার্চ মাসের ২০ তারিখে আয়ারল্যান্ডের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক স্যার আর্থার প্যাজেটকে নির্দেশ পাঠান হয় ওই সদর দপ্তরগুলি সুরক্ষিত করে রাখার জন্য ব্যবস্থা নিতে। উত্তরে একটি টেলিগ্রামের মাধ্যমে তিনি জানান যে আধিকারিকরা আদেশ পালনে রাজি নয় এবং তারা তাদের পদথেকে ইস্তাফা দিয়েছে এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে যে সাধারণ সৈনিকরাও সক্রিয় অংশ নিতে রাজি হবে না। জেনারেল স্যার সুবার্ট পাফ আলস্টার ইউনিয়ান পন্থীদের বিরুদ্ধে কাজ করতে চান না, এবং অন্যেরা তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছে। সরকার বুঝতে পেরে গেছে যে সেনাবাহিনী রাজনৈতিক*, না, গুপ্ত অনুগামী হয়ে গেছে। সরকার শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল এবং বীরত্বের চেয়ে বিজ্ঞতা শ্রেষ্ঠ এই সুগঠিত প্রবাদবাক্যের ভিত্তিতে কাজ করতে গিয়ে তিনি বিভাজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। যে অ্যাসকুইথ তার অবস্থান পরিবর্তন করলেন সেটা তাঁর বিবেক-বুদ্ধি নয়, বরং সেনাবাহিনীর বিদ্রোহের ভয়ে। ভীতিটা এতই বেশি পরিমাণে ছিল যে, তারপর কেউই সেনাবাহিনীকে চ্যালেঞ্জ জানাবার ও বিভাজন না করে স্বায়ত্তশাসন বলবৎ করার যথেষ্ট সাহস দেখাতে পারেননি।

---

* এই বিষয়ে দ্রষ্টব্য মেজর জেনারেল স্যার সি.ই. কলওয়েল রচিত **'লাইফ অফ ফিল্ড মার্শাল স্যার হেনরি উইলসন'** খণ্ড-১, অধ্যায় ৯; সেইসঙ্গে সংসদীয় বিতর্ক (হাউস অফ লর্ডস), ১৯১৪, খণ্ড- ১৫, পৃঃ ৯৯৮-১০১৭ আলস্টার ও সেনাবাহিনী সম্পর্কিত। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে কুরাঘ ঘটনার অনেক আগেই আলস্টার পন্থীরা সেনাবাহিনীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্বপক্ষে টেনে এনেছিল। সম্ভবত আলস্টারকে ছয় বৎসরের জন্য স্বায়ত্তশাসন থেকে বাদ দেওয়ার জন্য ১৯১৩ সালে একটি সংশোধনী বিধেয়ক আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কারন তিনি জানতে পেরে গিয়েছিলেন যে, সেনাবাহিনী আলস্টারের পক্ষে চলে গেছে এবং স্বায়ত্তশাসন বলবৎ করার ব্যাপারে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা যাবে না।

মহামান্য সম্রাটের সরকারের উপর কি নির্ভর করা যায় যে আয়ারল্যান্ডে তারা যা করেছে ভারতেও তার পুনরাবৃত্তি হবে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অসমর্থ। তবে দুটি কথা আমি বলবই। প্রথমটি এই যে, মহামান্য সম্রাটের সরকার ভালভাবেই জানে আয়ারল্যান্ডের এই বিভাজনের পরিণামের কী হয়েছে। আইরিশ ফ্রি স্টেট গ্রেট ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে উঠেছে, যার সঙ্গে কখনই পুনর্মিলন হতে পারবে না। এই শত্রুতার শেষ নেই। যতদিন পর্যন্ত বিভাজন একটি অবধারিত সত্য হয়ে থাকবে ততদিন বিভাজন জনিত ক্ষত শুকোবে না। আয়ারল্যান্ডের বিভাজনকে নীতিগতভাবে অসমর্থনীয় ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না। যেহেতু এটা জনগণের সম্মতির পরিণতি নয়, অধিকতর ক্ষমতাশালীর চাপে হয়েছিল। এটা ম্যাকবেথ কর্তৃক ডানকানকে হত্যা করার মতই নিকৃষ্ট কাজ। মহামান্য সম্রাটের সরকারের গায়ে রক্তের ছিটে লেডি ম্যাকবেথের মতই গাঢ়ভাবে লেগেছে এবং সে সম্পর্কে লেডি ম্যাকবেথ বলেছেন, রক্তের সৃতিগন্ধ ''আরবের সমগ্র সুগন্ধীসার'' দূর করতে ব্যর্থ হয়েছে। আর একটি বিভাজনের দলিল সম্পাদনের ব্যাপারে মহামান্য সম্রাটের সরকার আর দায়ি থাকতে যে চায় না সেটা স্পষ্ট হয় প্যালেস্টাইনে ইহুদি-আরব সমস্যা সম্পর্কে সরকারের নীতি থেকে। তদন্ত করার জন্য সরকার পীল আয়োরগ নিযুক্ত করেছিল। আয়োগ প্যালেস্টাইনের বিভাজন সুপারিশ করে। অচলাবস্থা সমাধানের জন্য এটাকেই সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক পন্থা বলে নীতিগত ভাবে সরকার মেনে নেয়।* হঠাৎ আরবদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া সমাধানের গুরুত্বটা বুঝতে পেরেছিল এবং উডহেড আয়োগ নামে আর একটি সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট আয়োগ গঠনকরে, যা বিভাজনের নিন্দা করে ও সরকারের পক্ষে এক সহজপথ প্রশস্ত করে দেয় কারণ সরকার এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে উদ্বিগ্ন ছিল। আয়ারল্যান্ডের বিভাজনের নজির অনুসরণযোগ্য ছিল না। এটা ছিল একটা কুৎসিত ঘটনা, যা এড়ানো প্রয়োজন ছিল। এটা একটা সমাধানকারী দৃষ্টান্ত নয়। মুসলীম লীগের আদেশে মহামান্য সম্রাটের সরকার নিজ কর্তৃত্বে ভারতকে বিভক্ত করবে কি না এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

এবং কেনই বা মহামান্য সম্রাটের সরকার মুসলীম লীগকে অনুগ্রহ করতে যাবে? আলস্টারের ক্ষেত্রে রক্তের সম্পর্ক ছিল, যার ফলে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের একটা শক্তিশালী অংশ আলস্টারের পক্ষ নিয়েছিল। এই রক্তের সম্পর্কের কারণেই লর্ড

* দ্রষ্টব্য সংসদীয় বিতর্ক (কমন্স), ১৯৩৮, খন্ড ৩৪১; পৃঃ ১৯৮৭-২১০৭; সেইসঙ্গে (লর্ডস), ১৯৩৬-৩৭ খণ্ড ১০৬, পৃঃ ৫৯৯-৬৭৪।

কার্জন বলতে বাধ্য হয়েছিলেন ‘‘আপনারা আলস্টারকে তার বর্তমান স্বামীকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য করছেন, যার প্রতি সে অবিশ্বাসিনী নয় এবং আপনারা তাকে বাধ্য করছেন অন্য একজনকে বিবাহ করতে যাকে সে মনেপ্রাণে অপছন্দ করে, যার সঙ্গে সে বসবাস করতে চাইছে না। কিন্তু মহামান্য সম্রাটের সরকার ও মুসলিম লীগের মধ্যে সে-রকম কোনও সম্পর্ক বন্ধন নেই এবং মহামান্য সম্রাটের সরকার তার পক্ষ অবলম্বন করবে লীগের পক্ষে এমন আশা করাটা নিষ্ফল হবে।

অপর যে বিষয়টি আমি বলতে চাইব সেটা হল এই যে, মহামান্য সম্রাটের সরকারের কর্তৃত্বাধিকারের সাহায্য প্রার্থনা করে ভারতের বিভাজন ঘটনানোর ব্যাপারে নিজ উদ্দেশ্য সাধনে সফল হবার বিষয়টি মুসলিম লীগের স্বার্থের অনুকূল হবে না। বিভাজনের পর পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান দুটি বন্ধুত্বপূর্ণ রাজ্য হিসাবে থাকতে সদিচ্ছা নিয়ে ও পরস্পরের বিরুদ্ধে কোনও দ্বেষ থাকবে না, এটাই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে পাকিস্তান পাওয়ার চেয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি করার পদ্ধতিটি কেমন হবে সেটাই আমার বিচারে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

এই উদ্দেশ্যটি বাস্তবায়িত করার জন্য কোন পদ্ধতিটি সবচেয়ে উপযুক্ত হবে? সকলেই একমত হবেন যে, পদ্ধতিটি এমন হওয়া উচিত যাতে কোনও এক সম্প্রদায়ের জয় এবং অন্যটির অপদস্থ হওয়ার ব্যাপারটি জড়িত থাকবে। পদ্ধতিটিকে অবশ্যই শান্তিপূর্ণ হলে এবং উভয়পক্ষের সম্মানে যেন বজায় থাকে। জনসাধারণের গণভোটের মাধ্যমে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তের চেয়ে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য কোনও সমাধান বেশি যুক্তিসিদ্ধ হবে বলে আমার জানা নেই। কোনটি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পন্থা এ ব্যাপারে আমি আমার প্রস্তাব জানিয়ে দিয়েছি। অন্যেরা তাদের প্রস্তাবগুলি নিয়ে এগিয়ে আসবেন। আমারটাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ সে কথা বলতে আমি পারি না। কিন্তু প্রস্তাব যাই হোক না কেন এই প্রশ্নের সমাধান সম্পর্কে শুভ বিচারবুদ্ধি ও দায়িত্ববোধের ভিত্তিতে যতক্ষণ না পর্যন্ত তা করা হচ্ছে, ততক্ষণ এটা একটা বিষাক্ত ক্ষত হয়েই থাকবে।

□ □ □

শেষকথা

আমি এখানে যদি টানতে পারি। কেন না এই বিষয়ে যা বলার তা বলা হয়েছে। আইনের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় আমার সওয়াল যথেষ্ট এবং অতএব শেষ। আমার সওয়াল ভিক্টোরিয়ান (Victorian) আইনের ব্যবসায়ীদের (lawyers) মতে দীর্ঘায়িত হল বলেও স্বীকার করি। এই দীর্ঘায়িত হবার কারণ এ আমার এই বক্তব্যের মধ্যে ঢুকে পড়েছে প্রশ্ন এবং উত্তর। বাদী বিবাদী দু পক্ষের উকিলের উত্তর-প্রত্যুত্তর, উক্তি-বক্রোক্তি, ব্যঙ্গোক্তির সমষ্টি যেন এক জায়গায় এসে তৈরি করেছে আমার ভাষণ। তাই মাঝে মাঝে আপনাদের বিরক্তির কারণ হয়েছে। কিন্তু আমার বক্তব্য এধার ওধার সেধার সব দিকে থেকে ভেবেচিন্তেই তৈরি। বক্তব্যে পাকিস্তানের সপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি যত্ন করে সাজানো আছে। আমার বিশ্বাস অনুযায়ী আমার বক্তব্য পেশ হল। এবার হিন্দুরা এবং মুসলমানরা তাঁদের নিজ নিজ বিশ্বাস, ভাবনা, চিন্তা সাজিয়ে দেবেন।

উভয়পক্ষের চিন্তার সংযোজনের জন্য কিছুটা যৌক্তিক সাহায্য করা যাক।

(১) ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য হিন্দু-মুসলমান ঐক্য কি জরুরি? যদি তাই হয় তবে হিন্দু আর মুসলমান প্রত্যেকের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের প্রয়োজন কিসে?

(২) হিন্দু-মুসলমান ঐক্য যদি সম্ভাব্য ভাবনা হয় তবে তার ভিত্তি কী হবে? হিন্দু মুসলমান পারস্পরিক তুষ্টিকরণ না কি পারস্পরিক স্বার্থের দেনা-পাওনার বন্দোবস্ত?

(৩) যদি এই ঐক্যের ভিতি হয় তুষ্টিকরণ তবে প্রশ্ন আসে, মুসলমানদের কী কী নতুন সুবিধার ডালা সাজানো হয়েছে যার বদলে তাদের সহযোগিতা হবে স্বতঃস্ফূর্ত এবং ডালা সাজানো হবে পক্ষপাতশূন্য।

(৪) যদি ভিত্তিটি হয় বন্দোবস্তের, তবে বন্দোবস্তের শর্ত কী কী? দুটি বিকল্প নিয়ে ভাবা যেতে পারে। প্রথমটি ভারতকে কেটে দু'ভাগ করে পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থান করে ফেলা। দ্বিতীয়টি আইনব্যবস্থাপক সভায় শাসনযন্ত্রে, এবং সামরিক চাকরিতে দু তরফের পঞ্চাশ শতাংশ অংশগ্রহণ।

(৫) ভারত যদি অখণ্ড সত্তায় বিরাজ করে তবে সেই সত্তার দুটি স্তম্ভ হবে হিন্দু এবং মুসলমান। অথবা ব্রিটিশদের কাছে অর্জিত স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারত যদি অখণ্ড সত্তায় বিরাজ করে তবে সেই সত্তার দুটি স্তম্ভ হবে হিন্দু এবং মুসলমান।

(৬) এই দুই পক্ষের মধ্যেকার জাতিগত দ্বেষ মাথায় রেখে এবং দুই পক্ষের স্ব-স্ব উদ্দেশ্যের মৌলিক পার্থক্য মাথায় রেখেই এখন একটি সংবিধানের চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে যা কিনা দু পক্ষের স্বার্থই দেখবে। যাতে করে কোন কিছুই থমকে না যায়।

(৭) দ্বি-জাতিতত্ত্বের ধারণা যদি মেনেই নেওয়া হয়, তবে ভারতকে আর একক একটি দেশ হিসাবে চলতে না দেওয়াই ভাল, কারণ অসামঞ্জস্য, অসুস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দৌর্বল্য প্রকাশ পায়। তার দুর্বল অস্তিত্ব অন্যের দাসত্বের শিকার হয়ে পড়ে। ভারতের ক্ষেত্রে তাই হবে যে, ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থেকে মুক্ত হল সেই শাসনাধীনে পুনর্বার ফিরে যেতে পারে অথবা অন্য কোন বিদেশি শক্তির অধীনস্থ হবে।

(৮) যদি ভারতবর্ষের একসূত্রে থাকার সূত্রটিই নিকট হয়ে যায় তবে পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থান নামের দুটি দেশে দ্বি-খণ্ডিত হওয়াই ভাল। কারণ অসমান স্তম্ভের ওপর যেমন ইমারত দাঁড়ায় না তেমনই সাযুজ্যহীন ভাবাদর্শ সকলের মিলনে একটি দেশের অনুপম আদর্শ গড়ে উঠে না।

(৯) যদি মুসলমানদের পাকিস্তান এবং হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান এই দুই আলাদ স্ব-স্ব নির্ভর দেশের ভাবনা-চিন্তা না করা যায়, তবে আমরা এই দূরপনেয় আশায় বেঁচে থাকি যে ভারতবর্ষ নামে এক অখণ্ড দেশ গড়ে উঠবে যেখানে হিন্দু আর মুসলমান কোনদিন এক স্বার্থের বন্ধনে বাঁধা পড়বে।

এ পর্যন্ত যে ভাবনাচিন্তা প্রকাশ পেল, তার চর্চা করে একজন ভারতীয় পৌঁছাতে পারে তিনটি ভাবনায় (১) এক কপট ঐতিহাসিক দেশপ্রেম (২) সর্বসত্ত্ব রাজ্যক্ষেত্রের এক অমূলক ধারণা এবং (৩) নিজের জন্য ভাবনার অনীহা। এই গুচ্ছের শেষ অর্থাৎ তিন নম্বর কী? চিন্তায় কপাল কুঞ্চন করার মতো দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে ভাবনা করা এক ব্যতিক্রমী প্রক্রিয়া আর মুক্ত ভাবনা আরও ব্যতিক্রমী প্রক্রিয়া। বিশেষ করে হিন্দুদের বেলায় একথা আরও বেশি করে সত্যি। হিন্দুরা এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেইজন্যই এই বইয়ের বেশি পাতাই তাদের জন্য খরচ করা হয়েছে। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ বলেই তাদের ভাবনা-চিন্তার গুরুত্ব আমাদের বেশি করে দিতে হবে। তাদের আমরা যুক্তি আর আবেগ দিয়ে বিচার না করি তবে সমাধানের আশা কম। কিন্তু শুধু এটুকুই তাদের জন্য আমার বক্তব্যের সিংহভাগের কারণ। একটু অন্য আমার মনে সমাজের চালিকাশক্তি কার্লাইলের(Carlyle) ভাষায় তাদের দেখার চোখ খুঁইয়ে এক আলেয়ার পিছে মগ্ন। ফল আমার বোধে ভয়াবহ। হিন্দুরা চলে গেছে সংগ্রামের মুঠোর মধ্যে আর কংগ্রেস চলে গেছে শ্রীযুক্ত গান্ধীর মুঠোর মধ্যে। এটা বলতে বাধে যে কংগ্রেসের পক্ষে গান্ধীর নেতৃত্ব সঠিক। সমস্যার

সমাধানের পথে না হেঁটে গান্ধী অন্য কথার পেছনে ছোটেন, তাঁর মতে দেশভাগ নৈতিক ভুল এবং তিনি এর মধ্যে নেই। এটি এক অদ্ভুত যুক্তি। ভারতবর্ষ একমাত্র দেশ নয় যে ভাগাভাগির কবলে পড়ল বা যার প্রাকৃতিক সীমানা নতুন জাতিতত্ত্বের সূত্র ধরে পাল্টাবে না। পোল্যান্ড (Polland) তিনবার ভাগ হয়েছে এবং আরও যে হবে না তার কোন নিশ্চয়তাও নেই। গত ১৫০ বছরে ইউরোপের এমন কোন দেশ নেই যে দেশভাগের কবলে পড়েনি। তার মানে দেশভাগ নৈতিক বা অনৈতিক কোনোটাই নয় বরং নীতিশাস্ত্রের উর্ধ্বে এক সামাজিক রাজনৈতিক অথবা সামরিক প্রশ্ন। পাপবোধের স্থান সেখানে নেই। শ্রীযুক্ত গান্ধীর আর একটির যুক্তির মধ্যেও আশ্রয় খোঁজেন। সেটি হল মুসলিম লীগ (Muslim League) আর শ্রীযুক্ত জিন্নাহ (Mr. Jinnah) সংক্রান্ত। গান্ধীর মতে মুসলিম লীগ মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি নয় এবং পাকিস্তান জিন্নার খেয়ালমাত্র। এই জায়গাটিই বোধের অগম্য। কেন যে শ্রীযুক্ত গান্ধী মুসলমানদের ওপর শ্রীযুক্ত জিন্নার ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং জিন্নাহ তাঁর সেই প্রভাব বিস্তার করে সমস্ত শক্তিকে একত্র করে বিরোধের জন্য তৈরি হয়েছিল এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে রইলেন। শ্রীযুক্ত জিন্নাহ কিন্তু কখনই জনগণের নেতা ছিলেন না। বরং তিনি জনগণকে সামগ্রিকভাবে বিশ্বাসই করতেন না।* জিন্নাকে কখনই ধর্মনিষ্ঠ, ভক্তিমান, আচারনিষ্ঠ মুসলমানদের বলে কখনই জানা যায় না। তিনি যখন বিধানসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেন তখনই তাঁকে পবিত্র কুরআনে চুম্বন করতে কিন্তু তার মানে এই নয় যে কুরআনে কী আছে তা নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা ছিল। তিনি কৌতূহলেই হোক বা ধর্মের নেশায়-ই হোক মসজিদে যাওয়া আসা করতেন কিনা তাতেও সন্দেহ ছিল। তাঁকে কখনও কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মুসলমান জনসমাগমে দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ইদানিংকালে জিন্নার মধ্যে সম্পূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তিনি জনগণের একজন হয়ে উঠেছেন। তিনি তাঁর প্রতিমা এমনভাবে এঁকে ফেলেছেন যে, তিনি জনগণেরই মধ্যেকার একজন। তাদের মাথার ওপর অধিষ্ঠিত কোনও ব্যক্তি নন। বরং জনগণ তাঁকে নিজেদের মাথার ওপর বসিয়ে তাঁকে তাদের কায়েদ-ই-আজম (Qaid-e-Azam) বানিয়ে দিল। অর্থাৎ যিনি ছিলেন ইসলামে (Islam) অবিশ্বাসী, রূপান্তরে তিনি হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি ইসলামের জন্য প্রাণ পর্যন্ত বাজি রাখেন। রূপান্তরিত জিন্নাহ কালামার (Kalama) থেকেও বেশি ইসলামে প্রাজ্ঞ হয়ে উঠলেন। দিন পরিবর্তনে পরিবর্তিত ব্যক্তিত্বের জিন্নাহ এখন খুটবা/খুৎবা (Khutba) শুনতে

* পন্ডিত জওহরলাল নেহরু (Pandit Jawaharlal Nehru) তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন যে, জিন্নাহ চেয়েছিলেন যে ম্যাট্রিক পাশ নয় এমন লোককে যেন কংগ্রেসের সদস্যপদ দেওয়া না হয়।

মসজিদের যান ইদের (Id) আমজনতার আলিঙ্গনে আনন্দ পান। ডোংরি, নালবাজারে জনতা এতদিন তাঁর নাম জানত। আজকাল তারা তাঁকে তাদের মধ্যে পায়, বোম্বাইয়ের প্রত্যেকটি মুসলমান সম্মেলনে দুটি ধ্বনি ওঠে—আল্লা-হো-আকবর এবং কায়েদ-ই-আজম দীর্ঘজীবী হোন। জিন্নার এই রূপান্তর দেখে মনে পড়ে ফরাসিদের রাজা চতুর্থ হেনরি (King Henry IV), যিনি ছিলেন ইংরেজের রাজা প্রথম চার্লসের অসুখী-শ্বশুর। ফরাসি দেশের রাজা ধর্মে হিউগোনট (Huguenot) হওয়া সত্ত্বেও তিনি পারিতে ক্যাথলিক চার্চের ধর্মীয় সমাবেশে অবলীলায় যোগ দিতেন। কারণ খুব সাধারণ—জনসমর্থন। অর্থাৎ পারিতে যেসব চতুর্থ হেনরীর কাছে তেমনি ডোংরি আর নালবাজার জিন্নার কাছে। দুজনের ক্ষেত্রে এই কথা কৌশল যেন রণচাতুর্যে সৈন্য সমাবেশ। এই রণচাতুর্যে এমন কিছু নজরে আসে যাতে মনে হয় জিন্নার এই চাতুর্য আসলে যৌক্তিকতা থেকে কু-সংস্কারের দিকে অধঃপতন। তবে মনে রাখতে হবে গোটা মুসলমান সমাজ-ই সেই অধঃপতনের সামিল। গান্ধী যে মুসলমানদের কথা ভাবেন সেই মুসলমানেরা জাতীয়বাদী মুসলমান। কিন্তু গান্ধীর কল্পিত সেই মুসলমানেরা বিরল প্রজাতির। কারণ মুসলমানেরা সে জাতীয়তাবাদীই হোক বা ধর্মভিরুই হোক মুসলিম লীগের অস্তিত্বের সঙ্গে নিজেকে একান্ত ভাবেন না। এমন ভাবনাতেই সন্দেহ থেকে যায়। সত্যি কথা বলতে কংগ্রেসের মধ্যে জাতীয়বাদী, মুসলমান বলে যে গোষ্ঠী আছে তারাও যথেষ্ট সাম্প্রদায়িক। এ ব্যাপারে স্মতর্ব্য মরহুম ডঃ আনসারির কথা যিনি জাতীয়বাদী মুসলমানদের নেতা হয়েও মুসলমানদের জন্য আলাদা নির্বাচকমণ্ডলীর বিরোধিতা করেন নি। এবং গোটা মুসলমান সমাজের ওপর মুসলিম লীগের এমন প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে যে মুসলিম লীগের একদা বিরোধীরাও পুরানো বিবাদ ভুলে মুসলিম লীগের মধ্যেই একটি জায়গা পাবার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে, অথবা মুসলিম লীগের দিকে শান্তির পায়রা উড়িয়ে দিচ্ছেন। উদাহরণ হিসাবে আমরা দেখতে পাই স্যার সিকান্দার হায়াৎ খান বা বাংলার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক দুজনেই নিজ নিজ রাজ্যে মুসলিম লীগের শাখা প্রসারের বিরেধিতা করেছিলেন। কিন্তু পঞ্জাবে এবং বাংলায় যখন জিন্নাহ ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের পুনরুজ্জীবন ঘটালেন তখন তাঁরা লীগে একপ্রকার বাধিত হয়ে যোগ দিলেন। দেখেশুনে মনে হয়, একদিন যাঁরা এসেছিল অবজ্ঞা করতে আজ তাঁরাই দাঁড়িয়ে আছে আজ্ঞা পেতে। লীগের জয়কে প্রমাণ করার জন্য এর থেকে অকাট্য যুক্তি আছে কি না জানা নেই।

তথাচ গান্ধীজি জিন্নাহ এবং মুসলিম লীগের কোনও সমঝোতায় না গিয়ে অন্য পথে হাঁটলেন। লীগের সঙ্গে কোন আলোচনা না করেই এককভাবে দুম্ করে

ডেকে বসলেন 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো" ডাক (৮ই অগাস্ট ১৯৪২)। লীগের সঙ্গে আলোচনা না করার অর্থ দাঁড়াল সংখ্যালঘুদের সমস্যা নিজ দায়িত্বে রেখে দিলেন কংগ্রেস ফলত 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। আন্দোলনের রূপেও দেখা গেল নির্মমতা। লুট অগ্নিকাণ্ড হত্যার শিকার হতে বেশি দেখা দেল ভারতীয়দের-ই। এরকম একটি অবস্থায় গান্ধীজি ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে ২১ দিনের অনশনে ব্রতী হলেন, উদ্দেশ্য কারাগার থেকে মুক্তি। এখানেও তাঁর সঙ্গী ব্যর্থতা। ক্রমশ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুস্থতা বাড়তে থাকল। ব্রিটিশ সরকার অতএব তাঁর মৃত্যুভয়ের কেলেঙ্কারির হাত থেকে বাঁচতে তাঁকে মুক্তি দিল। কারাগার থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে গান্ধীজি দেখলেন তিনি এবং তাঁর দল কংগ্রেস দুই-ই পথভ্রষ্ট হয়েছেন। ভারত ছাড় আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং তৎপরবর্তী হিংসার প্রকাশের কংগ্রেসের ভাবমূর্তির যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল বা হৃত হয়েছিল। এর পুনরুদ্ধারের জন্য বা এর-ই সঙ্গে ব্রিটিশদের কাছে কংগ্রেসকে এক নম্বর দল হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য গান্ধীজি বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন, সেখানেও ভগ্নদূত গান্ধী ফিরে তাকালেন এবার জিন্নার দিকে। ১৯৪৪ সালের ১৭ই জুলাই জিন্নাকে তিনি আলোচনায় বসার জন্য একটি চিঠি লিখে ফেললেন, বিষয় সাম্প্রদায়িকতা। জিন্নাহ রাজি হয়ে গেলেন। সেই বছরেই সেপ্টেম্বরে বোম্বাইতে তাঁর বাড়িতে বৈঠক বসল। শেষমেষ সুবুদ্ধি গান্ধীকে ভর করল বলা যায়।

দু'পক্ষের আলোচনার বিষয়বস্তু ঠিক হল ১৯৪৪ সালের জিন্নার কাছে পেশ করা শ্রী রাজাগোপালাচারির (রাজা গোপালাচারির) প্রস্তাবের ভিত্তিতে, তাঁর এই প্রস্তাব তাঁর কথায় (যদিও তাঁর কথা বিশ্বাসযোগ্যতার চৌকাঠ সত্যিই ডিঙিয়েছে কিনা এমন সন্দেহই থেকেই যায়) গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনার পরেই জিন্নার কাছে পেশ করা হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে কারাগার বন্দী অনশনরত গান্ধীর সঙ্গে তিনি আলোচনা সেরে ফেলেছিলেন বলে দাবি, কি সেই প্রস্তাব, তারা খানিকটা নিচে দেওয়া হল। ইতিহাসে এই প্রস্তাব সি আর সূত্র নামেই খ্যাত।

(১) শর্তসাপেক্ষে মুসলিম লীগ স্বাধীনতা অর্জনে কংগ্রেসের সঙ্গে একসাথে কাজ করবে, আর ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যবর্তী সময়ে যে অন্তবর্তী প্রাদেশিক সরকার (Provincial Interim Government) গঠনে সাহায্য করবে।

(২) যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরবর্তী সময়ে একটি কমিশন গঠিত হবে যার কাজ, হবে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের জেলাগুলি, যেখানে জনসংখ্যা বেশি সেগুলিকে চিহ্নিত করা। চিহ্নিত এই অঞ্চলগুলিতে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণের মতামত গণভোটের মাধ্যমে নেওয়া হবে তারা কোন দেশের অধিবাসী হতে চায়—

হিন্দুস্থান না পাকিস্তান।

(৩) গণভোটের পূর্বে প্রত্যেক দল-ই পারবে নিজ নিজ মতামত জনগণের সামনে তুলে ধরতে।

(৪) দেশভাগ যদি অপ্রতিরোধ্য হয়, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ, বাণিজ্যের মতন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পারস্পরিক সমঝোতায় পৌছানোর চেষ্টা হবে।

(৫) জনসংখ্যার আদান-প্রদান হবে সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক।

(৬) ব্রিটেন থেকে ভারতবর্ষের ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়-ই এই সমস্ত শর্তাবলী আলোচিত হবে।

আলোচনা শুরু হয়েছিল ৯ই সেপ্টেম্বর। চলেছিল ১৮ দিন ধরে। ২৭ সেপ্টেম্বর ঘোষিত হল, আলোচনা ভেস্তে গেছে। ফলত আলোচনার ব্যর্থতা বিভিন্ন ব্যক্তির মনে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। কেউ হল আনন্দিত, কেউ বা বিমর্ষ। তবে আলোচনায় দু'পক্ষই দেখা গেল পরাজিত। তবে অন্য পক্ষের কাছে। গান্ধী ব্রিটিশদের কাছে, জিন্নাহ পঞ্জাবের 'ইউনিয়নিস্ট পার্টি'র (Unionist Party) কাজে। আর দুপক্ষ একসাথে পরাজিত হল জনগণের কাছে। জনগণ তাদের ওপর বিশ্বাস আরোপ করেছিল। বিশ্বাস হত হল। আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার কারণ সি আর সূত্রের (C.R. Formula) মধ্যেই গলদ। সূত্রটি সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছিল। এই সূত্র কোনও সমাধানের পথ দেখায় নি। বদলে যেটি করতে চেয়েছিল সেটি হল জিন্নাকে সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে ফেলতে। রাজা গোপালাচারির কথা থেকে এমন সুত্রের ভাবনা ভেবেছিলেন। তবে মনে হয় ভারতীয় ইতিহাস থেকে তাঁর এই ভাবনা এসেছিল। ইতিহাস যেমন দেখা যায় রাজকন্যাদের শত্রু রাজাদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাদের বন্ধুত্ব অর্জন করার প্রচেষ্টা এই সূত্রে মধ্যেও সেই প্রচেষ্টা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ইতিহাস বলে, ওই সমস্ত রাজনৈতিক বিয়েতে যেমন রাজকন্যারা ভাল বরও পেতেন না, তেমন বন্ধুত্ব পাতলা হত। রাজা গোপালাচারিয়ার সূত্রের ব্যর্থতাও সেখানে স্বাধীনতা জয়ের জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে বন্ধনে আবদ্ধ করা এক বিরাট ভুল।

সি আর সুত্রের দ্বিতীয় ভুল চুক্তিনির্বাহে ব্যবস্থাপনা। এই সূত্রে ব্যবস্থাপক হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল প্রাদেশিক সরকারকে। চিন্তার ভুল এখানেই যে, একবার প্রাদেশিক সরকার স্থাপিত হলে দু'পক্ষের আলোচনায় বেরিয়ে আসা প্রস্তাবের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। কারণ তখন সরকারের আদেশ নির্দেশই বলবৎ হবে, কার্যে পরিণত

করা হবে আর কার্যে পরিণত করা হয়েছে এ দুয়ের মধ্যে ফারাক আছে। প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠার সম্মতির মাধ্যমে মুসলিম লীগ কংগ্রেসকে স্বাধীনতালাভে সাহায্য করতে পারে কিন্তু কংগ্রেস প্রাদেশিক সরকার গঠনের পর পাকিস্তান গঠনে কতটা সাহায্য করবে সে প্রশ্ন থেকেই যায়। জিন্নার দাবি ছিল এমন সঠিক দাবি, যে সমস্ত প্রস্তাবগুলি একত্রে সামগ্রিকভাবে লাগু হোগ। রাজাগোপালাচারি আর যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন নি সেটি হল প্রাদেশিক সরকার গঠিত হয়ে গেলে সরকারের কথাই শেষ কথা হবে। সেক্ষেত্রে সরকার তার উৎসশক্তির বক্তব্যকে প্রাধান্য নাও দিতে পারে। ধরে নেওয়া হল প্রাধান্য দেবে, সেক্ষেত্রে যদি কংগ্রেসের প্রস্তাব-ই প্রাধান্য পায়, তবে মুসলমানরা বিদ্রোহ করতে পারে যদি প্রাদেশিক সরকার গঠনের পূর্বের প্রস্তাব কার্যকরী করে এবং পাকিস্তান গঠনে সাহায্য করে, তবে সেটি সর্বজনগ্রাহ্য হবে কি না সেটিও ভেবে দেখা দরকার ছিল। সমাধানের একমাত্র উপায় সংসদে আইন পাস করে প্রস্তাবগুলি কার্যকর করা।

সি আর সূত্রের আরও ত্রুটি আছে। এটি তিন নম্বর। পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থানের মধ্যে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক কার্যনির্বাহ, শুল্ক, ইত্যাদি দ্বৈত স্বার্থসংশ্লিষ্ট সমস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে চুক্তি সম্পাদনের কথা সি আর সূত্রে উল্লেখ আছে। কিন্তু এখানেও কতগুলি বাস্তব অসুবিধা রাজাগোপালাচারি দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। দ্বৈত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানে গিয়ে এমন নিশ্চয় কোথায় পাওয়া যাবে যে, দ্বৈত স্বার্থ সত্যিই রক্ষিত হবে। আমার মতে দুটি পথ খোলা আছে। এক, একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা হবে যার হাতে আধিকারিক এবং সাংসদীয় (Excutive and Legislative) ক্ষমতা দেওয়া থাকবে যে ক্ষমতাবলে ওই কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করবে, সেক্ষেত্রে পাকিস্তান বা হিন্দুস্থান দুটি রাষ্ট্রই ওই কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মেনে চলবে। তার মানে হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রের-ই সার্বভৌমত্বে আঘাত লাগবে। শ্রীযুক্ত জিন্নাহ কি এই ব্যবস্থা মেনে নেবেন? কিছুতেই নয়। অন্য পথ হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান নামে দুটি সার্বভৌমত্ব দেশ গঠন করা। এবং তাদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করা। যে চুক্তির শর্ত দুপক্ষেরই সমান প্রযোজ্য হবে, কিন্তু এখানেও সমস্যা হতে পারে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান যদি এই চুক্তির অবমাননা করে, এমন কি অধিরাজ্য (Dominion) হিসাবেও? ইতিহাসে এ ঘটনার সাক্ষ্য আছে। 'অ্যাংলো আইরিশ চুক্তি' যেখান থেকে রাজাগোপালাচারি সূত্র খুঁজেছেন, সেই চুক্তি থাকা সত্ত্বেও আয়ারল্যান্ড যেই অধিরাজ্যের মর্যাদা পেল, সেদিন থেকে চুক্তিকে অবমাননা শুরু করল। ব্রিটিশ সংসদের নিঃস্তব্ধ হয়ে দাঁত কামড়ানো ছাড়া কিছুই করার ছিল না।

আলোচনা ভেস্তে যাওয়াতে অতএব কারুরই ভ্রূ-কুঞ্চন হয়নি। ভ্রূ-কুঞ্চন হচ্ছিল যখন-ই কতগুলি অবধারিত প্রশ্নের উত্তরে জিন্নাকে জনসভায় ঐচ্ছিক নীরবতা পালন করতে দেখা গেল। এই নীরবতা জিন্নাহ কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে ভেঙেছেন। প্রশ্নগুলি হল (১) মুসলিম লীগের প্রস্তাবনার (Resolution) কারণে পাকিস্তানের অস্তিত্ব কি হজম হয়ে যাবে? (২) মুসলিম লীগই মুসলমান জনগোষ্ঠীর একমাত্র প্রতিনিধি নয়। অতএব লীগের বাইরের জনগোষ্ঠীর অন্য অংশের কথার কি গুরুত্ব নেই? (৩) পাকিস্তানের সীমানা কী হবে? পঞ্জাব আর বাংলার যে শাসন সীমানা আছে, সেই সীমানাই থাকবে না কী জাতিগত সীমানা নির্ধারিত হবে? (৪) লাহোর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবনায় আছে "সীমানা নির্ধারণ পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে ঠিক হবে" মুসলমান লীগের এই ধরনের বক্তব্যের অর্থ কী? (৫) লাহোর প্রস্তাবনায় "অবশেষে" শহরের ব্যপ্তি কী? এর মানে কি এই লীগ ধরে নিয়েছে পরিবর্তনের সময়ে পাকিস্তানকে স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচিত হবে না? (৬) যদি জিন্নার প্রস্তাবমতো পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের যে প্রশাসনিক সীমানা আছে সেই সীমানায় বজায় থাকে, তবে এই অঞ্চলের তফসিলি জাতি ও উপজাতি সমূহ যারা মুসলিম নয়, তাদের ভাগ্য কী হবে? পাকিস্তানে তারা থাকবে কী থাকবে না এই নিয়ে তারা কি গণভোটে সামিল হতে পারবে? যদি তাদের বিশেষ করে পঞ্জাব এবং বাংলার তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের গণভোট দিতে দেওয়া হয় তবে সেই গণভোটের ফলাফল কি জিন্নাহ মেনে নেবেন? (৭) পশ্চিম এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সংযোগকারী একটি রাস্তা কি উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এমন কোনও বাসনা কিনা জিন্নাহ মনে মনে পোষণ করেন? যদি করেন তবে তাকে নির্দিষ্ট প্রশ্ন করে নির্দিষ্ট উত্তর তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে। সেই কাজ না করে গান্ধীজি এটিই প্রমাণ করতে ব্যগ্র, লীগের লাহোর প্রস্তাবনা এবং সি আর সূত্র চরিত্রে মূলত এক-ই। অতএব সুযোগ নষ্ট করছেন।

দু'জনের আলোচনা শেষ হয়েছে। দু'জনেই চুপ করে গেছেন। যেন ইনিংস শেষ করে ক্রিকেটের ব্যাটসম্যান প্যাভিলিয়নে ফিরে এসেছেন। পরবর্তী ক্রিয়াকাণ্ডের কোনও ভাবনাই নেই। অথচ সবাই এর পর কী?—এই প্রশ্নের উত্তরের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছে। যে কোনভাবেই এর উত্তর খুঁজে বার করতে হবে। হয় সমঝোতার মাধ্যমে অথবা সালিসির মাধ্যমে না হলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অন্ধকার। যদি পারস্পরিক ঐকমত্যের মাধ্যমে হয়, তবে ঐকমত্যের ভিত্তি হওয়া উচিত পারস্পরিক 'দিবে সার নিবে' সূত্র অনুযায়ী। এ কিছুটা ছাড়বে ও ছাড়াবে এই রকম। নচেৎ সেটি আর ঐকমত্য থাকবে না। হবে একে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে

দেওয়া প্রক্রিয়া। আর ঐকমত্য পৌঁছাতে যা দেখা যাচ্ছে দরকার পড়ছে, দীর্ঘ আলোচনায়, যার ফলে হচ্ছে বিলম্ব সুদূরে চলে যাচ্ছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির আলোটি অথচ সাম্প্রদায়িক এই সমস্যা না মিটিয়ে কিছু ভাগও অবিমৃষ্যকারী চিন্তা। অতএব আমার মতে কোনও আন্তর্জাতিক পর্ষদের (International Board) হাতে সালিসির ভার অর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ। এই পর্ষদ গঠিত হোক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরের প্রতিনিধি নিয়ে এবং হিন্দুদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রতিটি সংখ্যালঘু জাতের— যেমন মুসলমান, শিখ, তফসিলি জাতি ও উপজাতি, ভারতীয় খ্রিস্টান, প্রত্যেকে তাদের বক্তব্য পেশের জন্য তাদের মনোনীত প্রতিনিধি পাঠাবে এবং সালিসি শেষে প্রত্যেকে পর্ষদের আদেশ শিরোধার্য করবে। ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে এই অঙ্গীকার করতে হবে ।—

(১) তারা সাম্প্রদায়িক বন্দোবস্তে মাথা গলাবে না। এই বন্দোবস্ত পর্ষদই করে দেবে।

(২) সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে পর্ষদ স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত ভারত শাসন আইনে (Govt. of India Act.) অন্তর্ভূক্ত করবে।

(৩) আন্তর্জাতিক পর্যদ কৃত সিদ্ধান্ত দ্রুত কার্যকর করতে তারা ভারতকে অধিরাজ্যের মর্যাদা (Indian Dominion Status) দেবে।

এই প্রক্রিয়ার অনেক সুবিধা। সাম্প্রদায়িক বন্দোবস্তে ব্রিটিশদের নাক গলানোর রাস্তা বন্ধ হবে। অতএব কংগ্রেসও এই অভিযোগের ধুয়ো তুলতে পারবে না। কংগ্রেসের অভিযোগ এই ব্রিটিশ যতবারেই নাক গলিয়েছে ততবার-ই সংখ্যালঘুরা তাদের যা পাওনা তার থেকে বেশি পেয়ে কংগ্রেস বিমুখ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় যে সুবিধা দৃষ্টিতে আসে সেটি হল, এর ফলে কংগ্রেসের সংবিধান গঠন নিয়ে যে আপত্তি সেটিও গ্রাহ্য হবে না। কারণ কংগ্রেস এখানে বলতে পারবে না যে সংবিধান রচনায় ব্রিটিশ সরকার সংখ্যালঘুদের হাতে বেশি ক্ষমতা প্রদান করলে তারা ব্রিটিশদের দ্বারা চালিত হবে। অতএব ছোটখাটো ব্যাপারেও তারা ব্রিটিশ ইচ্ছানুযায়ী সম্মতি প্রদানে বিরত থাকবে। আন্তর্জাতিক সালিসি ব্যবস্থা থাকলে এই সম্ভাবনার কোনও জায়গা থাকবে না। আন্তর্জাতিক বন্দোবস্ত সবার ওপর-ই প্রযোজ্য হবে। বরং সংখ্যালঘুদের দাবি যদি যুক্তিসঙ্গত হয়, তবে তাদের দাবিও গ্রাহ্য হবে। অতএব সালিসি ব্যবস্থার দ্বারস্থ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ব্যক্তি বা ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে এই ব্যবস্থায় আইনের শাসন কায়েম হবে। এবং ব্রিটিশ সরকারের এই ব্যবস্থার বিরোধিতার কোনও কারণ নেই। বরং ব্রিটিশ সরকার ভারমুক্ত হবে। এই মুক্তি ঘৃণা

থেকে, যে ঘৃণা সে সংখ্যালঘুদের সামাজিক নিরাপত্তা এবং রক্ষাকবচের বন্দোবস্ত করতে গিয়ে অর্জন করেছিল। তবে সালিসি পর্ষদের রায় লাগু করতে গিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সম্ভাব্য কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে। যদি কোনও পক্ষ পর্ষদের সামনে তার বক্তব্য পেশ না করে, তবে কি ব্রিটিশ সরকার পর্ষদকৃত সর্বপক্ষমান্য রায় সেই অনিচ্ছুক পক্ষের ওপরও চাপাতে পারবে? আমার মতে পারবে এবং এতে অন্যায় হবে না। কারণ যদি কোন পক্ষ সালিসি পর্ষদের কাছে নিজ বক্তব্য পেশ করা থেকে, বিরত থাকে তবে ধরে নিতে হবে সেই পক্ষ পর্ষদের অস্তিত্ব অগ্রাহ্যকারী আর সার্বজনিক সংস্থার অগ্রাহ্যকারীকে সংস্থার মতামত চাপিয়ে দেওয়া ছাড়া গতি নেই। এটিকে শাস্তি বলে গণ্য করা যেতে পারে। এতে ব্রিটিশ সরকারের বিব্রত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এমন উদাহরণ তো আছেই। লীগ অব নেশনসে (League of Nations) আবিসিনীয় বিতর্কে নিজের পক্ষের বক্তব্য পেশ করার পদ্ধতি প্রত্যাখ্যান করায় মুসোলিনিকেও এরকম শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছিল। এযাবত আমার বক্তব্য 'পরবর্তী কী'? এর উত্তর নয়। পরে কী আমার জানা নেই। আমার যেটি জানা আছে সেটি হল ; হয় চূড়ান্ত এবং সব পক্ষের গ্রহণযোগ্য উত্তর দ্রুত বের করতে না পারলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সুদূর পরাহত।

□ □ □

পরিশিষ্ট সূচি

পরিশিষ্ট-I

ভারতের সম্প্রদায়ভিত্তিক জনসংখ্যা

সম্প্রদায়	ব্রিটিশ ভারত	দেশীয় রাজ্য ও এজেন্সি সমূহ	মোট সংখ্যা
১. হিন্দু	১৫০৮৯০১৪৬	৫৫২২৭১৮০	২০৬১১৭৩২৬
২. মুসলমান	৭৯৩৯৮৫০৩	১২৬৫৯৫৯৩	৯২০৫৮০৯৬
৩. তফসিলি জাতি*	৩৯৯২০৮০৭	৮৮৯২৩৭৩	৪৮৮১৩১৮০
৪. উপজাতি	১৬৭১৩২৫৬	৮৭২৮২৩৩	২৫৪৪১৪৮৯
৫. শিখ	৪১৬৫০৯৭	১৫২৬৩৫০	৫৬৯১৪৪৭
৬. খ্রিস্টান			
(ক) ভারতীয় খ্রিস্টান	১৬৫৫৯৮২	১৪১৩৮০৮	৩০৬৯৭৯০
(খ) অ্যাংলো ইন্ডিয়ান	১১৩৯৩৬	২৬৪৮৬	১৪০৪২২
(গ) অন্যান্য	৭৫৭৫১	৭৭০৮	৮৩৪৫৯
৭. জৈন	৫৭৮৩৭২	৮৭০৯১৪	১৪৪৯২৮৬
৮. বৌদ্ধ	১৬৭৪১৩	৬৪৫৯০	২৩২০০৩
৯. পার্শি	১০১৯৬৮	১২৯২২	১১৪৮৯০
১০. ইহুদি	১৯৩২৭	৩১৫৩	২২৪৮০
১১. অন্যান্য	৩৭১৪৩০	৩৮৪৭৪	৪০৯৮৭৭
মোট	**২৯৪১৭১৯৬১**	**৮৯৪৭১৭৮৪**	**৩৮৩৬৪৩৭৪৫**

* ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ভারত সরকার প্রদত্ত এই নাম।

টীকা—ব্রিটিশ ভারতে বা দেশীয় রাজ্যসমূহে তফসিলি জাতের যে সংখ্যা দেখানো হয়েছে সেটি সম্পূর্ণ নয়। ব্রিটিশ ভারতের আজমের মারওয়াড়ের (Ajmir Murwara) এবং দেশীয় গোয়ালিয়র রাজ্যের সংখ্যা এর মধ্যে নেই। কারণ ১৯৪০ সালের আদমশুমারে এর সংখ্যা দেওয়া নেই।

পরিশিষ্ট-II

ব্রিটিশ-ভারতে প্রদেশভিত্তিক সংখ্যালঘুদের সম্প্রদায়গত বিভাজন

প্রদেশ	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান		তফসিলি জাতি		ভারতীয় খ্রিস্টান		শিখ	
		মোট জনসংখ্যা	শতকরা হিসাব	মোট জনসংখ্যা	শতকরা হিসাব	মোট জনসংখ্যা	শতকরা হিসাব	মোট জনসংখ্যা	শতকরা হিসাব
১। আজমীর মোরওয়ারা	৫৮৩৬৯৩	৮৯৮৯৯	১৫.৪	শূন্য (?)	......	৩৮৯৫	০.৮	৮৬৭	.১৫
২। আন্দামান নিকোবর	৩৩৭৬৮	৮০০৫	২৩.৭	শূন্য	......	৭৭৯	২.৩	৭৪৪	২.২
৩। অসম	১০২০৪৭৩৩	৩৪৪২৪৭৯	৩৩.৭	৬৭৬২৯১	৬.৬	৩৭৭৫০	০.৪	৩৪৬৪	.০৩
৪। ব্রিটিশ বালুচিস্তান	৫০১৬৩১	৪৩৮৯৩০	৮৭.৫	৫১০২	১.০	২৬৩৩	০.৫	১১৯১৮	২.৩
৫। বঙ্গদেশ	৬০৩০৬৫২৫	৩৩০০৫৪৩৪	৫৪.৭	৭৮৭৮৯৭০	১৩.০	১১০৯২৩	০.২	১৬২৮১	.০৩
৬। বিহার*	৩৬৩৪০১৫১	৪৭১৬৩১৪	১২.৯	৪৮৪০৩৭৯	১৩.৩	২৪৬৯৩	০.৭	১৩২১৩	.০৪
৭। বোম্বে	২০৮৪৯৮৪০	১৯২০৩৬৮	৯.২	১৮৫৫১৪৮	৮.৯	৩৩৮১২	১.৬	৮০১১	.০৪
৮। মধ্য প্রদেশ এবং বেরার †	১৬৮১৩৫৮৫	৭৮৩৬৯৭	৪.৭	৩০৫১৪১৩	১৮.১	৪৮২৬০	০.৩	৮০১১	.০৯
৯। কুর্গ (Coorg)	১৬৮৭২৬	১৪৭৮০	৮.৮	২৫৭৪০	১৫.৩	৩৩০৯	২.০	শূন্য	....
১০। দিল্লি	৯১৭৯৩৯	৩০৪৯৭১	৩৩.২	১৬১৬৯৩	১৩.৩	১০৪৯৪	১.১	১৬১৫৭	১.৮
১১। মাদ্রাজ	৪৯৩৪১৮১০	৩৮৯৬৪৫২	৭.৯	৮০৬৮৪৯২	১৬.৪	২০০১০৮২	৪.০৬	৪১৮	.০০১
১২। উ.প.সী.প্র	৩০৩৮০৬৭	২৭৮৮৭৯৭	৯১.৮	শূন্য	—	৫৪২৬	০.২	৫৭৯৮৯	১.৯

[পরের পৃষ্ঠায়]

[আগের পৃষ্ঠা থেকে]

পরিশিষ্ট-II

ব্রিটিশ ভারতে প্রদেশভিত্তিক সংখ্যালঘুদের সম্প্রদায়গত বিভাজন

প্রদেশ	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান		তফসিলি জাতি		ভারতীয় খ্রিস্টান		শিখ	
		মোট জনসংখ্যা	শতকরা হিসাব	মোট জনসংখ্যা	শতকরা হিসাব	মোট জনসংখ্যা	শতকরা হিসাব	মোট জনসংখ্যা	শতকরা হিসাব
১৩। ওড়িশা	৮৭২৮৫৪৪	১৪৬৩০১	১.৭	১২৩৮১৭১	১৪.২	২৬৫৮৪	০.৩	২৩২	.০০৩
১৪। পঞ্জাব	২৮৪১৮৮১৯	১৬২১৭২৪২	৫৭.০	১২৪৮৬৩৫	৪.৪	৪৮৬০৩৮	১.৭	৩৭৫৭৪০১	১৩.২
১৫। পন্থ পিপলোদা	৫২৬৭	২৫১	৪.৮	৯১৮	১৭.৪	২১৮	৪.১	শূন্য	
১৬। সিন্দ	৪২২৯২২১	৩০৫৪৬৩৫	৭২.২	১৯১৬৩৪	৪.৫	১৩২৩২	০.৩	৩১০১১	০.৭
১৭। সংযুক্ত প্রদেশ	৫৫০২০৬১৭	৮৪১৬৩০৮	১৫.৩	১১৭১৭১৫৮	২১.৩	১৩১৩২৭	০.২	২৩২৪৪৫	০.৪
মোট	২৯৫৫০২৯৩৫	৭৯৩৪৪৮৬৩	২৬.৯	৪০৯১৯৭৪৪	১৩.৯	৩২৪৫৪৫৩	১	৪১৫৫১৪৭	১.০
* বিহার	২৮৮২৩৮০২	৪১৬৮৪৭০	১৪.৪	৩৯১৯৬১৯	১৩.৬	১২৬৫১	.০৪	৩২০৪	.০১
ছোটনাগপুর	৭৫১৬৩৪৯	৫৪৭৮৪৪	৭.৩	৪২০৭৬০	৫.৬	১২০৪২	০.২	১০০০৯	০.১
† সি. পি.	১৩২০৮৭১৮	৪৪৮৫২৮	৩.৪	২৩৫৯৪৩৬	১৭.৯	৪১১৩৫	০.৩	১২৭৬৬	০.১
বেরার	৩৬০৪৮৬৬	৩৩৫১৬৯	৯.৩	৬৯১৫৭৭	১৯.২	৬১২৫	০.২	২২৩০	০.৫
@ আগ্রা	৪০৯০৩১৪৭	৬২৩১০৬২	১৫.২	৮০১৮৮০৩	১৯.৬	১২০৫৪৯	০.৩	২২৬০৯৬	০.৫
অওধ	১৪১১৪৪৭০	২১৮৫২৪৬	১৫.৫	৩৬৯৮৮৩৫৫	২৬.২	১০৭৭৮	.০৮	৬৩৪৯	.০৫

পরিশিষ্ট - III

দেশীয় রাজ্যে সংখ্যালঘুদের সম্প্রদায়গত বিভাজন

রাজ্য এবং এজেন্সি	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান		তফসিলি জাত		ভারতীয় খ্রিস্টান		শিখ	
		জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা
অসম	৭২৫,৬৫৫	৩১,৬৬২	৪.৪	২৬৫	০.০৪	২৫,৯১৩	৩.৬	৩৮১	০.০৫
বেলুচিস্তান	৩৫৬,২০৪	৩৪৬,২৫১	৯৭.২	৬৫	০.০২	৪০	০.০১	১২৬	০.০৪
বরোদা	২,৮৫৫,০১০	২২৩,৬১০	৭.৮	২৩০,৭৯৪	৮.১	৯,১৮২	০.৩	৫৬৬	০.০২
বাংলা	২,১৪৪,৮২৯	৩৭২,১১৩	১৭.৩	২৬৯,৭২৯	১২.৬	৫৬৪	০.০৩	২৮	০.০০১
মধ্যভারত	৭,৫০৬,৪২৭	৪৩৯,৮৫০	৫.৯	১,০২৭,০০৯	১৩.৭	৭,৫৮২	০.১	২,৭৩১	০.০৪
ছত্রিশগড়	৪,০৫০,০০০	২৮,৭৭৩	০.৭	৪৮৩,১৩২	১১.৯	১১,৮২০	০.৩	৫০৭	০.০১
কোচিন	১,৪২২,৮৭৫	১০৯,১৮৮	৭.৭	১৪১,১৫৪	৯.৯	৩৯৯,৩৯৪	২৮.১	৯	—
দাক্ষিনাত্য (এবং কোলাপুর)	২,৭৮৫,৪২৮	১৮২,০৩৬	৬.৫	৩০৬,৮৯৮	১১.০	১৭,২৩৬	০.৬	২২	০.০০১
গুজরাট	১,৪৫৮,৭০২	৫৮,০০০	৩.৯	৫৫,২০৪	৩.৮	৪,২১৫	০.৩	১৮২	০.০১
গোয়ালিয়র	৪,০০৬,১৫৯	২৪০,৯০৩	৬.০	—	—	১,৩৫২	০.০৩	২,৩৪২	০.০৬
হায়দ্রাবাদ	১৬,৩৩৮,৫৩৪	২,০৯৭,৪৭৫	১২.৮	২,৯২৮,০৪৮	১৭.৯	২১৫,৯৮৯	১.৩	৫,৩৩০	০.০৩
কাশ্মীর এবং সামন্ত-প্রথানুযায়ী ভুক্তিত রাজ্য	৪,০২১,৬১৬	৩,০৭৩,৫৪০	৭৬.৪	১১৩,৪৬৪	২.৮	৩,০৭৯	০.০৮	৬৫,৯০৩	১.৬

[পরের পৃষ্ঠায়]

[আগের পৃষ্ঠার পর]

পরিশিষ্ট - III

দেশীয় রাজ্যে সংখ্যালঘু শ্রেণীর সম্প্রদায়গত বিভাজন

রাজ্য এবং এজেন্সি	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান		তফসিলি জাত		ভারতীয় খ্রিস্টান		শিখ	
		জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা
মাদ্রাজ	৪৯৮,৭৫৪	৩০,২৬৩	৬.০	৮৩,৭৩৪	১৬.৮	২০,৮০৬	৪.২	৫	—
মহীশূর	৭,৩২৯,১৪০	৪৮৫,২৩০	৬.৬	১,৪০৫,০৬৭	১৯.২	৯৮,৫৮০	১.৩	২৬৯	০.০০৪
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪৬,২৬৭	২২,০৬৮	৪৭.৭	শূন্য	—	৫৭১	১.২	৪,৪৭২	৯.১
ওড়িশা	৩,০২৩,৭৩১	১৪,৩৫৫	০.৪৭	৩৫২,০৮৮	১১.৬	২,২৪৯	০.০৭	১৫১	০.০০৫
পঞ্জাব	৫,৫০৩,৫৫৪	২,২৫১,৪৫৯	৪০.৯	৩৪৯,৯৬২	৬.৪	৬,৯৫২	০.১	১,৩৪২,৬৮৫	২৪.৪
পঞ্জাব পার্বত্য অঞ্চল	১,০৯০,৬৪৪	৪৬,৬৭৮	৪.৩	২৩৮,৭৭৪	২১.৯	১৮৮	০.০২	১৭,৭৩৯	১.৬
রাজপুতানা	১৩,৬৭০,২০৮	১,২৯৮,৮৪১	৯.৫	—	—	৪,৩৪৯	০.০৩	৮১,৮৯৬	০.৬
সিক্কিম	১২১,৫২০	৮৩	০.০৭	৭৬	০.০৬	৩৪	০.০৩	১	—
ত্রিবাঙ্কুর	৬,০৭০,০১৮	৪৩৪,১৫০	৭.২	৩৯৫,৯৫২	৬.৫	১,৯৫৮,৪৯১	৩২.৩	৩১	—
যুক্তপ্রদেশ	৯২৮,৪৭০	২৭৩,৬২৫	২৯.৫	১৫২,৯২৭	১৬.৫	১,২৮১	০.০১	৭৩১	০.০৮
পশ্চিম ভারত	৪,৯০৪,১৫৬	৬০০,৪৪০	১২.২	৩৫৮,০৩৮	৭.৩	৩,১০৫	০.৬	২৩৯	০.০০৫
মোট	৯১,৮১০,৫৭১	১৫,৭৩৩,১৩৩	১৬.৫৯	৮,৮৯২,৩৭৩	৯.৭	২,৭৯২,৯৫৯	৩.১	১,৫২৬,৩৪৬	১.৭

পরিশিষ্ট - IV

পঞ্জাবের জেলাওয়ারি সম্প্রদায়গত বিভাজন

জেলা	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান		তফসিলি জাত		ভারতীয় খ্রিস্টান		শিখ		হিন্দু	
		জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা
হিসার	১,০০৬,৭০৯	২৮৫,২০৮	২৮.৩	১২৮,২৪০	১২.৭	১,২৩৫	.১	৬০,৭৩১	৬.০	৫৪২,৬০২	৫২.১
রোহটক	৯৫৬,৩৯৯	১৬৬,৫৬৯	১৭.৪	১৩৫,১০৩	১৪.১	১,০২৬	.১	১,৪৬৬	.২	৬৪৫,৩৭১	৫৭.৫
গুরগাঁও	৮৫১,৪৫৮	২৮৫,৯৯২	৩৩.৬	১১৯,২৫০	১৪.০	১,৪৫৭	.২	৬৩৭	.০৭	৪৪১,২৮৭	৫১.৮
কর্নাল	৯৯৪,৫৭৫	৩০৪,৩৪৬	৩০.৬	১৩৬,৭১৩	১৩.৭	১,২২৩	.১	১৯,৮৮৭	২.০	৫২৯,৫৮৮	৫৩.২
আম্বালা	৮৪৭,৭৪৫	২৬৮,৯৯৯	৩১.৭	১২৪,০০৬	১৪.৬	৪,৮৯২	.৬	১৫৩,৫৪৩	১৮.১	২৮৮,৬৫২	৩৪.০
সিমলা	৩৮,৫৭৬	৭,০২২	১৮.২	৭,০৯২	১৮.৪	৫০৮	১.৩	১,০৩২	২.৭	২২,৩৭৪	৫৮.০
কাঙড়া	৮৯৯,৩৭৭	৪৩,২৪৯	৪.৮	১২১,৬২২	১৩.৫	৫৯০	.০৭	৪,৮০৯	.৫	৭২৫,৯০৯	৮০.৭
হোসিয়ারপুর	১,১৭০,৩২৩	৩৮০,৭৫৯	৩২.৫	১৭০,৮৫৫	১৪.৬	৬,০৬০	.৫	১৯৮,১৯৪	১৬.৯	৪১৩,৮৩৭	৩৫.৪
জলন্ধর	১,১২৭,১৯০	৫০৯,৮০৪	৪৫.২	১৫৪,৪৩১	১৩.৭	৫,৯৭১	.৫	২৯৮,৭৪৪	২৬.৫	১৫৬,৫৭৯	১৩.৯
লুধিয়ানা	৮১৮,৬১৫	৩০২,৪৮২	৩৬.৯	৬৮,৪৬৯	৮.৪	১,৬৩২	.২	৩৪১,১৭৫	৪১.৭	১০৬,২৪৬	১২.৯
ফিরোজপুর	১,৪২৩,০৭৬	৬৪১,৪৪৮	৪৫.১	৭৩,৫০৪	৫.১	১১,০৩১	.৮	৪৭৯,৪৮৬	৩৩.৭	২১৬,২২৯	১৫.২
লাহোর	১,৬৯৫,৩৭৫	১,০২৭,৭৭২	৬০.৬	৩২,৭৩৫	১.৯	৬৭,৬৮৬	৪.০	৩১০,৬৪৮	১৮.৩	২৫২,০০৪	১৪.৯
অমৃতসর	১,৪১৩,৮৭৬	৬৫৭,৬৯৫	৪৬.৫	২২,৭৫০	১.৬	২৫,৩৩০	১.৮	৫১০,৮৪৫	৩৬.১	১৯৪,৭২৭	১৩.৮
গুরদাসপুর	১,১৫৩,৫১১	৫৮৯,৯২৩	৫১.১	৪৫,৮৩৯	৪.০	৪০,২৬২	৪.৪	২২১,২৬১	১৯.২	২৪৪,৯৩৫	২১.২
সিয়ালকোট	১,১৯০,৪৯৭	৭৩৯,২১৮	৬২.১	৬৫,৩৫৪	৫.৫	৭৩,৮৪৬	৬.২	১৩৯,৪০৯	১১.৭	১৬৫,৯৬৫	১৩.৯
গুজরানওয়ালা	৯১২,২৩৫	৬৪২,৭০৬	৭০.৫	৭,৪৮৫	০.৮	৬০,৩৮০	৬.৬	৯৯,১৩৯	১০.৯	১০০,৬৩০	১১.০

[পরের পৃষ্ঠায়]

পরিশিষ্ট - IV

পঞ্জাবের জেলাওয়ারি সম্প্রদায়গত বিভাজন

জেলা	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান		তফসিলি জাত		ভারতীয় খ্রিস্টান		শিখ		হিন্দু	
		জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা
শখুপুরা	৮৫২,৫০৮	৫৪২,৩৪৪	৬৩,৬	২২,৪৩৮	২.৬	৫৯,৯৮৫	৭.০	১৬০,৭০৬	১৮.৯	৬৬,৭৪৪	৭.৮
গুজরাট	১,১০৪,৫২	৯৪৫,৬০৯	৮৫.৬	৪,৬২১	.৪	৪,৩৯১	.৪	৭০,২৩৩	৬.৩	৮০,০২২	৭.২
সাহাপুর	৯৯৮,৯২১	৮৩৫,৯১৮	৮৩.৭	৯,৬৯৩	১.০	১২,৬৯০	১.৩	৪৮,০৪৬	৪.৮	৯২,৪৭৯	৯.২
ঝিলম	৬২৯,৬৫৮	৫৬৩,০৩৩	৮৯.৪	৭৭১	.১	৭৩০	.১	২৪,৬৮০	৩.৯	৪০,১১৭	৬.৪
রাওয়ালপিণ্ডি	৭৮৫,২৩১	৬২৮,১৯৩	৮০.০	৪,২৩৩	.৫	৪,২১২	.৫	৬৪,১২৭	৮.২	৭৮,২৪৫	১০.০
অ্যাটক	৬৭৫,৮৭৫	৬১১,১২৮	৯০.৪	১,০১৫	.১	৫০৪	.০৯	২০,১০২	৩.০	৪২,১৯৪	৬.২
মিএনওয়ালি	৫০৬,৩২১	৪৩৬,২৬০	৮৬.২	১,০০৮	.২	৩২৪	.০৬	৬,৮৬৫	১.৩	৬১,৮০৬	১২.২
মন্টোগোমারি	১,৩২৯,১০৩	৯১৮,৫৬৪	৬৯.১	৪৩,৪৫৬	৩.২	২৪,১০১	১.৯	১৭৫,০৬৪	১৩.২	১৬৭,৫১০	১২.৬
লায়লাপুর	১,৩৯৬,৩০৫	৮৭৭,৫১৮	৬২.৮	৬৮,২২২	৪.৯	৫১,৬৯৪	৩.৭	২৬২,৭৩৭	১৮.৮	১৩৫,৬৩৭	৯.৭
জঙ	৮২১,৬৩১	৬৭৮,৭৩৬	৮২.৬	১,৯৪৩	.২	৭৪৪	.১	১২,২৩৮	১.৫	১২৭,৯৪৬	১৫.৬
মুলতান	১,৪৮৪,৩৩৩	১,১৫৭,৯১১	৭৮.০	২৪,৫৩০	১.৭	১৩,২৭০	.৯	৬১,৬২৮	৪.১	২২৫,৩৪২	১৫.২
মুজফরগড়	৭১২,৮৪৯	৬১৬,০৭৪	৮৬.৪	২,৬৯১	.৪	২১৮	.০৩	৫,৮৮২	.৮	৮৭,৯৫২	১২.৩
ডেরা গাজি খান	৫৮১,৩৫০	৫১২,৬৭৮	৮৮.১	১,০৫৯	.২	৪৬	.০১	১,০৭২	.২	৬৬,৩৪৮	১১.৪
সীমান্ত অঞ্চল	৪০,২৪৬	৪০,০৮৪	৯৯.৬	শূন্য	..	শূন্য	..	২	..	১৬০	.৪
মোট	২৮,৪১৮,৮২০	১৬,২১৭,২৪২	৫৭.১	১,৫৯২,৩২০	৫.৬	৪৮৬,০৩৮	১.৭	৩,৭৫৭,৪০১	১৩.২	৬,৩০১,৭৩৭	২২.২

পরিশিষ্ট - V

বাংলার জেলাওয়ারি সম্প্রদায়গত বিভাজন

জেলা	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান		তফসিলি জাত		হিন্দু		ভারতীয় খ্রিস্টান	
		জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা
বর্ধমান	১,৮৯০,৭৩২	৩৩৬,৬৬৫	১৭.৮	৪৩০,৩০০	২২.৮	৯৬৩,৫২০	৫১.০	৩,২৮০	.২
বীরভূম	১,০৪৮,৩১৭	২৮৭,৩১০	২৭.৪	২৮০,২৫৪	২৬.৭	৪০৬,১৮২	৩৮.৮	৩৪৪	.০৩
বাঁকুড়া	১,২৮৯,৬৪০	৫৫,৫৬৪	৪.৩	৩৫৫,২৯০	২৭.৫	৭২৩,২৬৯	৫৬.১	১,২১৬	.১
মেদিনীপুর	৩,১৯০,৬৪৭	২৪৬,৫৫৯	৭.৭	৩৩৯,০৬৬	১০.৬	২,৩৪২,৮৯৭	৭৩.৪	৩,৮৩৪	.০৪
হুগলি	১,৩৭৭,৭২৯	২০৭,০৭৭	১৫.০	২৪৫,৮১০	১৭.৮	৮৫৩,৭৩৪	৬১.৯	৫৪৩	.০৬
হাওড়া	১,৪৯০,৩০৪	২৯৬,৩২৫	১৯.৯	১৮৪,৩১৮	১২.৪	১,০০০,৫৪৮	৬৭.১	৯৯৪	.০৬
২৪-পরগনা	৩,৫৩৬,৩৮৬	১,১৪৮,১৮০	৩২.৫	৭৪৩,৩৯৭	২১.০	১,৫৬৬,৫৯৯	৪৪.৩	২০,৮২৩	.৬
কলকাতা	২,১০৮,৮৯১	৪৯৭,৫৩৫	২৩.৬	৫৫,২২৮	২.৬	১,৪৭৬,২৮৪	৭০.০	১৬,৪৩১	.৮
নদিয়া	১,৭৫৯,৮৪৬	১,০৭৮,০০৭	৬১.৩	১৪৩,৬৮২	৮.২	৫১৪,২৬৮	২৯.২	১০,৭৪৯	.৬
মুর্শিদাবাদ	১,৬৪০,৫৩০	৯২৭,৭৪৭	৫৬.৬	১৬৭.১৮৪	১০.২	৫১৭,৮০৩	৩১.৬	৩৯৪	.০২
খুলনা	১,৯৪৩,২১৮	৯৫৯,১৭২	৪৯.৪	৪৭০,৫৫০	২৪.২	৫০৭,১৪৩	২৬.১	৩,৫৩৮	.২
রাজশাহী	১,৫৭১,৭৫০	১,১৭৩,২৮৫	৭৪.৬	৭৫,৬৫০	৪.৮	২৫৩,৫৮০	১৬.১	১,১৬৬	.০৭
দিনাজপুর	১,৯২৬,৮৩৩	৯৬৭,২৪৬	৫০.২	৩৯৯,৪১০	২০.৭	৩৭৫,২১২	১৯.৫	১,৪৪৮	.০৭
জলপাইগুড়ি	১,০৮৯,৫১৩	২৫১,৪৬০	২৩.১	৩২৫,৫০৪	২৯.৯	২২৬,১৪৩	২০.৮	২,৫৮৯	.২
দার্জিলিং	৩৭৬,৩৬৯	৯,১২৫	২.৪	২৮,৯২২	৭.৭	১৪৯,৫৭৪	৩৯.৭	২,৫৯৯	.৭

[পরের পৃষ্ঠায়]

[আগের পৃষ্ঠার পর]

পরিশিষ্ট - V

বাংলার জেলাওয়ারি সম্প্রদায়গত বিভাজন

জেলা	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান		তফসিলি জাত		হিন্দু		ভারতীয় খ্রিস্টান	
		জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা
রংপুর	২,৮৭৭,৮৪৭	২,০৫৫,১৮৬	৭১.৪	৪৯৫,৪৬২	১৭.২	৩০৭,৩৮৭	১০.৭	৩৮৯	.০১
বগুড়া	১,২৬০,৪৬৩	১,০৫৭,৯০২	৮৩.৯	৬১,৩০৩	৪.৯	১২৬,২২৯	১০.০	২৮৬	.০২
পাবনা	১,৭০৫,০৭২	১,৩১৩,৯৬৮	৭৭.১	১১৪,৭৩৮	৬.৭	২৬৯,০১৭	১৫.৮	২৮৫	.০২
মালদহ	১,২৩২,৬১৮	৬৯৯,৯৪৫	৫৬.৭	৭৫,৫৩৫	৬.১	৩৯০,১৪৩	৩১.৬	৪৬৬	.০৪
ঢাকা	৪,২২২,১৪৩	২,৮৪১,২৬১	৬৭.৩	৪০৯,৯০৫	৯.৭	৯৫০,২২৭	২২.৫	১৫,৮৪৬	.৪
ময়মনসিংহ	৬,০২৩,৭৫৮	৪,৬৬৪,৫৪৮	৭৭.৪	৩৪০,৬৭৬	৫.৭	৯৫৫,৯৬২	১৫.৯	২,৩২২	.০৪
ফরিদপুর	২,৮৮৮,৮০৩	১,৮৭১,৩৩৬	৬৪.৪	৫২৭,৪৯৬	১৮.৩	৪৭৮,৭৪২	১৬.৬	৯,৫৪৯	.৩
বাখরগঞ্জ	৩,৫৪৯,০১০	২,৫৬৭,০২৭	৭২.৩	৪২৭,৬৬৭	১২.১	৪৮০,৯৬২	১৩.৬	৯,৩৫৭	.২
ত্রিপুরা	৩,৮৬০,১৩৯	২,৯৭৫,৯০১	৭৭.১	২২৭,৬৪৩	৫.৯	৬৫২,৩১৮	১৬.৯	৪২৮	.০১
নোয়াখালি	২,২১৭,৪০২	১,৮০৩,৯৩৭	৮১.৩	৮১,৮১৭	৩.৭	৩৩০,৪৯৪	১৪.৯	৫৩৫	.০২
চট্টগ্রাম	২,১৫৩,২৯৬	১,৬০৫,১৮৩	৭৪.৫	৫৭,০২৪	২.৬	৪০১,০৫০	১৮.৬	৩৯৫	.০২
পার্বত্য চট্টগ্রাম	২৪৭,০৫৩	৭,২৭০	২.৯	২৮৩	.১	৪,৫৯৮	১.৯	৬০	.০২
যশোহর	১,৮২৮,২১৬	১,১০০,৭১৩	৬০.২	৩১৪,৮৫৬	১৭.২	৪০৬,২২৩	২২.২	১,০৫৭	.০৬
মোট	৬০,৩০৬,৫২৫	৩৩,০০৫,৪৩৪	৫৪.৭	৭,৩৭৮,৯৭০	১২.২	১৭,৬৩০,০৫৪	২৯.৩	১১০,৯২৩	.২

পরিশিষ্ট - VI

অসমে জেলাওয়ারি সম্প্রদায়গত বিভাজন

জেলা	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান		তফসিলি জাত		ভারতীয় খ্রিস্টান		শিখ		হিন্দু	
		জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা
সুরমা উপত্যকা											
কাছাড়	৬৪১,১৮১	২৩২,৯৫০	৩৬.৩	৫১,৯৬১	৮.১	৩,৭৪৪	.৬	—	—	১৭৩,৮৫৫	২৭.১
সিলেট	৩,১১৬,৬০২	১,৮৯২,১১৭	৬০.৭	৩৬৪,৫০০	১১.৭	২,৫৯০	.০৮	—	—	৭৮৫,০০৪	২৫.২
খাসি ও জয়ন্তিয়া											
পাহাড়ি অঞ্চল	১১৮,৬৬৫	১,৫৫৫	১.৩	৬৩	.০৫	১২০	.১	—	—	১২,৬৭৬	১০.৭
নাগা পার্বত্য ভূমি	১৮৯,৬৪১	৫৩১	.২	৪৫	.০২	৯	—	—	—	৪,১৫৩	২.২
লুসাই পার্বত্যভূমি	১৫২,৭৮৬	১০১	.০৬	২২	.০১	—	—	—	—	২,৪২৫	১.৬
অসম উপত্যকা											
গোয়ালপাড়া	১,০১৪,২৮৫	৪৬৮,৯২৪	৪৬.২	২৩,৪৩৪	২.৩	২৬৯	.০৩	—	—	২৮২,৭৮৯	২৭.৯
কামরূপ	১,২৬৪,২০০	৩৬১,৫২২	৩৯.১	৫৯,০৯২	৪.৭	১,০৩৮	.০৮	—	—	৬৩৭,৪৫৭	৫০.৪
দারাং	৭৩৬,৭৯১	১২০,৯৯৫	১৬.৪	১৯,৪৭৫	২.৬	৬,৩৬৭	.৮	—	—	৩২৮,২৮৩	৪৪.৬
নওগাঁ	৭১০,৮০০	২৫০,১১৩	৩৫.২	৫৯,২১৪	৮.৩	৪,০৪৯	.৬	—	—	২২৯,১৩৭	৩২.২
শিবসাগর	১,০৭৪,৭৪১	৫১,৭৬৯	৪.৮	৫০,১৮৪	৪.৭	১৫,২৬৮	১.৪	—	—	৫৯৩,০০৭	৫৫.২
লখিমপুর	৮৯৪,৮৪২	৪৪,৫৭৯	৫.০	৪৩,৫২৭	৪.৯	৩,৭৮৬	.৪	—	—	৪৫৭,৫০৯	৫১.১

[পরের পৃষ্ঠায়]

[আগের পৃষ্ঠার পর]

পরিশিষ্ট - VI

অসমে জেলাভিত্তিক সম্প্রদায়গত বিভাজন

জেলা	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান		তফসিলি জাত		ভারতীয় খ্রিস্টান		শিখ		হিন্দু	
		জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা
গারো পাহাড়	২৩৩,৫৬৯	১০,৩৯৮	৪.৫	৭৮৯	১.৩	১	—	—	—	১৩,৫১৮	৫.৮
সাদিয়া সীমান্ত অঞ্চল	৬০,১১৮	৮৬৪	১.৪	৩,৯৯১	৬.৬	৪৮৯	.৮	—	—	১৪,৬০৫	২৪.৩
বালিপাড়া সীমান্ত অঞ্চল	৬,৫১২	৬১	.৯	৭৪	১.১	২৩	.৪	—	—	২,৫১৪	৩৮.৬
মোট	১০,২০৪,৭৩৩	৩,৪৪২,৪৭৯	৩৩.৭	৬৭৬,২৯১	৬.৬	৩৭,৭৫০	.৪	৩,৪৬৪	.০৩	৩,৫৩৬,৯৩২	৩৪.৬

পরিশিষ্ট-VII

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ

জেলাওয়ারি মুসলমান জনসংখ্যা

জেলা	মোট জনসংখ্যা	মোট মুসলমান জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা অনুপাতে মুসলমান শতকরা	মোট অ-মুসলমান জনসংখ্যা	মোট অ-মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা
হাজারা	৭৯৬,২৩০	৭৫৬,০০৪	৯৪.৯	৪০,২২৬	৫.১
মার্দন	৫০৬,৫৩৯	৪৮৩,৫৭৫	৯৬.৫	২২,৯৬৪	৪.৫
পেশওয়াড়	৮৫১,৮৩৩	৭৬৯,৫৮৯	৯০.৪	৮২,২৪৪	৯.৬
কোহট	২৮৯,৪০৪	২৬৬,২২৪	৯২.০	২৩,১৮০	৮.০
বান্নু	২৯৫,৯৩০	২৫৭,৬৪৮	৮৭.১	৩৮,২৮২	১২.৯
ডি আই খান	২৯৮,১৩১	২৫৫,৭৫৭	৮৫.৮	৪২,৩৭৪	১৪.২

পরিশিষ্ট-VIII

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ

মুসলমান জনসংখ্যার সঙ্গে অ-মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত : শহরে

সি. ক্যানটনম্যান্ট　　পু-পুরসভা　　পি-প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল (Notified Area)

জেলাওয়ারি শহর	মোট জনসংখ্যা	মোট মুসলমান জনসংখ্যা	মোট মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা	মোট অ-মুসলমান জনসংখ্যা	মোট অ-মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা
হাজারা					
অবেবাত্তবাদ-সি	১৩,৮৬৬	৩,৩৩১	২৪	১০,৫৩৫	৭.৬
অবেবাত্তবাদ-পু	১৩,৫৫৮	৮,৮৬১	৬৬.১	৪,৬৯৭	৩৩.৯
হরিপুর-পু	৯,৩২২	৫,১৭৪	৫৫.৫	৪,১৪৮	৪৪.৫
বাফা-পি	৭,৯৮৮	৭,১৬৬	৮৯.৭	৮২২	১০.৩
নওয়াশেহর-পি	৬,৪১৪	৫,০৭৫	৭৯.১	১,৩৩৯	২০.৯
কট নাজিবুল্লা	৫,৩১৫	৪,২২৮	৭৯.৫	২,০৮৭	২০.৫
মানশেহর	১০,২১৭	৮,১৪১	৭৯.৭	১,০৭৬	২০.৩
মার্দন					
মার্দন-পু	৩৯,২০০	২৮,৯৯৪	৭৩.৯	১০,২০৬	২৬.১
মার্দন-সি	৩,২৯৪	১,৩০৭	৩৯.৭	১,৯৮৭	৬০.৩
পেশওয়ার					
পেশওয়ার-পু	১,৩০,৯৬৭	১,০৪,৬৫০	৭৯.৯	২৬,৩১৭	২০.১
পেশওয়ার-সি	৪২,৪৫৩	১৮,৩২২	৪৩.২	২৪,১৩১	৫৬.৮
নওশেহর-পি	১৭,৪৯১	১৬,৯৭৬	৯৭.০	৫১৫	৩.০
নওশেহর-সি	২৬,৫৩১	১১,২৫৬	৪২.৪	১৫,২৭৫	৫৭.৬
রিসালপুর-সি	৯,০০৯	৩,৫০৬	৩৮.৯	৫,৫০৩	৬১.১
চেরট-সি	৩৩৭	২৭০	৮০.১	৬৭	১৯.৯
চারসাদা	১৬,৯৪৫	১৫,৭৪৭	৯২.৯	১,১৯৮	৭.১
উৎমাজাই	১০,১২৯	৯,৭৬৮	৯৬.৪	৩৬১	৩.৬
তাঙ্গি	১২,৯০৬	১২,৪৫৬	৯৬.৫	৪৫০	৩.৫
পরঙ্গ	১৩,৪৯৬	১৩,৪৯৪	৯৯.৯	২	...

[পরের পৃষ্ঠায়]

[আগের পৃষ্ঠার পর]

জেলাওয়ারি শহর	মোট জনসংখ্যা	মোট মুসলমান জনসংখ্যা	মোট মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা	মোট অ-মুসলমান জনসংখ্যা	মোট অ-মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা
কোহট					
কোহট-পু	৩৪,৩১৬	২৭,৮৬৮	৮১.২	৬,৪৪৮	১৮.৮
কোহট-সি	১০,৬৬১	৪,২৪৩	৩৯.৮	৬,৪১৮	৬০.২
বান্নু					
বান্নু-পু	৩৩,২১০	৮,৫০৭	২৫.৬	২৪,৭০৩	৭৪.৪
বান্নু-সি	৫,২৯৪	২,১৮৯	৪১.৪	৩,১০৫	৫৮.৬
লাক্কি-পি	১০,১৪১	৫,৮৮৩	৫৮.০	৪,২৫৮	৪২.০
দারা ইসমাইলখান					
দারা ইসমাইলখান	৪৯,২৩৮	২৫,৪৪৩	৫১.৭	২৩,৭৯৫	৪৮.৩
দারা ইসমাইলখান	২,০৬৮	৯৮১	৪৭.৪	১,০৮৭	৫২.৬
কুলচী-পি	৮,৮৪০	৬,৬১০	৭৪.৮	২,২৩০	২৫.২
তাওক-পি	৯,০৮৯	৫,৫৩১	৬০.৮	৩,৫৫৮	৩৯.২

পরিশিষ্ট-IX

সিন্ধু

জেলাওয়ারি মুসলমান জনসংখ্যার বিভাজন

জেলা	মোট জনসংখ্যা	মোট মুসলমান জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমান	মোট অ-মুসলমান জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যার অনুপাতে অ-মুসলমান
১	২	৩	৪	৫	৬
দাদু	৩৮৯,৩৮০	৩২৯,৯৯১	৮৪.৭	৫৯,৩৮৯	১৫.৩
হায়দ্রাবাদ	৭৫৮,৭৪৮	৫০৭,৬২০	৬৬.৯	২৫১,১২৮	৩৩.১
করাচি	৭১৩,৯০০	৪৫৭,০৩৫	৬৪.০	২৫৬,৮৬৫	৩৬.০
লরকানা	৫১১,২০৮	৪১৮,৫৪৩	৮১.৯	৯২,৬৬৫	১৮.১
নবাবশাহ্	৫৮৪,১৭৮	৪৩৬,৪১৪	৭৪.৭	১৪৭,৭৬৪	২৫.৩
সক্কুর	৬৯২,৫৫৬	৪৯১,৬৩৪	৭১.০	২০০,৯২২	২৯.০
থর পরকার	৫৮১,০০৪	২৯২,০২৫	৫০.৩	২৮৮,৯৭৯	৪৯.৭
আপার সিন্ধু সীমান্ত	৩০৪,০৩৪	২৭৫,০৬৩	৯০.৫	২৮,৯৭১	৯.৫
মোট	৪,৫৫৩,০০৮	৩,২০৮,৩২৫	৭০.৭	১,৩২৬,৬৮৩	২৯.৩

* খৈরপুরের জনসংখ্যা ছাড়া

পরিশিষ্ট-X

সিন্ধু

শহরাঞ্চলে অমুসলমান জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমান জনসংখ্যা

পু-পুরসভা সি-সিভিল ক্যান্টনম্যান্ট মি-মিলিটারি ক্যান্টনম্যান্ট

জেলাওয়ারি শহর	মোট জনসংখ্যা	মোট মুসলমান জনসংখ্যা	মোট মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা	মোট অ-মুসলমান জনসংখ্যা	মোট অ-মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা
দাদু					
দাদু-পু	১০,৯৯৬	৫,২৭৯	৪৮.০	৫,৭১৭	৫২.০
কোটরি-পু	৯,৯৭৯	৫,১৩৭	৫১.৫	৪,৮৪২	৪৮.৫
মঞ্জহন্দ-পু	৩,০২৫	১,০৫৩	৩৪.৮	১,৯৭২	৬৫.২
শেরওয়ান	৪,৩৬৪	২,২১৮	৫০.৮	২,১৪৬	৪৯.২
হায়দ্রাবাদ					
হালা-পু	৭,৯৬০	৫,০৪২	৬৩.৩	২,৯১৮	৩৬.৭
হায়দ্রাবাদ-সি	১,২৭,৫২১	৩১,৯৮৩	২৫.১	৯৫,৫৩৮	৭৪.৯
হায়দ্রাবাদ-সি	৫,২৫৫	২,৬৬৭	৫০.৭	২,৫৮৮	৪৯.৩
হায়দ্রাবাদ-পু	১,৯১৭	১,৪১৯	৭৪.০	৪৯৮	২৬.০
মতিয়ারি-পু	৫,৯১০	৪,৩৩৯	৭৩.৪	১,৫৭১	২৬.৬
নসরপুর-পু	৩,৮১০	২,৩৩১	৬১.২	১,৪৭৯	৩৮.৮
তাণ্ডো অল্যাভুর-পু	৮,৪০৬	১,৬৯০	২০.১	৬,৭১৬	৭৯.৯
তাণ্ডো মহম্মদ খান-পু	৮,৭১৮	২,৯০২	৩৩.৩	৫,৮১৬	৬৬.৭
করাচি					
করাচি-পু	৩,৫৮,৪৯২	১,৫২,৩৬৫	৪২.৫	২,০৬,১২৭	৫৭.৫
করাচি-সি	৫,৮৫৪	৮৯৫	১৫.৩	৪,৯৫৯	৮৪.৭
দৈঘ রোড-সি	২,৮৮১	১,১৭২	৪০.৭	১,৭০৯	৫৯.৩
মনোরা-সি	২,৫৩৩	৯৩২	৩৬.৮	১,৬০১	৬৩.২
করাচি-সি	১৫,৮৯৫	৭,০৬৩	৪৪.৪	৮,৮৩২	৫.৫৬
তত্তা-সি	৮,২৬২	৪,১৯৮	৫০.৮	৪,০৬৪	৪৯.২

[পরের পৃষ্ঠায়]

[আগের পৃষ্ঠার পর]

পরিশিষ্ট-X

জেলাওয়ারি শহর	মোট জনসংখ্যা	মোট মুসলমান জনসংখ্যা	মোট মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা	মোট অ-মুসলমান জনসংখ্যা	মোট অ-মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা
লরকানা					
কম্বার-পু	১১,৬৮১	৬,২৯৭	৫৩.১	৫,৩৮৪	৪৬.৯
লরকানা-পু	২০,৩৯০	৭,৮৩৪	৩৮.৪	১২,৫৫৬	৬১.৬
রতেদারো-পু	৯,৯২৫	২,৩৯৩	২৪.১	৭,৫৩২	৭৫.৯
নবাবশাহ					
নবাবশাহ-পু	১৭,৫০৯	৪,৪২০	২৫.৩	১৩,০৮৯	৭৪.৭
শাহাবাদপুর-পু	১১,৭৮৬	১,৮৯৮	১৬.১	৯,৮৮৮	৮৩.৯
তাণ্ডো আদম-পু	১৭,২৩৩	২,৯৯৪	১৭.৪	১৪,২৩৯	৮২.৬
সুক্কুর					
ঘরি যাসিন	৮,৩৯৭	২,৮৯৫	৩৪.৫	৫,৫০২	৬৫.৫
ঘোটকি-পু	৫,২৩৬	১,৫৩৩	২৯.৩	৩,৭০৩	৭০.৭
রোহরি-পু	১৪,৭২১	৪,১৩২	২৮.৭	১০,৫৮৯	৭১.৯
শিকারপুর-পু	৬৭,৭৪৬	২১,৭৭৫	৩২.১	৪৫,৯৭১	৬৭.৯
সুক্কুর-পু	৬৬,৪৬৬	১৮,১৫২	২৭.৩	৪৮,৩১৪	৭২.৭
থর পরবর					
মীরপুরখস-পু	১৯,৫৯১	৫,০৮৬	২৫.৯	১৪,৫০৫	৭৪.১
উমরকোট-পু	৪,২৭৫	৯৮৬	২২.৯	৩,২৮৯	৭৭.১
আপার সিন্ধু সীমান্ত					
যকোকাবাদ-পু	২১,৫৮৮	৯,৭৭৪	৪৫.৩	১১,৮১৪	৫৪.৭

পরিশিষ্ট - XI

১৯২১-এর আদমশুমার অনুযায়ী ভারতে মুসলমান জনসংখ্যার ব্যবহৃত ভাষা—

ভাষা				সংখ্যা
উর্দু (পশ্চিমী হিন্দি)	...	...	...	২০,৭৯১,০০
বাংলা	...	...	...	২৩,৯৯৫,০০০
পাঞ্জাবি	...	...	...	৭,৭০০,০০০
সিন্ধি	...	...	...	২,৯১২,০০০
কাশ্মীরী (এবং সম্বন্ধীয় ভাষা)	...	...	...	১,৫০০,০০০
পুশতু	...	...	...	১,৪৬০,০০০
গুজরাটি	...	...	...	১,৪০০,০০০
তামিল	...	...	...	১,২৫০,০০০
মালয়ালম	...	...	...	১,১০৭,০০০
তেলুগু	...	...	...	৭৫০,০০০
ওড়িয়া	...	...	...	৪০০,০০০
বালুচি	...	...	...	২২৪,০০০
ব্রাহই	...	...	...	১২২,০০০
আরবী	...	...	...	৪২,০০০
পার্শি	...	...	...	২২,০০০
অন্যান্য ভাষা	...	...	...	৫,০৬০,০০০
	...	...	মোট	৬৮,৭৩৫,০০০

পরিশিষ্ট - XII

১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর সিমলাতে ভারতের বড়লাট লর্ড মিন্টোকে মুসলমান প্রতিনিধিদল কর্তৃক এক দাবি-সনদ পেশ* করা হয়।

দাবি-সনদ

'মহামহিমের অনুগ্রহবশত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর শাসনধীনে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ-জায়গিরদার, তালুকদার, আইনজীবী, জমিদার বণিক এবং রাজাধিরাজের শাসনাধীনে প্রজাগণ আপনার সুবিবেচনার জন্য নিম্নোক্ত সনদ পেশ করছি। এই দাবিসনদ পেশের অনুমতির জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

* ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই প্রামাণ্যপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের সুবিধাদানের ব্রিটিশ সরকারের নীতির এটা সূচনাপর্ব, অভিযোগ ওঠে কংগ্রেস থেকে মুসলমানদের পৃথক করতে এবং হিন্দু ও মুসলমানদের সম্পর্কের ঐক্যে ভাঙন ধরাতে ব্রিটিশ সরকার এই নীতি অবলম্বন করেছে। কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে মৌলানা মহম্মদ আলি তাঁর ভাষণে যা বলেছেন তাতে ভারতীয়দের মনে এক ধরনের বিরোধিতা প্রবল হয়ে ওঠে। মৌলানা মহম্মদ আলি 'এটাকে এক অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন কাজ বলে অভিহিত করেছিলেন। যার অর্থ দাঁড়ায়, ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনামাফিক এই দাবি সনদ প্রস্তুত করা হয়েছিল। অনেক ভারতীয়ের মনেই এই দাবি সনদের বিষয় এবং লর্ড মিন্টোর প্রত্যুত্তর নিয়ে গভীর ঔৎসুক্য ছিল। এটি উদ্ধারের জন্য আমি দীর্ঘদিন চেষ্টা করেছি। সেই সময়কার আগে বিশিষ্ট প্রবীণ মুসলমান রাজনীতিবিদদের কাছে আমি এর একটি প্রতিলিপি চেয়েছি, কিন্তু তাঁদের কারও সংগ্রহেই এটি ছিল না। কোথায় তা পাওয়া যেতে পারে, সে সম্বন্ধে তাঁদের কোনও সম্যক ধারণা ছিল না। সেই সময়ের বেশির ভাগ সংবাদপত্রই এই দাবিপত্র এবং তার প্রত্যুত্তর সম্বন্ধে কিছু ছাপেনি। আমি সৌভাগ্যবশত আমার বন্ধু স্যার রাজা আলি এম এল এ (সেন্ট্রাল)-র কাছ থেকে এটি সংগ্রহ করি। লখনউ থেকে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়া ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এ এই প্রতিবেদনটি সে কেটে রেখেছিল। প্রসঙ্গত এই পত্রিকাটি পরে দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। এই পত্রিকাটিতে দাবিপত্রের পূর্ণ বয়ান এবং তার প্রত্যুত্তর ছাপা হত। স্যার, রাজা আলি আমাকে এটি দেখতে দেওয়ায় বলাবাহুল্য আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। এটি ভারতে ব্রিটিশ প্রাশাসনের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রামাণ্য দলিল। 'ইন্ডিয়া ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এর ১৯০৬ সালের ৩রা অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত এই বয়ানটি পুনঃপ্রকাশিত হলে তা বিশেষ কাজে লাগাতে পারে। কাগজের সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদক লিখেছিলেন ঃ

'মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা মহামান্য বড়লাটের কুঠির নাচঘরে (Ballroom) এদিন সকাল ১১টায় বড়লাটের কাছে তাঁদের দাবি সনদ জমা দেন। প্রতিনিধি দলে মোট ৩৫ জন ছিলেন। তাঁরা বড়লাটের কেদারার দিকে মুখ করে ঘোড়ার খুড়ের নালের ন্যায় সারিবদ্ধভাবে বসেছিলেন। এগারোটা বাজার ঠিক পূর্বমুহূর্তে লর্ড মিন্টো তাঁর সভাসদের সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য উপবিষ্টরা উঠে দাঁড়ালেন। আগাখান বড়লাটকে প্রতিনিধি দলের প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচয় করালেন। পাতিয়ালার খলিফা এরপর দাবিসনদ পেশের অনুমতি চান। আগা খান এগিয়ে গিয়ে বড়লাটের দিকে মুখ করে নিম্নে উল্লিখিত প্রতিবেদনটি পাঠ করেন। প্রতিনিধিদের সকলেই সেইসময় দাঁড়িয়ে ছিলেন।

ভারতবর্ষের এই বিশাল উপমহাদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায় ভাষাগোষ্ঠী, এবং বিভিন্ন ধর্মের অযুত সহস্র মানুষকে ইংরেজ শাসন যে অফুরন্ত সুযোগ-সুবিধায় সমৃদ্ধ করেছে, সে ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। সরকারের প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী বিচার থেকে আমাদের মনে করা সঙ্গত যে, এইসব সুবিধাদান দেশের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির সহায়ক হবে।

প্রতিনিধি দলে যাঁরা ছিলেনঃ মহামান্য আগা স্যার সুলতান মহম্মদ আগা খান, জি.সি.আই.ই (বোম্বাই); শাহজাদা বক্তিয়ার শাহ, ও.আই.ই, কলকাতার মহীশূর পরিবারের প্রধান; মাননীয় মালিক ওমর হায়াৎ খান, সি.আই.ই, সপ্তদশ স্থলবাহিনীর অবর সেনাপতি প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ তাইওয়ানা লেনসার্স, তাইওয়ানা, শাহপুর (পঞ্জাব); মাননীয় খান বাহাদুর মিঞা মহম্মদ শাহ দিন, বার-এট-ল, লাহোর; মাননীয় মৌলভি শরফুদ্দিন, বার-এট-ল, পাটনা; খান বাহাদুর সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরি, ময়মন সিংহ (পূর্ববঙ্গ); নবাব বাহাদুর সৈয়দ আমির হুসান খান, সি.আই.ই., কলকাতা; নাশের হুশেন খান খয়াল, কলকাতা; খান বাহাদুর মির্জা শুজাত আলি বেগ, পারশীয় রাজ প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা (বাংলা); সৈয়দ আলি ইমাম, বার-এট-ল, পাটনা (বিহার); নবাব শরফরাজ হুসেন খান, পাটনা (বিহার); খান বাহাদুর আহমেদ মহিউদ্দিন খান, কর্ণাটক পরিবারের বৃত্তিভোগী (মাদ্রাজ); মৌলভি রফিউদ্দিন আহমেদ, বার-এট-ল (বোম্বাই); ইব্রাহিমভাই আদমজি পীরভাই, সাধারণ বণিক (বোম্বাই); জনাব আবদুর রহিস, বার-এট-ল, কলকাতা; সৈয়দ আল্লাহদাদ শাহ্, বিশেষ জেলা-শাসক (Magistrate) এবং জমিদার অ্যাসোসিয়েশন, খৈরপুর (সিন্ধু); মৌলানা এইচ.এম. মালিক, মেহেদি বাজ বোহরা, নাগপুর (মধ্য প্রদেশ); মুসির-উদ্-দৌলা, মুমতাজল-উল-মুল্ক খান বাহাদুর খলিফা সৈয়দ মহম্মদ হুসেন, পালিয়ালা রাজ্য পরিষদের সদস্য (পঞ্জাব); খান বাহাদুর কর্ণেল আবদুল মজিদ খান, পাতিয়ালার পররাষ্ট্র মন্ত্রী (পঞ্জাব); খান বাহাদুর খাজা কুসুফ শাহ, অবৈতনিক জেলা-শাসক, অমৃতসর (পঞ্জাব); মিঞা মহম্মদ শফি, বার-এট-ল, লাহোর (পঞ্জাব); শেখ গোলাম সাদিক, অমৃতসর (পঞ্জাব); হকিম মহম্মদ আজমল খান, দিল্লি (পঞ্জাব); মুন্সি ইতিশম আলি, জামিদার এবং রাইস, কাকোরি (অযোধ্যা); সৈয়দ নবিউল্লা, বার-এট-ল, কারা বিভাগের রাইস, জেলা ইলাহাবাদ; মৌলভি সৈয়দ কারামত হুসেন, বার-এট-ল, ইলাহাবাদ; সৈয়দ আবদুল রউফ, বার-এট-ল, ইলাহাবাদ; মুন্সি আবদুল সলম খান, অবসর প্রাপ্ত অবর জেলা-শাসক, রামপুর খান বাহাদুর মোহম্মদ মুজাম্মিল উল্লাহ্ খান, জমিদার অ্যাসোসিয়েশন যুক্তপ্রদেশ এবং যুগ্ম-সচিব, এম.এ.ও কলেজ ট্রাস্টি, আলিগড়; হাজি মোহম্মদ ইসমাইল খান, জমিদার আলিগড়; সাহেবজাদা আফতাব আহম্মদ খান; বার-এট-ল, আলিগড়; মৌলভি মুস্তাক হুসেন রাইস, যুক্তপ্রদেশ; মৌলভি হবিবুল রহমান খান, জমিদার, ভিখানপুর, যুক্তপ্রদেশ; নবাব সৈয়দ সর্দার আলি খান, মৃত নবাব সিরদার দিলের-উল-মুল্ক বাহাদুর সি.আই.ই. হায়দ্রাবাদ-এর পুত্র (দাক্ষিণাত্য); মৌলভি সৈয়দ মহদির আলি খান (মুসিন-উল-মুল্ক), অবৈতনিক সচিব, এম.এ.ও. কলেজ, আলিগড়, এটাওয়া, যুক্তপ্রদেশ।

নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয় গণের বড়লাটকে দাবিপত্র পেশের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা ছিল তবে অসুস্থতা ও অন্য কারণে তাঁরা উপস্থিত থাকতে পারেন নিঃ- মাননীয় নবাব খাজা সালিমুল্লা, ঢাকার নবাব; মাননীয় নবাব হাজি মোহম্মদ ফতে আলি খান কারজেলুদ্দিন পীরজাদা, লাহোর; মাননীয় সৈয়দ জইনুল এদ্রস, সুরাট; খান বাহাদুর কাশিম মীর গীয়াসুদ্দিন পীরজাদা, ব্রোচ; খান বাহাদুর রাজা জাহানদাদ, হাজারা এবং লখনউ-এর শেখ শহিদ হুসেন।

বড়লাটের কুঠিতে প্রীতি সম্মেলন

বড়লাটের কুঠির প্রাঙ্গণে এই দিন বিকেলে প্রীতি সমাবেশের আয়োজন করা হয়। বড়লাট মুসলমান প্রতিনিধিবৃন্দকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান এবং তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদাভাবে আলোচনা করেন। অর্থসচিব মাননীয় বাকের মুসলমান প্রতিনিধি দলের বাংলার নিম্নল্লিখিত ব্যক্তিবর্গকে পরের দিন মধ্যহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানান ঃ নবাব আমির হোসেন, মির্জা সুজাত আলি, নবাব নসর হোসেন, মাননীয় সরফুদ্দিন এবং আলি ইমাম। ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে দেশসমূহের মধ্যে উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নেবে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ নীতির পূর্ণ মৌলিক দিক হল ভারতের বিভিন্ন জাত গোষ্ঠী এবং বিভিন্নধর্মের বৈচিত্র্যে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তার প্রতি যথাযথ সম্মান বজায় রেখে ভারতের মানুষদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এবং তাদের ইচ্ছা ও মতামতের প্রতি ব্রিটিশ সরকার গুরুত্ব ক্রমশই বৃদ্ধি করছেন।

এই সম্প্রদায়ের দাবি

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়গুলির প্রভাবশালী সদস্যদের সঙ্গে গোপনে পরামর্শের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, ক্রমশই সেই নীতি সুদূরপ্রসারী হয়েছে। স্বীকৃত রাজনৈতিক দল এবং বাণিজ্যিক সংগঠনগুলির অধিকারকে স্বীকার করে নিয়ে এর পাশাপাশি জনগুরুত্ব অনুসারে তাদের মতামত ও সমালোচনা কর্তৃপক্ষকে জানানো, পুরসভা, জেলা পর্ষদ, অধিকন্তু দেশের আইনসভাগুলিতে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি মনোনয়ন ও নির্বাচনে এই নীতির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমাদের বিশ্বাস কোথাও এই আইনসভার সম্প্রসারণের জন্য আপনার গঠিত কমিটি মনোনিবেশ করবে। এই সম্প্রসারিত এবং পরিবর্তিত আইনসভায় যাতে আমাদের সম্প্রদায়ের উপযুক্ত অংশীদারী থাকে সেইজন্যই এই প্রস্তাবনা এছাড়াও বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আরও কয়েকটি বিষয় সরকারের দৃষ্টি গোচর করতে চাই।

টেলিগ্রাফের প্রতিনিধি আরও উল্লেখ করেন ঃ- লেডি মিন্টো, এলিয়ট এবং মাননীয় শ্রীমতী হিওয়ট অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আজকের এই দাবি সনদ পেশের অনুষ্ঠানে আসা প্রতিনিধি দলের সকলেই সাধারণ ইউরোপীয় পোশাক পরিহিত ছিলেন। তাঁদের মাথায় সকলের (তুর্কিদের মতো) ফেজটুপি তবে পাতিয়ালার প্রতিনিধিবর্গের লেঃ মালিক ওমর হায়াত খান, খান বাহাদুর আলি চৌধুরি, খান বাহাদুর আহমেদ মহিউদ্দিন খান এবং আরও কয়েকজন ছিলেন ভারতীয় পোশাক পরিহিত। অন্য কয়েকজনের পোশাকে ছিল জরির ফিতে। মহামান্য বড়লাটের পরনে ছিল প্রভাতী পোশাক। তাঁর হাঁটু পর্যন্ত কোটের ওপর ছিল ভারতের তারকা খোচিত চিহ্ন।

অতীতের ধারা

১৯০১ এর আদমশুমার অনুযায়ী ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা ৬ কোটি ২০ লক্ষেরও বেশি যা ব্রিটিশ ভারতীয় উপনিবেশে মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চাংশ এবং এক চতুর্থাংশের মধ্যে। এছাড়াও অনগ্রসর এর অনুন্নত শ্রেণী সম্প্রদায়ের হিসাবকে বাদ দিলে অথবা যে সব শ্রেণীক হিন্দু বলে পরিগণিত করা হয় অথচ আদপে যারা হিন্দু নয়, সেই সংখ্যার হিসাব নিলে সংখ্যাগুরু হিন্দু জনসংখ্যাকে আনুপাতিক হিসাবে মুসলমান জনসংখ্যা ছাপিয়ে যাবে। বর্ধিত বা সীমাবদ্ধ যে কোনও প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যাবস্থায় এই একটি সম্প্রদায় রাশিয়া বাদে ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর যে কোনও শক্তির জনসংখ্যাকে ছাপিয়ে যেতে পারে। অতএব রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে তারা যথাযথ পরিচিত ন্যায়সঙ্গতভাবে দাবি করতে পারে। মহামহিমের অনুমতি নিয়ে আমরা আরও বলতে চাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোনও রকম প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থায় মুসলমান সম্প্রদায়কে যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তাদের সামাজিক সম্মান এবং প্রভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে তা যথাযথ হওয়া উচিত, কেবলমাত্র সংখ্যাগত দিক দিয়েই নয়, তাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি তাদের বিশ্বাসযোগ্যতার দিকে নজর রেখে তাদের অবদানের বিচার করা উচিত। একশো বছরের কিছু বেশি সময় আগে মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক অবস্থানের কথা বিবেচনা করে সমাজে তাদের প্রাপ্য স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। কেন না, সেই সময়কার ঐতিহ্য স্বাভাবিকভাবেই এখনও তাদের মন থেকে মুছে যায় নি। ভারতে মুসলমানরা ন্যায়বিচার এবং সততা-পরায়নতার প্রতি নিষ্ঠাবান থেকেছে এবং তাদের শাসনকর্তাদের এটাই মূলগত বিশেষত্ব বলে চিহ্নিত হয়েছে। ফলে দাবি আদায়ের তারা এমন কোনও পন্থা অবলম্বন করেনি যা বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা প্রকৃতপক্ষে এও বিশ্বাস করি, অতীত ঐতিহ্যের এই ধারাকে উপেক্ষা করে ভবিষ্যতেও ভারতীয় মুসলমানরা কখনও বিপথচালিত হবে না। তবে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা মুসলমানদের নতুন প্রজন্মে নানাভাবে চাঞ্চল্যের জন্ম দিয়েছে। এর ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে হিতাহিত ও সুপারমর্শের ক্ষেত্র লঙ্ঘন করে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছে। অতএব ভারতের সর্বত্র বিরাট সংখ্যক সহধর্মীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি ও ইচ্ছার কথা সুচিন্তিত বিচার বিবেচনার পর যে দাবি সনদ আমরা পেশ করতে চাই, আমাদের প্রার্থনা মহামহিম আমাদের এই দাবি সনদ আন্তরিকভাবে বিবেচনা করবেন।

ইউরোপীয় প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ

ইউরোপীয় ধাঁচে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারতের মানুষদের কাছে নতুন ধারণা। শুরুতেই এই মনোভাব পোষণে মহামহিম ক্ষমাশীল মনোভাব দেখাবেন আমরা তা বিশ্বাস করি। আমাদের সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের অনেকেই মনে করেন, ভারতের সামাজিক ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক অবস্থায় এইগুলি অঙ্গীভূত করতে সর্বাধিক তত্ত্বাবধান, পূর্বচিন্তা এবং সতর্কতা জরুরি। অন্যথায় তাদের গ্রহণ ক্ষতিকর জিনিসের মতো আমাদের জাতীয় স্বার্থ অ-সহৃদয় সংখ্যাগুরুর করুণানির্ভর করে তুলবে। এতদসত্ত্বেও আমাদের শাসকরা তাঁদের সহজাত প্রবৃত্তি এবং অতীত ঐতিহ্যের বশবর্তী হয়ে এইসব প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেশের সরকারি পরিকাঠামোয় অগ্রগণ্য জায়গা করে দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন। যে শর্তে তাঁরা তাঁদের এই জাতিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন, তাতে অংশ নেওয়া থেকে পিছিয়ে থেকে আমরা মুসলমানরা আমাদের জাতীয় স্বার্থকে কোনভাবেই বিপন্ন হতে দিতে পারি না। এ পর্যন্ত এই জাতীয় বিভিন্ন দাবি সনদের ক্ষেত্রে ভারতীয় মুসলমানরা আপনাদের তরফ থেকে ন্যায়বিচার এবং সদবিচার এবং সদবিবেচনা পেয়ে এসেছে। সেজন্য আমরা পূর্বেই কৃতজ্ঞতা জানাতে বাধ্য। আপনার যে পূর্বসূরিরা এই পদ অলংকৃত করেছেন, এমনকি স্থানীয় সরকারের প্রধানরাও আইনসভায় কোনও মুসলমান সদস্য মনোনীত করেননি। এপর্যন্ত এমন কোনও নজির নেই। তবে আমরা একথাও না বলে পারছি না যে, প্রতিনিধিত্ব আমাদের যা দেওয়া হয়েছে তা বস্তুতপক্ষে আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। এমনকি বহু ক্ষেত্রেই মনোনীত ব্যক্তি যাঁদের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন, তাঁদের কোনও রকম অনুমোদন ছাড়াই বেছে নেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতিগত কারণে হয়ত তাই অবশ্যম্ভাবী ছিল। কারণ, একদিকে বড়লাট এবং স্থানীয় সরকারের কাছে সংরক্ষিত মনোনয়ন সভা নিশ্চিতভাবেই কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যদিকে জনপ্রিয় নির্বাচিত প্রতিনিধি বেছে নেওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট এবং বিশ্বাসযোগ্য পদ্ধতির অভাবে প্রকৃত প্রতিনিধিত্বকারী বেছে নেওয়ার কাজ যথেষ্টই কঠিন ছিল। নির্বাচনের ফল থেকে দেখা গিয়েছে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংখ্যাগুরুর মতের সঙ্গে মিল না থাকলে সরকারি অনুমোদনের জন্য নির্বাচকরা কোনও মুসলমান প্রার্থীর নাম জমা দিয়েছেন, এরকম কোনও ঘটনা প্রায় অসম্ভব। আমাদের সহোদর অ-মুসলমান দেশবাসীরা এই সুযোগ কেবলমাত্র তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের সদস্যদের মনোনীত করতে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করবে, এতেও আমরা দোষের কিছু দেখি না। হিন্দু না হলেও এমন মানুষও রয়েছেন, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতেই তারা ভোট দেবেন।

কারণ ভবিষ্যতে পুনর্নির্বাচনের জন্য তাদের এই সংখ্যাগরিষ্ঠের সদিচ্ছার ওপর-ই নির্ভরশীল থাকতে হয়। আবার একথাও ঠিক যে, আমাদের হিন্দু দেশবাসীদের সঙ্গে অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের মিল রয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে গভীর আত্মতৃপ্তির বিষয়ে যে জাতিগত তাদের যে পরিচয়-ই হোক না কেন, আইনসভায় এইসব দক্ষ সদস্যদের জন্য এইসব অভিন্ন স্বার্থ সুরক্ষিত রয়েছে।

একটি পৃথক সম্প্রদায়

এতদসত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, আমরা মুসলমানরা, একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। আমাদের নিজস্ব অতিরিক্ত কিছু স্বার্থ রয়েছে যা অন্য সম্প্রদায়ের থেকে ভিন্ন এবং পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্বের অভাবে এখনও পর্যন্ত এই সব স্বার্থের যথাযথ সম্পূরণ সম্ভব হয় নি। বলা বাহুল্য নয় যে, যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানেও তাদের এমন চোখে দেখা হয় যে, যেন তারা অযাচিত নগণ্য রাজনৈতিক উৎপাদক এবং স্বভাবতই উপেক্ষার যোগ্য। পঞ্জাবেই কিছুক্ষেত্রে এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। এই সমস্যা সব থেকে বেশি প্রকট সিন্ধু এবং পূর্ব বাংলায়। প্রতিনিধি নির্বাচন নিয়ে মতামত নিরূপণের পূর্বে আমরা এও বলতে চাই যে, সরকারি চাকরিতে কোনও সম্প্রদায়ের কত সংখ্যক সদস্য কী জায়গা করে আছে, তার ওপরও নির্ভর করে সেই সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব কতদূর বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, মুসলমান সম্প্রদায়-ই এর শিকার, যেহেতু সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যা যথেষ্ট নয়। তাই সমাজে তাদের প্রাপ্য সম্মান ও প্রভাবও খোয়াতে হয়।

সরকারি চাকরিতে নিয়োগ

আমাদের অনুরোধ, সরকার খুশি হয়ে সমস্ত ভারতীয় প্রদেশে সরকারি চাকরিতে মুসলমান সম্প্রদায়কে আধিকারিক এবং অধস্তন পদে এবং এছাড়া প্রশাসনিক পরিষেবায় প্রাপ্য অংশীদারী দেবেন। বলাবাহুল্য, ইতিপূর্বে এই জাতীয় সংস্থান রেখে স্থানীয় সরকারগুলি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনামা দিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সব ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়িত হয়নি। শিক্ষিত মুসলমানদের অপ্রতুলতাই এজন্য কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছিল। তবে এই অভিযোগ কোনও এক সময়ে বাস্তবায়িত হলেও বর্তমানে তা তার গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের নিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করে যেখানে তাদের অপ্রতুলতাকে প্রতিমূলক সূচক হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে যা আদৌ ঠিক নয়। বরং চাহিদার সমপরিমাণ শিক্ষিত মুসলমান রয়েছেন,

আমরা আপনাকে নিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারি।

প্রতিযোগিতার বিষয়

যেহেতু শিক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি পেয়েছে, তাই এখন তাদের বঞ্চিত করার দুর্ভাগ্যবশত নতুন কারণ তৈরি করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, অধিক শিক্ষিতদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। এর ফলে নক্কারজনক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র চালু হচ্ছে। চাকরি ক্ষেত্রে একটা শ্রেণীর একচেটিয়া আধিপত্যের পিছনে যে রাজনৈতিক কারণ রয়েছে, সে ব্যাপারে মহামান্যকে ওয়াকিবহাল করতে চাই। এ ব্যাপারে আমরা আরও বলতে চাই যে, শিক্ষা আন্দোলনের শুরু থেকেই মুসলমান শিক্ষাবিদরা চরিত্র গঠনের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন। ভাল সরকারি চাকুরে তৈরিতে সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির থেকে চরিত্রগঠন অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে আমাদের বিশ্বাস। ভারতের সর্বত্রই মুসলমান জনসম্প্রদায়ের অভিযোগ, উচ্চ ন্যায়ালয় এবং প্রধান আদালতগুলিতে তুলনামূলকভাবে মুসলমান বিচারপতি কম নিয়োগ করা হয়। এইসব আদালত তৈরি হওয়ার পর থেকে তিনজন মুসলমান আইনজীবী বিচারপতির সম্মানীয় পদে নিযুক্ত হয়েছেন—এবং তাঁরা প্রত্যেকেই স্বীয় কৃতিত্বে বিচারপতির আসনে উত্তরণের যোগ্যতা স্পর্শ করেছেন। বর্তমানে কিন্তু কোনও মুসলমান বিচারপতি এই সব আদালতগুলির কোনও এজলাস (Bench) নেই। অথচ কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে তিনজন হিন্দুবিচারপতি রয়েছেন, অথচ জনসংখ্যার আনুপাতিক হিসাবে কলিকাতার জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ মুসলমান, পঞ্জাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান। অতএব প্রত্যেক উচ্চ ন্যায়ালয়ে এবং প্রধান আদালতগুলির এজলাসে একজন করে মুসলমান বিচারপতি দেওয়ার জন্য দাবিকে মাত্রাতিরিক্ত কোনও দাবি বোধ হয় বলা সঙ্গত নয়। এইসব ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য মুসলমান আইনজীবী অনায়াসেই পাওয়া যায়। একটা প্রদেশে না হলেও অন্য প্রদেশে পাওয়া খুব-ই সহজ। অধিকন্তু একথা বলায় কোনও অপরাধ নেই যে, ইসলামি আইনে পারঙ্গম এইসব আদালতগুলির কাজ করবে, কোনও মুসলমান বিচারপতি নিযুক্ত হলে তা বিচারের সামাজিক সঙ্গতিপূর্ণ শক্তি হিসাবে সন্দেহ নেই।

পুর প্রতিনিধিত্ব

নাগরিক স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষাগত প্রয়োজন এবং ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত আরও হাজারো স্থানীয় শাসন সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে পৌর এবং জেলা পর্যদগুলিকে কাজ করতে হয়। অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণার আগে এইসব জায়গায়

মুসলমানদের সংস্থানের প্রকৃত স্বরূপ কী তা নিয়ে মুহূর্তের জন্য মহামান্যের মনোনিবেশ আদায়ের দাবিতে কোনও জায়গায় হয়ে থাকলে মার্জনা করবেন। এইসব সংস্থাগুলিই স্বশাসিত সরকারের সিঁড়ির প্রথম সোপান রচনা করে। প্রতিনিধিদের সম্পর্ক এখানে থাকাটা ঘরোয়া বিষয় এবং জনসাধারণের তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। এতদসত্ত্বেও এইসব পর্ষদে মুসলমানদের মনোনয়ন আবেদনপত্রের ভিত্তিতে বা ধারাবাহিক কোনও নীতি অনুসরণ করে হয় না। ফলে একেকটি এলাকায় পর্ষদে তাদের সংখ্যার তারতম্য থেকে যায়। আলিগড় পুরসভায় ৬টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। এই ৬টি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটিতেই পুরপিতা হিসাবে একজন মুসলমান ও একজন হিন্দু মনোনীত হয়ে থাকেন। পঞ্জাব এবং অন্যত্রও এই নীতি গৃহীত হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। দুঃখের বিষয় মুসলমান করদাতাদের আনেক জায়গাতেই চিহ্নিত করা হয় না। মহামান্যের কাছে আমাদের আবেদন, পুরসভা এবং জেলাপর্ষদগুলিতে মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অগ্রিম ঘোষণা করে দেওয়া উচিত। জনসংখ্যা, সামাজিক অবস্থান, স্থানীয় প্রভাব, এছাড়া সমস্ত সম্প্রদায়ের নিজস্ব চাহিদার দিকে তাকিয়ে এই আনুপাতিক সংখ্যা নির্ধারণ করা উচিত। একবার যদি এই আনুপাতিক সংখ্যা কঠোরভাবে স্থিরীকৃত হয়, তাহলে প্রত্যেক সম্প্রদায়-ই তাদের নিজস্ব প্রতিনিধি পাঠাতে সমর্থ হবে। পঞ্জাবের অনেক শহরেই এখন এই নিয়ম চালু আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো

আমরা চাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিষদে (Senate) এবং নিষদে (Senate) ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। অর্থাৎ এর যে কোনও একটিতে যতদূর সম্ভব মুসলমান সম্প্রদায়ের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয় নির্দেশনামা ঘোষণা করা হোক।

প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে মনোনয়ন

এরপর আমাদের দাবি, দেশের প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন নিয়ে। দাবি সনদের পাঁচ নম্বর অনুচ্ছেদে পুরসভা এবং জেলা পর্ষদগুলিতে প্রতিনিধিত্বের যে প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি, তার প্রসঙ্গ টেনেই বলতে চাই প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতেও এই গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে মুসলমান প্রতিনিধিত্বের সমানুপাতিক সংখ্যা নির্ধারিত হোক। প্রভাবশালী মুসলমান, জমিস্বত্বভোগী, আইনজীবী, বণিক এবং জেলাপর্ষদ ও পুরসভাগুলিতে মুসলমান সদস্য এবং অন্য সব গুরুত্বপূর্ণ

ক্ষেত্রের মুসলমান প্রতিনিধিত্বকারী, এমনকি মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান স্নাতকদের নিয়ে নিদেনপক্ষে পাঁচ বছরের জন্য একটা নির্বাচকমণ্ডলী গড়ে তোলা হোক। এবং মহামান্য সরকারের যোগ্য প্রতিবিধান অনুযায়ী এই নির্বাচকমণ্ডলী নিজেদের পছন্দমতো যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে পাঠাক।

বড়লাটের পরিষদ

রাজকীয় আইন পরিষদে মুসলমান প্রতিনিধিত্ব স্বার্থের যে প্রাপ্য বকেয়ার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের প্রস্তাবসমূহ হল (১) পরিষদের গঠনতন্ত্রে মুসলমান প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা নির্ধারণ মুসলমান সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার নিরিখে নির্বাচন করা চলবে না। মুসলমান সম্প্রদায় যাতে কোনভাবেই অক্ষম সংখ্যালঘু না হয়ে পড়ে তার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। (২) মনোনয়নের থেকে বরং নির্বাচনের মাধ্যমেই প্রতিনিধি নিয়োগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। (৩) মুসলমান সম্প্রদায় বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মুসলমান ভূমিস্বত্বভোগী, আইনজীবী, বণিক এবং অন্য সব গুরুত্বপূর্ণ পেশাগত ক্ষেত্রের প্রতিনিধিবর্গকে মহামান্য সরকারের নির্বাচন করা উচিত। এছাড়া প্রাদেশিক আইনসভা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ফেলোদের ক্ষমতা প্রয়োগের মতো নির্বাচনী ক্ষমতা দেওয়া উচিত। মহামান্য সরকারের প্রচলিত আইনি সংস্থান মেনেই বরং তা করা হোক।

কার্যনির্বাহি পরিষদ

বড়লাটের কার্যনির্বাহি পরিষদে এক বা ততোধিক ভারতীয় সদস্য নিয়োগের দাবিতে জনমত সক্রিয় হচ্ছে। এই নিয়োগের ক্ষেত্রেও মুসলমানদের দাবিকে যাতে কোনভাবে ঝাপসা করা না হয়, সেদিকে নজর রাখা দরকার এই পরিষদের জন্য একাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলমান প্রার্থী এদেশে বিরল নয়।

একটি মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের জাতীয় কল্যাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবার এমন একটা বিষয়ের অবতারণা করার অনুমতি চাইছি। একটি মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার সঙ্গে একটি সম্প্রদায় হিসাবে আমাদের আকাঙ্ক্ষা এবং ভবিষ্যৎ অগ্রগতির বহুলাংশে নির্ভরশীল বলে আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস। এটা সম্ভব হলে তা আমাদের ধর্মীয় এবং শিক্ষাগত জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে। মহামান্য মান্যবরের কাছে আমাদের আবেদন আপনি এই জাতীয় একটা গঠনমূলক ব্যবস্থা নিন যাতে আমাদের সম্প্রদায়ের পূর্ণ

অনুমোদন রয়েছে। এই দাবি সনদে যে-সব বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে তা যথাযথ সম্পূরণ সম্ভব হলে সম্রাটের প্রতি আমাদের কথিত বিশ্বস্ততা আরও বাড়বে। এবং জাতীয় সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক অগ্রগতির তা ভিত্তিপ্রস্তর রচনা করবে আগামী প্রজন্ম ও মহামান্যের এই বদান্যতার কথা মনে রাখবে। মহামান্যের কাছ থেকে এ ব্যাপারে সদ্বিবেচনার আশ্বাস পাওয়া যাবে এই নিশ্চিত বিশ্বাস আমাদের রয়েছে। সর্বোপরি মহামান্যের সর্বাধিক বিশ্বস্ত এবং অনুগৃহীত সেবক বলে আমরা নিজেদের তুলে ধরতে চাই।

লর্ড মিন্টোর প্রত্যুত্তর

মুসলমান দাবির প্রতি সহানুভূতি

এই দাবি সনদ পেশের পর-ই মহামান্য উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ জবাবি ভাষণ দেন। এই স্পর্শকাতর ভাষণের মাঝে মধ্যেই মুসলমান প্রতিনিধিদল হর্ষধ্বনি দিয়ে ওঠেন, অশ্রুবিগলিত হয়ে তারা বলতে থাকেন 'শুনুন, শুনুন' বিশেষত মান্যবর যখন বললেন যে তিনি প্রতিনিধিদলের দাবির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত তখন তাদের উচ্ছ্বাস বাঁধাভাঙ্গা প্লাবনের মতো ভেঙে পড়ল। মহামান্য বলেন, যে কোনও নির্বাচনী ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধর্মীয় দলের দৃষ্টিভঙ্গিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এবং ব্রিটিশ সরকার এই বিরাট সাম্রাজ্য অতীতের মতো ভবিষ্যতেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতি পালন করবে। প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাতের সুযোগ হওয়ার বড়লাট তাঁদের সাধুবাদ জানান। বড়লাট বলেন ঃ—

ভদ্রমহোদয়গণ, দাবি-সনদ আপনাদের সম্যক দাবি বিবেচনার পূর্বে সিমলায় আপনাদের আগমনকে আমি হার্দ্য অভিবাদন জানাতে চাই। এখানে আপনাদের আগমন প্রকৃতই গুরুত্বপূর্ণ। যে দাবি-সনদ আপনারা আমাকে দিয়েছেন, তা বিশিষ্ট মানুষদের স্বাক্ষর সম্বলিত। বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রীরা ছাড়াও ভূস্বামী, আইনজীবী, বণিক এবং সরকারের অধীনস্থ আরও অনেকের স্বাক্ষর এতে রয়েছে। ভারতে আলোকপ্রাপ্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার এক প্রতিনিধিত্বমূলক বৈশিষ্ট্য আপনাদের এই দাবি-সনদে ফুটে উঠেছে। ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ অথবা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর প্রতি সহমর্মিতা বা বিদ্বেষ ছাপিয়ে আপনাদের এই দাবি-সনদে ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুবিবেচনার ফলশ্রুতিস্বরূপ এক মতামত দাবি-সনদে প্রতিফলিত হয়েছে। ইসলামপন্থীদের এই ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আমি আমার সাধুবাদ জানাতে চাই। অধিকন্তু আমাদের শাসনের রাজনৈতিক

ইতিহাসের অংশীদারী হতে আপনাদের সঙ্কল্পের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। এই বিশাল মহাদেশে জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস এবং বিভিন্ন জাতির সুবিধাকে ব্রিটিশ শাসন ভারতে মর্যাদা দিয়েছে বলে আপনাদের মনোভাবে বড়লাট হিসাবে আমি খুশি। ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসন ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতার প্রতি মর্যাদা দিয়েছে এবং আশাপ্রদ ভবিষ্যতেও শান্তিরক্ষায় ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা একটা অগ্রগণ্য জাতির প্রতিভূ হিসাবে আপনাদের কাছে জানতে পেরে আমি আপনাদের প্রতি নিরতিশয় কৃতজ্ঞ।

অতীতে সাহায্য

অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখার এক তৃপ্তিদায়ক ঘটনা হল সরকারি চাকরি পেতে মুসলমান সম্প্রদায়কে সাহায্য করার জন্য ব্রিটিশ প্রচেষ্টার কথা। ১৭৮২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতা মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই ছিল হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মুসলমানদের সক্ষম করা এবং সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের সুযোগ করে দেওয়া। ১৮১১ সালে আমার পূর্বসূরি লর্ড মিন্টো মাদ্রাসার উন্নতিকল্পে এবং ভারতের অন্যত্র মুসলমানদের জন্য কলেজ নির্মাণে উদ্যোগী হন। এর পরবর্তীকালে মুসলমান 'অ্যাসোসিয়েশনে'র প্রচেষ্টায় মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত অবস্থান এবং সরকারি চাকরিতে তাদের নিযুক্তির জন্য ১৮৮৫ সালে সরকারি প্রস্তাব গৃহীত হয়। উদার মনোভাব স্যার সৈয়দ আহমেদ খান তাঁর সহধর্মীয়দের আলিগড়ের কলেজ দান করেন এবং এই মহান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান শিক্ষা প্রচেষ্টা তরান্বিত হয়।

আলিগড় কলেজ

১৮৭৭ এর জুলাই মাসে লর্ড লিটন আলিগড়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। স্যার সৈয়দ আহমেদ খান অনুষ্ঠানে বড়লাটকে সম্ভাষণ করে বলেন; 'যে ব্যক্তিগত সম্মানে আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন তাতে ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা জানানোর থেকেও আরও বড় কিছু আমার হৃদয়কে আলোড়িত করেছে। ব্রিটিশ শাসনের প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে আপনি বর্তমান অনুষ্ঠানে উপস্থিত। আমাদের শ্রমজীবী মানুষদের প্রতি আপনি সহানুভূতিশীল বলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস রয়েছে এবং এই নিশ্চয়তা আমার কাছে নিরতিশয় তৃপ্তিদায়ক। আমার জীবদ্দশায় বহু বছরের চেষ্টায় এই যে প্রতিষ্ঠান আমি গড়ে তুলতে চেয়েছি, তা আমার জীবনের এক এবং অন্যতম অভীষ্ট। এই প্রতিষ্ঠান যেমন একদিকে আমার দেশবাসীর শক্তির সারাৎসারকে তুলে ধরবে

অন্যদিকে তা শাসকদের সহমর্মিতা অর্জন করবে বলেও আমার নিশ্চিত বিশ্বাস। আমার আয়ু আর সামান্য কয়েক বছর, এরপর যখন আমি আর আপনাদের মধ্যে থাকব না, আমার কামনা আমার দেশবাসীকে শিক্ষার আলোকে উদ্দীপিত করে এই কলেজ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হবে। এবং তখনও তা দেশবাসীর আস্থাভাজন থেকে বঞ্চিত হবে না। ব্রিটিশ শাসনের প্রতিও এই কলেজ তার আনুগত্য বজায় রাখবে। ব্রিটিশ শাসনের আশীর্বাদধন্য এবং এর-ই সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনাধীন অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের বস্তুপরায়নতায় ধন্য হবে, এটাই আমার মনস্কামনা।'

স্যার সৈয়দের প্রভাব

আলিগড় বহুবিধ সম্মানে ভূষিত হয়েছে। আনুগত্য এবং দেশাত্মবোধের ভাবধারায় আপ্লুত এই কলেজের ছাত্ররা নিজেদের ধর্মীয় মতবাদে একনিষ্ঠ থেকে জীবনসংগ্রামে ব্রতী হয়েছেন। স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের উৎসাহ এবং আলিগড়ের শিক্ষা ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং মুসলমান ইতিহাসে এক জাজ্জ্বল্য দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। আপনাদের অভিভাষণে এই কঠোর যুক্তিবোধ, উপস্থিত বিবেচনাশক্তি বারংবার প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আপনাদের বিশ্বাস এবং আপনাদের শাসনকর্তাদের সঙ্গে ন্যয়বিচারে বিশ্বাস করেন বলে জানালেন। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় যে চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছে, তা কিন্তু আপনারা উপেক্ষা করতে পারেন না। এটা সম্ভবত 'আপনাদের সংযমী উপদেষ্টা এবং সংযত নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ লঙ্ঘন করতে পারে।'

পূর্ববঙ্গে শাসন - প্রণালী

পূর্ববঙ্গ এবং অসমের বিষয় নিয়ে আলোচনায় কোনও মধ্যস্থতার আমার অভিপ্রায় নেই। কাউকে কোনও আঘাত না করেই আমি নতুন প্রদেশের মুসলমানদের সতত ধন্যবাদ জানতে চাই। নতুন এই পরিবেশে যে আত্মসংযম এবং আধুনিক মনস্কতার যে পরিচয় তারা দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। অবধারিতভাবেই বেশকিছু ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে। তবে বাঙালি মনস্কতায় যে আন্তরিকতার বোধ রয়েছে তার প্রতি আমি পূর্ণমাত্রায় সহানুভূতিশীল। অধিকন্তু আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই যে, বড়লাট এবং ভারতের সরকার সম্মীলিতভাবে এই নতুন প্রদেশের বিষয় সমূহ খতিয়ে দেখেছে। নতুন এই প্রদেশের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। ধর্মবিশ্বাস এবং জাতিগত ভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের আনুগত্য এবং ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষায় তাদের জন্য পূর্ববঙ্গ এবং অসমের মুসলমান সম্প্রদায় আগের মতো এখনও ব্রিটিশ শাসনের

ন্যায় বিচারের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হতে পারেন।

ভারতে অস্থিরতা

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা এমন একটা সময় আমার সমীপে এসেছেন যখন ভারতের রাজনৈতিক পরিবেশ এক পরিবর্তনের মুখে দাঁড়িয়ে। এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা বোকামি। আশা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভারতে নতুন হলেও ক্রমশই তার অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। এগুলি আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। তাছাড়া তা করাও নিতান্ত বোকামি। কিন্তু এই অস্থিরতার কারণ কী? বিপথগামী সহস্র মানুষের অসন্তোষ তার কারণ নয়। কেউ এ কথা বললে আমি অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে তা অস্বীকার করব। আনুগত্যহীন কোনও মানুষের বিদ্রোহও এর কারণ হতে পারে না।

পশ্চিমী শিক্ষার ফল

যদিও জনসংখ্যার একটা ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই পশ্চিমী শিক্ষার প্রসার হয়েছে, তা হলেও এই শিক্ষার প্রসার-ই তার কারণ। ব্রিটিশ শাসন এই ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই পশ্চিমী শিক্ষার বীজ বপন করেছে। এখন তার ফলকে ছড়িয়ে দিতে এবং একটা গতিমুখে তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যারপরনাই চেষ্টা করা হচ্ছে। এই শিক্ষার প্রসারের যে ফল আমরা পাচ্ছি, তার অনেকটাই কাজে লাগছে না। ভারতের মানুষদের জন্য পশ্চিমী শিক্ষার ধারণা হয়তো পুরোপুরি কার্যকর নয়। তবে যতদিন যাবে এবং শিক্ষার প্রসার যত বৃদ্ধি পাবে, ততই তা ফলদায়ক হবে। তবে কী পরিমাণ সুস্বাস্থ্য এবং সাহচর্য তা দিতে পারে তা পুরোপুরিই নির্ভর করবে প্রশাসনিক ন্যায়নিষ্ঠা ও সরবরাহের ওপর। 'ভারতের মানুষদের কাছে ইউরোপীয় আদলে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণ ও নতুন ধারণা' অথবা এই শিক্ষা চালু করতে সর্বাধিক যত্নশীল এবং নিষ্ঠাবান হওয়া দরকার — এ কথা বলার জন্য আমার কাছে আপনাদের ক্ষমা প্রার্থনা বাঞ্ছনীয় নয়। প্রাচ্যের জাতিগুলির বংশানুক্রমিক প্রবৃত্তি এবং ধারার মধ্যে পশ্চিমী দুনিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে যে মেশানো হচ্ছে, তার সবগুলিতে আমি সাধুবাদ জানাতে পারব না। পশ্চিমী চিন্তার ধারা, পশ্চিমী সভ্যতার শিক্ষা, ব্রিটিশ ব্যক্তিস্বাধীনতার ভাবধারা, ভারতের মানুষদের ক্ষেত্রেও বহুলাংশে কল্যাণজনক হতে পারে। তবে আপনাদের সঙ্গে আমিও একমত যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জোর করে চাপ সৃষ্টির প্রয়াস অবাস্তবসম্মত।

মুসলমানদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ

ভদ্রমহোদয়গণে, রাজনৈতিক ভবিষ্যতের স্বার্থে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের অবস্থান নিয়ে আপনাদের বক্তব্যে আপনারা যা তুলে ধরেছেন, আমি সে ব্যাপারে পূর্ণ সহমত হয়েই মত বিনিময় করতে চাই। আমার বিশ্বাস, আপনারা বুঝবেন, প্রশাসনিক এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপনাদের সম্প্রদায়ের অংশীদারী এবং শর্ত সম্বন্ধে এমতাবস্থায় কোনও নিশ্চিত আশ্বাস আপনাদের দেওয়া আমার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। আপনাদের সঙ্গে আমি এখন নিতান্ত সৌজন্যটুকুই বিনিময় করতে পারি। যে সমস্ত প্রশ্নগুলি আপনারা তুলে ধরেছেন, তা বর্তমানে কমিটির বিবেচনাধীন। মনোনয়ন (প্রতিনিধিত্ব) এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অনেক পরে। আপনাদের দাবি-সনদ যাতে কমিটির কাছে জমা পড়ে, আমি তা দেখবো। তবে কমিটির সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করেই আপনাদের মতামতের গুরুত্ব বিবেচনা করে এখন-ই একটা সাদামাটা উত্তর আমি দিতে পারি, যে জন্য কেউ আমার কৈফিয়ত তলব করবে না।

প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন

আপনাদের দাবি-সনদের মূল প্রতিপাদ্য হল প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত, তা সে জেলা পর্যদ বা আইন পরিষদ যেখানেই হোক না কেন। আপনাদের দাবি হল এইসব জায়গায় নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি বা নির্বাচকমণ্ডলীর পুনর্গঠন, যাতে মুসলমান সম্প্রদায় একটি সম্প্রদায় হিসাবে যথাযথ স্বীকৃতি পায়। আপনারা উল্লেখ করেছেন যে, এখন যে নির্বাচকমণ্ডলী রয়েছে তাদের দ্বারা বেশিরভাগ সময়-ই মুসলমান প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। যদিবা তা তারা করেন, তাহলেও সেই প্রার্থীর মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পায় না। সংখ্যাগরিষ্ঠের চাপে সেই প্রার্থী তার সম্প্রদায়ের দাবিকে কখনও তুলে ধরতে পারে না। আমি মনে করি, আপনাদের সম্প্রদায়ের যে রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি এই সম্প্রদায় যেভাবে ন্যায়নিষ্ঠ থেকেছে তাতে আপনাদের দাবি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত এবং তা বিবেচিত হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে আমি আপনাদের সঙ্গে পূর্ণ সহমত। দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিত্ব কী ভাবে হওয়া উচিত, সেই প্রশ্নের মধ্যে আমি যাচ্ছি না। তবে আমি স্থির নিশ্চিত এবং আমার মনে হয়, এ-ব্যাপারে আপনারাও একমত হবেন। বিষয়টি হল, ভারতে যে কোনও নির্বাচনী প্রতিনিধিত্ব তা যদি সম্প্রদায়গুলির ঐতিহ্য, ধারা এবং সমাজে তাদের অবস্থান সম্পর্কে উদাসীন

থেকে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সুবিধা ও স্বার্থ চরিতার্থ করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

ভারতের বৃহত্তর জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সম্যক কোনও ধারণাই নেই। ভদ্রমহোদয়গণ, আমিও আপনাদের সঙ্গে একমত যে, পুরসভা এবং জেলাপর্ষদগুলিতেই স্বায়ত্তশাসনের প্রাথমিক সোপান রচিত হয়। এবং জনসাধারণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় ক্রমান্বয়ে শিক্ষিত করে তোলার জন্য সেই দিকেই আমাদের নজর দেওয়া উচিত।

একটি প্রতিশ্রুতি

আমি কেবল আপনাদের অবশেষে এটুকুই বলতে পারি যে, কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে অন্তত যার সাথে আমি সংশ্লিষ্ট, একটি সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার এবং স্বার্থ সুরক্ষিত থাকা নিয়ে আপনারা আশ্বস্ত থাকতে পারেন। আপনারা এবং ভারতের জনসাধারণ ব্রিটিশ রাজের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ন্যস্ত করতে পারেন। ব্রিটিশ শাসনে ভারতের জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার এবং জাতীয় ঐতিহ্য সুরক্ষিত থাকবে। তাদের এই মর্যাদা বোধকে অক্ষুন্ন রাখা ব্রিটিশ সরকার নিজেদের দায়িত্ব জ্ঞান করে।

ভদ্রমহোদয়গণ, মুসলমান প্রতিনিধিত্বকারী আপনাদের প্রতিনিধিদলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাতের এই অনন্য সুযোগ হওয়ায় আমি আপনাদের যারপর ধন্যবাদ জানাতে চাই। জনস্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রকৃত উৎসাহ থাকায় কষ্ট করে হলেও আপনারা এতটা পথ এসেছেন। আপনাদের এই উৎসাহ এবং উদ্যমকে আমি প্রশংসা করি। কেবল আপনাদের সিমলা সফর অতি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় আমার আক্ষেপ থেকে গেল।

পরিশিষ্ট - XIII

ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ অনুযায়ী প্রতিটি প্রদেশের নিম্নকক্ষের আসন বন্টন

প্রদেশ	মোট আসন	সাধারন আসন		অনুন্নত এবং আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত আসন	শিখদের আসন	মুসলিম আসন	অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান আসন	ইউরোপীয়দের আসন	ভারতীয়-খ্রিস্টানদের আসন	বাণিজ্য, শিল্প, খনি এবং আবাদী ক্ষেত্রে প্রতিনিধিদের আসন	ভূস্বামীদের আসন	বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন	শ্রমিক প্রতিনিধিদের আসন	মহিলাদের জন্য আসন				
		মোট সাধারন আসন	তফসিলিদের জন্য সংরক্ষিত সাধারণ আসন											সাধারণ	শিখ	মুসলমান	ইন্দো-ইউরোপীয়	ভারতীয় খ্রিস্টান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
মাদ্রাজ -	২১৫	১৪৬	৩০	১	-	২৮	২	৩	৮	৬	৬	১	৬	৬	-	১	-	১
বোম্বাই -	১৭৫	১১৪	১৫	১	-	২৯	২	৩	৩	৭	২	১	৭	৫	-	১	-	-
বাংলা -	২৫০	৭৮	৩০	-	-	১১৭	৩	১১	২	১৯	৫	২	৮	২	-	২	১	-
যুক্তপ্রদেশ -	২২৮	১৪০	২০	-	-	৬৪	১	২	২	৩	৬	১	৩	৪	১	২	-	-
পঞ্জাব -	১৭৫	৪২	৮	-	৩১	৮৪	১	১	২	১	৫	১	৩	১	-	১	-	-
বিহার -	১৫২	৮৬	১৫	৭	-	৩৯	১	২	১	৪	৪	১	৩	৩	-	১	-	-
মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার -	১১২	৮৪	২০	১	-	১৪	১	১	-	২	৩	১	২	৩	-	-	-	-

[পরের পৃষ্ঠায়]

[আগের পৃষ্ঠার পর]

পরিশিষ্ট - XIII

ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ অনুযায়ী প্রতিটি প্রদেশের নিম্নকক্ষের আসন বন্টন

প্রদেশ	মোট আসন	সাধারন আসন		অনুন্নত এবং আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত আসন	শিখদের আসন	মুসলিম আসন	অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আসন	ইউরোপীয়দের আসন	ভারতীয়-খ্রিস্টানদের আসন	বাণিজ্য, শিল্প, খনি এবং আবাদী ক্ষেত্রে প্রতিনিধিদের আসন	ভূস্বামীদের আসন	বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন	শ্রমিক প্রতিনিধিদের আসন	মহিলাদের জন্য আসন				
		মোট সাধারন আসন	তফসিলিদের জন্য সংরক্ষিত সাধারণ আসন											সাধারণ	শিখ	মুসলমান	ইঙ্গো-ইউরোপীয়	ভারতীয় খ্রিস্টান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
অসম	১০৮	৪৭	৭	৯	-	৩৪	-	১	১	১১	-	-	৪	১	-	-	-	-
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ -	৫০	৯	-	-	৩	৩৬	-	-	-	-	২	-	-	-	-	-	-	-
ওড়িশা -	৬০	৪৪	৬	৫	-	৪	-	-	১	১	২	-	১	২	-	-	-	-
সিন্ধু -	৬০	১৮	-	-	-	৩৩	-	২	-	২	২	-	১	১	-	১	-	-

বোম্বাইতে সাধারণ আসনগুলির সাতটি মারাঠাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পঞ্জাবে ভূস্বামীদের জন্য আসনগুলির একটি তুমানদার কর্তৃক পূর্ণ করা হবে। অসম এবং ওড়িশায় মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন হতে হবে সম্প্রদায় নির্বিশেষে আসন।

পরিশিষ্ট - XIV

ভারত শাসন আইন-১৯৩৫-এর অধীন প্রত্যেক প্রাদেশিক আইনসভার উচ্চকক্ষে আসন বন্টন

প্রদেশ	মোট আসন	সাধারণ আসন	মুসলমান আসন	ইউরোপীয় আসন	ভারতীয় খ্রিস্টানদের আসন	আসন যা আইনসভা কর্তৃক পূর্ণকরা হবে	ছোটলাট যেসব আসনগুলিতে মনোনয়ন করবেন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মাদ্রাজ	এর কম নয় ৫৪ এর বেশি নয় ৫৬	৩৫	৭	১	৩	—	এরকম নয় ৮ এর বেশি নয় ১০
বোম্বাই	এর কম নয় ২৯ এর বেশি নয় ৩০	২০	৫	১	—	—	এর কম নয় ৩ এর বেশি নয় ৪
বাংলা	এর কম নয় ৬৩ এর বেশি নয় ৬৫	১০	১৭	৩	—	২৭	এর কম নয় ৬ এর বেশি নয় ৮
যুক্তপ্রদেশ	এর কম নয় ৫৮ এর বেশি নয় ৬০	৩৪	১৭	১	—	—	এর কম নয় ৬ এর বেশি নয় ৮
বিহার	এর কম নয় ২৯ এর বেশি নয় ৩০	৯	৪	১	—	১২	এর কম নয় ৩ এর বেশি নয় ৪
অসম	এর কম নয় ২১ এর বেশি নয় ২২	১০	৬	২	—	—	এর কম নয় ৩ এর বেশি নয় ৪

[আগের পৃষ্ঠার পর]

পরিশিষ্ট - XIV

ভারত শাসন আইন-১৯৩৫-এর অধীন প্রত্যেক প্রাদেশিক আইনসভার নিম্নকক্ষে আসন বন্টন

প্রদেশ	মোট	সাধারণ আসন		শিখেদের আসন	মুসলমান আসন	অ্যাংলো ইন্ডিয়ান আসন	ইউরোপীয়দের আসন	ভারতীয় খ্রিস্টানদের আসন	বাণিজ্য ও শিল্পের প্রতিনিধিদের জন্য আসন	ভূস্বামীদের আসন	শ্রমিক প্রতিনিধিদের জন্য আসন	মহিলাদের আসন
		মোট সাধারণ আসন	তপসিলিদের জন্য সংরক্ষিত সাধারণ আসন									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৫	১	১	—	৪	—	—	১	—	—	১	—
ওড়িশা -	৫	৪	—	—	১	—	১	—	—	—	—	—
সিন্ধু -	৫	১	১	—	৩	—	—	—	—	—	—	—
ব্রিটিশ বেলুচিস্তান	১	১	১	—	১	—	—	—	—	—	—	—
দিল্লি -	২	—	—	—	১	—	১	—	—	—	—	—
আজমের মারওয়ারা কুর্গ	১	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
অ-প্রাদেশিক রাজ্য	৪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১	—
মোট	২৫০	১০৫	১৯	৬	৮২	৪	৮	৮	১১	৭	১০	৯

পরিশিষ্ট - XV

ভারত শাসন আইন-১৯৩৫-এর অধীন প্রত্যেক প্রাদেশিক আইনসভার নিম্নকক্ষে আসন বন্টন

প্রদেশ	মোট	সাধারণ আসন		শিখেদের আসন	মুসলমান আসন	অ্যাংলো ইন্ডিয়ান আসন	ইউরোপীয়দের আসন	ভারতীয় খ্রিস্টানদের আসন	বাণিজ্য ও শিল্পের প্রতিনিধিদের জন্য আসন	ভূস্বামীদের আসন	শ্রমিক প্রতিনিধিদের জন্য আসন	মহিলাদের আসন
		মোট সাধারণ আসন	তফসিলিদের জন্য সংরক্ষিত সাধারণ আসন									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
মাদ্রাজ -	৩৭	১৯	৪	—	৮	১	১	২	২	১	১	২
বোম্বাই -	৩০	১৩	২	—	৬	১	১	১	৩	১	২	২
বাংলা -	৩৭	১০	৩	—	১৭	১	১	১	৩	১	২	১
যুক্তপ্রদেশ -	৩৭	১৯	৩	—	১২	১	১	১	—	১	১	১
পঞ্জাব -	৩০	৬	১	৬	১৪	—	১	১	—	১	—	১
বিহার -	৩০	১৬	২	—	৯	—	১	১	—	১	১	১
মধ্যপ্রদেশ বেরার	১৫	—	১	—	৩	—	—	—	—	১	১	১
অসম	১০	৪	১	—	৩	—	১	১	—	—	১	—

[পরের পৃষ্ঠায়]

পরিশিষ্ট - XVI

ভারত শাসন আইন - ১৯৩৫-এর অধীন ব্রিটিশ ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় অধীন পরিষদের উচ্চকক্ষে আসন বন্টন

প্রদেশ অথবা সম্প্রদায়	মোট আসন	সাধারণ আসন	তফসিলিদের জন্য আসন	শিখদের আসন	মুসলমানদের আসন	মহিলাদের আসন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মাদ্রাজ	২০	১৪	১	—	৪	১
বোম্বাই	১৬	১০	১	—	৪	১
বাংলা	২০	৮	১	—	১০	১
যুক্তপ্রদেশ	২০	১১	১	—	৭	১
পঞ্জাব	১৬	৩	—	৪	৮	১
বিহার	১৬	১০	১	—	৪	১
মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার	৮	৬	১	—	১	—
অসম	৫	৩	—	—	২	—
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৫	১	—	—	৪	—
ওড়িশা -	৫	৪	—	—	১	—
সিন্ধু -	৫	২	—	—	৩	—
ব্রিটিশ বেলুচিস্তান -	১	—	—	—	১	—
দিল্লি -	১	১	—	—	—	—
আজমের মেরওয়ার	১	১	—	—	—	—
কুর্গ -	১	১	—	—	—	—
ইঙ্গ-ভারতীয়	১	—	—	—	—	—
ইউরোপীয়	৭	—	—	—	—	—
ভারতীয় খ্রিস্টান	২	—	—	—	—	—
মোট	১৫০	৭৫	৬	৪	৪৯	৬

পরিশিষ্ট - XVII

ভারত শাসন আইন - ১৯৩৫-এর অধীন দেশীয় রাজ্যগুলির জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের নিম্ন ও উচ্চকক্ষে আসন বন্টন

রাজ্য এবং রাজ্যগুলির সমষ্টি	পরিষদ আসন সংখ্যা	রাজ্য ও রাজ্যগুলির সমষ্টি	যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদ আসন সংখ্যা	জনসংখ্যা
বিভাগ - I		বিভাগ - I		
হায়দ্রাবাদ	৫	হায়দ্রাবাদ	১৬	১,৪৪,৩৬,১৪২
বিভাগ - II		বিভাগ - II		
মহীশূর	৩	মহীশূর	৭	৬৫,৫৭,৩০২
বিভাগ - III		বিভাগ - III		
কাশ্মীর	৩	কাশ্মীর	৪	৩৬,৪৬,২৪৩
বিভাগ - IV		বিভাগ - IV		
গোয়ালিয়র	৩	গোয়ালিয়র	৪	৩৫,২৩,০৭০
বিভাগ - V		বিভাগ - V		
বরোদা	৩	বরোদা	৩	২৪,৪৩,০০৭
বিভাগ - VI		বিভাগ - VI		
কালাট	২	কালাট	১	৩,৪২,১০১
বিভাগ - VII		বিভাগ - VII		
সিক্কিম	১	সিক্কিম	—	১,০৯,৮০৮
বিভাগ - VIII		বিভাগ - VIII		
১. রামপুর	১	১. রামপুর	১	৪,৬৫,২২৫
২. বেনারস	১	২. বেনারস...	১	৩,৯১,২৭২
বিভাগ - IX		বিভাগ - IX		
১. ত্রিবাঙ্কুর	২	১. ত্রিবাঙ্কুর...	৫	৫০,৯৫,৯৭৩
২. কোচিন	২	২. কোচিন	১	১২,০৫,০১৬
৩. পুডুকোট্টাই		৩. পুডুকোট্টাই		৪,০০,৬৯৪
বাঙ্গানাপাল্লি	১	বাঙ্গানাপাল্লি	১	৩৯,২১৮
সান্দুর		সান্দুর		১৩,৫৮৩

[পরের পৃষ্ঠায়]

পরিশিষ্ট - XVII

রাজ্য এবং রাজ্যগুলির সমষ্টি	পরিষদ আসন সংখ্যা	রাজ্য ও রাজ্যগুলির সমষ্টি	যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদ আসন সংখ্যা	জনসংখ্যা
বিভাগ - X		বিভাগ - X		
১. উদয়পুর	২	১. উদয়পুর	২	১৫,৬৬,৯১০
২. জয়পুর	২	২. জয়পুর	৩	২৬,৩১,৭৭৫
৩. যোধপুর	২	৩. যোধপুর	২	২১,২৫,৯৮২
৪. বিকানির	২	৪. বিকানির	১	৯,৩৬,২১৮
৫. আলোয়ার	১	৫. আলোয়ার	১	৭,৪৯,৭৫১
৬. কোটা	১	৬. কোটা	১	৬,৮৫,৮০৪
৭. ভরতপুর...	১	৭. ভরতপুর	১	৪,৮৬,৯৫৪
৮. টোঙ্ক	১	৮. টোঙ্ক	১	৩,১৭,৩৬০
৯. ঢোলপুর	১	৯. ঢোলপুর		২,৫৪,৯৮৬
১০. কারাউলি...	১	কারাউলি	১	১,৪০,৫২৫
১১. বুন্দি	১	১০. বুন্দি		২,১৬,৭২২
১২. সিরোহি...	১	সিরোহি	১	২,১৬,৫২৮
১৩. দুঙ্গারপুর...	১	১১. দুঙ্গারপুর		২,২৭,৫৪৪
১৪. বানসওয়ারা	১	বানসওয়ারা	১	২,৬০,৬৭০
১৫. প্রতাপগড়		১২. প্রতাপগড়		৭৬,৫৩৯
জালোয়ার	১	জালোয়ার	১	১,০৭,৮৯০
১৬. জয়সালমির		১৩. জয়সালমির		৭৬,২৫৫
কিসেণগড়	১	কিসেণগড়	১	৮৫,৭৪৪
বিভাগ - XI		বিভাগ XI		
১. ইন্দোর	২	১. ইন্দোর	২	১৮,২৫,০৮৯
২. ভূপাল	২	২. ভূপাল	১	৭,২৯,৯৫৫
৩. রেওয়া	২	৩. রেওয়া	২	১৫,৮৭,৪৪৫
৪. দাতিয়া		৪. দাতিয়া		১,৫৮,৮৩৪

[পরের পৃষ্ঠায়]

পরিশিষ্ট - XVII

রাজ্য এবং রাজ্যগুলির সমষ্টি	পরিষদ আসন সংখ্যা	রাজ্য ও রাজ্যগুলির সমষ্টি	যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদ আসন সংখ্যা	জনসংখ্যা
৫. ওরচাহা	১	৫. ওরচাহা	১	৩,১৪,৬৬১
৬. ধর	১	৬. ধর		২,৪৩,৪৩০
৭. দেওয়াস (সিনিয়র)		৭. দেওয়াস (সিনিয়র)		৮৩,৩২১
দেওয়াস (জুনিয়ার)	১	দেওয়াস (জুনিয়ার)	১	৭০,৫১৩
৮. জাওরা		৮. জাওরা		১,০০,১৬৬
রাতলাম	১	রাতলাম	১	১,০৭,৩২১
৯. পান্না		৯. পান্না		২,১২,১৩০
সামতার	১	সামতার	১	৩৩,৩০৭
অজয়গড়...		অজয়গড়		৮৫,৮৯৫
১০. বিজাওয়ারা		১০. বিজাওয়ারা		১১,৫৮,৮৫২
চরকারি	১	চরকারি	১	১,২০,৩৫১
দত্তারপুর...		দত্তারপুর		১,৬১,২৬৭
১১. বায়োনি		১১. বায়োনি		১৯,১৩২
নাগো	১	নাগোদ	১	৭৪,৫৮৯
মাইহার		মাইহার		৬৮,৯৯১
বারাউন্ধা...		বারাউন্ধা		১৬,০৭১
১২. বারওয়ানি		১২. বারওয়ানি	১	১,৪১,১১০
আলিরাজপুর	১	আলিরাজপুর		১,০১,৯৬৩
শাহপুরা		শাহপুরা		৫৪,২৩৩
১৩. বাবুয়া		১২. বাবুয়া		১,৪৫,৫২২
সইলানা	১	সইলানা	১	৩৫,২২৩
সীতামাও		সীতামাও		২৮,৪২২
১৪. রাজগড়		১২. রাজগড়		১,৩৪,৮৯১
নারায়ণগড়	১	নারায়ণগড়...	১	১,১৩,৮৭৩
খিলচিপুর		খিলচিপুর		৪৫,৫৮৩

[পরের পৃষ্ঠায়]

[আগের পৃষ্ঠার পর]

পরিশিষ্ট - XVII

রাজ্য এবং রাজ্যগুলির সমষ্টি	রাজ্য পরিষদে আসন সংখ্যা	রাজ্য এবং রাজ্যগুলির সমষ্টি	যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদ	জনসংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
বিভাগ - XII		**বিভাগ - XII**		
১. কচ্ছ	১	১. কচ্ছ-	১	৫,১৪,৩০৭
২. ইদার	১	২. ইদার-	১	২,৬২,৬৬০
৩. নওনাগড়	১	৩. নওদাগড়-	১	৪,০৯,১৯২
৪. ভাবনগর	১	৪. ভাবনগর	১	৫,০০,২৭৪
৫. জুনাগড়	১	৫. জুনাগড়	১	৫,৪৫,১৫২
৬. রাজপিপলা	১	৬. রাজপিপলা	১	২,০৬,১১৪
পালানপুর		পালানপুর		২,৬৪,১৭৯
৭. ধ্রানগাধরা	১	৭. ধ্রানগাধরা	১	৮৮,৯৬১
গোন্ডল		৭. গোন্ডল		২,০৫,২৪৬
৮. পোরবন্দর	১	৮. পোরবন্দর	১	১,১৫,৬৭৩
মোরভি		মোরভি		১,১৩,০২৩
৯. রাধানগর	১	৯. রাধানগর	১	৭০,৫৩০
ওয়ানকানের		ওয়ানকানের		৪৪,২৫৯
পালিতানা		পাতিয়ানা		৬,২৪,১৫০
১০. ক্যাম্বে	১	১০. ক্যাম্বে	১	৮৭,৭০১
ধরমপুর		ধরমপুর		১,১২,০৩১
বালাসিনর		বালাসিনর		৫২,৫২৭
১১. বারিয়া	১	১১. বারিয়া	১	১,৫৯,৪২৯
ছোটউদয়পুর		ছোটউদয়পুর		১,৪৪,৬৪০
সন্ত		সন্ত		৮৩,৫৩১
লুনাওয়াডা		লুনাওয়াডা		৯৫,১৬২
১২. বানসদা	১	১২. বানসদা	১	৪৮,৮৩৯
শচীন		শচীন		২২,১০৭
জহর		জহর		৫৭,২৬১
দন্তা		দন্তা		২৬,১৯৬
১৩. ধ্রোল	১	১৩. ধ্রোল	১	২৭,৬৩৯
লিম্বডি		লিম্বডি		৪০,০৮৮
ওধায়ান		ওধায়ান		৪২,৬০২
রাজকোট		রাজকোট		৭৫,৫৪০

[আগের পৃষ্ঠার পর]

পরিশিষ্ট - XVII

রাজ্য এবং রাজ্যগুলির সমষ্টি	রাজ্য পরিষদে আসন সংখ্যা	রাজ্য এবং রাজ্যগুলির সমষ্টি	যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদ	জনসংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
বিভাগ - XIII		বিভাগ - XIII		
১. কোলাপুর	২	১. কোলাপুর	১	৯,৫৭,১৩৭
২. সাংলি	১	২. সাংলি	১	২,৫৮,৪৪২
সাভন্তবাদি		সাভন্তবাদি		২,৩০,৫৮৯
৩. জনজিরা	১	৩. জনজিরা	১	১,১০,৩৭৯
মুটল		মুটল		৬২,৮৩২
ভর		ভর		১,৪১,৫৪৬
৪. জামখানভি	১	৪. জামখানভি	১	১,১৪,২৭০
মিরাজ (সিনিয়র)		মিরাজ (সিনিয়র)		৯৩,৯৩৮
মিরাজ (জুনিয়র)		মিরাজ (জুনিয়র)		৪০,৬৮৪
করুনদাওয়াদি (সিনিয়র)		করুনদাওয়াদি (সিনিয়র)		৪৪,২০৪
করুনদাওয়াদি (জুনিয়র)		করুনদাওয়াদি (জুনিয়র)		৭৫,৫৪০
৫. আকালকোট	১	৫. আকালকোট	১	৯২,৬০৫
পল্টন		পল্টন		৫৮,৯৬১
জাট		জাট		৯১,০৯৯
আয়ুন্ধ		আয়ুন্ধ		৭৬,৫০৭
রামদুর্গ		রামদুর্গ		৩৫,৪৫৪
বিভাগ - XIV		বিভাগ - XIV		
১. পাতিয়ালা	২	১. পাতিয়ালা-	২	১,৬২৫,৫২০
২. ভাওয়ালপুর	২	২. ভাওয়ালপুর-	১	৯,৮৪,৬১২
৩. গাইরপুর	১	৩. গাইরপুর-	১	২২৭,১৮৩
৪. কাপুরথালা	১	৪. কাপুরথালা-	১	৩১৬,৭৫৭
৫. ঝিন্দ	১	৫. ঝিন্দ-	১	৩২৪,৬৭৬
৬. নাবহা	১	৬. নাবহা-	১	২৮৭,৫৭৪

[আগের পৃষ্ঠার পর]

পরিশিষ্ট - XVII

রাজ্য এবং রাজ্যগুলির সমষ্টি	রাজ্য পরিষদে আসন সংখ্যা	রাজ্য এবং রাজ্যগুলির সমষ্টি	যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদ	জনসংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
বিভাগ - XIV		বিভাগ - XIV		
৭. মান্ডি বিলাসপুর সুকেত	১	৭. মান্ডি বিলাসপুর সুকেট	১	৩৪৯,৫৭৩
৮. তেহেরি-গাড়োয়াল সিরমুর ছাম্বা	১	৮. তেহেরি গাড়ায়াল	১	২০৭,৪৬৫ ১০০,৯৯৪ ৫৮,৪০৮
৯. ফরিদকোট মালেরকোট লোহারু	১	৯. সরমুর ছাম্বা	১	১৪৮,৫৬৮ ১৪৬,৮৭০
১০. ফরিদকোট মালেরকোট লোহারন	১	১০. ফরিদকোট মালেরকোট লোহারু	১	১৬৪,৩৬৪ ৮৩,০৭২ ২৩,৩৩৮
বিভাগ - XV		বিভাগ - XV		
১. কোচবিহার	১	১. কোচবিহার	১	৫,৯০,৮৮৬
২. ত্রিপুরা	১	২. ত্রিপুরা	১	৩,৮২,৪৫০
৩. মণিপুর	১	৩. মণিপুর	১	৪,৪৫,৬০৬
বিভাগ - XVI		বিভাগ - XVI		
১. ময়ূরভঞ্জ	১	১. ময়ূরভঞ্জ	১	৮,৮৯,৬০৩
সোনেপুর	১	২. সোনেপুর	১	২,৩৭,৯২০
২. পাটনা		৩. পাটনা	১	৫,৬৬,৯১৪
কালাহান্ডি	১	৪. কালাহান্ডি	১	৫,১৩,৭১৬
৩. কেওনঝড়	১	৫. কেওনগড়	১	৪,৬০,৬০৯
ঢেঙ্কানল		৬. গাংপুর	১	৩,৫৬,৬৭৪
নয়াগড়	১	৭. বাস্তার	১	৫,২৪,৭২১
তালচের		৮. সুরগুজা	১	৫,০১,৯৩৯

[আগের পৃষ্ঠার পর]

পরিশিষ্ট - XVII

রাজ্য এবং রাজ্যগুলির সমষ্টি	রাজ্য পরিষদে আসন সংখ্যা	রাজ্য এবং রাজ্যগুলির সমষ্টি	যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদ	জনসংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
বিভাগ - XVI		**বিভাগ - XVI**		
৪. গাংপুর	১	৯. ঢেঙ্কানল		২,৮৪,৩২৩
বামুরা		নয়াগড়		১,৪২,৪০৬
সিরেইকেলা		সরাইকেলা	৩	১,৪৩,৫২৫
বাউদ		বাউদ		১,৩৫,২৪৮
বোনই		তালচের		৬৯,৭০২
৫. বাস্তার		১০. বোনই		৮০,১৮৬
সুরগুজা	১	নীলগিরি		৬৮,৫৯৪
রায়গড়		বামরা		১,৫১,০৪৭
নন্দগাঁও				
৬. কাহিরগড়		১১. রায়গড়		২,২৭,৫৬৯
জাসপুর		কাঁহিরগড়		১,৫৭,৪০০
কঙ্কের	১	জাসপুর	৩	১,৯৩,৬৯৮
কোরেয়া		কাঙ্কের		১,৩৬,১০১
সরনগড়		সরনগড়		১,২৮,৯৬৭
		কোরেয়া		৯০,৮৮৬
		নন্দগাঁও		১,৮২,৩৮০
বিভাগ - XVII		**বিভাগ - XVII**		
যেসব রাজ্য পূর্ববর্তী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি অথচ এই তালিকার১২ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে।	২	যেসব রাজ্য পূর্ববর্তী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি অথচ এই তালিকার ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখরয়েছে।	৫	৩০,৪৭,১২৯
		এই সারণির মোট জনসংখ্যা		৭৮,৯৯৬,৮৪৪

পরিশিষ্ট-XVIII

মহামান্য সম্রাটের সরকার কর্তৃক সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা—১৯৩২*

গত ১ ডিসেম্বর, 'গোল-টেবিল বৈঠকে'র দ্বিতীয় অধিবেশনের শেষে মহামান্য সম্রাটের সরকারের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, আইনসভার উভয় কক্ষদ্বারা অনতিবিলম্বেই তা সমর্থিত হয়েছিল। বিবৃতিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল যে, 'গোল-টেবিল বৈঠকে' সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ও সমস্ত রাজনৈতিক দলের গ্রহণযোগ্য ঐক্যমতে পৌঁছতে অক্ষম হলেও, মহামান্য সম্রাটের সরকার এই কারণে ভারতের সাংবিধানিক অগ্রগতি স্তব্ধ হতে না দিতে বদ্ধপরিকর। নতুন পদ্ধতি খুঁজে বের করে এবং সাময়িকভাবে সেই সব পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমস্ত বাধা দূর করা হবে।

২) গত ১৯ মার্চ মহামান্য সম্রাটের সরকারকে জানানো হল যে, বিভিন্ন সম্প্রদায় ঐক্যমতে পৌঁছতে লাগাতার ব্যর্থতা নতুন সংবিধান তৈরির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, উত্থাপিত সমস্ত জটিল এবং বিতর্কিত প্রশ্নগুলি তারা যত্নসহকারে খুঁটিয়ে দেখছেন। বর্তমানে তাঁরা নিঃসন্দেহ যে, নতুন সংবিধানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থানগত ন্যূন্যতম কিছু বিষয় এবং সমস্যা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত না নিলে, নতুন সংবিধান তৈরির কাজ আর বিশেষ অগ্রসর হবে না।

৩) মহামান্য সম্রাটের সরকার তদানুসারে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, ভারতীয় সংবিধান সম্বন্ধে যথা সময়ে আইন সভায় যে প্রস্তাব পেশ করা হবে তার মধ্যে পরবর্তী পরিকল্পনাটি কার্যকর করার ব্যবস্থা রাখা হবে। এই প্রকল্পের পরিধি ইচ্ছাকৃত ভাবেই বৃটিশ ভারতীয়দের প্রাদেশিক আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব স্থির করার বিষয় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়টা বিলম্বিত করা হয়েছে। বিলম্বিত করার কারণ পরে কুড়ি নম্বর অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। প্রকল্পটির পরিধি সীমিত করার অর্থ এই নয় যে, সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে না পারা। প্রকল্পটির সীমিত রাখা হয়েছে এই আয় যে, প্রতিনিধিত্বের অনুপাতের মত একটা মৌলিক প্রশ্নের একটা সমাধান হয়ে গেলে সম্প্রদায়গুলি নিজেরাই অন্য সব সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলি

*পার্লামেন্টারি পেপার (কম্যান্ড 4147), ১৯৩২। সরকারিভাবে বলা হয়েছিল 'সাম্প্রদায়িক বিনির্ণয়'।

সমাধানের পথ খুঁজে পাবে, যে সমস্ত সমস্যাগুলি নিয়ে এখনও বিচার বিবেচনা হয়নি, অথচ হওয়া উচিত ছিল।

৪) মহামান্য রাজার সম্রাটের নিজের অবস্থানের কথা স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক। তাঁরা নিজের গৃহীত কোনও সিদ্ধান্ত সংশোধন করার আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন না এবং এমন কোনও আর্জিকে প্রশ্রয় দেবেন না, যা সমস্ত দল-গুলি দ্বারা সমর্থিত নয়। তবে তাঁরা কোনও স্বতস্ফূর্তভাবে স্বীকৃত আসন্ন মীমাংসার দরজা বন্ধ রাখতে কোনও মতেই আগ্রহী নন। সুতরাং 'ভারত শাসন আইন' রূপান্তরিত হওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলি যদি নিজেদের মধ্যে ঐক্যমতের ভিত্তিতে কোনও বাস্তব-সম্মত বিকল্প পরিকল্প তৈরি করতে সমর্থ হয়, তা যদি ছোটলাট শাসিত এক বা একাধিক প্রদেশ অথবা সমগ্র ব্রিটিশ ভারত সম্বন্ধেও হয়, তাঁরা সেই নতুন বিকল্প প্রকল্পটিকে আইন সভায় পেশ করার জন্য এবং সেটির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা খুঁটিয়ে দেখার জন্য সুপারিশ করবেন।

৫) ছোটলাট শাসিত প্রদেশগুলিতে বিধান পরিষদগুলির আসন অথবা "উচ্চকক্ষ" থাকলে নিম্নকক্ষের আসনগুলিও সংযোজিত সারণি অনুযায়ী বন্টন করা হবে।*

৬) মুসলমান, ইউরোপীয় এবং শিখ সম্প্রদায়ের জন্য বণ্টিত নির্বাচন ক্ষেত্রগুলিতে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন সম্প্রদায়ভিত্তিক নথিভুক্ত ভোটারদের ভোটে। ভোট-ক্ষেত্রগুলি সমস্ত রাজ্য জুড়ে বিস্তৃত হতে পারে (যে সমস্ত এলাকা 'অনগ্রসর' এই বিশেষ কারণে নির্বাচকমণ্ডলী থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, সেই সমস্ত এলাকা ব্যতীত)।

সংবিধানের মধ্যেই এই নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ক্ষমতা থাকবে (এবং পরে বর্ণিত অন্যান্য অনুরূপ বিষয়গুলিও)। দশ বছর পরে সংশ্লিষ্ট সমস্ত সম্প্রদায়ের সম্প্রতি ক্রমে একটি মানানসই কৌশল নির্ধারণ করা হবে।

৭) সমস্ত যোগ্য ভোটাধিকারী যারা মুসলমান, শিখ, ভারতীয় খ্রিষ্টান নিচের ১০ নম্বর অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), ইন্দ-ভারতীয় (নিচের ১১ নম্বর অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), অথবা ইউরোপীয় নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার নন, তারা সাধারণ নির্বাচন ক্ষেত্রে, ভোট-দানের অধিকারী।

৮) বোম্বাই-এর মিশ্র ভোটক্ষেত্রগুলির মধ্যে সাতটি আসন মারাঠিদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

৯) 'অনগ্রসর সম্প্রদায়ের' নাগরিকদের মধ্যে যারা ভোটদানের অধিকারী, যারা সাধারণ নির্বাচন ক্ষেত্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে। ঘটনাক্রমে যদি দেখা যায় যে,

*অধ্যায় 4147 দ্রষ্টব্য।

যথেষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তারা আইনসভায় পর্যাপ্ত সংখ্যায়—প্রতিনিধি প্রেরণে সক্ষম হবে পারছে না, সারণি অনুযায়ী কয়েকটি বিশেষ আসন তাদের অর্পন করা হবে। ঐ আসনগুলি বিশেষ নির্বাচন ক্ষেত্রগুলি থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণ করা হবে, যেখানে শুধু মাত্র নির্বাচক তালিকাভুক্ত অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষেরই ভোটদানের অধিকারী থাকবে। কোনও ব্যক্তি উপরে বর্ণিত বিশেষ নির্বাচনক্ষেত্রের ভোটার হলেও সে সাধারণ ভোটক্ষেত্রে ভোটদানের অধিকার মারাবে না। যে সমস্ত জায়গায় অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা অধিক, সেই সমস্ত জায়গাতেই বিশেষ নির্বাচন ক্ষেত্রেগুলি গঠিত হতে পারে—ব্যতিক্রম মাদ্রাজ, সেখানে পুরো প্রদেশ জুড়ে ঐ ক্ষেত্রেগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হবে না।

বাংলার কিছু কিছু সাধারণ নির্বাচনক্ষেত্রে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ভোটাররা সংখ্যাগুরু থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই অনুসারে, আরও বিষদ অনুসন্ধানের কাজ মুলতবি থাকায় এই প্রদেশে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির সংখ্যা এখনও স্থির করা হয় নি। বাংলা প্রদেশের বিধানসভায় নূন্যপক্ষে দশ জন অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিন্ত করাই হল সরকারের অভিপ্রেত।

অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কারা (যদি ভোটদানের উপযুক্ত হন) ভোটদানের অধিকারী হবে সেই সম্বন্ধে কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা এখন পর্যন্ত নির্ধারিত হয় নি। ভোটাধিকার সমিতির (Franchise Committee) প্রতিবেদনে উল্লেখিত সাধারণ নীতিসমূহের ওপর ভিত্তি করেই এটা করা হবে। উত্তর ভারতের কতগুলি রাজ্যে যেখানে অস্পৃশ্যতা একটি সাধারণ বিষয়, সেই সব রাজ্যের বিশেষ অবস্থানগত কারণে সংজ্ঞাটা অনুপযুক্ত হতে পারে বলে এঁর পরিবর্তন, পরিবর্ধন প্রয়োজন হতে পারে।

একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর ঐ বিশেষ ভোটক্ষেত্রগুলির আর প্রয়োজন আছে বলে মহামান্য সম্রাটের সরকার মনে করে না। তারা মনে করে যে, কুড়ি বৎসর পরে এর সমাপ্তি ঘটাতে সংবিধানে উল্লেখ থাকবে, যদি না আগে-ভাগেই ছয় নম্বর অনুচ্ছেদের সূত্রানুসারে নির্বাচকমন্ডলীর তালিকা পূনর্বিবেচনা করার সময় বিশেষ অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ভোট-ক্ষেত্রেগুলির অবলুপ্তি ঘটে।

১০) ভারতীয় খ্রিস্টানদের জন্য বন্টিত আসনগুলির নির্বাচন আলাদা সাম্প্রদায়িক ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত ভোটারদের ভোটে সম্পন্ন হবে। এটা প্রায় অবশ্যম্ভাবি যে, মাদ্রাজে কিছু বাস্তব সমস্যা দেখা দেবে। সেখানে পুরো রাজ্য জুড়ে ভারতীয় খ্রিস্টান ভোট-ক্ষেত্র তৈরিতে বাধা আসবে, এবং সেই অনুসারে প্রদেশের কোনও

একটি বা দুটি নির্বাচিত এলাকায় বিশেষ ভারতীয় খ্রিস্টান ভোট ক্ষেত্রে তৈরি করতে হবে। ঐ সকল এলাকার ভারতীয় খ্রিস্টানরা সাধারণ ভোটক্ষেত্রে ভোট দেবে না। ঐ এলাকার বাইরের ভারতীয় খ্রিস্টানরা সাধারণ নির্বাচন ক্ষেত্রে ভোট দেবে। বিহার এবং ওড়িশায়, যেখানে বিরাট সংখ্যক ভারতীয় খ্রিস্টান আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত, সেখানে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন হতে পারে।

১১) ইঙ্গ-ভারতীয়দের জন্য বণ্টিত আসনগুলির নির্বাচন আলাদা সাম্প্রদায়িক ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত ভোটারদের ভোট সম্পন্ন হবে। বর্তমান অভিপ্রায় হল প্রত্যেকটি বাস্তব প্রতিবন্ধকতার অনুসন্ধান সাপেক্ষ প্রত্যেক প্রদেশে ইঙ্গ-ভারতীয় ভোট ক্ষেত্রগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হবে, ডাক-যোগে ভোটদানের ব্যবস্থাও চালু হবে, যদিও এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় নি।

১২) অনগ্রসর এলাকার প্রতিনিধিদের যে আসনগুলি অর্পন করা হয়েছে, সেইগুলি পূর্ণ করার নিয়মাবলী এখনও তদন্তাধীন। ঐ সমস্ত এলাকার সাংবিধানিক বিন্যাস সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মূলতবি থাকায় অর্পিত আসন সংখ্যা সাময়িক বলে গণ্য হবে।

১৩) মহামান্য সম্রাটের সরকার নতুন বিধান সভাগুলিতে অল্পসংখ্যক হলেও কিছু মহিলা সদস্যের আসন নিশ্চিন্ত করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে চায়। তারা মনে করে যে, মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন বিশেষভাবে বণ্টন করা না হলে এই উদ্দেশ্য সফল হবে না। তারা আরও অনুভব করে যে, অসামঞ্জস্যভাবে একটা মাত্র সম্প্রদায় থেকে মহিলা সদস্য নেওয়া হবে না। ঝুঁকি এড়াতে কোনও সূত্র বের করতে তারা ব্যর্থ তবে মহিলাদের বিশেষ আসনগুলি এক-ই সম্প্রদায়ের ভোটারদের নির্বাচন এলাকায় সীমাবদ্ধ রাখার বিষয়টি ছাড়া প্রকল্পের বাকি অংশ—মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তারা দৃঢ় মনোভাব পোষণ করেন। মহিলাদের বিশেষ আসনগুলি সেই অনুসারে কেবল এক সম্প্রদায়ের মহিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে ভাল করে দেওয়া হয়েছে, সারণি দ্রষ্টব্য। ঐ সমস্ত বিশেষ নির্বাচনক্ষেত্রগুলিকে নির্বাচক সংক্রান্ত নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি এখনও বিবেচনাধীন।

১৪) 'মজুর'দের যে আসনগুলি বন্টন করা হয়েছে সেইগুলি অসাম্প্রদায়িক ভোট-ক্ষেত্র থেকে পূর্ণ করা হবে। ঐ সমস্ত নির্বাচন ক্ষেত্রেগুলির নির্বাচন ব্যবস্থা এখনও নির্ধারিত হয়নি। কিন্তু 'ভোটাধিকার সমিতি'র সুপারিশ অনুযায়ী মজদুর নির্বাচন ক্ষেত্রগুলি সম্ভবত আংশিকভাবে ট্রেড ইউনিয়ন এবং আংশিকভাবে বিশেষ নির্বাচন ক্ষেত্র নিয়ে গঠিত হবে।

---

*পরিশিষ্ট XVI দ্রষ্টব্য।

১৫) 'শিল্প এবং বানিজ্য', 'খনি এবং আবাদ-কারী'দের মধ্যে যে সমস্ত বিশেষ আসন বণ্টিত হয়েছে, সেইগুলি বিভিন্ন বণিক সভা এবং বিভিন্ন সংঘ দ্বারা পূর্ণ হবে। নির্বাচন ব্যবস্থার বিস্তারিত বিষয়গুলির স্থিরকরণ আরও তদন্ত সাপেক্ষ।

১৬) 'জমিদার'দের জন্য বণ্টিত বিশেষ আসনগুলি জমিদারদের বিশেষ নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচকদের ভোট দ্বারা পূর্ণ করা হবে।

১৭) বিশ্ববিদ্যালয়ের আসনগুলির নির্বাচন পদ্ধতি কি হবে, তা একনও বিবেচনাধীন।

১৮) মহামান্য সম্রাটের সরকার মনে করেন, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে প্রাদেশিক বিধান সভাগুলিতে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নগুলির মীমাংসা অসম্ভব। তারপরেও বাকি থাকল নির্বাচন-ক্ষেত্রগুলির সীমা নির্ধারণ। যত শীঘ্র সম্ভব ভারতবর্ষে এই কর্মভারটি হাতে নেওয়া উচিত, এটাই তাঁদের অভিপ্রায়।

যত সংখ্যক আসন রয়েছে, তার মধ্যে কিছু সংখ্যক আসনের হের-ফের ঘটিয়ে কোনও নির্বাচন ক্ষেত্রের সীমা নির্ধারণের মৌলিক উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। মহামান্য সম্রাটের সরকার সামান্য পরিবর্তনের ক্ষমতা নিজের কাছে গচ্ছিত রাখছেন, যদি না এই পরিবর্তনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভারসাম্যের মূলে আঘাত না করে। যাই হোক না কেন, বাংলা এবং পঞ্জাবে এমন কোনও পরিবর্তন করা হবে না।

১৯) সংবিধান বিষয়ে আলোচনা সময় প্রদেশগুলিতে 'দ্বিতীয় কক্ষ' গঠনের প্রশ্নে তুলনামূলকভাবে খুব-ই কম জোর দেওয়া হয়েছে। কোনও কোনও প্রদেশে 'দ্বিতীয় কক্ষ' গঠিত হবে এবং তাদের গঠন প্রণালী ঠিক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে এই বিষয়ে আরও বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন রয়েছে।

মহামান্য সম্রাটের সরকার মনে করে যে প্রদেশগুলিতে দ্বিতীয় কক্ষ'-এর গঠন এমনভাবে করা হবে যাতে নিম্নকক্ষের সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অবস্থানের কোনও অসুবিধা না হয়।

২০) মহামান্য সম্রাটের সরকার এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় আইনসভার আচার এবং গঠনের প্রশ্নে যেতে চান না, যেহেতু অন্যান্য প্রশ্নের সঙ্গে দেশীয় রাজাদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটাও জড়িয়ে আছে যা এখনও আরও বিষদভাবে আলোচিত হওয়া দরকার। গঠন প্রণালী নিয়ে যখন বিচার বিবেচনা হবে, তখন অবশ্যই তাঁরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্বের দাবিগুলির প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করবেন।

২১) মহামান্য সম্রাটের সরকার ইতিমধ্যেই নীতিগতভাবে এটা গ্রহণ করেছেন যে, যদি অর্থসংস্থানের কোনও সন্তোষজনক উপায় দেখা যায়, তাহলে সিন্ধুকে একটি আলাদা প্রদেশ হিসাবে গঠন করা যেতে পারে। যেহেতু এর সঙ্গে অর্থনৈতিক

সমস্যা জড়িত, তবুও যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থ-ব্যবস্থার অন্যান্য সমস্যাগুলির সঙ্গে এর পুনর্বিবেচনাও করতে হবে। মহামান্য সরকার মনে করে, বর্তমান পর্যায়ে অগ্রাধিকার অনুযায়ী মূল বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এবং সিন্ধুর জন্য অতিরিক্ত আলাদা আইনসভা গঠনের পরিকল্পনাটি বর্তমানে বোম্বাই প্রদেশের আইনসভার অন্তর্ভুক্ত করাই উচিত।

২২) বিহার এবং ওড়িশাকে যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে সেগুলি বর্তমান রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ওড়িশাকে একটি পূর্ণ প্রদেশ রূপে গঠনের প্রশ্নটি এখনও বিচারাধীন।

২৩) বেরারকে মধপ্রদেশের বিধানসভার সংখ্যাসম্বলিত সারণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও এটা মনে করার কোনও অবকাশ নেই যে, বেরারের ভবিষ্যৎ সাংবিধানিক অবস্থান নির্ধারিত হয়ে গেছে।

লন্ডন

৪ অগাস্ট, ১৯৩২

পরিশিষ্ট XVIII চলছে

প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলে আসনসংখ্যা বন্টন (কেবল বিধানসভা)

প্রদেশ	সাধারণ	অন্ত্যজ শ্রেণী সম্প্রদায়	অবদমিত শ্রেণীর প্রতিনিধিবৃন্দ	শিখ	মুসলমান	ভারতীয় খ্রিস্টান	ইঙ্গ-ভারতীয়	ইউরোপীয়	বাণিজ্য শিল্প, খনি এবং চায-আবাদের বিশেষ ক্ষেত্র (ক)	জমি মালিকের বিশেষ ক্ষেত্র	বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ ক্ষেত্র	মজদুর বিশেষ ক্ষেত্র	মোট
মাদ্রাজ	১৩৪ (৬জন মহিলা সমেত)	১৮	১	০	২০ (১ জন মহিলা সহ)	৯ (১ জন মহিলা সহ	২	৩	৬	৬	১	৬	২১৫
বোম্বাই (সিন্ধু সমেত)	৯৭ (খ) ৫ জন মহিলা সমেত	১০	১	০	৬৩ (১ জন মহিলা সহ)	৩	২	৪	৮	৩	১	৮	২০০
বাংলা	৮০ (গ) ২জন মহিলা সমেত	(গ)	০	০	১১৯ (২ জন মহিলা সহ)	২	৪ (১ জন মহিলা সহ)	১১	১৯	৫	২	৮	২৫০

[পরের পৃষ্ঠায়]

[আগের পৃষ্ঠা থেকে]

প্রদেশ	সাধারণ	অন্ত্যজ শ্রেণী সম্প্রদায়	অবদমিত শ্রেণীর প্রতিনিধিবৃন্দ	শিখ	মুসলমান	ভারতীয় খ্রিস্টান	ইঙ্গ-ভারতীয়	ইউরোপীয়	বাণিজ্য শিল্প, খনি এবং চাষ-আবাদের বিশেষ ক্ষেত্র (ক)	জমি মালিকের বিশেষ ক্ষেত্র	বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ ক্ষেত্র	মজদুর বিশেষ ক্ষেত্র	মোট
যুক্তপ্রদেশ	১৩২ (৪জন মহিলা সমেত)	১২	০	০	৬৬ (২ জন মহিলা সহ)	২	১	২	৩	৫	১	৩	২২৮
পঞ্জাব	৪৩ (১ জন মহিলা সমেত)	০	০	৩২ (১ জন মহিলা সমেত)	৮৬ (২ জন মহিলা সহ)	২	১	১	১	৫ (ঘ)	১	৩	১৭৫
বিহার এবং ওড়িশা	৯৯ (৩জন মহিলা সমেত)	৭	০	০	৪২ (১ জন মহিলা সহ)	২	১	২	৪	৪	১	৪	১৭৫
মধ্যপ্রদেশ (বেরার সমেত)	৭৭ (৩জন মহিলা সমেত)	১০	১	০	১৪	০	১	১	২	৮	১	২	১১২
অসম	৯৯ (৩ জন মহিলা সমেত)	৪	-	০	৩৪	১	০	১	১১	-	০	৪	১০৮
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৯	০	০	৩	৩৬	০	০	০	০	২	০	০	৫০
বোম্বাই (সিন্ধু ব্যতীত)	১০৯ (খ) ৫ জন মহিলা সমেত)	১০	১০	০	৩০ (১ জন মহিলা সহ)	৩	৩	২	৭	২	১	৭	১৭৫
সিন্ধু	১৯ (১ জন মহিলা সহ	০	০	০	৩৪ (১ জন মহিলা সহ)	০	০	২	২	২	০	১	৬০

ক) এই সমস্ত ক্ষেত্রে যে নির্বাচন হবে তার পরিচালক সমিতি সম্পাদন করবে, তা সঠিকভাবে ইউরোপীয় বা ভারতীয় বলতে সক্ষম হবে না। প্রদেশের সঠিকভাবে তাই ইউরোপীয় বা ভারতীয়দের মধ্যে। কয়জন নির্বাচিত হবেন, বলা অসম্ভব। তবে প্রাথমিকভাবে আশা করা যায়, সংখ্যা হবে ; মাদ্রাজে ৪ ইউরোপীয়, ২ ভারতীয় ; সিন্ধু সহ বোম্বাইতে ৫ ইউরোপীয়, ৩ ভারতীয় ছ বাংলায় ১৪ ইউরোপীয়, ৫ ভারতীয় ; যুক্তপ্রদেশে ২ ইউরোপীয় ১ ভারতীয় ; সিন্ধু ব্যতীত বোম্বাইতে ৪ ইউরোপীয়, ৩ ভারতীয় ; সিন্ধুতে ইউরোপীয় ১ ভারতীয়।

খ) ৭টি মারাঠাদের জন্য সংরক্ষিত হবে।

গ) ৯ নং অনুচ্ছেদে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তদনুসারে বাংলার বিশেষ অবদমিতদের জন্য আসন ১০টির বেশি হবে কিনা—তা এখনও স্থির হয়নি। সাধারণ আসন হবে ৮০টি-এর থেকে অবদমিত শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত আসন বাদ যাবে।

ঘ) ১টি আসন সংরক্ষিত হবে তুমানদারদের জন্য। ৪টি আসন যাবে জমি-মালিকদের জন্য যা যুগ্ম নির্বাচকমণ্ডলী থেকে বিশেষ নির্বাচনক্ষেত্র থেকে পূরণ করা হবে। হয়তো এতে দেখা যাবে নির্বাচিতদের মধ্যে ১ জন হিন্দু, ১ জন শিখ ও ২ জন মুসলমান থাকতে পারে।

ঙ) শিলংয়ে মহিলাদের আসন পূরণ করা হবে সাধারণ আসন থেকে।

পরিশিষ্ট-XIX

অনুপূরক সাম্প্রদায়িক বিনির্ণয়*

"পরের প্রশ্নটি ছিল সম্প্রদায়গুলির কেন্দ্রে প্রতিনিধিত্ব ; বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের। ঐ বিষয়ে আমি মনে করি, যথাযথভাবেই বলতে পারি, আগে বহুবার পরোক্ষভাবে সরকারকে বিবেচনা করতে বলেছি যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় কেন্দ্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের ৩৩১/৩ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত। বিষয়টি যখন ভারত সম্পর্কিত, যতদূর সম্ভব ভারতীয়দের-ই এগিয়ে আসতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সম্প্রদায় ও রাজন্যবর্গের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। যতদূর সম্ভব, এই প্রশ্নে ইংরেজ সরকারের কিছু করণীয় নেই। তবে তাঁরা বিভিন্ন দলের মধ্যে আপস-আলোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ আসন বণ্টনের পথ সহজ করে তুলতে সমস্তরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন।"

*মহামান্য সরকারের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়াড়া (পরিশিষ্ট XVIII) কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের ৩৩১/৩ শতাংশ প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত জানান নি। মহামান্য সরকারের দাবির এই সিদ্ধান্তটি ভারত-সচিব ২৪ ডিসেম্বর ১৯৩২ সালে তৃতীয়, গোল টেবল বৈঠক'-এ বিবৃতি দানের সময় ঘোষণা করেছিলেন।

পরিশিষ্ট-XX

পুনা চুক্তি*

১. প্রাদেশিক বিনানসভাগুলিতে সাধারণ নির্বাচকমন্ডলীর আসনের বাইরের অন্ত্যজ শ্রেণীর জন্য আসন সংরক্ষণ নিমোক্তভাবেই অনুসৃত হওয়া উচিত।

মাদ্রাজ ৩০; সিন্ধুসহ বোম্বাই ১৫; পঞ্জাব ৮; বিহার ও ওড়িশা ১৮; মধ্যপ্রদেশ ২০; অসম ৭; বাংলা ৩০; যুক্তপ্রদেশ ২০। মোট = ১৪৮

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই অঙ্ক প্রাদেশিক পরিষদের মোট শক্তির ওপর নির্ভরশীল।

২. যাইহোক, নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই যুগ্ম-নির্বাচকমন্ডলীর নিয়ন্ত্রণাধীনেই নির্বাচন হওয়া উচিত।

একটি নির্বাচন ক্ষেত্রের সাধারণ নির্বাচন তালিকায় অন্ত্যজ শ্রেণীর সমস্ত নিবন্ধিত সদস্যরাই একটি নির্বাচকমন্ডল তৈরি করতে পারে এবং এই নির্বাচকমন্ডল একক ভোটের প্রক্রিয়ার দ্বারা এ-ধরনের প্রতিটি সংরক্ষিত আসনের জন্য অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত চার প্রার্থীর একটি নামসূচি (প্যানেল) নির্বাচিত করতে পারে। এ ধরনের প্রাথমিক নির্বাচনে চার প্রার্থী পাচ্ছে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট এবং এদের-ই সাধারণ নির্বাচকমন্ডলী দ্বারা নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হওয়া উচিত।

৩. কেন্দ্রীয় আইনসভায় অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব অনুরূপভাবে যুগ্ম-নির্বাচকমন্ডলীর নীতির ওপর-ই হওয়া উচিত এবং সংরক্ষিত আসন প্রাদেশিক বিধানসভায় তাদের প্রতিনিধিত্বের জন্য ওপরের ২ নং প্রকরণের (Clause) জন্য প্রাথমিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তৈরি হবে।

৪. কেন্দ্রীয় আইনসভায় ব্রিটিশ-ভারতের সাধারণ নির্বাচকমন্ডলীর শতকরা ১৮ শতাংশ আসন ওই আইনসভায় অন্ত্যজ শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত থাকা উচিত।

৫. নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে প্রার্থীদের নামসূচিতে (Panel) প্রাথমিক নির্বাচনের পদ্ধতি, যা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে, তা প্রথম দশ বছর পরে শেষ হওয়া উচিত, যদি না পরবর্তী ৬নং প্রকরণের

---

*২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ সালে স্বাক্ষরিত হয়।

(Clause) ব্যবস্থা মতো দ্রুত পারস্পরিক চুক্তিদ্বারা অবসান ঘটানো যায়।

৬. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে প্রকরণ-১ (Clause 1) ও প্রকরণ-৪ (Clause -4)-এর বিধান মতো সংরক্ষিত আসনের দ্বারা অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের নিয়ম চালিয়ে যাওয়া উচিত, যতক্ষণ পর্যন্ত না পারস্পরিক চুক্তি দ্বারা সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের নিষ্পত্তির মীমাংসা হয়।

৭. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে অন্ত্যজ শ্রেণীর জন্য নাগরিকাধিকার 'লোথিয়ান কমিটি'র প্রতিবেদনে (Report) নির্দেশ অনুযায়ী হবে।

৮. অন্ত্যজ শ্রেণীর সদস্য হিসেবে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের (Local Bodies) যে কোনও নির্বাচনে ও জন-কৃত্যকগুলিতে (Public Service) নিয়োগের ব্যাপারে কর্মক্ষেত্রে সংযুক্ত কারও সম্পর্কেই কোনও অযোগ্যতা দেখানো উচিত নয়। জন-কৃত্যকগুলিতে নিয়োগের ব্যাপারে শিক্ষাগত যোগ্যতা যা এখানে নির্দিষ্ট আছে, সেই ব্যাপারে প্রত্যেক প্রচেষ্টার-ই অন্ত্যজ শ্রেণীগুলির পক্ষপাতহীন প্রতিনিধিত্ব অর্জন করা উচিত।

৯. প্রতি প্রদেশে শিক্ষাখাতে অনুদানের বাইরেও পর্যাপ্ত টাকা অন্ত্যজ শ্রেণীগুলির সদস্যদের শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থার জন্য আলাদা করে রাখা উচিত।

পরিশিষ্ট XXI

প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলে ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ সালের সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বের তুলনামূলক বিবৃতি

১. নিম্নকক্ষ

প্রদেশ	মোট আসন	মুসলমান			তফসিলি সম্প্রদায়			ভারতীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়			শিখ সম্প্রদায়		
		আইন অনুসারে আসন বণ্টন	জনসংখ্যা অনুযায়ী আসন প্রাপ্য	অতিরিক্ত + অথবা ঘাটতি	আইন অনুসারে আসন বণ্টন	জনসংখ্যা অনুযায়ী আসন প্রাপ্য	অতিরিক্ত + অথবা ঘাটতি	আইন অনুসারে আসন বণ্টন	জনসংখ্যা অনুযায়ী আসন নির্দিষ্ট	অতিরিক্ত + অথবা ঘাটতি	আইন অনুসারে আসন বণ্টন	জনসংখ্যা অনুযায়ী আসন প্রাপ্য	অতিরিক্ত + অথবা ঘাটতি
মাদ্রাজ	২১৫	২৯	১৭	+ ১২	৩০	৩৫	– ৫	৯	৯	—	নেই	নেই	—
বোম্বাই	১৭৫	৩০	১৬	+ ১৪	১৫	১৬	– ১	৩	৩	—	নেই	নেই	—
বাংলা	২৫০	১১৯	১৩৭	+ ১৮	৩০	৩৩	– ৩	৩	নেই	+ ৩	নেই	নেই	—
যুক্তপ্রদেশ	২২৮	৬৬	৩৫	+ ৩১	২০	৪৯	– ২৯	২	নেই	+ ২	নেই	১	– ১
পঞ্জাব	১৭৫	৮৬	১০০	+ ১৪	৮	৮	–	২	৩	– ১	৩২	২৩	+ ৯
বিহার	১৫২	৪০	২০	+ ২০	১৫	২০	– ৫	১	নেই	+ ১	নেই	নেই	–
মধ্যপ্রদেশ (বেরার সমেত)	১১২	১৪	৫	+ ৯	২০	২০	–	নেই	নেই	–	নেই	নেই	–
অসম	১০৮	৩৪	৩৬	– ২	৭	৭	–	১	নেই	+ ১	নেই	নেই	–
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৫০	৩৬	৪৬	– ১০	নেই	–	–	নেই	নেই	–	৩	১	+ ২
ওড়িশা	৬০	৪	১	+ ৩	৬	৯	– ৩	১	নেই	+ ১	নেই	নেই	–
সিন্ধু	৬০	৩৪	৪৩	– ৯	নেই	৩	– ৩	নেই	নেই	–	নেই	নেই	–
মোট	১৫৮৫	৪৯২	৪৫৬	+ ৩৬	১৫১	২০০	– ৪৯	২২	১৫	– ৭	৩৫	২৫	+ ১০

পরিশিষ্ট XXI

২. উচ্চকক্ষ

প্রদেশ	মোট আসন	মুসলমান			তফসিলি সম্প্রদায়			ভারতীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়			শিখ সম্প্রদায়		
		আইন অনুসারে আসন বণ্টন	জনসংখ্যা অনুযায়ী আসন প্রাপ্য	অতিরিক্ত + অথবা ঘাটতি	আইন অনুসারে আসন বণ্টন	জনসংখ্যা অনুযায়ী আসন প্রাপ্য	অতিরিক্ত + অথবা ঘাটতি	আইন অনুসারে আসন বণ্টন	জনসংখ্যা অনুযায়ী আসন প্রাপ্য	অতিরিক্ত + অথবা ঘাটতি	আইন অনুসারে আসন বণ্টন	জনসংখ্যা অনুযায়ী আসন প্রাপ্য	অতিরিক্ত + অথবা ঘাটতি
মাদ্রাজ	৫৬	৭	৪	+৩	নেই	৯	–৯	৩	২	+১	নেই	নেই	—
বোম্বাই	৩০	৫	৩	+২	নেই	৩	–৩	নেই	নেই	—	নেই	নেই	—
বাংলা	৬৫	১৭	৩৬	–১৯	নেই	৮	–৮	নেই	নেই	—	নেই	নেই	—
যুক্তপ্রদেশ	৬০	১৭	৯	+৮	নেই	১৩	–১৩	নেই	নেই	—	নেই	নেই	—
বিহার	৩০	৪	৪	—	নেই	৪	–৪	নেই	নেই	—	নেই	নেই	—
অসম	২২	১০	৭	+৩	নেই	১	–১	নেই	নেই	—	নেই	নেই	—
মোট	২৬৩	৬০	৬৩	–৩	নেই	৩৮	–৩৮	৩	২	+১	নেই	নেই	—

পরিশিষ্ট XXII

কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বের তুলনামূলক বিবৃতি

	ব্রিটিশ ভারতে মোট আসন	মুসলমান			তফসিলভুক্ত সম্প্রদায়			ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়			শিখ সম্প্রদায়		
		আইন অনুসারে আসন বণ্টন	জনসংখ্যা অনুযায়ী আসন প্রাপ্য	অতিরিক্ত + অথবা ঘাটতি	আইন অনুসারে আসন বণ্টন	জনসংখ্যা অনুযায়ী আসন প্রাপ্য	অতিরিক্ত + অথবা ঘাটতি	আইন অনুসারে আসন বণ্টন	জনসংখ্যা অনুযায়ী আসন প্রাপ্য	অতিরিক্ত + অথবা ঘাটতি	আইন অনুসারে আসন বণ্টন	জনসংখ্যা অনুযায়ী আসন প্রাপ্য	অতিরিক্ত + অথবা ঘাটতি
১. নিম্ন কক্ষ	২৫০	৮২	৬৭	+১৫	১৯	৩৫	–১৬	৮	৩	+৫	৬	৩	+৩
২. উচ্চ কক্ষ	১৫০	৪৯	৪০	+৯	৬	২১	–১৫	নেই	২	–২	৪	২	+২

পরিশিষ্ট XXIII

জন-কৃত্যকে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ভারত সরকারের প্রস্তাব* সংস্থা সমূহ (Establishments)

৪ জুলাই, ১৯৩৪

অনুবিভাগ I : সাধারণ

নং এফ. ১৪/১৭-বি/৩৩—বিধানসভায় দেয় অঙ্গীকার অনুসারে ভারত সরকার খুব সাবধানতার সঙ্গে ১৯২৫ সাল থেকে জন-কৃত্যকে সরাসরি নিযুক্তির ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক অসাম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে কিছু শতাংশ সংরক্ষণ সম্বন্ধে পর্যালোচনা করেছেন। অভিযোগ করা হয়েছে যে, যদিও মুসলমানদের জন-কৃত্যকে প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে এই কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তবু বাস্তবে মুসলমানরা তাদের যথোচিত নিযুক্তি পায়নি এবং এই অবস্থার পরিবর্তন হবে না, যদি না মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট শতাংশ চাকরিতে সংরক্ষিত হয়। রেল-কৃত্যকে কম সংখ্যক মুসলমানের নিয়োগ বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এমনকী মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে যে সব রেল পরিষেবা রয়েছে, সেখানেও।

পর্যালোচনায় এই অভিযোগ সমূহ যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে। জন-কৃত্যকে মুসলমান প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধানে ভারত সরকার সন্তুষ্ট।

২. এই সাধারণ প্রশ্নটি বিবেচনা করে ভারত সরকার ইঙ্গ-ভারতীয়, স্থায়ীভাবে নিবাসিত ইউরোপীয় এবং দলিত শ্রেণীর সংরক্ষণ বিষয়টিও ধর্তব্যের মধ্যে এনছেন। জন-কৃত্যকের কিছু শাখায় ইঙ্গ-ভারতীয়রা সর্বদাই বেশি নিযুক্তি পেয়েছেন এবং এটাও স্বীকার করা হয়েছে যে, এই পরিপ্রেক্ষিতে এমন কিছু সুরক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে ভবিষ্যতের নতুন পরিস্থিতিতে তাদের দ্রুত অপসারণ না করা যায়—কারণ এই সম্প্রদায় প্রধানত চাকুরি নির্ভর এবং অপসারিত হলে এই সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রচণ্ডভাবে বিপর্যস্ত হবে। ইঙ্গ-ভারতীয় এবং স্থায়ীভাবে নিবাসিত

---

* গেজেট অব্ ইন্ডিয়া, খণ্ড ১, জুলাই ৭, ১৯৩৪-এ প্রকাশিত।

ইউরোপীয়দের উদ্দেশ্যে এই কর্মপন্থাকে কার্যকরী করবার জন্য কিছু নির্দেশ সংযোজন করা হয়েছে।

৩. দলিত শ্রেণী সম্বন্ধে বলা যায়—সব যুক্তিপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হবে, যাতে জন-কৃত্যকে যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব থাকে। এই বিষয়ে বর্ণহিন্দুদের উদ্দেশ্য, ১৯৩২ সালের 'পুনা চুক্তি'তে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবৃত হয়েছে এবং মহামান্য সম্রাটের সরকার তা নথিভুক্ত করেছেন। এই সম্প্রদায়ের বর্তমান শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার মনে করে। তাদের জন্য সামগ্রিকভাবে হিন্দুদের জন্য নির্ধারিত শতাংশ থেকে কমিয়ে দলিতদের জন্য নির্ধারিত করলে কোনও লাভ হবে না, তবে উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন দলিত শ্রেণীর মানুষরা যেন বঞ্চিত না হয়, তা দেখা হবে, মুক্ত প্রতিযোগিতায় যা সম্ভব নয়।

৪. ভারত সরকার উপরে বর্ণিত সম্প্রদায় সমূহ ছাড়াও অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধেও যত্নসহকারে বিবেচনা করেছেন এবং সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এই কারণে যে, নতুন নিয়মেও বর্তমানের মতো জন-কৃত্যকে যুক্তিসম্মত প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবেন।

অনুবিভাগ-**II** : বিধির পরিধি

৫. ভারত সরকার বাৎসরিক বিবরণ প্রকাশ করার প্রস্তাব দেন, যাতে বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী কতদূর পালিত হচ্ছে, তা বিচারের সুযোগ পাওয়া যায়।

৬. সাধারণ নিয়মাবলী, যা ভারত সরকারের পক্ষে ভারত-সচিব কর্তৃক গৃহীত হয়েছে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, তা নিচে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। এই নিয়মাবলী কেবল সোজাসুজি চাকুরিতে যারা নিযুক্ত হচ্ছে তাদের জন্য—চাকরিতে কাজ করার সময় কোনও উচ্চপদে উন্নতির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না, বর্তমানে যা কেবল যোগ্যতার ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। তারা ভারতীয় জন-কৃত্যকে আবেদন করে সেই সব পদের জন্য যা প্রশাসনের অধীন কেন্দ্রীয় সরকার পদ, ১ম শ্রেণী, ২য় শ্রেণী এবং তার অধীনস্থ অন্যান্য পদ—কেবল কিছু উচ্চ প্রযুক্তি এবং বিশেষ বিষয়ে শংসাপত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত পদ ছাড়া ব্রহ্মদেশের ক্ষেত্রে অবশ্য তা প্রযোজ্য নয়। রেল-পরিষেবার ক্ষেত্রে সমস্ত পদে কিছু অধস্তন পদ যা চারটি দেশীয় রাজ্যের অধীন, তা ছাড়া এবং কোম্পানি পরিচালিত পরিষেবার ক্ষেত্রে উপযুক্ত নিয়মাবলী প্রয়োগের জন্য বলা হবে।

অনুবিভাগ-III : সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে নিয়োগের নিয়মাবলী

৭. (১) ভারতীয় জন-কৃত্যক এবং কেন্দ্রীয় অধীনস্থ কৃত্যকে সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে পরবর্তী উল্লিখিত নিয়মাবলী মান্য করা হবে—

(i) ২৫% সমস্ত পদের ক্ষেত্রেই সোজাসুজি নিয়োগ করা হবে এবং মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং ৮১/৩% সংরক্ষিত থাকবে অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্য।

(ii) যদি অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগ হয়, যদি মুসলমান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুরা এই শতকরা হিসাবের কম পায়, তাহলে তা পূরণ করা হবে মনোনয়নের মাধ্যমে, যদি মুসলমানরা সংরক্ষিত পদের চেয়ে বেশি পায় অবাধ প্রতিযোগিতায়, তাহলে তা অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষিত থাকলেও কমানো হবে না, যদি অন্যান্য সংখ্যালঘুরা অবাধ প্রতিযোগিতায় বেশি পায়, তাহলে কিন্তু মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত পদ কমানো হবে না।

(iii) যদি অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা অবাধ প্রতিযোগিতায় যদি তাদের জন্য সংরক্ষিত পদের জন্য কম পায় এবং যদি মনোনয়নের জন্য যোগ্য লোক না পাওয়া যায়, তাহলে ৮১/৩ থেকে উদ্বৃত পদ মুসলমানরা পাবে।

(iv) সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষিত ৮১/৩% তাদের মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট অনুপাত অনুযায়ী বন্টন করা হবে না।

(v) সব ক্ষেত্রেই যোগ্যতার সর্বনিম্ন মান প্রয়োগ করা হবে এবং সংরক্ষণ নির্ধারিত হবে এর দ্বারাই।

(vi) অবদমিত শ্রেণীর উপযুক্ত শিক্ষিতদের যথেষ্ট প্রতিনিধিত্বর জন্য এই শ্রেণী থেকে জন-কৃত্যকে মনোনীত করা যেতে পারে, যদিও তা অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে হয়ে থাকে। এই শ্রেণী থেকে যাঁরা মনোনীত হবেন, খন্ড (i) অনুসারে তাদের সংরক্ষণের গাণিতিক শতাংশ ধরা হবে না।

(২) এই প্রস্তাবের অনুচ্ছেদ ২-তে বর্ণিত কারণ অনুসারে ভারত সরকার ইঙ্গ-ভারতীয় এবং ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের জন্য রেল-পরিষেবার ঘোষিত পদসমূহে (Gazetted post), যার নিয়োগ সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে হয়, বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। এই দুই সম্প্রদায়ের বর্তমান প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখার জন্য ইঙ্গ-ভারতীয় এবং ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের জন্য এই পদসমূহে নিয়োগের নিমিত্ত ভারতীয়দের জন্য নির্দিষ্ট মোট পদসমূহের ৯% সংরক্ষিত রাখা হবে। ভারত সরকার

তাদের বর্তমানে উন্নীত করে (by promotion) অথবা সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমেই ৯ % এর বেশি পদে সুযোগ দিচ্ছে। এই অবস্থায় স্থির হয়েছে, কোনও বিশেষ সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই। যখন দেখা যাবে, এই দুই সম্প্রদায়ের লোক ৯ % এর কম নিয়োগ পাচ্ছে, তখন যে কোনও সমঝোতা করা হবে তাদের বিধিবদ্ধ নিয়োগ সুরক্ষার জন্য।

অনুবিভাগ - IV : স্থানীয়ভাবে নিয়োগের নিয়মাবলী

সর্ব-ভারতীয় নয় এমন স্থানীয় পরিষেবায় সব রকম নিযুক্তির ক্ষেত্রে, যেমন, অধীনস্থ রেল, ডাক-তার, শুল্ক, আয়কর, ইত্যাদি বিভাগে নিযুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মাবলী নিম্নোক্ত পরিবর্তন সহ প্রযোজ্য হবে।

(i) সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য যে ২৫ % এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য ৮$\frac{১}{৩}$ % সংরক্ষণ নির্ধারিত আছে, তা প্রত্যেক স্থানীয় বা আঞ্চলিক বিভাগে সংরক্ষিত থাকবে জনসংখ্যায় মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনুপাত হিসাবে এবং স্থানীয় সরকারের নিযুক্তির নিয়মানুসারে;

(ii) রেল, ডাক-তার এবং শুল্ক বিভাগে ইঙ্গ-ভারতীয় ও ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়রা বর্তমানে পরবর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত যে বিশেষ সুবিধা ভোগ করছেন, তা বহাল থাকবে।

ইঙ্গ-ভারতীয় ও ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়রা বর্তমানে ৮.৮ % রেল-পরিষেবায় অধস্তন পদে (Subordinate) নিযুক্তি পান, তাদের অবস্থার সুরক্ষার জন্য ৮ % নিয়োগ সংরক্ষিত রাখা হবে এই দুই সম্প্রদায়ের জন্য। মোট সমানুপাতিক অংশ (Percentage) নির্ধারিত হবে অন্য সমানুপাত নির্দিষ্ট করার দ্বারা (i) রেলের প্রতি শাখায় বর্তমানে এই দুই সম্প্রদায়ের নিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে, (ii) রেল-কৃত্যক প্রতি বিভাগে বা শাখায় বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ পদ মর্যাদায় নিযুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে, যেমন আছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ট্রাফিক বিভাগে তেমনি হবে। অধস্তন পদের উচ্চ কোনও পদে এই সংরক্ষণ থাকবে না এবং উচ্চতর পদে উন্নীত হবে যোগ্যতার ভিত্তিতে।

(খ) মুসলমানদের জন্য ২৫ % এবং ইঙ্গ-ভারতীয়দের জন্য ৮ % সংরক্ষণ অর্থাৎ মোট সংরক্ষণ ৩৩$\frac{১}{৩}$ % কে বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে, মুসলমান ও ইঙ্গ-ভারতীয় ছাড়া অন্য সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য। অতএব সিদ্ধান্ত গৃহীত

হয়েছে, এদের জন্য ৬ % নিয়োগ সংরক্ষিত রাখা হবে সরাসরি নিযুক্তির ক্ষেত্রে, যা এই সম্প্রদায়ের বর্তমান নিযুক্ত পদের সমান। মোট সংরক্ষণ এই প্রস্তাবের অনুচ্ছেদ ৮(১)-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে হবে, সংখ্যালঘুদের মধ্যে আর কোনও উপবিভাগ করা হবে না।

৯(২) ডাক-তার বিভাগে এক-ই নীতি অনুসরণ করা হবে যা রেল-পরিষেবার ক্ষেত্রে করা হয় ইঙ্গ-ভারতীয় ও ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের স্বার্থসুরক্ষার জন্য; বর্তমানে যা অধস্তন পদে ২.২ % সংরক্ষিত। এটা স্থির করা হয়েছে যে, যদি এই সম্প্রদায়ের জন্য ৫ % করা হয় বিভিন্ন বা শাখায় বিভাগে বা শ্রেণীতে নিযুক্তির জন্য যা এই সম্প্রদায়ের মানুষরা যুক্তিসঙ্গত কারণেই আশা করতে পারে, তাহলে তা হবে বর্তমানে তারা যে সুবিধা পাচ্ছে, তার চেয়ে কম। ইঙ্গ-ভারতীয় এবং অন্য সংখ্যালঘুদের জন্য মোট সংরক্ষিত পদ, মুসলমান ছাড়া, কোনভাবেই ৮½ %-এর কম হবে না।

৯(৩) ইঙ্গ-ভারতীয়রা বর্তমানে বহুলাংশে সরকারি মূল্য নির্ধারণ বিভাগে (Appraising Department) এবং উচ্চতর নিবারক-কৃত্যকে (Preventive Service) প্রধান পদে নিযুক্ত রয়েছে। প্রথমোক্ত বিভাগের জন্য প্রযুক্তিগত বিদ্যার প্রয়োজন এবং এই প্রস্তাবের অনুচ্ছেদ ৬-এর নীতি নির্ধারণে তা বাদ যাবে রূপায়ণের ক্ষেত্রে। নিবারক-কৃত্যকে যোগ্যতার প্রয়োজন আছে, এবং বর্তমান নিযুক্তির পদ্ধতিতে সংরক্ষিত পদগুলি ইঙ্গ-ভারতীয়দের জন্য সংরক্ষিত-ই থাকবে।

আদেশ—এই প্রস্তাব সমস্ত স্থানীয় সরকার এবং প্রশাসন আর ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে ওয়াকিবহালের উদ্দেশ্যে এবং পথনির্দেশের জন্য জ্ঞাত করার জন্য 'গেজেট অব্ ইন্ডিয়া'-তে প্রকাশ করা হবে।

এম.জি. হাল্লেট

ভারত-সচিব

পরিশিষ্ট XXIV

জন-কৃত্যকে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে ১৯৪৩ সালের ভারত সরকারের প্রস্তাব

স্বরাষ্ট্র দফতর

প্রস্তাব

নতুন দিল্লি, ১১ আগস্ট, ১৯৪৩

নং ২৩/৫/৪২—এস্টাব্লিসমেন্ট (এস)—১৯৪২ সালে কেন্দ্রীয় বিধানমন্ডলে দেওয়া অঙ্গীকার অনুসারে ভারত সরকার খুব যত্ন সহকারে অবদমিত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে যে নীতি ১৯৩৪ সাল থেকে অনুসরণ করে আসছে এবং ১৯৩৫ সালের 'ভারত শাসন আইনে' তাদের সরকারের জন কৃত্যকে তফসিলি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রস্তাব নং এফ ১৪/১৭-বি/৩৩ তারখি, জুলাই ৪, ১৯৩৪, ভারত সরকার বলেছেন যে, এইসব শ্রেণীর ক্ষেত্রে তৎকালীন সাধারন শিক্ষায় মনে করা হয়েছিল, বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হবে না কেবল কিছু পদ তাদের জন্য সংরক্ষিত রেখে। আদেশে তফসিলি জাতের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন এই শ্রেণীর লোকদের জন-কৃত্যকে মনোনীত করা যেতে পারে, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগ পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও। তখন থেকে জন-কৃত্যকে তফসিলিদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির বিবিধ প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত, তেমন কোনও মূল্যবান ফল পাওয়া যায়নি। ভারত সরকার যদিও স্বীকার করে নিয়েছে যে, এর প্রধান কারণ হল শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর অভাব, তবু এখন তারা বলছে যে যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ পদের জন্য সংরক্ষণ প্রথা চালু হয়, তাহলে এই শ্রেণীর প্রার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন সরকারি পদের জন্য উপযুক্ত হবার জন্য শিক্ষাগত মান উন্নয়নে উদ্দীপনা সঞ্চার করবে। নিযুক্তির বয়স শিথিল করা এবং আবেদনের জন্য শুল্ক কমানো হলে তফসিলি শ্রেণী থেকে শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী পেতে সাহায্য করবে। ভারত সরকার এই পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিছু নিয়ম গ্রহণ করতে, যা অনুচ্ছেদ ৪-এ উল্লিখিত হয়েছে।

২. মোট জনসংখ্যার যে অনুপাতে তফসিলি জাত ও অন্যান্যরা অসংরক্ষিত পদে নিযুক্তির যে সুযোগ পায়, তা হবে মোট নিযুক্তির ১২.৭৫%। হয়তো জনসংখ্যার অনুপাতে তফসিলি জাতের প্রার্থীর উক্ত সংরক্ষিত পদ পূর্ণ করতে পারবে না। ভারত সরকার তাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, বর্তমানে এদের জন্য সংরক্ষিত পদ কিছু কম থাকবে, অর্থাৎ তা হবে ৪২%। যখনই শিক্ষাগত দিক থেকে এই সব শ্রেণীর যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যেতে আরম্ভ হবে, তখনই এই পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে।

৩. নিচে যে নিয়মাবলীর উল্লেখ করা হচ্ছে, তা সোজাসুজি নিযুক্তির জন্য নির্দিষ্ট থাকবে, কর্মক্ষেত্রে উন্নতির ক্ষেত্রে নয়। ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় জন-কৃত্যকে (শ্রেণী-I এবং শ্রেণী-II) এবং অধস্তন পদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে, কেবল কিছু পদে যেখানে প্রযুক্তি বিদ্যায় অতিশয় যোগ্য এবং অন্য বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন হবে, সেগুলি এই সাম্প্রদায়িক সংরক্ষণ বিষয়ে নং এফ, ১৪/১৭-বি/৩৩, তারিখ, জুলাই ৪, ১৯৩৪-এ গৃহীত প্রস্তাবের বাইরে রাখা হয়েছে। রেল-পরিষেবার ক্ষেত্রে সব পদেই এই নিয়ম প্রযুক্ত হবে, কেবল শ্রমিক ও ভৃত্য ছাড়া। কোম্পানি প্রশাসিত রেল-পরিষেবায় এই নিয়ম চালু করতে বলা হবে।

৪. জন-কৃত্যকে তাই পরবর্তী উল্লিখিত নিয়মাবলী ভবিষ্যতে পালন করা হবে তফসিলি জাতের বেশি প্রতিনিধিত্বের জন্য ঃ—

(ক) কেন্দ্রীয় এবং অধস্তন কৃত্যকে যেখানে সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে সরাসরি নিয়োগ করা হয়, সেখানে সব ক্ষেত্রেই ৮$\frac{১}{৩}$% পদ তফসিলিদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

(খ) সর্ব-ভারতীয় নয় অর্থাৎ স্থানীয়ভাবে যে-সব নিয়োগ হয়, যেমন—রেল, ডাক-তার। শুল্ক, আয়কর ইত্যাদি বিভাগের অধস্তন কর্মচারিদের ক্ষেত্রে যে সর্ব-ভারতীয় সংরক্ষণ ৮$\frac{১}{৩}$% রয়েছে, তা তফসিলিদের জন্য বিভিন্ন স্থানে করা হবে স্থানীয় তফসিলি সংখ্যার অনুপাতে এবং সেই স্থানে প্রাদেশিক সরকারের নিয়মাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে।

(গ) যেখানে মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগ হবে এবং যদি তফসিলি জাতের প্রতিনিধিত্ব কম হয়, তাহলে তা নতুন সংরক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারিত হবে স্থানীয় অঞ্চলের জন্য জনসংখ্যায় তফসিলি জাতের অনুপাত ধরে এবং প্রাদেশিক সরকারের নিয়ম অনুসরণ করে।

মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যখন নিয়োগ হয় এবং তফসিলি প্রার্থীরা তাদের

জন্য সংরক্ষিত পদের চেয়ে কম পদে নিযুক্তি পায়, তখন সেই ব্যবধান, সম্ভব হলে, তখন শিক্ষাগত যোগ্য প্রার্থীদের সেই সব শ্রেণী থেকে মনোনীত করা যেতে পারে ব্যবধান কমাতে।

(ঘ) যদি তফসিলি জাতের প্রার্থীরা তাদের জন্য সংরক্ষিত পদে মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কম নিযুক্তি পায় এবং তফসিলিদের থেকে যদি যোগ্য প্রার্থী না পাওয়া যায়, অথবা মনোনয়নের জন্য যথেষ্ট প্রার্থী না পাওয়া যায়, তাহলে বাকি পদগুলি যা সংরক্ষিত বলে ঘোষিত ছিল, তা হবে অ-সংরক্ষিত; তবে মানানসই কিছু পদ তাদের জন্য পরের বৎসরে আগে উল্লিখিত খণ্ড-১ এবং খণ্ড-২ অনুসারে সংরক্ষিত থাকবে।

(ঙ) যদি তফসিলিদের থেকে উপযুক্ত শিক্ষাগতমানের প্রার্থী খণ্ড-ঘ অনুসারে পরের বছরেও না পাওয়া যায়, তাহলে পদগুলি অ-সংরক্ষিত বলে ধরা হবে।

(চ) প্রতি ক্ষেত্রেই শিক্ষার একটি নিম্নতম মান নির্দিষ্ট থাকবে এবং সংরক্ষণ তা মেনে চলবে।

(ছ) তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে চাকরির অধিকতম বয়স ৩ বছর বেশি হবে।

(জ) তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কোনও পরীক্ষা বা নিয়োগের জন্য দেয় অর্থ নির্ধারিত পরিমাণের এক-চতুর্থাংশ হবে।

(ঝ) উপরে উল্লিখিত নিয়মাবলী সম্বন্ধে আদেশ তিন মাস বা ততোধিক সময়ের জন্য হলেও তা প্রযোজ্য হবে—স্থায়ী পদে সরকারি-কৃত্যকে অস্থায়ী নিয়োগের ক্ষেত্রেও মান্য হবে।

(ঞ) এই নিয়মাবলী অনুসারে একজন ব্যক্তিকে তফসিলি তখন-ই বলা যাবে, যদি ভারত সরকারের (তফসিলি জাত) আদেশ, ১৯৩৬ অনুযায়ী তাকে কোনও অঞ্চলের তফসিলি জাতভুক্ত বলা যাবে। যেখানে সে পরিবার সহ বসবাস করে।

আদেশ ঃ এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি সমস্ত মুখ্য মহাধ্যক্ষ (Chief Commissioner), ভারত সরকারের বিভিন্ন দফতর, গোয়েন্দ ব্যুরো এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় জন-কৃত্যকে (Federal Public Service Commission) জ্ঞাপন ও পথ নির্দেশের জন্য; রাজনৈতিক বিভাগ, সম্রাটের অর্থ বিভাগ, বড়লাটের সচিব (জনতা), বড়লাটের সচিব (সংস্কার), বড়লাটের সচিব (ব্যক্তিগত), বিধানমণ্ডল বিভাগ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ন্যায়ালয় (Federal Court), মহামহিমের ভাইসরয়ের সামরিক সচিব, সমস্ত প্রাদেশিক সরকারকে পনের জন্য পাঠান হবে। গেজেট অব্ ইন্ডিয়াতে প্রকাশিত হবে। ই. কনরন-স্মিথ সচিব।

পরিশিষ্ট XXV

ক্রিপস্ প্রস্তাব

মার্চ ২৯, ১৯৪১ সালে প্রকাশিত

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য খসড়ার ঘোষণা

মহামহিম সম্রাটের সরকার এ-দেশে এবং ভারতে উদ্বেগের কথা চিন্তা করে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে যথাযথ এবং স্পষ্টভাবে তাঁরা ভারতে যত দ্রুত সম্ভব স্ব-শাসিত সরকার গঠনের জন্য যে পদক্ষেপ নেবার প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, তা তুলে ধরবেন। এর উদ্দেশ্য, একটি নতুন ভারতীয় সংঘ (Union) তৈরি করা, যা একটি অধিরাজ্য (Dominion) গঠন করবে ইউনাইটেড কিংডম এবং অধিরাজ্যের সঙ্গে সম্রাটের সাধারন আনুগত্য সহ, অবশ্য প্রতি ক্ষেত্রেই তার স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র বিভাগকে অধস্তন না করে।

মহামহিম সম্রাটের সরকার, তাই পরবর্তী কয়েকটি ঘোষণা করছে;

(ক) অবিলম্বে বিরোধিতা বন্ধ করে ভারতে এমন অবস্থা তৈরি করতে হবে, যাতে এর পরে বিবৃত ব্যবস্থা অনুযায়ী নতুন সংবিধান রচনার দায়িত্ব নিতে নির্ধারিত সংস্থা গঠন করতে হবে।

(খ) দেশীয় রাজ্যগুলিকে সংবিধান রচনার জন্য গঠিত সংস্থার সঙ্গে যুক্ত করার ব্যবস্থা থাকবে।

(গ) মহামহিম সম্রাটের সরকার সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তুত সংবিধান মানতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে। যদি কেবল—

(i) ব্রিটিশ-ভারতের যে কোনও প্রদেশের ক্ষমতা থাকবে, যারা নতুন সংবিধান মানতে সম্মত নয়—বর্তমান সংবিধান চালু থাকবে যাতে পরবর্তী সময়ে সংযোজিত হবার ব্যবস্থা থাকবে।

যোগদানে অনিচ্ছুক প্রদেশগুলি, যদি মনে করে, মহামহিম সম্রাটের সরকার নতুন সংবিধান রচনায় সম্মতি দেবেন, ভারতীয় ইউনিয়নের সমান মর্যাদায় এবং এখানে যা তুলে ধরা হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।

(ii) চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে মহামহিম সম্রাটের সরকারের সঙ্গে সংবিধান রচনাকারী দলের (body) সঙ্গে। এইচুক্তি ব্রিটিশের হাত ভারতীয়দের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে যে সব প্রসঙ্গ উঠবে, তার সব কিছুকেই জড়িয়ে নেবে; এতে কিছু শর্ত থাকবে যা মহামহিম সম্রাটের সরকার অস্বীকার করেছেন জাতগত এবং ধর্মগত সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য; কিন্তু এমন কোনও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে না যা ভারতীয় ইউনিয়ন কমনওয়েলথভুক্ত অন্য কোনও দেশের সঙ্গে ভবিষ্যতে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না।

দেশীয় রাজ্য সংবিধান স্বীকার করুক আর নাই করুক। এই চুক্তি সম্পাদনে এবং তার পরিমার্জনে তার সঙ্গে সমঝোতা জরুরি হয়ে উঠবে নতুন পরিস্থিতিতে।

সংবিধান রচনার জন্য যে সমিতি হবে, তা হবে পরবর্তী উল্লেখের মতো, যতক্ষন না মূল সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষরা ভারতীয় জনমতের সঙ্গে অভিন্ন না হতে পারে এবং বিরোধিতা বন্ধ করে ঃ—

প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল জানার পরেই, যা বিরোধিতা থামার পর হবে একান্ত জরুরি, প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলের নিম্নকক্ষের সকল সদস্য একটি নির্বাচক মণ্ডল হিসাবে সংবিধান প্রণেতা কমিটি গঠন করবে রাজ্যভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে। এই নতুন কমিটি নির্বাচকমণ্ডলের (electoral college) এক দশমাংশ হবে।

দেশীয় রাজগুলিকে আহ্বান করা হবে এক-ই ভাবে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি মনোনয়ন করতে, যেমন সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ-ভারত প্রতিনিধিত্ব করবে এবং ব্রিটিশ-ভারতের সদস্যদের মতো সমান অধিকার সহ।

এই সংকটময় মুহূর্তে যার মুখোমুখি এখন ভারত, যতদিন না নতুন সংবিধান রচিত না হয়, ততদিন মহামহিম সম্রাটের সরকার অনিবার্য কারণে বিশ্বযুদ্ধের অঙ্গ হিসাবে ভারতের প্রতিরক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব বহন ও শাসন করবে। কিন্তু ভারতের সামরিক ব্যবস্থার নৈতিক এবং বাস্তব সংসাধনের দায়িত্ব হবে ভারত সরকারের ভারতের জনগণের সহযোগিতায়। মহামহিম সম্রাটের সরকার আশা করেন এবং ভারতীয় প্রধান সম্প্রদায় সমূহের নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করছে, অবিলম্বে তাঁদের দেশের হয়ে কমনওয়েলথ এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘে বক্তব্য রাখতে। তাহলে তাঁরা ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার জন্য অতি তেজোদীপ্ত, আবশ্যক সক্রিয় ও গঠনমূলক দায়িত্ব পালনে সমর্থ হবেন।

মানচিত্রাবলী

মানচিত্র-১

পঞ্জাবের হিন্দু ও মুসলমান অঞ্চল
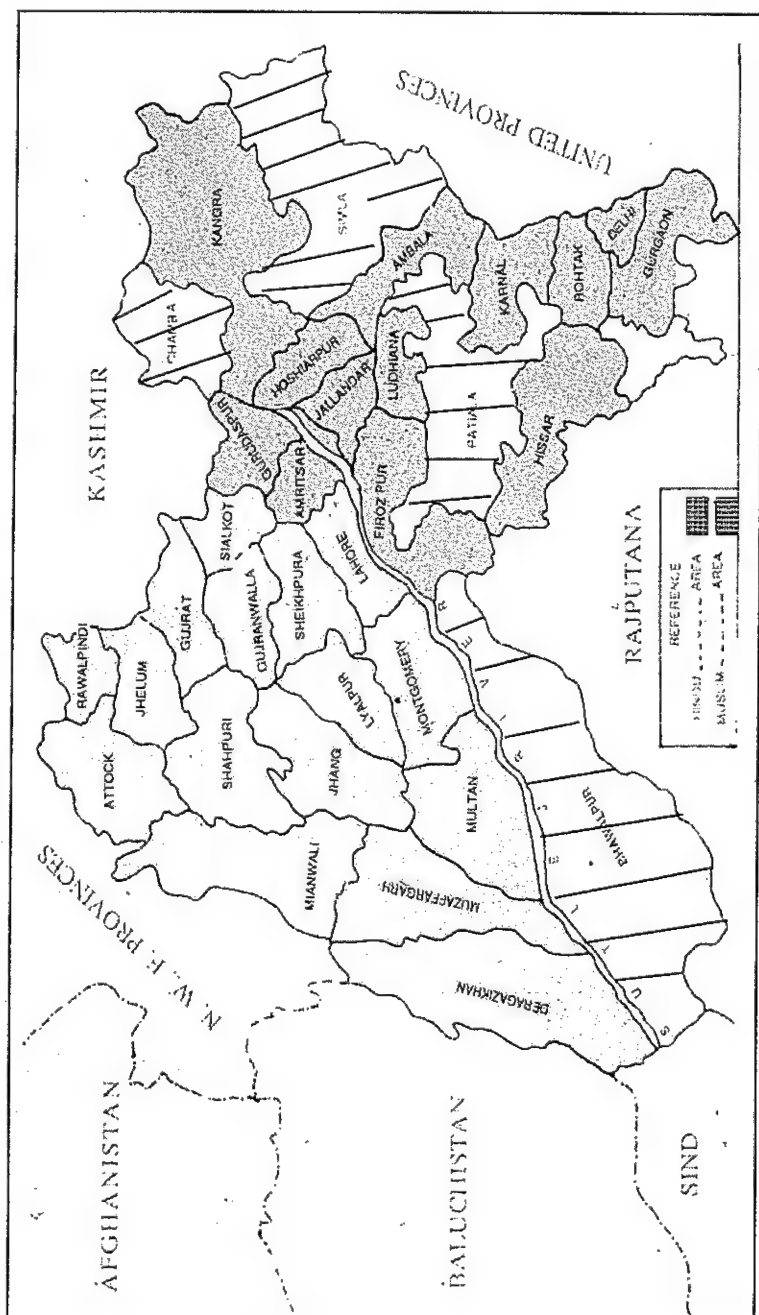
মানচিত্র-২

বাংলা ও অসমের হিন্দু ও মুসলমান অঞ্চল
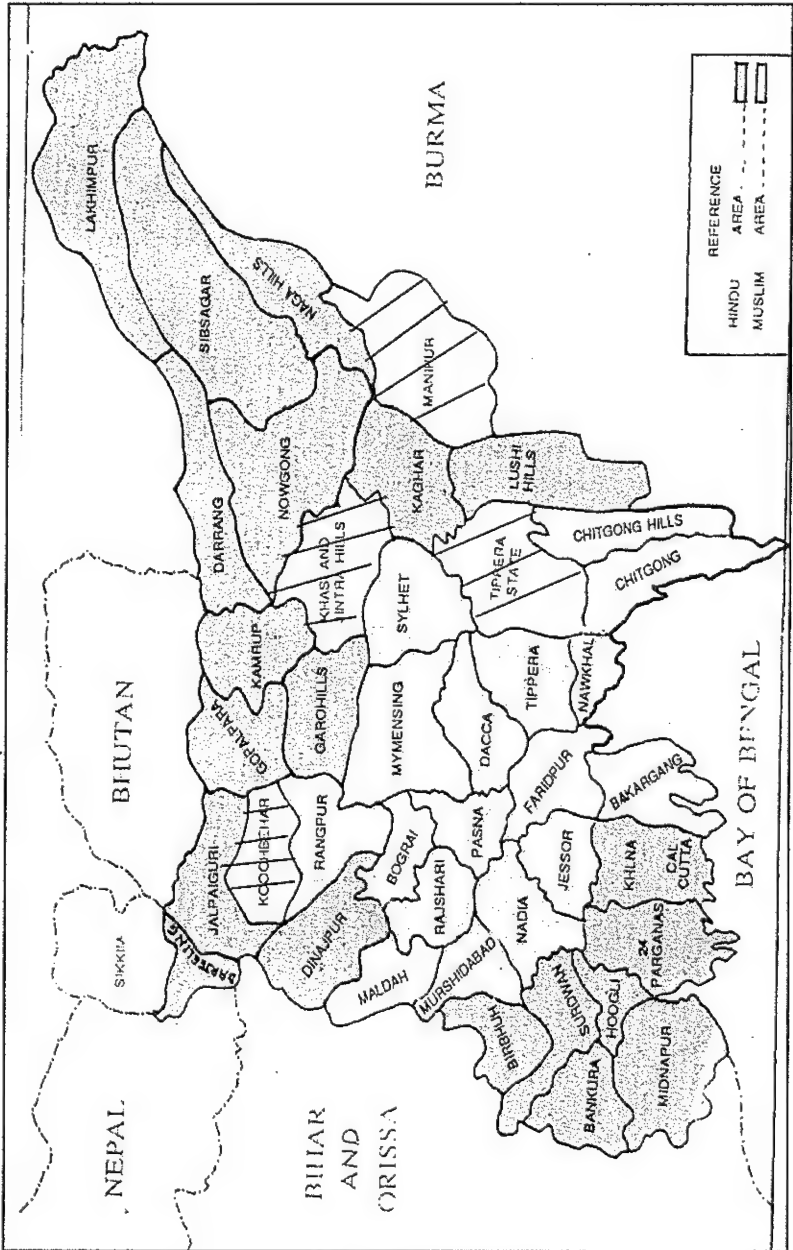
মানচিত্র-৩

পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থানে বিভক্ত ভারত
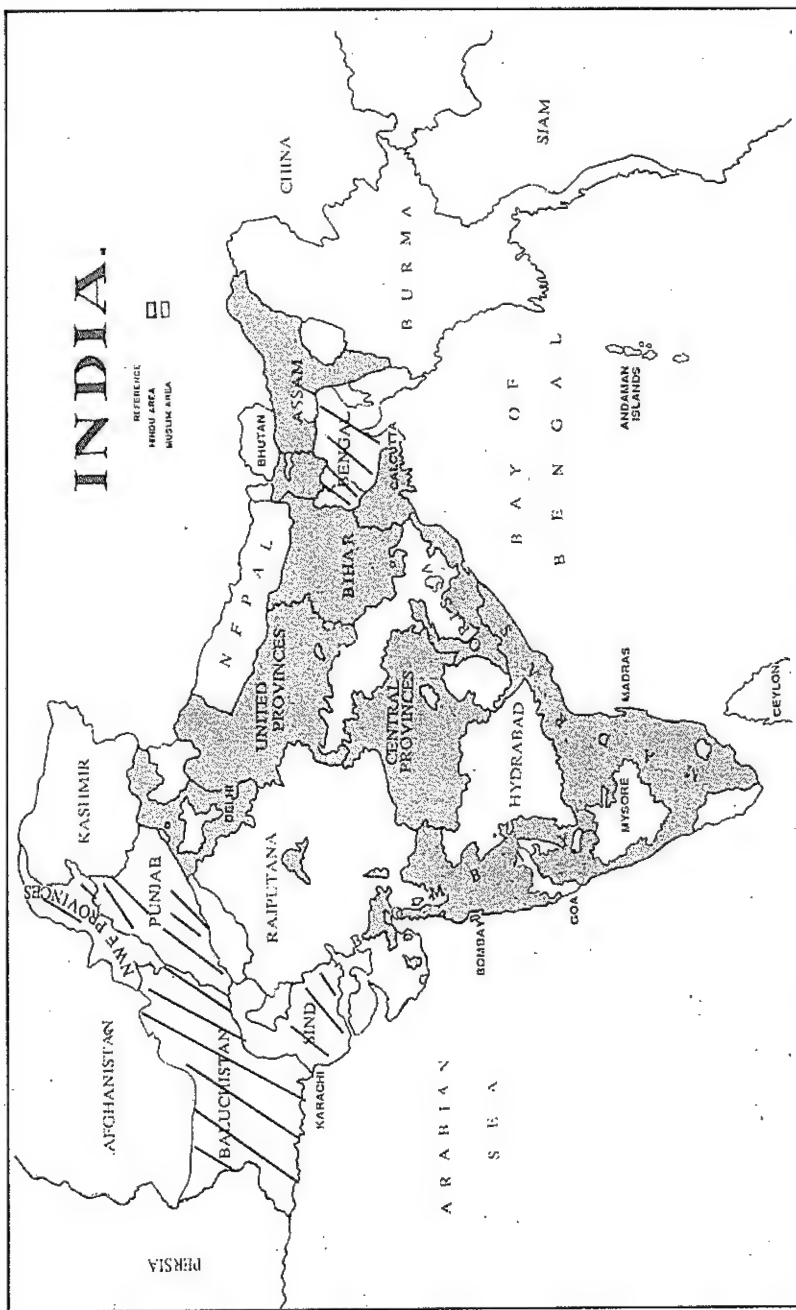
আম্বেদকর রচনা-সম্ভার : পঞ্চদশ খণ্ড

অনুবাদে : বাংলা ভাষায়

- সৈয়দ কওসর জামাল (পৃ : ১৭-২৫৫) : বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক। ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের বিশিষ্ট আধিকারিক।

- শান্তনু পালধি (২৫৬-৫১৭) : ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন সার্ভিসের সদস্য ; ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের পদস্থ আধিকারিক। বর্তমানে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের সংবাদ বিভাগের যুগ্ম নিদেশক। প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক।

অনুমোদনে : বাংলা ভাষায়

- আশিস সান্যাল : বিশিষ্ট কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, শিশু সাহিত্যিক, ও অনুবাদক। বহু পুরস্কারে সম্মানিত এবং বহু দেশে সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। ইন্ডিয়ান রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক।

নির্ঘণ্ট